মিখাইল শোলখভ
প্রশান্ত দন
দ্বিতীয় খণ্ড
প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ

ম. শোলোখভ · প্রশান্ত দন · ১

ভরোনেজ
বগুচার
কাজান্স্কায়া
মিশুলিন্স্কায়া
ভিওশেন্স্কায়া
বাজকি
তাতারস্কি
সেত্রাকভ
চের্ত্কোভো
কার্গিন্স্কায়া
মিলেরোভো
গ্লুবোকায়া
কামেন্স্কায়া
নোভোচের্কাস্ক
রস্তোভ
তাগান্রোগ
দন
বাতাইস্ক
সাল

ভোলগা
সারাতভ
পতোরিনো
লাল দরী
মেদ্‌ভেদিৎসা
কামিশিন
কুমিলজেন্‌স্কায়া
উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া
উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া
ত্সারিৎসিন
চির
ভোলগা
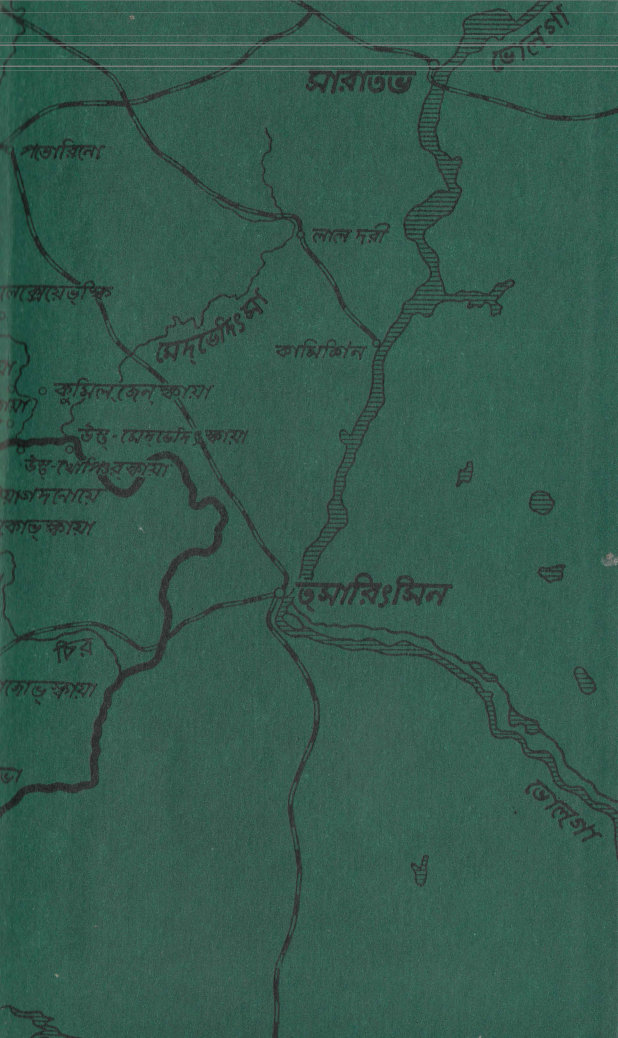
প্রশান্ত দন

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

М. Шолохов
Тихий Дон
Книга II
На языке бенгали

Mikhail Sholokhov
Quiet Flows the Don
Book Two
In Bengali

М. Шолохов, Тихий Дон. Роман в 4-х книгах. Книга II. Перевод сделан по изданию: Шолохов М., Тихий Дон, в 2 т т., Т.1, изд-во »Молодая гвардия«, М., 1980.

Редактор русского текста: *Е.К. Нестерова*
Контрольный редактор: *В. Л. Коровин*
Корректор: *Н. А. Антонова*

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-002893-0
ISBN 5-05-002895-7

সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পর্ব ৯
পঞ্চম পর্ব ২৩৪

প্রশান্ত দন

দ্বিতীয়
খণ্ড

চতুর্থ পর্ব

এক

১৯১৬ সাল। অক্টোবর। রাত্রি। বৃষ্টি আর বাতাস। বেলোরুশিয়ার পলিয়েসিয়ে অঞ্চল। অ্যাল্‌ডার গাছের জঙ্গলে ছাওয়া একটা জলা জায়গার মাথার ওপরে ট্রেঞ্চের সারি। সামনে কাঁটাতারের বেড়া। ট্রেঞ্চের ভেতরে ঠাণ্ডা জলকাদা। নজর রাখার ঘাঁটির আড়াল-করা ঢালটা ভিজে আবছা চকচক করছে। সুড়ঙ্গ-ঘরগুলোর এখানে সেখানে একটু আধটু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। অফিসারদের একটা সুড়ঙ্গ-ঘরের ঢোকার মুখে একজন গাঁট্টাগোট্টা গোছের অফিসার এক মুহূর্তের জন্য থামল। তার হাতের ভিজে আঙুলগুলো গ্রেটকোটের বাঁধন খুলতে গিয়ে পিছলে যেতে লাগল। দ্রুত হাতে বাঁধনগুলো সে খুলে ফেলল, কলার থেকে জল ঝেড়ে ফেলল, কাদার ভেতরে পায়ে মাড়ানো একটা খড়ের গাদায় চটপট বুটজোড়া ঘসে মুছে নিল, তার পরেই ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে কুঁজো হয়ে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে ঢুকল।

ছোট একটা কেরোসিন-বাতির হলদে আলোর রেখা আগন্তুকের মুখের ওপর পড়ল। তেল চকচকে দেখাল তার মুখটা। বুকখোলা চামড়ার কোর্তা গায়ে একজন অফিসার তক্তপোষ ছেড়ে উঠে পড়ল। পাক ধরা এলোমেলো চুলের রাশির ভেতরে হাত চালিয়ে হাই তুলল। জিজ্ঞেস করল, 'বৃষ্টি পড়ছে?'

'হ্যাঁ।' আগন্তুক তার ধড়াচুড়ো খুলল। দরজার কাছে একটা পেরেকের গায়ে গ্রেটকোট আর ভিজে জবজবে টুপিটা টাঙিয়ে রেখে বলল, 'এখানে ত দিব্যি গরম। হাওয়া বেশ তাতিয়ে উঠেছে দেখছি।'

'আমরা এই হালে চুল্লি জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছি। কাদামাটির তলা থেকে জল ঠেলে উঠে অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে। হতচ্ছাড়া বৃষ্টিতে আমাদের ভোগান্তির একশেষ। অ্যাঁ . . . আপনার কী মনে হয় বুনচুক?'

লোমশ হাত দু'খানা ঘসতে ঘসতে বুনচুক কুঁজো হয়ে আলগোছে চুল্লীর কাছে গিয়ে বসল: 'কিছু তক্তা পেতে দিন। আমাদের সুড়ঙ্গখানার চেহারা খোলতাই হবে, খালি পায়ে হাঁটা যাবে। . . . লিস্ত্‌নিৎস্কি কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'কতক্ষণ হল?'

'এক চক্কর টহল দিয়ে ঘুরে এসেই শুয়ে পড়েছে।'

'জাগালে হয় না এখন?'

'দিন না জাগিয়ে। এক হাত দাবা খেলা যাক।'

তর্জনী দিয়ে চওড়া ঘন ভুরু থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলে মাথা না তুলেই মৃদুস্বরে ডাক দিল বুনচুক, 'ইয়েভ্গেনি নিকলায়েভিচ।'

'ঘুমোচ্ছে,' চুলে-পাক-ধরা অফিসারটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'ইয়েভ্গেনি নিকলায়েভিচ!'

'কী ব্যাপার?' কনুইয়ে ভর দিয়ে লিস্তনিৎস্কি শরীরটা সামান্য ওঠায়।

'এক হাত দাবা চলবে?'

লিস্তনিৎস্কি বিছানা থেকে পা নামিয়ে দেয়। গদির মতো নরম গোলাপী রঙের হাতের তেলো দিয়ে ফুলোফুলো বুকটা অনেকক্ষণ ধরে রগড়ায়।

প্রথম দফার খেলা যখন শেষ হতে চলেছে সেই সময় ভেতরে এসে ঢুকল আরও দু'জন অফিসার – পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনের মেজর কাল্মিকোভ আর লেফ্টেনাণ্ট চুবোভ।

'খবর আছে!' চৌকাটের পার থেকেই চেঁচিয়ে বলল কাল্মিকোভ। 'রেজিমেণ্টটা খুব সম্ভব সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

'এ খবর আবার কোত্থেকে পেলে হে?' চুলে-পাক-ধরা সাব-অল্টার্ণ মের্কুলভ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল।

'কী, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি পেতিয়া খুড়ো?'

'সত্যি কথা বলতে গেলে কি, না।'

'ব্যাটারীর কম্যাণ্ডার টেলিফোনে জানাল। সে কী করে জানল? আরে, সবে গতকাল যে ফিরেছে ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার থেকে!'

'ওঃ হামামে গিয়ে আচ্ছা করে গরমজলে চান করতে পারলে মন্দ হত না!'

চুবোভ গদগদ উল্লাসভরে এমন করে হাসল যেন স্নান করার সময় পাছায় সপাসপ বার্চের ডালের বাড়ি মেরে পরম তৃপ্তি পাচ্ছে। মের্কুলভ জোরে হেসে উঠল।

'আমাদের সুড়ঙ্গ-ঘরে একটা বয়লার রেখে দিলেই ত দিব্যি সে কাজ সারা যায় – জলের কোন অভাব নেই এখানে।'

'ভিজে, বড্ড ভিজে মশাই আপনাদের এই জায়গাটা,' গুঁড়ির পর গুঁড়ি সাজিয়ে তৈরি দেয়াল আর কাদা প্যাচপেচে মাটির মেঝের দিকে তাকাতে তাকাতে কাল্মিকোভ গজগজ করে বলল।

'পাশেই বিল রয়েছে কিনা।'

'সর্বশক্তিমান ইশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে এখানে এই বিলের কাছে পরম নির্ভাবনায় আছেন,' কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটল বুনচুক। 'শক্ত জায়গা হলে আমাদের ওপর আক্রমণ চলত। কিন্তু এখানে আমাদের সপ্তাহে একটার বেশি কার্তুজের ক্লিপ খরচ করতে হয় না।'

'এখানে জ্যান্ত অবস্থায় পচে মরার চেয়ে আক্রমণের মুখে পড়াও ভালো।'

'এর জন্যে কসাকদের পোষা হয় না পেতিয়া খুড়ো। আক্রমণের মুখে ধ্বংস করার জন্যে নয়। অমন ন্যাকা সাজলে কী হবে, সে তুমিও ভালো জান।'

'তাহলে কী জন্যে পোষা হয় বলে তোমার ধারণা?'

'সরকার উপযুক্ত সময় তার পুরনো অভ্যেসমতো কসাকদের কাঁধে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে।'

'যতসব উদ্ভট কথা।' কাল্‌মিকোভ হাত নেড়ে তার কথাটা উড়িয়ে দিল।

'কেন? উদ্ভট হতে যাবে কেন?'

'যেহেতু তাই।'

'ছাড় দেখি কাল্‌মিকোভ! আসল কথায় এসো। যা সত্যি তাকে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।'

'সত্যির আবার কী আছে ওর মধ্যে?'

'কিন্তু একথা ত সকলেরই জানা। তুমি অমন না জানার ভান করছ কেন?'

'অ্যাটেনশন প্লীজ, অফিসার ভদ্রমহোদয়গণ!' থিয়েটারী ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বুনচুককে দেখিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চুবোভ। 'কর্ণেট বুনচুক এখন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্বপ্নকথা ব্যাখ্যা করে শোনাবেন।'

'আপনি কি তামাসা করতে চান?' বুনচুক সোজাসুজি চুবভের চোখের দিকে তাকাতে চুবোভ চোখ ফিরিয়ে নিল। বাঁকা হেসে বলল, 'সে যাক গে, চালিয়ে যান – যার যেমন মত সে সেই মতো চলবে, এটাই ত স্বাভাবিক। আমি বলতে চাই, গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে যুদ্ধের কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই খুঁটি আঁকড়ে থাকার লড়াই যে দিন থেকে শুরু হয়েছে সেই দিন থেকেই কসাক রেজিমেন্টগুলোকে বেশ নিরাপদ জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত আপাতত তাদের এই ভাবেই লুকিয়ে রেখে দেওয়া হবে।'

'বেশ ত, তারপর?' দাবার ঘুঁটিগুলো তুলে রাখতে রাখতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'তারপর? তারপর ফ্রন্টে যখন অসন্তোষ শুরু হয়ে যাবে – এটা হবেই: সৈন্যদের পালানোর যেমন হিড়িক পড়ে গেছে তা থেকেই প্রমাণ হয় যে লড়াই

ভেজেন্‌বের্গ, নার্ভা, ইয়াম্‌বুর্গ, গাত্‌চিনা, সোম্‌রিনো, ভিরিৎসা, চুদোভো, গ্‌দোভ, নোভ্‌গোরদ, দ্‌নো, প্‌স্কোভ, লুগা এবং মাঝখানকার যত ছোট স্টেশন, পাশের যত ছোট ছোট লাইন সৈন্য-বোঝাই গাড়িগুলো আস্তে আস্তে চলাচল করার ফলে কিংবা আটকে যাবার ফলে গাদাগাদি হয়ে উঠল। রেজিমেন্টগুলো ওপরওয়ালা অফিসারদের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। স্কোয়াড্রনগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল। পথের মাঝখানেই কোর্‌ আর তার সঙ্গে যুক্ত আদিবাসী ডিভিশনটাকে আর্মি হিশেবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল। তখন বিশৃঙ্খলা চরমে উঠল। এর জন্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইউনিটগুলো গুছিয়ে এনে জায়গামতো তাদের সরিয়ে রাখা, সামরিক ট্রেনগুলোকে ঢেলে সাজানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। সব মিলিয়ে তালগোলপাকানো এক জটিল অবস্থা। নানা রকম অসঙ্গত, কখনও কখনও বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্ত হুকুম আসতে থাকে। তাছাড়া পরিবেশও স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

পথে রেল-শ্রমিক ও রেল-কর্মচারীদের বিরোধিতার সামনাসামনি হয়ে, নানা রকম বাধা বিপত্তি কাটিয়ে কর্নিলভের সৈন্যবাহিনী বোঝাই গাড়িগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পেত্রোগ্রাদের দিকে। জংশনগুলোতে গাদাগাদি ভিড় জমিয়ে তারপর আবার চলতে শুরু করল।

খাঁচার মতো দেখতে লাল রঙের কামরায় কামরায় জিন-খুলে-রাখা অর্ধভুক্ত ঘোড়াগুলোর পাশে দন, উস্‌সুরি, ওরেন্‌বুর্গ, নের্‌চিন্‌স্ক ও আমুরের কসাকরা, ইংগুশি, চের্‌কেসী, কাবার্দিনীয়, ওসেতিন আর দাগেস্তানীরা ভিড় করে আছে। তারাও অর্ধভুক্ত। রাস্তা খালি পাওয়ার জন্য গাড়িগুলো স্টেশনে স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। কসাকরা তখন হুড়হুড় করে কামরা থেকে নেমে পড়ে, পঙ্গপালের মতো ছেয়ে ফেলে স্টেশন-ঘর, রেললাইনের ওপর ভিড় করে দাঁড়ায়, আগের সৈন্যবোঝাই ট্রেনগুলোর ফেলে যাওয়া খাবারদাবার যা পায় সব গেলে, অলক্ষ্যে স্থানীয় লোকজনের ওপর চুরি বাটপারি করে, খাবারের গুদাম লুট করে।

কসাকদের প্যান্টের দু'পাশের হলুদ আর লাল ডোরা, ড্রাগুন সৈন্যদের পরিপাটি কোর্তা, পাহাড়ীদের লম্বা চের্‌কেসীয় কোর্তা। . . . বর্ণলেপনে কুণ্ঠিত উত্তরাঞ্চলের প্রকৃতি এমন ঐশ্বর্যময় বর্ণসমাহার এর আগে আর কখনও দেখে নি।

আগস্টের ২৯ তারিখে প্রিন্স গাগারিনের পরিচালনাধীন আদিবাসী ডিভিশনের তিন নম্বর ব্রিগেড পাভ্‌লভ্‌স্কের কাছে শত্রুপক্ষের সংস্পর্শে এলো। রেললাইন তুলে ফেলা হয়েছে দেখে ডিভিশনের মাথার দিককার ইংগুশ ও চের্‌কেসীয় রেজিমেন্ট ট্রেন থেকে নেমে কুচকাওয়াজ করে ত্‌সার্‌স্কোয়ে সেলোর দিকে রওনা দিল। ইংগুশদের ঘোড়সওয়ার টহলদার দলগুলো সোম্‌রিনো স্টেশন পর্যন্ত ভেতরে

ঢুকে গেল। গার্ড-বাহিনীর যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রেজিমেন্টগুলো ধীরগতিতে সামনে এগোতে লাগল, ডিভিশনের অন্য সব ইউনিট যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে ইউনিটগুলো তখনও দনোতেই আটকে পড়ে ছিল। কোন কোনটা আবার সে পর্যন্তও পৌঁছুতে পারে নি।

স্টেশন থেকে অল্প খানিকটা দূরে এক জমিদারের তালুকে আস্তানা গাড়ল আদিবাসী ডিভিশনের কম্যাণ্ডার প্রিন্স বাগ্রাতিওন, কুচকাওয়াজ করে ভিরিৎসা পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে এখানে বাকি ইউনিটগুলোর সমাবেশের প্রতীক্ষায় রইল।

২৮ তারিখে উত্তরাঞ্চলের সদর দপ্তর থেকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামের একটা কপি তার কাছে এসে পৌঁছুল:

> তিন নম্বর কোর্-এর কম্যাণ্ডার এবং এক নম্বর দন ডিভিশন, উসুরী ও ককেশীয় আদিবাসী ডিভিশনগুলির প্রধানদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন এই মর্মে সর্বাধিনায়কের একটি আদেশ ঘোষণা করেন যে কোন অজ্ঞাতপূর্ব পরিস্থিতিবশত রেলপথে সামরিক ট্রেনসমূহের চলাচল যদি দুরূহ হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সর্বাধিনায়কের নির্দেশানুসারে অতঃপর ডিভিশনগুলিকে শৃঙখলাবদ্ধ হইয়া কুচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।
>
> ২৭ আগস্ট ১৯১৭। নং ৬৪১১ রমানোভ্স্কি

সকাল প্রায় নয়টা নাগাদ বাগ্রাতিওন টেলিগ্রাফ করে কর্নিলভকে জানিয়ে দিল যে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে পেত্রোগ্রাদ সামরিক জেলার সদর দপ্তরের প্রধান কর্ণেল বাগ্রাতিওনের মারফত কেরেন্স্কির একটা নির্দেশ সে পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে সব ডিভিশন যেন ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সাময়িক সরকারের নির্দেশ অনুসারে রেল বিভাগ যেহেতু গাড়ি চলতে দিচ্ছে না সেই হেতু গাচ্কার সাইডিং লাইন থেকে ওরেদেজ স্টেশন পর্যন্ত রেলপথের ওপর যত ডিভিশন আছে সবগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিন্তু কর্নিলভের একটা প্রস্তাবও সে পেয়েছে, যাতে বলা হয়েছে:

> প্রিন্স বাগ্রাতিওন সমীপেষু। রেলপথে যাত্রার প্রয়াস অব্যাহত থাকিবে। রেলপথে যাত্রা অসম্ভব হইয়া দেখা দিলে শৃঙখলাবদ্ধ হইয়া কুচকাওয়াজপূর্বক লুগায় পহুঁছিয়া একান্তভাবে জেনারেল ক্রিমভের অনুবর্তী হইতে হইবে।

করে করে তারা এখন বিরক্ত – তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য ডাক পড়বে কসাকদের। সরকার কসাক বাহিনীকে মুগুর হিশেবে হাতে ধরে রেখেছে। উপযুক্ত মুহূর্তে এই মুগুর দিয়ে সরকার বিপ্লবের মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দেবে।'

'ওহে বন্ধুবর, অনেক দূর চলে গেছ দেখছি! তোমার ওই অনুমানগুলো বড়ই নড়বড়ে। সবচেয়ে বড় কথা হল ঘটনা কোন্ দিকে গড়াবে আগে থাকতেই স্থির করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যে অসন্তোষ বা ওই ধরনের কিছু দেখা যেতে পারে একথা তোমাকে কে বলল?. আচ্ছা, আমরা এরকমও ত অনুমান করতে পারি যে মিত্রপক্ষরা জার্মানদের গুঁড়িয়ে দিল, যুদ্ধ শেষ হল বিজয় গৌরবে? – তখন? তখন কসাকদের কী ভূমিকা হবে বলে তোমার মনে হয়?' লিস্তনিৎস্কি আপত্তি তুলে বলল।

বুনচুকের মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

'শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখছি নে, বিজয় গৌরব ত দূরের কথা।'

'নামার সময় একটু বেশি পাঁয়তারা কষেছে এটা বলতে পার . . .'

'আরও পাঁয়তারা কষবে,' বুনচুক বলল।

'তুমি কবে এলে ছুটি থেকে?' কাল্‌মিকোভ জিজ্ঞেস করল।

'পরশু দিন।'

ঠোঁট গোল করে পাকিয়ে জিভ দিয়ে ঠেলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বার করল বুনচুক, তারপর সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কোথায় ছিলে?'

'পেত্রোগ্রাদে।'

'তারপর ওখানকার হালচাল কী? রাজধানী বলে কথা! জমজমাট, তাই না? আহা, অন্তত একটা হপ্তাও যদি ওখানে কাটাতে পারতাম! তার জন্যে দিতে না পারি এমন কোন জিনিস নেই।'

'আনন্দ পাবার মতো তেমন একটা কিছু নেই ওখানে,' কথাগুলো ওজন করতে করতে বুনচুক বলল। 'খাবারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মজুর এলাকায় লোকেরা খেতে পাচ্ছে না, তাদের মধ্যে অসন্তোষ, চাপা প্রতিবাদ।'

'এই যুদ্ধ থেকে আমরা ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে আসতে পারব বলে ত মনে হয় না। আপনারা কী মনে করেন, ভদ্রমহোদয়রা?' মের্কুলভ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অন্য অফিসারদের মুখের দিকে তাকাল।

'রুশ-জাপান যুদ্ধ জন্ম দিয়েছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে। এ যুদ্ধ শেষ হবে আরেক নতুন বিপ্লবে। শুধু বিপ্লব কেন, গৃহযুদ্ধে।'

বুনচুকের কথাগুলো শুনতে শুনতে লিস্তনিৎস্কি কেমন যেন একটা অনির্দিষ্ট

ভঙ্গি করল, মনে হল যেন কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পরে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে লাগল। শেষে চাপা ক্রোধের সুরে সে বলতে শুরু করল, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে আমাদের অফিসারমহলের মধ্যে এই এরকম লোক আছে।' বুনচুক কুঁজো হয়ে যেখানে বসে ছিল ভঙ্গি করে সেই দিকে দেখাল। 'আশ্চর্য হয়ে যাই এই কারণে যে নিজের দেশ সম্পর্কে, যুদ্ধ সম্পর্কে তার ধারণাটা কী, আজ পর্যন্ত আমার কাছে স্পষ্ট নয়। . . . একবার আলোচনা করতে গিয়ে খুবই ভাসা-ভাসা কতকগুলো কথা বলেছিল, কিন্তু তা থেকে বুঝতে এতটুকু বাকি থাকে না যে এই যুদ্ধে আমাদের হার হয় এটাই তার কাম্য। ঠিক বলছি কিনা বুনচুক?'

'হ্যাঁ, হার হয় এটাই আমি চাই।'

'কিন্তু কেন? আমার কথা হল তোমার রাজনৈতিক মতামত যা-ই হোক না কেন, নিজের দেশের হার হোক এই কামনা করা . . . এ হল দেশ ও জাতির প্রতি বেইমানী। যে কোন সৎ লোকের পক্ষে এটা অসম্মানজনক!'

'আপনাদের মনে আছে, সরকারের বিরুদ্ধে দুমার বলশেভিক গ্রুপের আন্দোলন – তাতে হার হওয়ার পথই কি খুলে যায় নি?' কথার মাঝখানে মের্কুলভ বলল।

'তুমি ওদের মত মান বুনচুক?' লিস্তনিৎস্কি প্রশ্ন করল।

'আমি যেহেতু হার হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করছি, সেহেতু ওদের মত মানি বৈ কি! তাছাড়া রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বলশেভিক শাখার একজন সদস্য হয়ে তার পার্টির পার্লামেন্টারী গ্রুপের সমর্থন না করাটাই ত হাস্যকর হবে আমার পক্ষে। আমার আরও বেশি অবাক লাগে এই দেখে যে একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান সমাজের লোক হয়ে তুমি, ইয়েভ্গেনি নিকলায়েভিচ, রাজনীতির ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ী।'

'সকলের আগে, আমি হলাম একান্ত অনুগত একজন রাজভক্ত সৈনিক। 'সোশ্যালিস্ট কমরেডদের' দেখামাত্র আমার সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে।'

বুনচুকের ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। 'সকলের আগে তুমি হলে গিয়ে একটা গাড়ল, তারপর একটা আত্মতৃপ্ত চোয়াড়ে সেপাই,' সে মনে মনে ভাবল।

'আল্লাহু আকবর . . .'

'ফৌজীদের মহলে পরিস্থিতিটা একটু বিশেষ ধরনের,' যেন ক্ষমা চাইছে এমনি ভাবে মের্কুলভ টিপ্পনী কাটল, 'আমরা সবাই রাজনীতিকে কেমন যেন এক পাশে সরিয়ে রেখেছি, আমরা যেন আছি পাড়ার একেবারে শেষ সীমানায়।'

মেজর কাল্‌মিকোভ বসে বসে ঝুলে-পড়া গোঁফজোড়ায় তা দিতে থাকে। তার মঙ্গোলীয় ধাঁচের ক্ষিপ্ত চোখে তীক্ষ্ণ ঝলক ফুটে ওঠে। চুবোভ খাটের ওপর শুয়ে থাকে। কথোপকথনকারীদের কণ্ঠস্বর কান পেতে শুনতে শুনতে দেয়ালে টাঙানো, তামাকের ধোঁয়ায় হলদে রঙ ধরা একখানা ছবি মন দিয়ে দেখতে থাকে। ছবিটা মের্কুলভের আঁকা। অর্ধ-উলঙ্গ এক নারীমূর্তি, মেরি ম্যাগ্‌ডালেনের মতো তার মুখখানা। মুখে একটা ক্লান্ত, লালসাপূর্ণ হাসি, চেয়ে আছে নিজের নগ্ন স্তনযুগলের দিকে। বাঁ হাতের দু'আঙুলে খয়েরীরঙের একটা স্তনবৃন্ত টানছে, কড়ে আঙুলটা সতর্ক ভাবে এক পাশে সরানো, আধবোজা চোখের পাতার নীচে ছায়া, চোখের তারায় ঈষদুষ্ণ দীপ্তি। গায়ের জামাটা খসে পড়তে পড়তে সামান্য উঁচু করা একটা কাঁধে কোন রকমে আটকে আছে, কণ্ঠাস্থির গর্তের গায়ে এসে পড়েছে মৃদু স্নিগ্ধ আলো। রমণীর ভঙ্গিতে এত স্বাভাবিক শ্রী ও খাঁটি বাস্তবতা ছিল, আবছা তুলির টানের মধ্যে এমনই অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছিল যে ছবির মুন্সিয়ানায় মুগ্ধ হয়ে যায় চুবোভ। তার মুখে নিজের অজান্তেই হাসি ফুটে ওঠে। ওদের আলোচনা তার কানে পৌঁছুলেও মরমে প্রবেশ করছিল না।

'আহা, চমৎকার!' ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেষ কালে উল্লসিত হয়ে সে বলল। কিন্তু মন্তব্যটা বেমক্কা শোনাল, কেননা ঠিক তখুনি বুন্‌চুক এই কথাগুলো শেষ করেছে: '...জারতন্ত্র ধ্বংস হবে, আপনারা নিশ্চিত জানবেন।'

সিগারেট পাকাতে পাকাতে জ্বালাধরা হাসি হেসে একবার বুন্‌চুকের দিকে আরেকবার চুবোভের দিকে তাকাল লিস্ত্‌নিৎস্কি।

'মের্কুলভ, তুমি একজন খাঁটি শিল্পী!' চুবোভ এমন ভাবে চোখ টিপল যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

'আরে, এ আমার নেহাৎই একটা শখ...'

'আমরা কয়েক লক্ষ সৈন্য হারাতে পারি, কিন্তু এই দেশের মাটিতে যারা লালিত পালিত হয়েছে পরাধীনতার হাত থেকে পিতৃভূমিকে রক্ষা করা তাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য।' লিস্ত্‌নিৎস্কি সিগারেট ধরাল, রুমাল দিয়ে প্যাঁশনের কাচ মুছে পরিষ্কার করতে করতে দৃষ্টিক্ষীণ খালি চোখে উৎসুক ভাবে তাকাল বুন্‌চুকের দিকে।

'মজুরের পিতৃভূমি বলে কিছু নেই,' লিস্ত্‌নিৎস্কির কথাটা নস্যাৎ করে দিয়ে বুন্‌চুক বলল। 'মার্কসের এই কথাগুলোর মধ্যে গভীর সত্য আছে। আমাদের কোন পিতৃভূমি নেই, কস্মিনকালে ছিলও না! দেশপ্রেম আপনাদের জীবনের নিশ্বাসপ্রশ্বাস! এই অভিশপ্ত দেশের মাটি আপনাদের অন্ন যুগিয়েছে, আপনাদের

লালনপালন করেছে, কিন্তু আমরা . . . আমরা আগাছার মতো, পড়ো জমির ওপরকার বুনো ঝোপঝাড়ের মতো জন্মেছি, বেড়ে উঠেছি। . . . আপনারা আর আমরা একসঙ্গে বাঁচতে পারি নে।'

সে তার পাশ-পকেট থেকে একটা কাগজের তাড়া টেনে বার করল। লিস্ত্নিৎস্কির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। শেষে টেবিলের সামনে এসে শিরাওঠা চওড়া হাতের তালু দিয়ে খবরের কাগজের একটা হলদে বিবর্ণ পাতা পাট করে সামনে রাখল।

'শুনবেন কি?' লিস্ত্নিৎস্কির দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল।

'কী এটা?'

'যুদ্ধের ওপর একটা লেখা। খানিকটা পড়ব। লেখাপড়া তেমন একটা শিখি নি আমি, তাই বলতে গেলে ঠিক মতো বোঝাতে পারব না। কিন্তু এখানে অল্পের মধ্যে সব কথা বলা আছে:

'' . . . পিতৃভূমির পুরাতন কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব নহে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নূতন ধাঁচের উন্নততর এক মানবসম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। বর্তমানের জাতীয় প্রতিবন্ধগুলি যদি ধ্বংস হয় তবেই সেখানে আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রে প্রথম প্রতিটি জাতির মেহনতী জনগণের প্রগতিমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার, তাহাদিগের ন্যায্য দাবির পরিপূরণ ঘটিবে। 'পিতৃভূমি রক্ষার' ভণ্ডামিপূর্ণ ধুয়া তুলিয়া বর্তমানে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদিগকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে ভাঙন ধরাইবার যে-চেষ্টা করিতেছে, রাজনীতিসচেতন শ্রমিক জনসাধারণ সকল জাতির বুর্জোয়াদিগকে উচ্ছেদের সংগ্রামে বিভিন্ন জাতির শ্রমিক শ্রেণীকে অবিরত ঐক্যবদ্ধ করিবার নূতন প্রয়াসের মধ্য দিয়া তাহার সমুচিত জবাব দিবে।

''জাতীয় সংগ্রামের' পুরাতন তত্ত্বের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী লুঠতরাজকে গোপন করিয়া বুর্জোয়ারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করিতে হইবে এই ধ্বনি তুলিয়া প্রলেতারিয়েত সেই ভাঁওতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। মোটামুটি ভাবে ইহাই ছিল স্টুটগার্ট ও বাস্‌লে প্রস্তাবের মূল ধ্বনি। সাধারণ ভাবে যুদ্ধপ্রসঙ্গে নয়, বিশেষ ভাবে বর্তমান যুদ্ধের কথা মনে রাখিয়াই উক্ত প্রস্তাব। উহাতে, 'পিতৃভূমি রক্ষার' পরিবর্তে 'ধনতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করিবার কথা বলা হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধজনিত সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ ও প্যারী কমিউনের আদর্শ অনুসরণের জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ যে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে প্যারী কমিউন তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ। অবশ্য এবংবিধ রূপান্তর সহজসাধ্য নহে, পৃথক পৃথক পার্টির

'খেয়ালখুশি' অনুযায়ী তাহা সাধিত হওয়া সম্ভবও নহে। কিন্তু সাধারণ ভাবে ধনতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা এবং বিশেষ ভাবে ধনতন্ত্রের অন্তিম পর্বের মধ্যে তাহা নিহিত আছে। ওই পথে, একমাত্র ওই পথেই সমাজতন্ত্রীদিগকে তাহাদের কর্ম পরিচালনা করিতে হইবে। যুদ্ধঋণের পক্ষে মত প্রকাশ করা অথবা নিজের দেশে (এবং মিত্র দেশগুলিতেও) উগ্র জাতীয়তাবাদে উৎসাহ প্রদান করা হইতে তাহাদিগকে বিরত থাকিতে হইবে। তবে সঙ্কট যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং যখন বুর্জোয়ারা নিজেদের সৃষ্ট সকল বৈধতা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে, তখন সংগ্রামের আইনসম্মত পদ্ধতির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রাখিয়া প্রধানত 'নিজের দেশের' উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর আঘাত হানিতে হইবে। এই কার্যক্রমই গৃহযুদ্ধের দিকে পরিচালন করিবে, সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিবে গৃহযুদ্ধের দাবানল। যুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকরা (যাঁহারা দেশপ্রেম, মানবতাবাদ ও শান্তির কথা সুবিধাবাদীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রচার করেন না) যুদ্ধকে 'পাপ' মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধ তাহা নহে। যুদ্ধ ধনতন্ত্রের এক অবশ্যম্ভাবী পর্যায়। শান্তির মতো উহাও ধনতান্ত্রিক জীবনের একটি বৈধ রূপ। বর্তমানকালের যুদ্ধ জনযুদ্ধ। তবে এই সত্য হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না যে সাধারণের উপর যাহার বিশেষ প্রভাব সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের স্রোতে আমরাও গা ভাসাইয়া দিব। আসলে যে-শ্রেণীবিরোধ জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যুদ্ধের সময়ও তাহা অব্যাহত থাকে, যুদ্ধাবস্থার মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে। সামরিক চাকুরীতে যোগদানে অসম্মতি, যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট ইত্যাদি নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, সশস্ত্র বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন সংগ্রামের এক কাপুরুষোচিত হীন স্বপ্ন; ইহা হইল মরণপণ গৃহযুদ্ধ অথবা পর পর কতকগুলি যুদ্ধ ব্যতিরেকেই ধনতন্ত্র ধ্বংস করিবার নিষ্ফল আকুলতা। প্রতিটি সমাজতন্ত্রীর কর্তব্য যুদ্ধের সময়ও শ্রেণীসংগ্রামের প্রচার চালাইয়া যাওয়া। সকল জাতির বুর্জোয়াদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের যুগে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে কর্মপরিচালনা করাই সমাজতন্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য। মনগড়া পবিত্রতার বশবর্তী হইয়া 'যে-কোন মূল্যে শান্তি চাই' বলিয়া মূর্খের মতন ভাবালুতাপূর্ণ হা-হুতাশ করা আর নহে। গৃহযুদ্ধের নিশান উড়াও! ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভাগ্য লইয়া সাম্রাজ্যবাদ ছিনিমিনি খেলিতেছে। এই যুদ্ধের শেষে যদি অনেকগুলি সাফল্যমণ্ডিত বিপ্লব সংঘটিত না হয় তাহা হইলে অচিরেই আরও কতকগুলি যুদ্ধ ঘটিবে। এই যুদ্ধ 'শেষ যুদ্ধ' বলিয়া যে উপকথা প্রচার করা হয় তাহা শূন্যগর্ভ, বিপজ্জনক, এক ধরনের পেটি-বুর্জোয়া গল্পকথা। . . .''

সকলে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বুনচুক এতক্ষণ শান্ত গলায় ধীরে ধীরে পড়ছিল; কিন্তু শেষের লাইনগুলোতে এসে সে তার গম্ভীর ঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বর চড়িয়ে পড়ে গেল: ''আজ হউক কিংবা কাল হউক; বর্তমান যুদ্ধকালের মধ্যে না হউক তাহার পর, এই যুদ্ধে না হউক পরবর্তী যুদ্ধের সময় শতসহস্র শ্রেণীসচেতন শ্রমিক প্রলেতারিয়েতের পতাকাতলে সমবেত হইবে। শুধু তাহাই নহে, যে কোটি কোটি অর্ধ-প্রলেতারীয় ও পেটি-বুর্জোয়া আজ উগ্র জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, যুদ্ধের বিভীষিকা তাহাদিগকে শুধু ভীত ও হতোদ্যম করিয়া ফেলিবে না, পরন্তু আলোকিত করিয়া তুলিবে, শিক্ষিত ও জাগরিত করিয়া তুলিবে, সংগঠিত ও দৃঢ় করিবে, 'স্বদেশের' ও 'বিদেশের' বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবে, এই পতাকাতলে সমবেত করিবে।...''

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। অবশেষে মের্কুলভ জিজ্ঞেস করল, 'এটা রাশিয়াতে ছাপা হয় নি, তাই না?'

'না।'

'তাহলে কোথায়?'

'জেনেভায়। বেরিয়েছে ১৯১৪ সালের 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' পত্রিকার ৩৩ নম্বর সংখ্যায়।'

'কে লিখেছে?'

'লেনিন।'

'উনি... বলশেভিকদের নেতা, তাই না?'

বুনচুক তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিল। ভাঁজ করার সময় সামান্য কেঁপে উঠল তার হাতের আঙুলগুলো। মের্কুলভ তার পাক-ধরা-চুলের রাশিতে বিলি কাটতে কাটতে অন্যদের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'নিজের মতে টানার দারুণ ক্ষমতা আছে লোকটার।... যাই বল না কেন, লেখাটার মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা লোককে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে।...'

লিস্তনিৎস্কি ফেটে পড়ল। উত্তেজনায় সে তার শার্টের কলারের বোতাম আঁটল। ঘরের এমুড়ো ওমুড়ো দ্রুত পায়চারী শুরু করে দিল। কথার খই ফুটতে লাগল তার মুখে।

'স্বদেশের ত্রিসীমানা থেকে যে লোককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই লেখাটা ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করার জন্য তার একটা করুণ প্রয়াস। আমাদের এই বাস্তবতার যুগে ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য দেখা যায় না - বিশেষত এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর! যে-লোক খাঁটি রুশী এই ধরনের পাগলের প্রলাপকে সে ঘৃণাভরে অবহেলা করবে।

ফাঁকা বুলি! জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা! ওঃ ভগবান, কী জঘন্য! কী কুৎসিত কথা!'

লিস্তনিৎস্কি বিরক্তি ভরে বুনচুকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। বুনচুক তখন মাথা ঝুঁকিয়ে কাগজের তাড়ার ভেতরে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। তার ভুরু কোঁচকানো। তামাটে রঙের মোটা ঘাড়ের ওপর একটা রগ ফুলে রয়েছে, সেটা থেকে থেকে কাঁপছে। লিস্তনিৎস্কির কথাগুলো ভয়ঙ্কর তোড়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু তার মৃদু কণ্ঠস্বর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারল না।

'বুনচুক!' কাল্‌মিকোভ চেঁচিয়ে উঠল। 'দাঁড়ান লিস্তনিৎস্কি! . . . বুনচুক, শুনছেন? . . . আচ্ছা বেশ, ধরলাম না হয় এই লড়াই গৃহযুদ্ধে গড়াবে . . . কিন্তু তারপর? বেশ ত, রাজতন্ত্র না হয় খতম করলেন আপনারা . . . তারপর শাসনব্যবস্থাটা কী হবে বলে আপনার মনে হয়? কী ধরনের শাসনক্ষমতা হবে?'

'প্রলেতারিয়েতের শাসনক্ষমতা।'

'মানে, বলতে চান পার্লামেণ্ট?'

'ঠিক তা নয়!' বুনচুক মৃদু হাসল।

'তাহলে ঠিক কী?'

'শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব হবে।'

'সাবাস! . . . তাহলে বুদ্ধিজীবী আর কৃষকদের ভূমিকা সেখানে কী হবে?'

'কৃষকরা আমাদের অনুসরণ করবে, যারা ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে বুদ্ধিজীবীদের সেরকম একটা অংশও করবে। আর বাদবাকিরা? . . . তাদের আমরা যা করব, এই দেখুন . . .' কোথাকার একটা কাগজের টুকরো বুনচুকের হাতের মধ্যে ধরা ছিল, দ্রুত হাতে সেটাকে শক্ত করে পাকিয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিল। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এই করব!'

'হুঁ ডানা গজিয়েছে দেখছি!' লিস্তনিৎস্কি বাঁকা হাসি হাসল।

'সেই ডানায় ভর দিয়ে আমরা অনেক উচুঁতে গিয়ে বসবও,' বুনচুক প্রত্যুত্তর দিল।

'আগে থাকতে মাটিতে খড়টড় বিছিয়ে রাখতে হয়। . . .'

'তা-ই যদি হয় তাহলে কী করতে আপনি নিজের ইচ্ছেয় ফ্রণ্টে এলেন। শুধু তা-ই নয়, এত কাঠ খড় পুড়িয়ে অফিসারের পদে উঠতেই বা কেন গেলেন? আপনার ধ্যানধারণার সঙ্গে এর মিল কোথায়? চ-মৎ-কার! উনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে . . . হে-হে-হে . . . নিজের . . . ওই যে কী বলে . . . শ্রেণী-ভ্রাতাদের ধ্বংসের বিরুদ্ধে, অথচ নিজে কিনা একজন অফিসার!'

কাল্‌মিকোভ বুটের গায়ে চাপড় মেরে পরম তৃপ্তিভরে হো হো করে হেসে ওঠে।

'আপনি আর আপনার মেশিনগান কম্যাণ্ডের সৈন্যরা মিলে কত জন জার্মান

মজুরকে খতম করেছেন জানতে পারি কি?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাগজের বাণ্ডিলটা হাতড়াতে হাতড়াতে বুনচুক উত্তর দিল, 'কতজন জার্মানকে আমি গুলি করে মেরেছি – এটা . . . একটা প্রশ্ন বটে। আমি নিজের ইচ্ছেয় যুদ্ধে এসেছি, তার কারণ এই যে অমনিতেই আমার ডাক পড়ত। আমার মনে হয় এখানে ট্রেঞ্চের ভেতরে যে অভিজ্ঞতা আমার হল তা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। . . . এই যে, এখানে কী বলা হয়েছে শুনুন।' এই বলে সে পড়ল লেনিনের কথাগুলো:

''আধুনিক ফৌজের কথাই ধরা যাক। সংগঠনের অন্যতম ভালো দৃষ্টান্ত। এই সংগঠন ভালো একমাত্র এই কারণেই যে ইহা নমনীয়, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একটিমাত্র ইচ্ছার অনুবর্তী করিবার ক্ষমতা রাখে। আজ সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্ব স্ব গৃহে অধিষ্ঠান করিতেছে। কাল সৈন্য সমাবেশের হুকুম আসিবামাত্র তাহারা বিভিন্ন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সমবেত হইবার আয়োজন করিতেছে। আজ তাহারা ট্রেঞ্চে রহিয়াছে, সময় সময় হয়ত বা মাসের পর মাস তাহাদিগকে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে; আবার কাল অন্য এক আদেশের বলে তাহারা আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। আজ গুলিগোলা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহারা তাক লাগাইতেছে; কাল তাহারা তাক লাগাইতেছে উন্মুক্ত স্থানে যুদ্ধ করিয়া। আজ তাহাদের অগ্রবর্তী দলগুলি মাটির নীচে মাইন পুঁতিতেছে; কাল তাহারা মাথার উপর উড়ন্ত বিমানবহর হইতে বৈমানিকদের নির্দেশক্রমে মাইলের পর মাইল আগাইয়া চলিতেছে। ইহাকেই বলে সংগঠন। সংগঠন তাহাকেই বলে যখন একটিমাত্র লক্ষ্যের বশবর্তী হইয়া, একটিমাত্র ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের যোগাযোগ ও কর্মের ধারা পরিবর্তন করে, ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি পরিবর্তন করে, পরিবর্তিত অবস্থা ও সংগ্রামের প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার পরিবর্তন করে।

'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। আজ প্রত্যক্ষ ভাবে এমন কোন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নাই . . .''

''পরিস্থিতি' বলতে বলতে কী বোঝায়?' চুবোভ তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল।

বুনচুক স্বপ্নোত্থিতের মতো নড়েচড়ে উঠল। বুড়ো আঙুলের গাঁট দিয়ে টিবিওয়ালা কপালটা এমন ভাবে রগড়াল যেন প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করছে।

'আমি জানতে চাই 'পরিস্থিতি' শব্দটার অর্থ কী?'

'আসল ব্যাপার হল কী, শব্দটার অর্থ আমি ঠিকই বুঝি, কিন্তু ভালোমতো বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। . . .' একটা বাচ্চা ছেলের মতো সহজসরল নির্দোষ হাসি ফুটে উঠল বুনচুকের মুখে। তার বড়সড় বিষণ্ণ মুখের ওপর হাসিটা অদ্ভুত দেখাল – মনে হল যেন শরতের বৃষ্টি ধোওয়া উদাস মাঠের ওপর দিয়ে হাল্কা ছাইরঙা একটা ছটফটে আলোর বিন্দু মুহূর্তের মধ্যে নাচতে নাচতে ছুটে চলে গেল। 'পরিস্থিতি হল গিয়ে একটা অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা – এই গোছের একটা কিছু। ঠিক বললাম কিনা?'

লিস্তনিৎস্কি অনির্দিষ্ট ভাবে মাথা নাড়াল।

'পড়ে যাও।'

'' . . .আজ প্রত্যক্ষ ভাবে এমন কোন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নাই, এমন কোন অবস্থা নাই যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হইতে পারে, তাহাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইতে পারে; আজ তাই হাতে ধরাইয়া দিতেছে ভোটের কাগজ – উহাকেই শিরোধার্য করিয়া লও। জেলের ভয়ে যাহারা চেয়ার আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে, পার্লামেণ্টে আরামের জায়গায় তাহাদিগকে ঢুকাইবার বদলে শত্রুর উপর আঘাত হানিবার অস্ত্রস্বরূপ উহাকে গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হও। কাল হয়ত ভোটের কাগজ কাড়িয়া লইয়া তোমার হাতে ধরাইয়া দিল রাইফেল কিংবা দ্রুত গোলা ছুঁড়িবার উপযোগী অতি উন্নত ধরনের আধুনিকতম কোন কামান – মৃত্যু আর ধ্বংসের এই অস্ত্র হাতে তুলিয়া লও। যাহারা যুদ্ধের ভয়ে ভীত তাহাদের ভাবাবেগপূর্ণ কাঁদুনিতে কর্ণপাত করিও না। পৃথিবীতে এখনও প্রচুর পরিমাণে এমন সমস্ত বস্তু রহিয়া গিয়াছে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যাহাকে অগ্নি ও তরবারি দ্বারাই ধ্বংস করিতে হইবে; আর জনসাধারণের মধ্যে যদি ক্রোধ ও নৈরাশ্য ক্রমবর্ধমান হইয়া উঠে, যদি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তাহা হইলে নূতন নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হও, মৃত্যু ও ধ্বংসের এই বিপুল পরিমাণ কার্যকরী অস্ত্রকে নিজের দেশের সরকার ও নিজের দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর। . . .''

বুনচুকের পড়া তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনের সার্জেণ্ট-মেজর দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল।

কাল্মিকোভের দিকে ফিরে সার্জেণ্ট-মেজর বলল, 'রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টার থেকে একজন আর্দালি এসেছে হুজুর।'

কাল্মিকোভ ও চুবোভ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেটকোট গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

মের্কুলভ আপন মনে শিস দিতে দিতে বসে আঁকতে শুরু করে দিল। লিস্ত্নিৎস্কি কিন্তু আগের মতোই কোন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে ঘরের ভেতরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বুনচুকও বিদায় নিল। বাঁ হাতে গ্রেটকোটের কলার চেপে ধরে ডান হাতে তার কিনারা গুটিয়ে ধরে পাঁকে-ভরা কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে সে এগিয়ে চলল। ট্রেঞ্চের সরু কাটা খালের গায়ে বাতাস আছড়ে পড়ছে, খাঁজগুলোতে আটকা পড়ে শিস দিচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে বুনচুক আপন মনে অস্পষ্ট হাসল। নিজের সুড়ঙ্গ-ঘরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সে আবার বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হয়ে উঠল। তার গা থেকে আবার বেরোতে লাগল পচা অ্যাল্ডার পাতার গন্ধ। মেশিনগান-প্লেটুনের কম্যাণ্ডার ঘুমোচ্ছিল। পর পর তিন রাত জেগে তাস পিটিয়েছে। রোদে পোড়া তামাটে মুখের ওপর শোভা পাচ্ছে এক জোড়া কালো গোঁফ। মুখে রাত জাগার ক্লান্তির ছাপ। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় থেকে যে থলিটা বুনচুক সব সময় সঙ্গে রাখত তার ভেতরে হাতড়াতে লাগল সে। দরজার কাছে এক তাড়া কাগজ জড় করে আগুন ধরিয়ে দিল তাতে। তারপর প্যাণ্টের পকেটে দু'টিন মাংস আর কয়েক মুঠো রিভল্বারের গুলি ভরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য দরজার পাল্লা হাঁ করে খুলে যেতে তার ফাঁক দিয়ে দমকা হাওয়া ভেতরে ঢুকে দোরগোড়ায় পুড়িয়ে ফেলা কাগজের ছাইগুলোকে উড়িয়ে দিল, ঘরের ভেতরের ধূমায়মান বাতিটা দপ্ করে নিভিয়ে দিল।

বুনচুক চলে যাবার পর লিস্ত্নিৎস্কি তার সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে নিঃশব্দে মিনিট পাঁচেক পায়চারি করল। পরে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। মের্কুলভ মাথাটা একপাশে কাত করে তখনও ছবি এঁকে চলেছে। তার হাতের সরু-করে-কাটা পেন্সিল একখণ্ড চৌকো কাগজের ওপর ধোঁয়া ধোঁয়া কালো দাগ ফেলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কাগজের ওপর ফুটে উঠল বুনচুকের মুখ। সাদা কাগজ থেকে বুনচুক তাকিয়ে আছে – মুখে তার সেই চিরাচরিত কুণ্ঠিত হাসি, যেন কেউ তাকে হাসতে বাধ্য করেছে।

'বেশ জবরদস্ত কিন্তু মুখখানা,' ছবি থেকে হাত উঠিয়ে লিস্ত্নিৎস্কির দিকে তাকিয়ে মের্কুলভ বলল।

'কী, কেমন মনে হল?' লিস্ত্নিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'কে জানে বাপু!' প্রশ্নটার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করতে করতে মের্কুলভ উত্তর দিল। 'ছোকরা একটু খাপছাড়া ধরনের। এখন নিজেই নিজেকে ফাঁস করে ফেলেছে। তাই অনেক জিনিস খোলসা হয়ে গেল। আগে বুঝতেই পারতাম না

আসলে ও কী। জান, কসাকদের মধ্যে, বিশেষ করে মেশিনগানারদের মধ্যে ওর দারুণ প্রতিপত্তি কিন্তু। লক্ষ করেছ সেটা?'

'হ্যাঁ,' কেমন যেন অনিশ্চিত ভাবে উত্তর দিল লিস্তনিৎস্কি।

'মেশিনগান ফৌজের প্রত্যেকেই একেকটি বলশেভিক। লোকটা ওদের কবজা করে ওই পথে নিয়ে গেছে। ও যে আজ নিজেকে এমন করে খুলে দিল তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। কেন এমন করল? স্রেফ আমাদের রাগিয়ে দেবার জন্যে! জানে যে ওর মতে আমাদের কারোই সায় নেই, তবু কেন যেন নিজেকে ধরিয়ে দিল। অথচ মাথা গরম করার লোক নয়। বিপজ্জনক ধরনের লোক।'

বুনচুকের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে করতে মের্কুলভ ছবিটা ঠেলে সরিয়ে রাখল। তারপর জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করল। পায়ের ভিজে মোজাগুলো খুলে উনুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখল, ঘড়িতে দম দিল, একটা সিগারেট ফুঁকল। শেষকালে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। মিনিট পনেরো আগে মের্কুলভ যে টুলটা দখল করে ছিল এখন লিস্তনিৎস্কি সেটার ওপর বসল। মের্কুলভের আঁকা ছবির উলটো পৃষ্ঠায় লিখতে গিয়ে পেন্সিলের চোখা শীষের মাথাটা ভেঙে গেল। খসখস করে টানা লিখে চলল:

'মহামান্যবরেষু,

'আমার যে অনুমান ইতিপূর্বে আপনাকে জানাইয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। আজ আমাদের রেজিমেণ্টের অফিসারদের সহিত আলোচনাকালে (আমি ছাড়াও পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনের মেজর কাল্‌মিকোভ ও লেফ্‌টেনাণ্ট চুবভ এবং তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের সাব-অলটার্ণ মের্কুলভ উপস্থিত ছিলেন) কর্ণেট বুনচুক নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস অনুসারে এবং সম্ভবত তাঁহার পার্টির পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে কী ধরনের কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন তাহা বুঝাইয়া বলেন। অবশ্য স্বীকার করিতে বাধা নাই কেন যে তিনি বুঝাইতে গেলেন, আমার পক্ষে সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার নিকট নিষিদ্ধ প্রকৃতির কাগজপত্রের বাণ্ডিল ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি জেনেভায় প্রকাশিত তাঁহার পার্টির মুখপত্র 'কমিউনিস্ট' হইতে কতিপয় অংশ পড়িয়া শুনান। কর্ণেট বুনচুক নিঃসন্দেহে আমাদের রেজিমেণ্টের মধ্যে গোপন আন্দোলন চালাইতেছেন (অনুমান করা যাইতে পারে যে এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া রেজিমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন) এবং মেশিনগান সৈনিকরা হইয়াছে তাঁহার ক্রিয়াকলাপের সরাসরি লক্ষ্যস্থল। তাহাদের পচন ধরিয়াছে। রেজিমেণ্টের নৈতিক চরিত্রের উপর তাঁহার ক্ষতিকারক প্রভাব পড়িয়াছে।

সামরিক নির্দেশ অমান্য করিবার মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহা আমি ইতিপূর্বেই ডিভিশনের বিশেষ দপ্তরকে জানাইয়াছি।

'কর্ণেট বুনচুক সদ্য ছুটি হইতে (ছুটিতে পেত্রোগ্রাদে ছিলেন) ফিরিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে প্রচুরসংখ্যক অনিষ্টকর কাগজপত্র আছে। এখন তিনি কাজ আরও জোরদার করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন।

'পূর্বোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে ক) কর্ণেট বুনচুকের অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে (আলোচনার সময় উপস্থিত অফিসারমহোদয়গণ শপথগ্রহণ পূর্বক আমার এই উক্তির সমর্থন জানাইতে পারেন); খ) এক্ষণে তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সামরিক আদালত বিচার করা অবশ্যকর্তব্য; গ) মেশিনগান প্লেটুনকে যথাশীঘ্র সম্ভব ঝাড়াই বাছাই করা উচিত, বিশেষ বিপজ্জনক প্রকৃতির লোকদের সরাইয়া অন্য সকলকে হয় যুদ্ধসীমানার পশ্চাদ্ভাগে পাঠানো উচিত নতুবা অন্যান্য রেজিমেণ্টের সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

'স্বদেশ ও রাজাধিরাজকে সেবার জন্য আমার যে আন্তরিক অভিলাষ তাহা বিস্মৃত হইবেন না, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

৭ নং সেক্টর
২০শে অক্টোবর,
১৯১৬

আপনার একান্ত বশংবদ
মেজর ইয়েভ্‌গেনি লিস্তনিৎস্কি।'

পরদিন সকালে এক বিশেষ আর্দালিকে দিয়ে লিস্তনিৎস্কি তার রিপোর্টটা ডিভিশনের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিল। সকালের খাবার খেয়ে সুড়ঙ্গ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ট্রেঞ্চের সামনে পিছল কাদামাটির স্তূপের প্রাচীর। তার ওপাশে জলাভূমির মাথার ওপর কুয়াশা দুলছে, পেঁজা তুলোর মতো ঝুলছে, যেন বেড়ার কাঁটাতারের গায়ে আটকে আছে। ট্রেঞ্চের তলায় থকথকে কাদা, দু'আঙুল সমান পুরু হয়ে জমেছে। কামানের গোলা ছোঁড়ার জন্য দেয়ালে যে সমস্ত ফোকর করা হয়েছে তার ভেতর দিয়ে গলগল করে গৈরিক জলের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। কাদায় মাখামাখি, ভিজে একসা গ্রেটকোট গায়ে কসাকরা মাটির পাঁচিলের গা থেকে লোহার চাদর সরিয়ে তার ওপর আগুন জ্বালিয়ে চায়ের ডেকচি গরম করছে, রাইফেলগুলো দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে উবু হয়ে বসে তামাক টানছে।

'কতবার বারণ করেছি না লোহার চাদরের ওপর আগুন জ্বালাতে! শুয়োরের বাচ্চা সব, কথা বোঝ না নাকি?' ধোঁয়াকার অগ্নিকুণ্ডের চারধারে কসাকদের প্রথম

যে দলটাকে চোখে পড়ল তাদের কাছে পৌঁছুতেই ক্ষিপ্ত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল লিস্তনিৎস্কি।

দু'জন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। বাকিরা গ্রেটকোটের কিনারা গুটিয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল, বসে বসে তামাক টানতে লাগল। রোদে পোড়া তামাটে, দাড়িওয়ালা এক কসাক, তার বলিরেখা আঁকা এক কানের লতিতে ঢলঢল করে ঝুলছে একটা মাকড়ি – ডেকচির নীচে কিছু শুকনো কুচো ডালপালা গুঁজে দিয়ে সে উত্তর দিল, 'লোহার চাদরটা ব্যবহার করতে না পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু হুজুর, আগুন আমরা কী করে জ্বালাব বলুন ত? একবার তাকিয়েই দেখুন না চারধারে কত জল! কেবল জল আর কাদা!'

'এক্ষুনি সরিয়ে নাও বলছি লোহার চাদরটা!'

'তার মানে কি, আপনি চান আমরা উপোস করে থাকি? এই বলতে চান?' চওড়া-মুখ, বসন্তের দাগওয়ালা এক কসাক ভুরু কুঁচকে এক পাশে তাকিয়ে বলল।

'বললাম যে... সরাও লোহার চাদরটা!' লিস্তনিৎস্কি বুটের ডগা দিয়ে ডেকচির নীচের জ্বলন্ত কাঠকুটো সরিয়ে দিল।

কানে মাকড়িপরা দাড়িওয়ালা কসাকটা হতভম্ব হয়ে ক্রোধের হাসি হেসে ডেকচির জলটুকু ছলাৎ করে ঢেলে ফেলে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'হয়েছে হে তোমাদের চা খাওয়া, খুব হয়েছে!'

কসাকরা তাকিয়ে তাকিয়ে চুপচাপ দেখতে থাকে ট্রেঞ্চের লাইনের ভেতর দিয়ে মেজর দূরে চলে যাচ্ছে। দাড়িওয়ালার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টিতে ধিকিধিকি আগুন জ্বলে ওঠে।

'শালা হারামীর বাচ্চা! আমাদের অপমান করে গেল!'

আরেকজন রাইফেলের বেল্টটা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

চার নম্বর ট্রুপের সেক্টরে লিস্তনিৎস্কিকে পাকড়াও করল মের্কুলভ। নতুন চামড়ার জ্যাকেটটার মচমচ আওয়াজ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছুটে এলো। তার মুখ থেকে ভকভক করে তামাকের কড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। লিস্তনিৎস্কিকে একপাশে ডেকে নিয়ে হড়বড় করে সে বলল, 'খবর শুনেছ! বুনচুক কাল রাতেই পালিয়েছে?'

'বুনচুক? কী? কী হয়েছে?'

'পালিয়েছে।... বুঝলে? মেশিনগান প্লেটুনের কম্যাণ্ডার ইগ্‌নাতিচ বুনচুকের সঙ্গে একই ঘরে থাকে – বলল যে আমাদের কাছ থেকে যাবার পর আর ফেরে নি। তার মানে, আমাদের কাছ থেকে বেরিয়েই চম্পট দিয়েছে।... বোঝ কাণ্ড!'

লিস্ত্‌নিৎস্কি অনেকক্ষণ ধরে পাঁশ্‌নের কাচ মুছল, চোখ কুঁচকে রইল।

'তোমাকে কেমন যেন উতলা দেখাচ্ছে?' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মের্কুলভ।

'আমি? আরে না। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি উতলা হতে যাব কোন দুঃখে? তবে হ্যাঁ সংবাদটা এমনই আচমকা যে আমি থ' হয়ে গেছি।'

দুই

পরের দিন সকালে সার্জেন্ট-মেজর হন্তদন্ত হয়ে লিস্ত্‌নিৎস্কির সুড়ঙ্গ-ঘরে এসে ঢুকল। একটু ইতস্তত করে শেষকালে জানাল: 'হুজুর, আজ সকালে কসাকরা ট্রেঞ্চের ভেতরে এই যে এই কাগজগুলো পেয়েছে। কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার।... তাই এলাম আপনাকে জানাতে। নইলে কোন্ পাপের দায়ে পড়ব কে জানে?'

'কিসের কাগজ?' খাট ছেড়ে উঠতে উঠতে লিস্ত্‌নিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

সার্জেন্ট-মেজর মুঠোয় ধরা, দলা পাকানো কতকগুলো প্রচারপত্র তার হাতে তুলে দিল। শস্তা কাগজের টুকরোর ওপর থেকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে টাইপ-করা জলজ্যান্ত শব্দগুলো। লিস্ত্‌নিৎস্কি এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল:

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

সৈনিক কমরেডরা,

দুই বৎসর ধরিয়া এই অভিশপ্ত যুদ্ধ চলিতেছে। দুই বৎসর আপনারা অপরের স্বার্থরক্ষার খাতিরে ট্রেঞ্চে পচিয়া মরিতেছেন। দুই বৎসর ধরিয়া সকল জাতির চাষী ও মজুরের রক্ত ঝরিতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হইয়াছে, পঙ্গু হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ অনাথ ও বিধবা হইয়াছে - ইহাই হইল এই নিধনযজ্ঞের ফলাফল। কিসের জন্য লড়াই আপনাদের? কাহাদের স্বার্থে? জারের সরকার নূতন নূতন দেশ দখলের জন্য, দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য জাতিগুলিকে যেমন নিপীড়ন করিয়া থাকে সেই সকল দেশের

অধিবাসীদিগকেও তেমনি নিপীড়ন করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সৈনিককে গুলিগোলার মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। পৃথিবীর শিল্পপতিরা তাহাদের কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বাজার ভাগাভাগি করিবার ব্যাপারে আপসে আসিতে পারিতেছে না; মুনাফা ভাগাভাগি করিয়া লইতে তাহারা নারাজ – তাই ভাগবাঁটোয়ারার কাজ চলিতেছে অস্ত্রবলের সাহায্যে – আর আপনারা, অজ্ঞ মানুষেরা তাহাদের স্বার্থের খাতিরে চলিয়াছেন মৃত্যুর মুখে। আপনাদের মতোই যাহারা মেহনতী মানুষ, তাহাদিগকে হত্যা করিতেছেন।

নিজের ভ্রাতার রক্ত ঝরানো আর নহে! প্রকৃতিস্থ হন, মেহনতী মানুষ! অস্ট্রীয় ও জার্মান সৈন্যরা আপনাদের শত্রু নহে। তাহারাও আপনাদের মতোই প্রতারিত। আপনাদের শত্রু হইল স্বদেশের জার, স্বদেশের শিল্পপতি ও জমিদাররা। তাহাদের দিকে আপনাদের হাতের রাইফেল ঘুরাইয়া ধরুন। অস্ট্রীয় ও জার্মান সৈনিকদের সহিত ভ্রাতৃভাব গড়িয়া তুলুন। যে কাঁটাতারের বেড়া আপনাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়াছে, আপনাদিগকে জন্তুর মতো পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহার উপর দিয়া পরস্পরের দিকে হস্ত প্রসারিত করুন। আপনারা শ্রমের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, শ্রমের রক্তচর্চিত কঠিন দাগ আপনাদের হাত হইতে এখনও মিলাইয়া যায় নাই, ভাগবাঁটোয়ারা করিবার মতো কোন সামগ্রী আপনাদের নাই। স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিপাত থাক! দুনিয়ার মেহনতী মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ!

শেষ লাইনগুলো পড়তে পড়তে লিস্ত্নিৎস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা প্রবল ঘৃণা তাকে পেয়ে বসল। ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে আগে থাকতে অনুমান করতে পেরে মনটা ভার হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'এবারে শুরু হয়ে গেল!' টেলিফোন করে রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডারকে খবরটা জানাল।

'এখন আপনার কী আদেশ হয় হুজুর?' শেষকালে সে জিজ্ঞেস করল।

টেলিফোনের দূরাগত একটানা গুঞ্জন আর মশার মতো পিনপিন আওয়াজ ভেদ করে রিসিভারের ভেতর দিয়ে ঘন হয়ে ঝরে পড়ল জেনারেলের কণ্ঠস্বর: 'এক্ষুনি সার্জেন্ট-মেজর আর ট্রুপ অফিসারদের নিয়ে খানাতল্লাসি শুরু করে দিন। এক এক করে প্রত্যেককে করবেন। এমনকি অফিসারদেরও বাদ দেবেন না। আজ ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব কবে তারা রেজিমেণ্টে

অদলবদলের কথা ভাবছে। ওদের তাড়া দেব। খানাতল্লাসি করে যদি কিছু বেরোয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।'

'আমার মনে হয় এটা মেশিনগানারদের কাজ।'

'তাই বুঝি? এক্ষুনি ইগ্‌নাতিচকে বলে দিচ্ছি ওর প্লেটুনের কসাকদের খানাতল্লাসি করে দেখুক। আচ্ছা, ছাড়ি।'

লিস্ত্‌নিৎস্কি তার সুড়ঙ্গ-ঘরে ট্রুপ অফিসারদের জড় করে রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডারের নির্দেশ জানাল।

'এসব কী যা-তা ব্যাপার!' মের্কুলভ চটে গিয়ে বলল। 'তার মানে, আমরা একজন আরেকজনকে খানাতল্লাসি করব?'

'আপনাকে প্রথম, লিস্ত্‌নিৎস্কি!' রাজ্‌দোর্ত্‌সেভ নামে দাড়িগোঁফছাড়া অল্পবয়সী এক লেফ্‌টেনাণ্ট চেঁচিয়ে উঠল।

'আসুন, দান ফেলে ঠিক করা যাক।'

'নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী হোক।'

'ওসব হাসিঠাট্টা রাখুন মশাইরা,' সকলকে বাধা দিয়ে কঠিন স্বরে লিস্ত্‌নিৎস্কি বলল। 'আমাদের বুড়ো কর্তা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আমাদের রেজিমেণ্টের অফিসাররা সীজারের স্ত্রীর মতো – যাবতীয় সন্দেহের উর্ধ্বে।* একজনই ছিল – সে ওই কর্ণেট বুন্‌চুক – তা সে ত ফেরার। কিন্তু কসাকদের খানাতল্লাস করে দেখতে হয়। সার্জেণ্ট-মেজরকে কেউ ডেকে আনুন ত।'

সার্জেণ্ট-মেজর এলো। মাঝবয়সী কসাক। তিন তিনটে সেণ্ট জর্জ ক্রস ঝুলছে তার বুকে। অস্বস্তিভরে কেশে অফিসারদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে।

'তোমার স্কোয়াড্রনে সন্দেহজনক কারা? এই সব জিগির লেখা কাগজগুলো কারা ছড়াতে পারে বলে তোমার মনে হয়?' তার দিকে ফিরে লিস্ত্‌নিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'আমার এখানে সে রকম কেউ নেই, হুজুর,' সার্জেণ্ট-মেজর জোর দিয়ে বলল।

'কিন্তু আমাদের স্কোয়াড্রনের এলাকাতেই ওগুলো পাওয়া গেছে যে। অন্য কোন স্কোয়াড্রনের কেউ এসেছিল কি ট্রেঞ্চে?'

'কেউ আসে নি। বাইরের কোন স্কোয়াড্রনের কেউ আসে নি হুজুর।'

'তন্ন তন্ন করে সবাইকে তালাস করে দেখতে হয়।' মের্কুলভ হাত নাড়ল, তারপর দরজার দিকে এগোল।

---

* জুলিয়াস সীজারের স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে এক সময় সন্দেহ উঠলে সীজার নিজে নাকি মন্তব্য করেন, 'সীজারের স্ত্রী যাবতীয় সন্দেহের উর্ধ্বে।' উক্তিটি পরবর্তীকালে প্রবচনে পরিণত হয়। – অনুঃ

খানাতল্লাসি শুরু হয়ে গেল। কসাকদের একেক জনের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একেক রকম অনুভূতির ছাপ ফুটে উঠল। কেউ কেউ ভেবাচেকা খেয়ে ভুরু কোঁচকায়। কসাকদের যৎসামান্য টুকিটাকি সামগ্রী ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে কেউ কেউ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে অফিসারদের দিকে তাকাতে থাকে, কেউ বা আবার মুখ টিপে হাসতে থাকে। টহলদার ঘাঁটির একজন, ইয়া জোয়ান গোছের এক কমবয়সী সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কী খুঁজছেন বলুনই না? কোন জিনিস যদি চুরি গিয়ে থাকে বলুন না, কেউ কোথাও দেখেছে হয়ত?'

খানাতল্লাসিতে কোন ফল হল না। শুধু এক নম্বর ট্রুপের একজন কসাকের গ্রেটকোটের পকেট থেকে প্রচারপত্রের দলাপাকানো একটা কপি পাওয়া গেল।

'পড়েছ?' বার-করা কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, চোখে মুখে হাস্যকর ধরনের আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলে মের্কুলভ জিজ্ঞেস করল।

'সিগারেট পাকাব বলে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম,' চোখজোড়া যেমন মাটির দিকে নামিয়ে রেখেছিল তেমনি নামিয়ে রেখেই হাসতে হাসতে কসাকটা বলল।

'হাসছ কেন হে?' রাগে লাল হয়ে গিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে চিৎকার করে বলল লিস্তনিৎস্কি। পাঁশনের নীচে উত্তেজনায় পিটপিট করছে তার চোখের পাতার সোনালি রঙের ছোট ছোট লোম।

কসাকটার মুখ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল – হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তার মুখের হাসি।

'মাফ করবেন হুজুর! আমি বলতে গেলে একেবারে লেখাপড়া জানি নে! পড়ি কোন রকমে, কঁকিয়ে কুঁতিয়ে। সিগারেট পাকানোর কাগজ নেই, তাই তুলে নিয়েছিলাম। তামাক আছে, এবারে কাগজও পাওয়া গেল।'

কসাকের মনে আঘাত লেগেছিল, তাই কথাগুলো সে বলল বেশ উঁচু গলায়। তার কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস ফুটে উঠছিল।

লিস্তনিৎস্কি ঘৃণাভরে থুথু ফেলে সরে এলো। অন্যান্য অফিসাররাও তার পেছন পেছন চলে এলো।

এই ঘটনার একদিন পরে রেজিমেণ্টটাকে পজিশন থেকে উঠিয়ে ফ্রন্ট লাইনের ক্রোশ তিন-চার পেছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মেশিনগান প্লেটুন থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টমার্শাল করা হল। বাকিদের একটা অংশকে বদলি করে দেওয়া হল রিজার্ভ রেজিমেণ্টগুলোতে, আরেকটা অংশকে ছড়িয়ে দেওয়া হল দু'নম্বর কসাক ডিভিশনের বিভিন্ন রেজিমেণ্টে। কয়েক দিনের বিশ্রামের সুযোগে রেজিমেণ্টের নিয়মশৃঙ্খলা খানিকটা ফেরানো গেল। কসাকরা গা-হাত-পা ধুল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল, যত্ন করে দাড়ি কামাল। এখন আর ট্রেঞ্চের প্রথামতো

নয়। ট্রেঞ্চে থাকতে গালের গজগজে দাড়ির উপদ্রব থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য অনেক সময় যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হত সেটা এই রকম: দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত, খোঁচা খোঁচা দাড়ির কুচিতে আগুন লাগার পর সে আগুনের তাতে যখন চামড়ায় প্রায় জ্বলুনি ধরে যাচ্ছে কেবল তখুনি আগে থেকে জলে ভেজানো একটা গামছা চেপে ধরে তাই দিয়ে গাল রগড়ানো। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'শুয়োর ছ্যাঁকা'।

ট্রুপের নাপিত তার খদ্দেরকে জিজ্ঞেস করত, 'তোমার দাড়িটা কি শুয়োর ছ্যাঁকা দিয়ে কাটব নাকি?'

রেজিমেণ্টের এখন বিশ্রাম। কসাকদের বাইরের চেহারাটা বেশ খোলতাই হল – দস্তুরমতো ফুলবাবু হল, দিব্যি ফুর্তি করতে লাগল। কিন্তু লিস্ত্‌নিৎস্কি এবং অন্যান্য অফিসাররা ভালো ভাবেই জানে যে তাদের এই আমোদ আহ্লাদ শরৎকালের একটা ঝলমলে দিনের মতো – এই আছে এই নেই। পজিশনে ফিরে যাবার কথা উঠল কি উঠল না, অমনি সকলের মুখের ভাব পালটে গেল, চোখের পাতা নেমে এলো, ভারী চোখের পাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অসন্তোষ আর তিতবিরক্ত ভাব। বোঝা গেল তারা প্রচণ্ড ক্লান্ত, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। এই ক্লান্তি থেকে তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছে, তারা অস্থির হয়ে পড়েছে। লিস্ত্‌নিৎস্কি বেশ ভালো ভাবেই জানে এই অবস্থায় মানুষ যখন কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ছটফট করতে থাকে তখন কী সাংঘাতিকই না সে হতে পারে!

১৯১৫ সালে সে নিজের চোখে দেখেছে একটা কম্পানি পাঁচবার আক্রমণে নেমেছিল, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর বারবার এসেছে সেই একই নির্দেশ: 'আক্রমণ চালিয়ে যাও'। তখন কম্পানির যে সামান্য কিছু সংখ্যক সৈন্য অবশিষ্ট ছিল তারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো এলাকা ছেড়ে ফ্রণ্ট লাইনের পেছন দিকে চলে যায়। লিস্ত্‌নিৎস্কির স্কোয়াড্রনের ওপর হুকুম হল ওদের বাধা দেবার। কিন্তু যখন সে স্কোয়াড্রনকে শৃঙ্খলের আকারে ছড়িয়ে দিয়ে ওদের বেরোবার পথ আটকাতে গেল তখন গুলি চালাতে শুরু করল ওরা। জনা ষাটেকের বেশি অবশিষ্ট ছিল না কম্পানিতে। কিন্তু লিস্ত্‌নিৎস্কি সেদিন দেখেছিল কী রকম পাগলের মতো মরিয়া হয়ে ওই ক'জন লোক কসাকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছিল; তলোয়ারের কোপের নীচে মাথা পেতে দিয়েছিল, মারা যাচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জোর করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, মৃত্যুর মুখে, ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলছিল – যেন মনে মনে এই সঙ্কল্প করে রেখেছে যে যেখানেই মৃত্যু আসুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না।

সেদিনের সেই ঘটনা লিস্তনিৎস্কির মনে এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি হয়ে জেগে আছে। তাই আজ লিস্তনিৎস্কি উদ্বিগ্ন হয়ে নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে কসাকদের মুখগুলো, মনে মনে ভাবে: 'এরাও কি কোন একদিন ওই রকমই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে? মৃত্যু ছাড়া আর কোন শক্তিরই কি সাধ্য হবে না তাদের ধরে রাখার?' সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখের ক্রুদ্ধ ও ক্লান্ত দৃষ্টির সামনাসামনি হতে তাকে সততার সঙ্গে মেনে নিতে হল, হ্যাঁ ওরাও সেই পথেই যাবে।

গত কয়েক বছরের তুলনায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে কসাকদের। এমন কি তাদের যে গান সেগুলোও যেন হয়ে উঠেছে নতুন। সেগুলোর জন্ম হয়েছে লড়াই থেকে, সে সব গানের মধ্যে আছে নিরানন্দের কালো রঙ। যে কারখানার প্রশস্ত চালার নীচে স্কোয়াড্রনটা আস্তানা গেড়েছে তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে লিস্তনিৎস্কি প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় শুনতে পায় একটা গান – বিলাপ ছড়ানো সেই গানটা এত করুণ যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সব সময় তিন-চারজনে মিলে গানটা গাইত। জলদ্গম্ভীর কণ্ঠস্বর ছাড়িয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে সজোরে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে দোহারের সপ্তমের সুর:

ওগো আমার দেশের মাটি, জন্ম যাহার বুকে,
তোমার সনে চোখের দেখা হেথায় গেল চুকে।
দেখার ইতি, কর্ণে আমার ঢালবে না আর নিতি
ফুলের বনে বুলবুলিটি প্রভাত কলগীতি।
মা জননী, গর্ভে যাহার জন্ম হল মোর,
আমার তরে আকুল অত মন কেন রে তোর?
লক্ষকোটি পুত্র মা তোর লড়ছে দেশের তরে,
সবাই কি আর মরে?

লিস্তনিৎস্কি থমকে দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে, মনে মনে সে অনুভব করে যে গানের সহজ বেদনাটুকু তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিচ্ছে। শক্ত-করে-বাঁধা কোন একটা তন্ত্রী যেন হৃৎপিণ্ডের ঘন ঘন ওঠা-পড়ার তালে তালে টান টান হয়ে বাজছে। দোহারের নীচু পর্দায় ধরা সুর সেই তন্ত্রীতে আঘাত করে, বেদনার ঝঙ্কার তোলে। লিস্তনিৎস্কি চালাঘরটা থেকে একটু দূরে কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, চেয়ে চেয়ে দেখে শারদ-সন্ধ্যার কুহেলীবিজড়িত বিষণ্ণ প্রকৃতি। বুঝতে পারে তার চোখ জলে ভিজে উঠছে, চোখের পাতা কড়কড় করছে, অথচ কেমন যেন একটা মধুর আবেশে ভরে উঠছে।

খোলা মাঠের ওপর দিয়ে চলছি ঘোড়া টগবগিয়ে,
জানি আমি ভাগ্য কোথায় যাচ্ছে আমায় নিয়ে।
মনটা আমার আকুল হয়ে বলছে বারে বারে-
আহা সে বীর পুত্র মা তোর ফিরবে না আর ঘরে।

জলদগম্ভীর কণ্ঠের শেষ কথাগুলো মিলিয়ে যেতে না যেতে তাদের ওপর ভেসে ওঠে দোহারের কণ্ঠ। সে কণ্ঠের ধ্বনি সাদা ডানাওয়ালা একটা বিশাল উড়ন্ত পাখির মতো ঝটপট করতে থাকে, ছটফট করতে করতে ডাকে তাকে অনুসরণ করার জন্য, বলে চলে এক কাহিনী:

শনশনিয়ে সীসের গুলি হঠাৎ এলো ধেয়ে,
বিঁধল বুকে এসে।
গেলাম পড়ে ঘোড়ার ঘাড়ে তক্‌খুনি টাল খেয়ে,
রক্তে ঘোড়ার ভ্রমর-কালো কেশর গেল ভেসে।

রেজিমেণ্টটা যত দিন বিশ্রাম করছিল তার মধ্যে মাত্র একবারই লিস্তনিৎস্কি শুনতে পেয়েছিল একটা প্রাচীন কসাক-গীতির উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্যোতক কতকগুলো কথা। রোজকার মতো সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে চালাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে। এমন সময় তার কানে এলো কিছু আধা-মাতাল কণ্ঠের আওয়াজ আর হাসির হুল্লোড়। লিস্তনিৎস্কির বুঝতে বাকি রইল যে কোয়ার্টার-মাস্টার-সার্জেণ্ট* নেজ্‌ভিস্‌কা শহরতলিতে গিয়েছিল রসদ আনতে, সেখান থেকে কিছু চোলাই মদ নিয়ে ফিরে এসেছে, তাই দিয়ে আপ্যায়ন করছে কসাকদের। রাইয়ের ভোদ্‌কা খানিকটা পেটে পড়ার পর কসাকরা কোন একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছে, হাসাহাসি করছে। সান্ধ্যভ্রমণ থেকে ফেরার পথে অনেক দূর থেকেই লিস্তনিৎস্কি শুনতে পেল তাদের প্রচণ্ড বজ্রকণ্ঠের গান, আর তারই তালে তালে উদ্দাম তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ।

যুদ্ধে কভু যায় নি যে জন,
জানবে কি সে শঙ্কা কখন?
ভিজছি দিনে কাঁপছি রাতে,
নিদ্রা নাহি আঁখির পাতে।

শিসের উচ্ছ্বসিত হিস হিস আওয়াজ ঢেউ খেলিয়ে প্রবল ধারায় বয়ে চলে,

---

* সৈন্যদের ইউনিটে রসদ সংরক্ষণ ও বিতরণের ভার যার ওপর ন্যস্ত থাকে। - অনুঃ

কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। শেষকালে তাকে ছাপিয়ে একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে অন্তত তিরিশটি কণ্ঠের ধ্বনি:

খোলা মাঠে বিপদ-আপদ
যে কোন দিন, যখন তখন।

ওদের মধ্যে সম্ভবত অল্পবয়সী কোন এক দামাল ছোকরা কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে সংক্ষেপে শিস দিয়ে নাচতে নাচতে আলগোছে বসে পড়ে মেঝের পাটাতনের ওপর পা ঠুকতে থাকে। তার জুতোর হিলের দাবড়ানিতে ডুবে যায় গানের কথাগুলো:

উঠছে ফুঁসে কৃষ্ণসাগর,
জ্বলছে জাহাজ এধার ওধার।
আগুন নিভাই,
তুর্কী খেদাই,
দন-কসাকের জয়-জয়কার!

চলতে চলতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিস্ত্‌নিৎস্কি একটু হাসল, গানের সুরের তালে তালে পা ফেলার চেষ্টা করল সে। মনে মনে ভাবল, 'যারা পায়দল বাহিনীতে আছে তাদের কারুর বোধহয় কসাকদের মতো বাড়ির জন্য এত বেশি প্রাণ কাঁদে না।' পরক্ষণেই যুক্তি আপত্তি জানিয়ে তাকে জুগিয়ে দিল আরেকটি চিন্তা: 'তাহলে কি পায়দল সেপাইরা অন্য ধরনের লোক? বাধ্য হয়ে ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে থাকা কসাকদের ওপর নিঃসন্দেহে বেশি বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাদের কাজের পদ্ধতিটাই এমন যে তারা নিরন্তর চলায় অভ্যস্ত। অথচ গত দু'বছর হল তাদের কিনা এখানে ওত পেতে বসে থাকতে হচ্ছে, নয়ত বৃথাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণের পাঁয়তারা কষতে হচ্ছে! সৈন্যদল দুর্বল। এত দুর্বল এর আগে আর কখনও ছিল না। এই সময় দরকার শক্ত হাতের, বড় রকমের কোন সাফল্য, সামনে এগিয়ে যাওয়া – তাহলে হয়ত ওরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারত। অবশ্য ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও আছে যখন দীর্ঘকালীন যুদ্ধবিগ্রহের যুগে সবচেয়ে অটল ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়েছে। সুভোরভ* যে সুভোরভ তাঁরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। . . . কিন্তু কসাকরা খাড়া

---

* রুশ সেনানায়ক আলেক্সান্দর ভাসিলিয়েভিচ সুভোরভ (১৭২৯ বা ১৭৩০-১৮০০)। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের নায়ক। উত্তরকালে জেনারেলিসিমো পদে বৃত হন। জীবনে কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন নি। – অনুঃ

হয়ে থাকবে। যদি ভেঙে পড়ে ত ভেঙে পড়বে সকলের শেষে। হাজার হোক এই ছোট জাতিটার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সামরিক ঐতিহ্য আছে তাদের – কারখানার কুলিমজুর বা চাষাভুষো ধরনের আজেবাজে লোক নয় তারা।'

তার ভুলটা ভেঙে দেবার জন্য যেন ইচ্ছে করেই চালাঘরের ভেতর থেকে ঝনঝন করে বেজে ওঠে কারও এক ক্লান্ত ভাঙা গলার অন্য আরেক ধারার গান। আরও গলা তার সঙ্গে সুর মেলায়। লিস্তনিৎস্কি যেতে যেতে শুনতে পায় সেই একই আর্তি রূপ পেয়েছে তাদের গানের মধ্যে:

ভগবানের পুজো করেন জোয়ান-অফিসার।
জোয়ান-কসাক বাড়ি যাবার ধরেছে আবদার:
হেই অফিসার জোয়ান-মালিক,
বাড়ি ফিরতে দাও।
বাড়ি ফিরতে দাও গো মোরে,
বাপের কাছে যাব।
বাপের কাছে যাব, আমার মায়ের কাছে যাব।
বাপের কাছে, মায়ের কাছে যাব,
ঘরে আমার যুবতী বৌ আছে।

* * *

ফ্রন্ট থেকে পালানোর তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা বুনচুক এসে ঢুকল ফ্রন্টের লাগোয়া একটা অঞ্চলে। একটা বড় রকমের গঞ্জ সেটা। বাড়িতে বাড়িতে ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠেছে। হিমে জমা-জলের ছোট ছোট ডোবার ওপর পাতলা বরফের সর পড়েছে। রাস্তায় এখনও যে অল্পসল্প লোকজন চলাফেরা করছে, দূর থেকে তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশ সজাগ ভাবে কান খাড়া করে, আলোকিত রাস্তাঘাট এড়িয়ে নির্জন অলিগলির ভেতর দিয়ে বুনচুক চলতে লাগল। শহরতলিতে ঢোকার মুখে আরেকটু হলেই এক টহলদারের মুখোমুখি পড়ে যাচ্ছিল সে। এখন সে তাই চলেছে নেকড়ের মতো অস্থির গতিতে, বেড়ার গা ঘেঁষে ঘেঁষে। গায়ের গ্রেটকোটটা অসম্ভব রকমের নোংরায় মাখামাখি হয়ে আছে, পকেট থেকে ডান হাতটা সে আর বার করে না। দিনের বেলায় একটা বড় গোয়ালঘরের ভেতরে একরাশ ভুষি আর কুঁড়োর মধ্যে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে সে লুকিয়ে রইল।

শহরটাতে একটা আর্মি-কোর-এর সরবরাহ-ঘাঁটি ছিল। আর্মির কয়েকটা ইউনিটও ঘাঁটি গেড়ে ছিল সেখানে। সেদিক থেকে আচমকা টহলদার দলের

নজরে পড়ে যাওয়ার বিপদ ছিল। তাই বুন্‌চুকের হাতের লোমশ আঙুলগুলোও অনবরত তার গ্রেটকোটের পকেটের ভেতরে নাগান-রিভল্‌বারের খাঁজকাটা হাতলের সঙ্গে সেঁটে থেকে গরম হতে লাগল।

শহরের উল্‌টো দিকের এলাকায় নির্জন গলিটার ভেতরে বুন্‌চুক অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করল, শহরের ফটকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, দারিদ্র্য-পীড়িত ছোট ছোট ঘরবাড়ির প্রত্যেকটির আকার ভালোমতো নিরীক্ষণ করে মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করল। মিনিট বিশেক বাদে কোণের একটা কদাকার গোছের ছোট্ট বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরটা দেখার পর ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এবারে সে ফটক ঠেলে দৃঢ় পায়ে ভেতরে ঢুকল। টোকা দিতে দরজা খুলে দিল এক প্রৌঢ়া। গায়ে চাদর জড়ানো।

'বরিস ইভানভিচ এখানে থাকেন?' বুন্‌চুক জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।'

বুন্‌চুক কাত হয়ে মহিলার পাশ দিয়ে ভেতরে গলে গেল। পেছনে শুনতে পেল ঘরের শেকল তোলার একটা লৌহশীতল ঝনাৎকার। নীচু ঘর। টিমটিম করে আলো জ্বলছে, টেবিলের ধারে বসে আছে সামরিক উর্দি গায়ে যৌবনোত্তীর্ণ একটি লোক। মুহূর্তের জন্য ভ্রূকুটি করল, খুঁটিয়ে দেখল বুন্‌চুককে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মনের উচ্ছ্বাস চেপে রেখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'ফ্রন্ট থেকে।'

'বটে!'

'দেখতেই ত পাচ্ছ. . . ' বুন্‌চুক হাসল। আঙুলের ডগা দিয়ে সামরিক উর্দি-পরা লোকটার বেল্‌ট ছুঁয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, 'একটা ঘর পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাওয়া যাবে বৈ কি। এই যে এদিকে এসো।'

এই বলে বুন্‌চুককে সে নিয়ে এলো আগেরটার চেয়ে আরও ছোট একটা ঘরে। বাতি না জ্বেলেই তাকে একটা চেয়ারে বসতে দিল। পাশের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। জানলার পর্দা ফেলে দিয়ে বলল, 'তুমি কি একেবারেই চলে এলে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে ব্যাপার-স্যাপার কেমন?'

'সব তৈরি।'

'ছোকরাদের ওপর নির্ভর করা যায় ত?'

'অবশ্যই।'

'আমার মনে হয় তুমি বরং এখন জামাকাপড় খোল, পরে কথা হবে। দাও,

তোমার ওভারকোটটা দাও দেখি। তোমার হাত-মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করছি এখুনি।'

সবজে রঙ-ধরা একটা কাঁসার গামলার ওপর বুনচুক হাত-মুখ ধুতে থাকে। সামরিক পোশাক-পরা লোকটা ততক্ষণে কদম-ছাঁট-দেয়া চুলে হাত বুলাতে বুলাতে ক্লান্তস্বরে ধীরে ধীরে বলতে থাকে: 'এখন ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরে। আমাদের কাজ হবে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলা, ছড়িয়ে দেওয়া, চেষ্টার কোন ত্রুটি না রেখে যুদ্ধের আসল কারণ সবাইকে বুঝিয়ে বলা। আমরা অবশ্য বাড়ছিও – এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। ওদের কাছ ছেড়ে যা দূরে সরে যায় তা অনিবার্য ভাবে আমাদের কাছে চলে আসে। একজন বয়স্ক লোক অবশ্যই একটা বাচ্চাছেলের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে। কিন্তু সেই বয়স্ক লোকটি যখন বুড়িয়ে যায়, জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে তখন ওই ছোকরাটাই তাকে নিকেশ করে দিতে পারে। আর এক্ষেত্রে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা বার্ধক্যের জড়তামাত্র নয়, সমস্ত দেহযন্ত্র যেন ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতগ্রস্তও হয়ে পড়ছে।'

বুনচুকের হাত-মুখ ধোওয়া শেষ হল। খসখসে মোটা কাপড়ের গামছা দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে সে বলল, 'আমি চলে যাবার আগে অফিসারগুলোর কাছে আমার নিজের মতামত বলে দিই। ব্যাপারটা বেশ মজার হল কিন্তু! . . . আমি চলে যাবার পর মেশিনগানারদের ওপর খুব এক চোট নেবে ওরা, এতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের মধ্যে কারও কোর্ট-মার্শালও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ যখন নেই তখন আর কী কথা চলতে পারে? আমার যত দূর মনে হয় ছেলেছোকরাগুলোকে নানা ইউনিটে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাতে আমাদেরই পোয়া বারো – জমিতে ফসল ফলবে। . . . আঃ যা সব ছেলে আছে না ওখানে! একেকটা চকমকি পাথর!'

'স্তেপানের কাছ থেকে একটা চিরকুট পেয়েছি আমি। লিখেছে লড়াইয়ের কায়দাকানুন জানে শোনে এমন একজন কাউকে যেন ওর ওখানে পাঠাই। তুমি ওখানে যাবে। আচ্ছা তোমার পরিচয়ের জন্য যে সব কাগজপত্রের দরকার তার কী হবে? যোগাড় করা সম্ভব হবে কি?'

'কী ধরনের কাজ ওর ওখানে?' পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেরেকের গায়ে গামছাটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল বুনচুক।

'ছেলেছোকরাগুলোকে ট্রেনিং দিতে হবে। তুমি ত আর বিশেষ বাড় নি এখনও, তাই না?' গৃহকর্তা মৃদু হেসে বলল।

'খামোকা বেড়ে কাজ নেই,' মুখের ওপর জবাব দিয়ে বলল বুনচুক। 'বিশেষত আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে। আমার হওয়া উচিত মটরশুঁটির সমান, তাহলে কারও তেমন নজরে পড়ব না।'

ভোরের ধূসর আলো যতক্ষণ না নেমে এলো ততক্ষণ ওদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলল। এই ঘটনার এক দিন বাদে বুন্‌চুক ওই শহরতলি ছেড়ে স্টেশনের দিকে যাত্রা করল। বেশভূষা পালটে ও রঙচঙ করে তার চেহারা এমন পালটে গেছে যে তাকে তখন আর চেনার জো নেই। তার সঙ্গে ৪৪১ নম্বর ওর্শা রেজিমেণ্টের সৈনিক নিকলাই উখ্‌ভাতভের নামে যে পরিচয়পত্র আছে তাতে বলা হয়েছে যে যুদ্ধের সময় বুকে আঘাত পাওয়ায় তাকে সেনাবাহিনী থেকে নির্ভেজাল অবসর দেওয়া হয়েছে।

তিন

ভ্‌লাদিমির-ভোলিন্‌স্ক ও কোভেলের দিকে যেতে, যে এলাকাটা বিশেষ বাহিনীর (সংখ্যার হিসাবে আসলে ১৩ নং আর্মি, কিন্তু '১৩' সংখ্যাটা যেহেতু অপয়া আর বাঘা বাঘা জেনারেলরাও যেহেতু কুসংস্কারে ভোগেন তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'বিশেষ বাহিনী') অধিকারে আছে, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সেখানে এগিয়ে যাবার তোড়জোর শুরু হয়ে গেল। স্‌ভিনিউখা গ্রামের সামান্য দূরে একটা জায়গাকে সেনাপতিমণ্ডলী বিশাল এলাকা জুড়ে আক্রমণ চালানোর পাদভূমি হিশেবে বেছে নিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কামান দেগে পথ পরিষ্কারের প্রস্তুতি।

ইতিমধ্যে রণাঙ্গন মরণাস্ত্রে এমন ঠাসা হয়ে গেল যে তার চারপাশের সীমারেখার ওপর সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে হলেও বিপুল প্রয়াস ও বিরাট সংখ্যক প্রাণবলির প্রয়োজন। অভূতপূর্বসংখ্যায় আর্টিলারির সমাবেশ ঘটেছে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। দুটো লাইন জুড়ে জার্মান ট্রেঞ্চের যে এলাকা ছিল নয় দিন ধরে নানা ক্যালিবারের হাজার হাজার গোলা তার ওপর তাণ্ডব শুরু করে দিল। প্রথম যেদিন প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল সেই দিনই জার্মানরা কেবল নজরদারদের রেখে পরিখার প্রথম লাইন ছেড়ে পালাল। এর কয়েক দিন পরে দ্বিতীয় লাইনও ছেড়ে দিল তারা, উঠল গিয়ে তৃতীয় লাইনে।

দশ দিনের দিন তুর্কীস্তান কোর্-এর ইউনিটগুলো – পদাতিক সৈন্যরা আক্রমণে নামল। তারা আক্রমণ করল ফরাসী কায়দায় – যাকে বলে তরঙ্গাঘাত। একে একে ষোলটি তরঙ্গ রুশীদের পরিখার গায়ে এসে বাইরে ছিটকে পড়ল। দুমড়ে-মুচড়ে বিশ্রী রকমের তালগোল পাকিয়ে গেছে কাঁটাতারের বেড়াগুলো – দুলতে দুলতে, গর্জন করতে করতে, ফুঁসতে ফুঁসতে তারই পাশে জোয়ারের জলের মতো গড়িয়ে পড়ছে ধূসর জনস্রোত। ওদিকে, যেখানে অ্যাল্‌ডার গাছের গুঁড়িগুলো পুড়ে

কাঠকয়লা হয়ে নীলচে আভা নিয়েছে তার আড়াল থেকে, বিধ্বস্ত বালির স্তূপের ঢালের ওপাশ থেকে ঘন গর্জনে অবিরাম আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে, দাউ দাউ করে পটপট শব্দে আগুন জ্বালিয়ে ছুটছে জার্মান পক্ষের বন্দুক আর রাইফেলের গুলি।

'হু-হু হু-হু গুম্-গুম্' আওয়াজ তুলে মাঝেমধ্যে ফেটে পড়ে আলাদা কোন একটা ব্যাটারীর কামানগর্জন। তারপর আবার গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসতে থাকে, বহু ক্রোশব্যাপী এলাকা ছেয়ে ফেলে অগণিত কামানের সঘন গর্জন।

ক্ষিপ্ত হয়ে জার্মানরা দ্রুত মেশিনগান চালায় 'কট্-কট্, কট্-কট্'। . . .

প্রায় আধ ক্রোশখানেক এলাকা জুড়ে, ক্ষতবিক্ষত বালিমাটির বুকের ওপর বিস্ফোরণের ফলে কালো কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। আক্রমণকারীদের তরঙ্গরাশি ছিটকে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে, টগবগ করে উঠছে, গোলার গর্ত থেকে ফেনিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে সামনের দিকে।

বিস্ফোরণের কালো কালো ঝলক আরও ঘন ঘন মাটি উথাল পাথাল করে চলল, আরও ঘন হয়ে দরদর ধারে আক্রমণকারীদের উপর ঝরে পড়তে লাগল গুলিগোলা ফাটার কর্কশ গোঙানির তেরছা ছাঁট। মেশিনগানের আগুন আরও প্রচণ্ড হয়ে মাটির গা ঘেঁষে চাবুক হাঁকড়াতে লাগল। কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসার আগেই ওরা মার খেল। অব্যর্থ সেই মার। ষোলটা তরঙ্গের মধ্যে মাত্র শেষ তিনটি পৌঁছুতে পারল ভাঙাচোরা কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি, যেখানে তালগোল পাকানো কাঁটাতারের স্তূপের ওপর আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে কিছু খুঁটির দগ্ধাবশেষ। সেগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে তারা যেন বিন্দু বিন্দু জল হয়ে ক্ষীণধারায় ফিরে চলেছে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে। . . . স্‌ভিনিউখা গ্রামের কাছাকাছি সেই নিরানন্দ বালিমাটির বুকে সে দিন নয় হাজারেরও বেশি প্রাণ ভেসে গেল।

দু'ঘণ্টা পরে ফের নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। তুর্কীস্তান রাইফেল কোর্-এর দুই ও তিন নম্বর ডিভিশনের ইউনিটগুলোকে নামিয়ে দেওয়া হল। একটু বাঁয়ে, সরু ফালি জায়গার ওপরে কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চের প্রথম লাইনের দিকে জড় করে রাখা হল ৫৩ নম্বর পদাতিক ডিভিশনের কতকগুলো ইউনিট আর ৩০৭ নম্বর সাইবেরীয় রাইফেল ব্রিগেড। তুর্কীস্তানীদের ডান পাশ আগলে আগলে চলল তিন নম্বর গ্রেনেডিয়ার ডিভিশনের কয়েকটি ব্যাটেলিয়ন।

বিশেষ সেনাবাহিনীর ৩০ নম্বর আর্মি কোর্-এর কম্যাণ্ডার লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল গাভ্রিলভ দুটো ডিভিশনকে স্‌ভিনিউখা এলাকায় উঠিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ পেলেন আর্মির হেড-কোয়ার্টার থেকে। ৮০ নম্বর ডিভিশনের ৩২০ নম্বর চেম্বার্‌স্কি রেজিমেণ্ট, ৩১৯ নম্বর বুগুল্‌মিন্‌স্কি রেজিমেণ্ট ও ৩১৮ নম্বর চের্নোইয়ার্‌স্কি

রেজিমেণ্টকে রাতের বেলায় পজিশন থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। তাদের জায়গায় বহাল হল লাত্‌ভিয়ার রাইফেল ইউনিট আর সদ্যাগত কিছু স্বেচ্ছা-সৈনিক। রেজিমেণ্টগুলো সরানো হল রাত্রে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলোর মধ্যে একটাকে সন্ধ্যা থাকতেই লোক-দেখানোর খাতিরে উলটো দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ফ্রণ্ট লাইনের ওপর দিয়ে মার্চ করে রেজিমেণ্ট যখন চার ক্রোশ পেরিয়েছে কেবল তখনই তাকে ফিরে আসার হুকুম দেওয়া হল। সবগুলো রেজিমেণ্ট চলেছে এক দিকে, একই লক্ষ্যে, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে। ৮০ নম্বর ডিভিশনের যাত্রাপথের খানিকটা বাঁ দিক ধরে এগিয়ে চলেছে ৭১ নম্বর ডিভিশনের ২৮৩ নম্বর পাভ্‌লোগ্রাদ রেজিমেণ্ট ও ২৮৪ নম্বর ভেন্‌গ্রোভ রেজিমেণ্ট। তাদের পেছন পেছন চলেছে উরাল কসাকদের একটা রেজিমেণ্ট আর কুবান কসাক বাহিনীর কসাকদের ৪৪ নম্বর পদাতিক দলটা।

জায়গা বদলের আগে ৩১৮ নম্বর চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেণ্ট ছাউনি ফেলেছিল স্তখোদ নদীর ধারে, সোকাল নামে এক ছোট শহরাঞ্চলে। জায়গাটা বুদ্‌কা-মেরিন্‌স্কোয়ে জমিদারীর কাছাকাছি। প্রথম দফার মার্চের পরই, সকালে বনের ভেতরে ছেড়ে যাওয়া কতকগুলো সুরঙ্গ-ঘরের ভেতরে তাদের থাকার জায়গা হল। চার দিন ধরে তাদের শেখানো হল ফরাসী কায়দায় আক্রমণ – শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাটেলিয়নের জায়গার অর্ধেক কম্পানি নিয়ে লড়াইয়ের কায়দা; হাতবোমা ছোঁড়ার লোকদের শেখানো হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাঁটাতারের বেড়া কাটার সম্ভাব্য যত উপায়, নতুন করে তাদের হাতবোমা ছোড়ার ট্রেনিং দেওয়া হল। তারপর আবার যাত্রা করল রেজিমেণ্ট। তিন দিন ধরে চলল বনের মধ্য দিয়ে, বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে, কামানের চাকার দাগে ক্ষতবিক্ষত দূর দূর প্রদেশের পাকা রাস্তা ধরে। পেঁজা তুলোর মতো ছাড়া-ছাড়া কুয়াশা বাতাসে দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে, আটকে যাচ্ছে পাইন গাছের মাথায় মাথায়, বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ধূমায়মান জলাভূমির নীলচে-সবুজের মাথার ওপর বড় বড় পাতায় ছাওয়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে ভাগাড়ের মাথায় চিলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ঝাপসা কণা। লোকে চলেছে ভিজে জুবড়ি হয়ে। তাদের মন-মেজাজও তাই খিচড়ে আছে। তিন দিন পরে তারা আক্রমণের জায়গার কাছাকাছি এসে থামল। ছোট পোরেক ও বড় পোরেক – এই দুই গ্রাম জুড়ে জায়গাটা। সেখানে তারা একদিন বিশ্রাম করল, প্রস্তুতি নিল মৃত্যুপথযাত্রার।

এই সময় ৮০ নম্বর ডিভিশনের হাই কম্যাণ্ডের অফিসারমণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কসাক স্কোয়াড্রনটাও আসন্ন যুদ্ধের জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

স্কোয়াড্রনটা অংশত গড়া হয়েছে তাতার্স্কি গ্রামের থার্ড-লাইন রিজার্ভদলের কসাকদের নিয়ে। দ্বিতীয় ট্রুপটা গড়া হয়েছে পুরোপুরি তাতার্স্কি গ্রামের লোকজন নিয়ে। তাদের মধ্যে আছে হাত-কাটা আলেক্সেই শামিলের দুই ভাই মার্তিন আর প্রোখর, মোখভের মিলের প্রাক্তন ইঞ্জিনম্যান ইভান আলেক্সেয়েভিচ, ফোকলা-দাঁত আফোন্‌কা ওজেরভ, গ্রামের এককালের মোড়ল মানিৎস্‌কোভ, শামিলদের গোদা-পা ঝুঁটিওয়ালা পড়শী ইয়েভ্‌লাম্পি কালিনিন, বিশ্রী ঢ্যাঙা জোয়ান কসাক বোর্‌শ্চিওভ, ভালুকের মতো দেখতে ঘাড়ে-গর্দানে জাখার করলিওভ, গোটা স্কোয়াড্রনের মধ্যমণি অসাধারণ হিংস্র চেহারার ফুর্তিবাজ কসাক গাভ্রিলা লিখভিদভ – সত্তর বছরের বুড়ি মা আর সাদামাঠা চেহারার অথচ স্বাধীনচেতা বৌয়ের কাছে মুখ বুজে অবিরাম মার সহ্য করার জন্য যার বিশেষ খ্যাতি; এছাড়া আরও অনেকে আছে স্কোয়াড্রনের দু'নম্বর এবং বাকি আর সব ট্রুপে। কসাকদের একটা অংশ ডিভিশনের স্টাফে আর্দালির কাজ করছিল। কিন্তু দোসরা অক্টোবর তাদের জায়গায় এলো বর্শাধারী হাল্‌কা ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা। ডিভিশনের নেতা জেনারেল কিত্‌চেন্‌কোর নির্দেশে স্কোয়াড্রনকে পজিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

৩রা অক্টোবর ভোর হতে না হতে ৩১৮ নম্বর চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেন্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ন যখন ছোট পোরেক ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে স্কোয়াড্রনটা গ্রামে এসে ঢুকল। বিধ্বস্তপ্রায়, ছেড়ে যাওয়া কুটিরগুলো থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে পদাতিক সৈন্যরা। এসেই সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে রাস্তার ওপর। কচি বয়সের একজন এনসাইন, রোদে-পোড়া তামাটে তার গায়ের রঙ, সামনের প্লেটুনটার কাছে ঘুরঘুর করছে। ম্যাপ-কেস্‌-এর ভেতর থেকে একটা চকোলেট বার করে (তার উগ্র গোলাপী রঙের ভিজে ঠোঁটের ধার প্রান্তদেশ ইতিমধ্যেই চকোলেটে মাখামাখি হয়ে গেছে) সেটার মোড়ক সে খুলল, সৈন্যদের সারিগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। তার গায়ের ঝুলঝুলে লম্বা গ্রেটকোটের কিনারায় কাদা লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে, গ্রেটকোটটা ভেড়ার লেজের মতো লটপট করছে তার দু'পায়ের ফাঁকে। কসাকরা মার্চ করছিল রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে। দ্বিতীয় দলের একটা সারির ডান দিকের একেবারে কিনারা ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিল ইঞ্জিন-কারিগর ইভান আলেক্সেয়েভিচ। জল-জমা গর্তগুলো এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক হয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে মার্চ করছিল সে। পদাতিকদের সার থেকে কে যেন তাকে ডাকতে সে ঘাড় ফেরাল। সারিগুলোর ওপর এক ঝলক চোখ বুলাল।

'ইভান আলেক্সেয়েভিচ! এই যে দোস্ত্‌! . . .'

বেঁটেখাটো চেহারার এক সেপাই হাঁসের মতো হেলে দুলে নিজের প্লেটুন থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। ছুটতে ছুটতে সে তার রাইফেলটা ঠেলে

দিয়েছে পেছনের দিকে। কিন্তু ফিতেটা নেমে গেছে, ঝোলানো জলের পাত্রটার সঙ্গে রাইফেলের কুঁদো লেগে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করছে।

'চিনতে পারছ না? ভুলে গেলে নাকি?'

বেঁটেখাটো সেপাইয়ের মুখে একগাল ধোঁয়াটে-ছাইরঙা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গালের উঁচু হাড় পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। তারই ফাঁক দিয়ে তাকে গোলাম বলে অতি কষ্টে সনাক্ত করতে পারল ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

'তুমি কোত্থেকে হে স্যাঙাত?'

'এই ত... পল্টনে চাকরী করছি।'

'আচ্ছা, কোন্ রেজিমেন্টে আছ তুমি?'

'৩১৮ নম্বর চের্নোইয়ার্স্কিতে। কখনও ভাবি নি... স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের কারও সঙ্গে দেখা হতে পারে।'

গোলামের ছোট্ট নোংরা হাতটা নিজের রুক্ষ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রইল ইভান আলেক্সেয়েভিচ, খুশি হয়ে উত্তেজিত ভাবে হাসল। ইভান আলেক্সেয়েভিচের লম্বা লম্বা পা ফেলার সঙ্গে তাল রাখার জন্য সেও জোরে জোরে পা চালাতে লাগল। আবার সেই হাঁসের মতো হেলেদুলে চলতে লাগল। ইভান আলেক্সেয়েভিচের চোখে চোখ রাখল, আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে। তার নিজের ক্ষুদে ক্ষুদে রাগী চোখের দৃষ্টি এখন হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক কোমল, সজল।

'হামলা করতে যাচ্ছি আমরা।... দেখছ ত...'

'আমরাও যাচ্ছি।'

'তোমার খবর কী ইভান আলেক্সেয়েভিচ?'

'আর খবর!'

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর, সেই একই কথা বলতে হয়। চৌদ্দ সালের পর ট্রেঞ্চ থেকে আর বেরুতে পারি নি আমরা। বাড়িঘর পরিবার-পরিজন বলে কিছুই ছিল না। এখন কিনা কার জন্যে কে জানে খুন করতে যাচ্ছি।... আমাদের হল গিয়ে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

'স্টক্মানকে মনে আছে? আমাদের সেই ওসিপ দাভিদভিচ গো! এসব কী ঘটছে, সে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারত আমাদের। কী মানুষই না ছিল, অ্যাঁ? মানুষের মতো মানুষ ছিল!'

'হ্যাঁ সে ঠিক খোলসা করতে পারত!' গোলামের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ছোট্ট মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ছোট্ট মুঠোটা ঝাঁকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে সে বলল, 'মনে নেই আবার! নিজের বাপকে যতটা না মনে রেখেছি তার চেয়েও বেশি মনে আছে ওকে। আমার বাপের দাম আমার কাছে

ততটা নয়। . . . ওর কথা কিছু শুনেছ কি? কোন খবর-টবর আছে?'

'সাইবেরিয়ায় আছে এখন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইভান বলল। 'মেয়াদ খাটছে।'

'বল কী!' কানের ডগা খাড়া করে বিশাল চেহারার সঙ্গীর পাশে একটা ছাতার পাখির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল সে।

'জেলে বসে আছে। কে জানে, হয়ত বা মারাই গেছে অ্যাদ্দিনে।'

গোলাম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে কখনও ফিরে তাকায় পেছনে, যেখানে তার কোম্পানি সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে, কখনও বা ইভান আলেক্সেয়েভিচের উঁচিয়ে-থাকা চিবুক আর নীচের ঠোঁটের ঠিক নীচেকার গোল টোলটার দিকে।

'আচ্ছা চলি!' ইভান আলেক্সেয়েভিচের ঠাণ্ডা হাতের মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল। 'মনে হয় না আবার দেখা হবে আমাদের।'

বাঁ হাতে মাথার টুপিটা খুলল ইভান আলেক্সেয়েভিচ, তারপর ঝুঁকে পড়ে গোলামের হাড্ডিসার কাঁধ জড়িয়ে ধরল। আবেগভরে চুমু খেল দু'জনে, যেন চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছে ওরা। গোলাম পেছনে পড়ে রইল। হঠাৎ কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে দু'কাঁধের ভেতরে মাথাটা টেনে নিল, ফলে ছাইরঙা ফৌজী গ্রেটকোটের কলারের ওপর জেগে রইল শুধু তার তামাটে আভা মেশানো গোলাপী দুই কানের খাড়া ডগাদুটো। ঘাড় গোঁজ করে, সমান জায়গার ওপরই হোঁচট খেতে খেতে পিছনে ফিরল সে।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ সারি থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল: 'ওরে ভাই রে! প্রাণের বন্ধু আমার! তোমার শরীরে কিন্তু অনেক রাগ ছিল, জ্বালা ছিল। বেশ শক্ত লোক ছিলে তুমি . . . তাই না?'

গোলাম মুখ ফেরাল। চোখের জলে ভিজে গিয়ে তার মুখখানা আরও বয়স্ক দেখাচ্ছে। বোতাম-খোলা গ্রেটকোট আর জামার ছিন্নভিন্ন কলারের ভেতর থেকে উঁকি মারছে তার রোদে পোড়া তামাটে, হাড়-বার-করা বুকটা। হাতের মুঠো দিয়ে বুকের ওপর ঘা মারতে মারতে সে চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ছিলাম, শক্ত মানুষ ছিলাম আমি। কিন্তু এখন ওরা আর আমার কিছু রাখে নি। হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে দফারফা করে দিয়েছে তেজী ঘোড়াটার। . . .'

আরও কিছু যেন চেঁচিয়ে বলল সে। কিন্তু স্কোয়াড্রনটা পরের রাস্তায় মোড় ঘুরতে ইভান আলেক্সেয়েভিচ আর ওকে দেখতে পেল না।

প্রোখর শামিল ওর পেছন পেছন হাঁটছিল। জিজ্ঞেস করল: 'ওটা সেই গোলাম না?'

'ও একজন মানুষ,' কাঁধে-ঝোলানো আদরের রাইফেলটার গায়ে মৃদু চাপড়

মেরে ভাঙা ভাঙা গলায় ইভান আলেক্সেয়েভিচ উত্তর দিল।

গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুখে দেখা হতে লাগল আহতদের সঙ্গে – প্রথমে একজন দু'জন, পরে কয়েকজনের একেকটি দল, শেষ কালে বহু জনতার ভিড়। গুরুতর আহতদের নিয়ে গাদাগাদি করা কয়েকখানা গাড়ি কোন রকমে টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে। মরকুটে কতকগুলো ঘোড়া সেই গাড়ি টানছে। ঘোড়াগুলো বিশ্রী রকমের হাড় জিরজিরে। তাদের হাড় বার করা শিরদাঁড়ার ওপর অবিরাম চাবুক পড়ার সদ্য কাঁচা দাগ। জায়গায় জায়গায় লাল দগদগে দাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে গোলাপী রঙের হাড়, কোথাও কোথাও লেগে আছে একটু আধটু লোম। নাকে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে এত কষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে চার চাকার গাড়িগুলো টানছে যে তাদের মুখে ফেনা উঠছে, মুখ প্রায় কাদায় ঠেকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোন একটা মাদী-ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ছে, ভেতরে-ঢুকে-যাওয়া হাড্ডিসার পাঁজরটা ক্ষীণ ভাবে ফুলে ফুলে উঠছে, হতাশায় ঝুলে পড়ছে তার হাড়-বার-করা বিরাট মাথাটা। চাবুকের ঘা খেয়ে জায়গা ছেড়ে নড়তে বাধ্য হচ্ছে সে। প্রথমে এক পাশে, তারপর আরেক পাশে টলতে টলতে আবার চলতে শুরু করছে। গাড়ির চারপাশ আঁকড়ে ধরে আছে আহত লোকজন। তারাও সঙ্গে সঙ্গে টাল খাচ্ছে।

একটা লোকের মুখে ভালোমানুষ-ভালোমানুষ ভাব দেখতে পেয়ে বেছে বেছে তাকেই জিজ্ঞেস করল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, 'কোন্ ইউনিটের?'

'তুর্কীস্তান কোর্-এর, তিন নম্বর ডিভিশন।'

'আজ জখম হলে নাকি?'

সেপাই কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্কোয়াড্রনটা রাস্তা থেকে মোড় নিয়ে সিকি ক্রোশটাক দূরে যে বনটা দেখা যাচ্ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ৩১৮ নম্বর চের্নোইয়ারস্কি রেজিমেন্টের কোম্পানিগুলোও গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পদাতিকদের ভারী বুটজুতোয় ছপর ছপর করে কাদা ভাঙতে ভাঙতে তারা পেছন পেছন চলল। দূরে, বৃষ্টির জলে রঙ-ধোওয়া ঝাপসা আকাশের গায়ে হলুদ-ছাই রঙের একটা দাগের মতো স্থির হয়ে ঝুলছে জার্মানদের অবজার্ভেশন বেলুন।

'দেখ, দেখ ভাইসব কী আজব জিনিস ঝুলছে!'

'আহা, সাধ হয় ধরে খাই!'

'আরে ওটা ওখান থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে। ব্যাটা আমাদের সৈন্যদলের হালচাল দেখছে।'

'তা নয় ত কী? তুই ভাবলি কি অমনি অমনি ওই টঙে উঠে বসে আছে?'

'ইস্‌, বড় দূরে!'

'কাছে আর কোথায় ? গোলা ছুড়েও সুবিধে হবে না – আমার ত তা-ই ধারণা।'

বনের মধ্যে চের্নোইয়ার্‌স্কি রেজিমেণ্টের এক নম্বর কোম্পানি কসাকদের নাগাল ধরে ফেলল। সন্ধে পর্যন্ত ভিজে পাইন গাছগুলোর নীচে সকলে মিলে গাদাগাদি করে রইল। কলারের ভেতর দিয়ে ঘাড় বয়ে জল গড়াতে লাগল, পিঠ বয়ে নামতে লাগল কনকনে ঠাণ্ডার স্রোত। এদিকে আগুন জ্বালানো নিষেধ, তাছাড়া এই বৃষ্টিতে আগুন জ্বালানোও কঠিন। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুখে তাদের নিয়ে আসা হল একটা সরু ফোকরের ভেতরে। ফোকরটা তেমন গভীর নয়। বড়জোর এক-মানুষ-সমান উঁচু হবে, বেশ কয়েক আঙুল পরিমাণ জলে ভর্তি। নদীর তলার পাঁক, পাইন গাছের পচা পাতার দুর্গন্ধ আর বৃষ্টির মখমল-কোমল তাজা গন্ধ সেখানে। কসাকরা গ্রেটকোটের কিনারা গুটিয়ে উটকো হয়ে বসে বসে তামাক খেতে থাকে, তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন কোন এক ধূসরবর্ণের জীর্ণ সুতোর জট ছাড়াচ্ছে। দু'নম্বর ট্রুপের সৈন্যরা যাত্রা করার আগে তামাকের যে রেশন পেয়েছিল তা-ই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে একটা মোড়ে ট্রুপ-সার্জেণ্টকে ঘিরে ভিড় করে আছে। কে যেন তার-জড়িয়ে-রাখার একটা খালি কাটিম ফেলে দিয়েছিল, সার্জেণ্ট তারই ওপর বসে বসে গল্প করছিল। বলছিল গত সোমবারে নিহত জেনারেল কপিলোভ্‌স্কির কথা, যার ব্রিগেডে যুদ্ধের আগেও সে কাজ করেছে। তার বিবরণ আর শেষ হল না, ট্রুপ-অফিসার হাঁক দিল, 'হাতিয়ার তৈয়ার!' – সঙ্গে সঙ্গে কসাকরা লাফিয়ে উঠল, লোভের বশে সুখটান দিতে গিয়ে অনেকে আঙুল পুড়িয়ে ফেলল। স্কোয়াড্রনটা আবার ফোকরের ভেতর থেকে উঠে এলো অন্ধকারাচ্ছন্ন পাইন বনে। হাসি মস্করায় এ ওকে উৎসাহ দিতে দিতে চলতে লাগল। কে একজন শিসও দিল।

বনের ভেতরকার একটা ছোট ফাঁকায় তারা হঠাৎ দেখতে পেল মরা মানুষের এক লম্বা সারি। গাদাগাদি করে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পড়ে আছে সেগুলো – অনেক সময়ই বীভৎস, ভীতিকর – নানা ভঙ্গিতে। রাইফেল হাতে, কোমরের একপার্শে বেল্‌টের সঙ্গে গ্যাস-মুখোস ঝোলানো এক সেপাই সেখানে পাহারা দিচ্ছে। মড়াগুলোর আশেপাশের ভিজে মাটি উথাল পাথাল হওয়ার ফলে ঘন থকথক করছে। বহু পায়ের চিহ্ন চোখে পড়ছে, গাড়ির চাকার দাগ গভীর হয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর। কয়েক পা দূর দিয়ে চলল স্কোয়াড্রনটা। পচাগলা মাংসের ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার কসাকদের থামতে বলে ট্রুপ-অফিসারদের নিয়ে এগিয়ে গেল পাহারাদার সেপাইটার কাছে। কী যেন বলাবলি করল। ইতিমধ্যে কসাকরা সার ভেঙে মড়াগুলোর আরও কাছে এগিয়ে

এলো, মাথার টুপি খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সেগুলোকে; তাদের মনের ভেতরে গোপন আতঙ্ক আর পাশবিক কৌতূহলের সেই অস্থির অনুভূতি, মৃতের রহস্যের সামনে যে-কোন জীবন্ত প্রাণী যা অনুভব করে থাকে। যারা মারা গেছে তাদের সকলেই অফিসার। কসাকরা গুনে দেখল সাতচল্লিশজন। বেশির ভাগই অল্পবয়স্ক, চেহারা দেখে মনে হয় কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে বয়স। শুধু ডান দিকের একেবারে শেষের লোকটি, যার উর্দিতে জুনিয়র ক্যাপ্টেনের কাঁধ-পটি লাগানো, বয়সে প্রৌঢ়। তার চওড়া-হাঁ-করা মুখে লেগে আছে শেষ চিৎকারের মূক প্রতিধ্বনিটুকু, ওপরে বিষণ্ণ ভাবে ঝুলছে কালো ঘন গোঁফজোড়া, মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে প্রবল স্পর্ধাভরে কুঞ্চিত হয়ে আছে এক জোড়া চওড়া ভুরু। নিহতদের অনেকের গায়ে কাদামাখা চামড়ার জ্যাকেট, বাকিদের গায়ে গ্রেটকোট। দু'তিনজনের মাথায় টুপি নেই। একজন লেফ্‌টেনান্টের চেহারা মৃত্যুর পরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। কসাকরা বিশেষ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। লোকটা চিত হয়ে শুয়ে আছে। বাঁ হাতটা শক্ত হয়ে বুকের সঙ্গে সেঁটে আছে, ডান হাত পড়ে আছে এক পাশে, একটা নাগান রিভল্‌বারের বাঁট মুঠোয় চেপে ধরা। সে মুঠো কোনকালে আলগা হবার নয়। স্পষ্টই বোঝা যায় রিভল্‌বারটা কেউ তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তার হাতের চওড়া হলদে কবজিতে সাদা সাদা আঁচড়ের দাগ। কিন্তু ইস্পাত যেন গলে জমে গিয়ে লেগে আছে – আলাদা করার উপায় নেই। কোঁকড়ানো রেশমি চুলের ওপর ধেবড়ে আছে মাথার টুপিটা। মাটির সঙ্গে লেগে রয়েছে গাল, যেন আদর করছে মাটিকে। নীলচে-আভা-ধরা কমলারঙের ঠোঁটদুটো দুঃখে-বেদনায় বিহ্বল হয়ে কুঁকড়ে আছে। তার ডানধারের লোকটি পড়ে আছে উপুড় হয়ে, গ্রেটকোটটা পিঠের ওপর জড়ো হয়ে আছে, পেছনের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে; ফলে খাকিরঙের প্যাণ্ট আর ক্রোমলেদারের বুটের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে টানটান শক্ত পেশীগুলো। গোড়ালিদুটো একদিকে বেঁকে আছে। লোকটার মাথায় কোন টুপি নেই, মাথার খুলির ওপরের অংশটাও নেই, গোলার টুকরো সেটাকে পরিষ্কার কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। ভেজা চুল লম্বা লম্বা হয়ে ঝুলে আছে শূন্য করোটির চারপাশ ঘিরে, ভেতরে চকচক করছে গোলাপী রঙের বৃষ্টির জল। তার পরে পড়ে আছে বেঁটেখাটো শক্ত সমর্থ চেহারার একজন। জ্যাকেটের বুক খোলা, গায়ের ফৌজী শার্টটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। মুখ বলতে তার কিছু নেই; খোলা বুকের ওপর বেঁকে পড়ে আছে নীচের চোয়ালটা। মাথার চুলের খানিকটা নীচে কপাল বলতে সাদা চকচক করছে সরু একটা ফালি, চামড়া ঝলসে কুঁকড়ে পাকিয়ে গেছে। কপালের ওপরের অংশ আর চোয়ালের মাঝখানটায় আছে কয়েক টুকরো ভাঙা হাড়গোড় আর লাল-কালো পাতলা মণ্ড জাতীয়

খানিকটা পদার্থ। আরও দূরে, কোন রকমে এক জায়গায় জড় করা আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা স্তূপ, গ্রেটকোটের ছিন্নভিন্ন নেকড়া। যেখানে মাথা থাকার কথা সেখানে একটা থেঁতো ছেঁড়া পা। তারও পরে নেহাৎই একটি বালক। ফোলা ফোলা ঠোঁটদুটো, লম্বাটে গড়নের কচি কিশোর-মুখ। মেশিনগানের গুলির স্রোতে বুক তার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, গ্রেটকোটের চারটে জায়গায় ফুটো, পোড়া মাংসের কুচি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে ফুটোর মধ্য দিয়ে।

'মরার . . . মরার এই মুহূর্তটিতে কাকে ডেকেছিল ও? কাকে? মাকে?' দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে, তোতলাতে তোতলাতে বলে উঠল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। তারপর হঠাৎই পিছন ফিরে সে হাঁটতে শুরু করল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অন্ধ হয়ে গেছে।

কসাকরা ক্রুশ-প্রণাম করতে করতে তাড়াতাড়ি সরে এলো। ফিরেও তাকাল না আর। এর পর সরু ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকক্ষণ তারা নীরবতা রক্ষা করে চলল। যা দেখেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই স্মৃতি থেকে মুক্তি পেলে তারা যেন বাঁচে। একটা জায়গায় কারা যেন ঘন এক সারি সুড়ঙ্গ-ঘর ফেলে চলে গেছে। তারই কাছাকাছি স্কোয়াড্রনটাকে থামানো হল। চের্নোইয়ারস্কি রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টার থেকে কয়েকজন অফিসার আর একজন আর্দালি ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছিল, তারা ওই সুড়ঙ্গ-ঘরগুলোর একটার ভেতরে গিয়ে ঢুকল। একমাত্র তখুনি ইভান আলেক্সেয়েভিচের হাতটা থাবার ভেতরে চেপে ধরে ফোকলা আফোন্‌কা ওজেরভ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আচ্ছা, ওই . . . শেষের ওই যে ছোকরা ছেলেটা . . . আমার ত মনে হয় জন্মে কখনও কোন মেয়ের মুখে চুমো খায় নি। . . . জবাই হয়ে গেল, অ্যাঁ?'

'এরকম কচুকাটা ওরা কোথায় হল?' জাখার করলিওভ ওদের কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল।

'হামলা করতে গিয়েছিল। যে সেপাইটা মড়াগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল সে-ই বলল,' খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বোর্‌শ্চিওভ উত্তর দিল।

কসাকরা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ পেল। বনের মাথায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে মেঘপুঞ্জ, এখানে ওখানে মেঘ ছিন্নভিন্ন করে সরিয়ে দিচ্ছে। প্রকাশ পাচ্ছে দূর আকাশের তারার বেগনী রঙের বিন্দু বিন্দু আলো।

ইতিমধ্যে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে, স্কোয়াড্রনের অফিসাররা জড় হয়েছে। আর্দালিকে বিদেয় করে দিয়ে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার মোমবাতির টুকরোর আলোয় একটা প্যাকেট খুলল। ভেতরকার বিষয়বস্তুটা একবার বেশ করে দেখে নিয়ে পড়ে শোনাল:

'৩রা অক্টোবর ভোরে ২৫৬ নং রেজিমেন্টের তিনটি ব্যাটেলিয়নের উপর বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করিয়া জার্মানগণ আমাদের পরিখাগুলির প্রথম লাইন অধিকার করিয়া লইয়াছে। আপনাদের প্রতি আমার আদেশ এই যে পরিখার দ্বিতীয় লাইনের দিকে অগ্রসর হইবেন এবং ৩১৮ নং চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেন্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের সহিত যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক একই রাত্রে প্রথম লাইন হইতে শত্রুপক্ষকে বিতাড়নের উদ্দেশ্য লইয়া দ্বিতীয় লাইন অধিকার করিবেন। দুই নম্বর ব্যাটেলিয়নের দুইটি কোম্পানি এবং তিন নম্বর গ্রেনাডিয়ার ডিভিশনের ফানাগোরিইস্কি রেজিমেন্টের একটি ব্যাটেলিয়ন আপনাদের দক্ষিণ রক্ষণভাগে থাকিবে।'

পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর অফিসাররা একটা করে সিগারেট খেল, তারপর বাইরে বেরিয়ে পড়ল। স্কোয়াড্রন যাত্রা করল।

কসাকরা যতক্ষণ সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে বিশ্রাম করছিল ততক্ষণে চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেন্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ন তাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে, স্তখোদ নদীর সেতুর কাছে চলে এসেছে তারা। গ্রেনাডিয়ার রেজিমেন্টের একটা জবরদস্ত মেশিনগান-পোস্ট সেতুটার পাহারায় ছিল। সার্জেন্ট-মেজর ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিল। সেতু পার হওয়ার পর ব্যাটেলিয়ন ভাগাভাগি হয়ে গেল – দুটো কোম্পানি গেল ডান দিকে, একটা বাঁ দিকে, আর শেষটা ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডার সমেত রয়ে গেল রিজার্ভ হিশেবে। কোম্পানিগুলো ছড়ানো লাইন বেঁধে চলল। অগভীর বনে এবড়োখেবড়ো গর্ত হয়েছে। সৈন্যেরা সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে, অস্ফুটস্বরে গালিগালাজ করছে। একেবারে ডানধারে, শেষের দিক থেকে পাঁচজনের পর চলেছে গোলাম। 'তৈয়ার হও!' – হুকুম আসার পর যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে রাইফেলের ঘোড়া টেনে ধরল সে, রাইফেল সামনে বাগিয়ে ধরে পাইন গাছের গুঁড়ি আর ঝোপঝাড়ের ওপর বেয়নেটের খোঁচা মারতে মারতে এগিয়ে চলল। লাইন বরাবর তার পাশ দিয়ে দু'জন অফিসার চলে গেল। তারা চাপা গলায় কথা বলছিল। কোম্পানির কম্যাণ্ডারের কণ্ঠস্বর বেশ গাঢ়, জলদগম্ভীর। অনুযোগের সুরে সে বলছিল: 'আমার বহুদিনের পুরনো জখমটা গুঁতো খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল। গাছের কাটা গুঁড়ির নিকুচি করেছি! বুঝলেন কিনা ইভান ইভানভিচ, এই অন্ধকারের মধ্যে একটা গাছের কাটা গুঁড়িতে পা ঠুকে গুঁতো খেলাম। ফলে ঘা'টা আবার বেরিয়ে পড়ল। আমি আর হাঁটতে পারছি নে, ফিরে যাওয়া ছাড়া

গতি নেই।' কোম্পানি-কম্যাণ্ডারের জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা মুহূর্তের জন্য থেমে গেল তারপর আবার ফিরে এলো – এবারে আরও চাপা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে, 'কোম্পানির প্রথম অর্ধেকটার ভার আপনি নিন। দ্বিতীয়টার ভার নেবে বগ্‌দানভ। আমি . . . সত্যি বলতে গেলে কি . . . আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে ফিরেই যেতে হবে।'

উত্তরে কর্কশ চড়া সুরে খেঁকিয়ে উঠল এন্‌সাইন বেলিকভ: 'তাজ্জব ব্যাপার! যুদ্ধে যাবার নাম উঠতেই কিনা আপনার পুরনো ঘা চাগিয়ে উঠল!'

কোম্পানি-কম্যাণ্ডার গলা চড়াল:

'দয়া করে চুপ করুন এন্‌সাইন!'

'আচ্ছা ছেড়ে দিন। আপনি যেতে পারেন।'

নিজের এবং অন্য সকলের পায়ের শব্দ কান পেতে শুনতে শুনতে পেছন থেকে একটা দ্রুত সড়সড় আওয়াজ গোলামের কানে এলো। তার বুঝতে বাকি রইল না যে কোম্পানি-কম্যাণ্ডার ফিরে যাচ্ছে। মিনিট খানেক পরে সার্জেণ্ট-মেজরের সঙ্গে কোম্পানির বাঁ পাশের রক্ষণভাগে সরে যেতে যেতে বেলিকভ বিড়বিড় করে বলে গেল: ' . . . পাজীগুলো ঠিক টের পেয়ে যায়! কোন কাজ গুরুতর হলেই হল, অমনি ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, নয়ত ওদের পুরনো ঘা নতুন করে দেখা দেয়। আর তুমি, নতুন লোক, অর্ধেক কোম্পানির ভার নাও। . . . বদের ধাড়ি! আমি হলে ওদের . . . সাধারণ সেপাই করতাম . . .'

গলার আওয়াজগুলো অকস্মাৎ থেমে গেল। গোলাম শুনতে পেল শুধু নিজের পায়ের ভিজে প্যাচপ্যাচ শব্দ আর কানের ভেতরে একটানা ঝিঁঝিঁ আওয়াজ।

'ওহে দেশোয়ালী ভাই!' বাঁ দিক থেকে কে যেন কর্কশ গলায় ফিসফিস করে বলল।

'কী ব্যাপার?'

'চলছ?'

'চল্‌ছি,' উত্তর দিতে দিতে জলে ভর্তি একটা গোলার গর্তের ভেতরে হোঁচট খেয়ে ধপ করে পাছা ঠেকিয়ে বসে পড়ল গোলাম।

'কী ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা!' বাঁ দিক থেকে শোনা গেল।

মিনিটখানেক এরকম তারা চলতে লাগল একে অপরের কাছে অদৃশ্য থেকে। তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে গোলামের কানের কাছে সেই একই খসখসে গলা ফিসফিসিয়ে বলল: 'পাশে পাশে চলা যাক। তাহলে আর অতটা ভয় থাকে না।'

আবার সব চুপচাপ চলতে লাগল জলকাদার মধ্যে ভিজে-ঢোল হাইবুট

ফেলতে ফেলতে। হঠাৎ কালো মেঘের চুড়োর আড়াল থেকে ভুস করে ভেসে উঠল দাগদাগ এক ফালি ভাঙা চাঁদ, তার গায়ের হলুদ আঁশগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য চকচক করে উঠল, তারপর প্রবহমান মেঘের তরঙ্গরাশির মধ্যে একটা পুঁটিমাছের মতো ডুব দিল, আবার পরিষ্কার আকাশের বুকে উঠে এসে নীচে ঢালতে লাগল ম্লান জোছনার আলো। পাইন গাছের ভিজে পাতাগুলো – ছুঁচের মতো সরু সরু পাতাগুলো – ফসফরাসের মতো চকচক করতে লাগল; মনে হল আলোয় যেন তাদের গন্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, ভিজে মাটি যেন তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নিয়ে আসছে। গোলাম তার পাশের লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে, মাথাটা এমন ভাবে ঝাঁকাচ্ছে যেন ঘা খেয়েছে, তার ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে এসেছে।

'দ্যাখ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল।

তাদের তিন পা দূরে একটা পাইন গাছের কাছে দু'পা অনেকটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

'মা-নু-ষ,' গোলাম বলল, কিংবা এমনও হতে পারে যে বলবে এমন ভেবেছিল মাত্র।

গোলামের পাশে পাশে যে সৈনিকটা চলছিল সে হঠাৎ এক ঝটকায় রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলল, 'কে? কে ওখানে? . . . কে ওটা? গুলি করব কিন্তু! . . .'

পাইন গাছের তলায় দাঁড়ানো লোকটা কোন উত্তর দিল না। সূর্যমুখী ফুলের মাথার মতো তার মাথাটা এক ধারে কাত হয়ে ঝুলছিল।

'ঘুমুচ্ছে!' দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে কাষ্ঠহাসি হেসে গোলাম বলল। নিজেকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য জোর করে হাসল, সামনে পা বাড়াল।

দাঁড়ানো মূর্তিটার কাছে এলো তারা। গোলাম গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল। তার সঙ্গীটি বন্দুকের বাঁট দিয়ে ধূসর স্থির মূর্তিটি ছুঁয়ে দেখল।

'এই, কে তুমি? কে ওখানে? ঘুমোচ্ছ নাকি স্যাঙাত?' রসিকতা করে সে বলল। 'ভূত-প্রেত . . . কে? কে তুমি? . . .' বলতে বলতে তার গলা কেঁপে ওঠে। 'মড়া, একটা মড়া!' এই বলে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল।

গোলামের দাঁতে দাঁত লেগে গেল। এক লাফে সে পিছিয়ে গেল। পরক্ষণেই, একমুহূর্ত আগেও যেখানে তার পাদুটো ছিল, ঠিক সেখানে পাইন গাছের তলায় খাড়া লোকটা কাটা-গাছের মতো ধপাস করে পড়ে গেল। ওরা উলটে তার মুখ সামনের দিকে করে দিল, কেবল তখনই বুঝতে পারল যে লোকটা বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণে মারা পড়েছে। ২৫৬ নম্বর পদাতিক রেজিমেন্টের যে তিনটি

ব্যাটেলিয়ন ছিল তারই কোন একটার সেপাই এই লোকটা। ফুসফুসের ভেতরে ইতিমধ্যে যে মৃত্যু বাসা বেঁধেছে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় শেষ আশ্রয়ের সন্ধানে সে ছুটে এসেছিল এই পাইন গাছটার তলায়। চওড়া-কাঁধ, লম্বা এক ছোকরা। মাথাটা কেমন স্বচ্ছন্দে পেছনে হেলে আছে। পড়ার সময় এঁটেল কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে তার মুখটা, গ্যাসে চোখদুটো গলে গেছে, খসে পড়েছে। দাঁত কপাটি লাগা মুখের ফাঁক দিয়ে একটা কালো চকচকে কাঠের টুকরোর মতো বেরিয়ে আছে তার মাংসল জিভটা।

গোলামের হাত ধরে টানতে টানতে ফিসফিস করে তার সঙ্গীটি বলল, 'চলে এসো, ভগবানের দোহাই চলে এসো! ওটাকে পড়ে থাকতে দাও। পড়ে থাকুক আপন মনে।'

ওরা পা বাড়াতে না বাড়াতেই দেখতে পেল আরও একটা লাশ। বেশ ঘন ঘন মৃতদের দেখা মিলতে লাগল। কোন কোন জায়গায় গ্যাসে-মরা লোকগুলো গাদা মেরে পড়ে আছে, কেউ কেউ উটকো হয়ে বসে থাকতে থাকতে সেই অবস্থাতেই জমে গেছে, কেউ কেউ চার-হাত-পায়ে দাঁড়িয়ে – দেখে মনে হয় যেন গোরু-ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। পরিখার দ্বিতীয় লাইনের দিকে যে কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চটা চলে গেছে একজন আবার তার ঠিক মুখটায় গুটিসুটি মেরে কুঁকড়ে পড়ে আছে। যন্ত্রণায় নিজের হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে, সেটা পুরে দিয়েছে মুখের ভেতরে।

লাইন অনেকটা এগিয়ে চলে গেছে। গোলাম আর তার পাশের সেই সেপাইটা লাইনের নাগাল ধরার জন্য ছুটল। লাইনটা ছাড়িয়ে যাবার পর তারা আবার পাশাপাশি চলতে লাগল। পরিখাগুলো এঁকেবেঁকে গোলকধাঁধার মতো উধাও হয়ে গেছে অন্ধকারের মধ্যে। ওরা দু'জনে একটা অন্ধকার কোটরের ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। দু'জনে দু'দিকে চলে গেল।

'এসো, সুড়ঙ্গ-ঘরগুলো খুঁজে পেতে দেখা যাক। খাবারদাবার কিছু থাকলেও থাকতে পারে,' গোলামের সঙ্গীটি ইতস্তত ভাবে তাকে প্রস্তাব দিল।

'বেশ ত, চল।'

'তুমি ডাইনে যাও, আমি যাব বাঁয়ে। আমাদের আর সবাই এসে যাবার আগেই খুঁজে দেখতে হবে।'

গোলাম ফস করে দেশলাই জ্বালাল। প্রথম যে সুড়ঙ্গ-ঘরটি পড়ল খোলা দরজা দিয়ে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে, যেন কেউ তাকে ঠেলে বার করে দিয়েছে – ভেতরে এ ওর গায়ে আড়াআড়ি করে পড়ে আছে দুটো মড়া। তিন-তিনটে সুড়ঙ্গ-ঘর তন্ন তন্ন করে

খুঁজে দেখল, কিন্তু কোন ফল হল না। লাথি মেরে চতুর্থটার দরজা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল। ভেতর থেকে ভেসে এলো বিদেশী কোন এক লোকের খনখনে গলার আওয়াজ: 'Wer ist das ?'*

গোলামের সারা দেহে যেন কেউ জ্বলন্ত উনুনের গরম ছাই ঢেলে দিল। কোন কথা না বলে এক লাফে পিছিয়ে এলো।

'Das bist du, Otto ? Weshalb bist du so spät gekommen ?'** অলস ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে কাঁধের ওপর ফেলে-রাখা গ্রেটকোটটা ঠিক করে নিতে নিতে সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জার্মানটা।

'হ্যাণ্ডস আপ! হ্যাণ্ডস আপ! ধরা দাও!' কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করে কথাগুলো বলে গুড়ি মেরে বসে পড়ল গোলাম – দেখে মনে হল যেন যুদ্ধে নামার আদেশ পেয়েছে।

বিস্ময়ে জার্মানটার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হাত তুলল, এক পাশে ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে বাগিয়ে ধরা সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ চকচকে ডগাটার দিকে। গ্রেটকোটটা কাঁধ থেকে পড়ে গেল। গায়ের ধূসর-সবুজ ফৌজী উর্দিটা টান পড়ে বগলের কাছে কুঁচকে রইল। খেটে-খাওয়া-মানুষের মতো বড়। বড় হাতদুটো মাথার ওপর ওঠানো অবস্থায় কাঁপতে লাগল। আঙুলগুলো নড়তে লাগল, যেন অদৃশ্য কোন তারে ঝঙ্কার তুলছে। ভঙ্গি পরিবর্তন না করে গোলাম এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। জার্মানটার লম্বা মজবুত দেহটা, তার উর্দির পেতলের বোতাম, পাশ দিয়ে সেলাই করা খাটো বুটজোড়া, সামান্য কাত-করে-পরা কানাতহীন টুপিটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎই কেন যেন ভঙ্গি পরিবর্তন করল, দুলে উঠল, যেন তার বিদ্‌ঘুটে গ্রেটকোটটার ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলো; একটা অদ্ভুত ঘড় ঘড় আওয়াজ বার করল গলা দিয়ে – সেটা না কাশির না ফোঁপানির। জার্মানটার দিকে পা বাড়াল গোলাম। নিরাবেগ ভাঙা গলায় বলল: 'পালাও! পালাও জার্মান! তোমার ওপর কোন রাগ নেই আমার। গুলি করব না।'

রাইফেলটা পরিখার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল সে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জার্মানটার ডান হাত ধরল। তার অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠেছিল যে বন্দীকে তার আজ্ঞা মেনে

---

* কে? (জার্মান)

** অটো, তুমি নাকি? এত দেরি হল কেন? (জার্মান)

নিতে হল। হাত নামিয়ে সজাগ হয়ে মন দিয়ে সে শুনতে লাগল বিদেশী কণ্ঠের কথা বলার অদ্ভুত ঢঙ।

ইতস্তত না করে গোলাম বিশবছরের হাড়ভাঙা খাটুনিতে জর্জরিত তার নিজের কর্কশ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে জার্মানটার ঠাণ্ডা অসাড় আঙুলগুলো চেপে ধরল। তারপর উঁচু করে তুলে ধরল তার হাতের চেটো। বহুকাল হল কড়া পড়ে পড়ে বাদামী রঙের বিন্দু বিন্দু ঢিবিতে ছেয়ে গেছে হলদেটে ছোট্ট চেটোটা, তার ওপর ঝরে পড়েছে ক্ষীণ চাঁদের লালচে-নীল আলোর পাপড়ি।

'আমি মজুর।' গোলাম কাঁপতে লাগল - যেন তার জ্বর এসেছে। 'আমি তোমাকে মারতে যাব কেন? পালাও!' ডান হাত দিয়ে জার্মানটার কাঁধে মৃদু ঠেলা মেরে বনের কালো রেখার দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বলল। 'পালা রে হাঁদা! আমাদের লোকজন এসে পড়ল বলে...'

গোলামের বাড়ানো হাতখানার দিকে বারবার তাকাতে থাকে জার্মানটা, খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুর্বোধ্য কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। এই ভাবে কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। গোলামের চোখের ওপর তার চোখ পড়ল। আর তখনই হঠাৎ এক উল্লাসের হাসি খেলে গেল জার্মানটার চোখে। এক পা পেছনে হটে গিয়ে উদার ভঙ্গিতে দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে। গোলামের হাত জোরে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল। ঝুঁকে পড়ে গোলামের চোখে চোখ রাখল, উত্তেজনাভরা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চোখমুখ।

'Du entlässt mich?.. O, jetzt hab ich verstanden! Du bist ein russischer Arbeiter? Sozial-Demokrat, wie ich? So? O! O! Das ist wie im Traum... Mein Bruder, wie Kann ich vergessen? Ich finde keine Worte. Nur du bist ein wunderbarer wagender Junge... ich...' *

বিদেশী ভাষার শব্দের টগবগে স্রোতের মধ্যে গোলাম ধরতে পারল একটিমাত্র শব্দ - লোকটার একটা প্রশ্ন: 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। এখন পালাও।... বিদায় ভাই। হাতটা দাও ত ভাই।'

---

* তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ?... ও, এখন আমি বুঝতে পেরেছি! তুমি রুশ মজুর? আমারই মতন একজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট? অ্যাঁ? ও! ও! এ যেন স্বপ্ন দেখছি।... ভাই আমার, কী করে আমি ভুলব? কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। কিন্তু তুমি চমৎকার এক সাহসী ছোকরা।... আমি...' (জার্মান)

সহজজ্ঞানে একে অন্যকে বুঝতে পেরে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল তারা – একজন ব্যাভেরিয়ার লোক – দীর্ঘদেহী, সুঠাম, অপরজন ছোটখাটো চেহারার এক রুশ সৈনিক। ব্যাভেরিয়ার লোকটা ফিসফিস করে বলল, 'In den zukünftigen Klassenkämpfen werden wir in denselben Schützengräben sein, nicht wahr, Genosse?' * বলেই একটা ছাইরঙা বড়সড় জন্তুর মতো লাফ দিয়ে পরিখার সামনের মাটির স্তূপের ওপর উঠে গেল।

সৈন্যদের সারিটা এগিয়ে আসছে। বনের ভেতরে তাদের পা ফেলার ছপ্ ছপ্ আওয়াজ হচ্ছে। সামনে চলেছে চেক স্কাউটদের একটা প্লেটুন, সঙ্গে একজন অফিসার। খাবারের খোঁজে গোলাম পরিখার ভেতরে ঢুকেছিল, সেখান থেকে তাকে গুড়ি মেরে উঠে আসতে দেখে তারা গুলি ছুঁড়ে মারতে গিয়েছিল আর কি!

'তোমাদেরই লোক, দেখতে পাচ্ছ না? . . . চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?' একটা রাইফেলের নলের কালো বিন্দুটা তার দিকে তাক করে আছে দেখে ভয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল।

একটা কালো রুটির টুকরো বাচ্চাছেলের মতো করে বুকে চেপে ধরে সে আবার বলল, 'নিজেদের লোকেরাই সব আছে এখানে।'

একজন নিম্নপদস্থ অফিসার গোলামকে চিনতে পেরে লাফ দিয়ে পরিখা ডিঙিয়ে সজোরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার পিঠে গুঁতো মারল।

'মেরে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেব! নাকমুখ দিয়ে রক্ত বার করে ছাড়ব! ছিলি কোথায় এতক্ষণ?'

গোলাম চলতে লাগল। শক্তি হারিয়ে সে এমনই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে যে অফিসারের আঘাত পর্যন্ত তার ওপর যথাযথ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল না। টাল খেয়ে নিজেকে সামলাতে সামলাতে ভালোমানুষের মতো সে উত্তর দিল, 'এগিয়ে গিয়েছিলাম। মারধর করা কেন বাপু?'

গোলামের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এহেন উত্তরে অফিসার অবাক হয়ে গেল।

'তাই বলে কুকুরের মতো লেজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে! এই পেছনে পড়ে থাকে আবার এই এগিয়ে চলে যায়। পল্টনের আইনকানুন জান না? প্রথম বছর কাজ করছ নাকি?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তামাক হবে খানিকটা?'

'মিইয়ে গেছে কিন্তু।'

---

* আগামী দিনের শ্রেণীসংগ্রামে আমরা একই ট্রেঞ্চের ভেতরে থাকব। ঠিক কিনা কমরেড? (জার্মান)

'ও-ই ঝেড়ে বার কর।'

অফিসার তামাক ধরাল, প্লেটুনের শেষে সরে গেল।

ভোরের আলো ফোটার কিছু আগে আগে চেকদের একটা সন্ধানী দল আচমকা জার্মানদের নজর রাখার ঘাঁটির ওপর এসে পড়ল। জার্মানদের গুলিতে নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। সমান বিরতিতে আরও দু'বার ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটল। পরিখার মাথার ওপর একটা লাল হাউইয়ের দীপ্তি উঠল, নানা কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, হাউইয়ের রক্তিম ফুলকিগুলো নিভতে না নিভতে একপাশ থেকে জার্মান কামানগুলো গোলা দাগতে শুরু করে দিল।

'গুম্! গুম্!' প্রথম বারের আঘাতের প্রতিধ্বনিকে ধাওয়া করে ছুটল আরও দু'দুবার 'গুম্ গুম্' আওয়াজ।

গোলার শক্তি বেড়ে চলল, 'কড় কড় কড়াং' আওয়াজ তুলে তুরপুন দিয়ে যেন বাতাস ছ্যাঁদা করে কোম্পানির প্রথম অর্ধাংশের সৈন্যদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। মুহূর্তের নীরবতা – তারপরই দূরে, স্তখোদ নদীর ধারে কাছের কোন এক জায়গা থেকে আসতে লাগল গোলা-ফাটার স্বস্তিকর আওয়াজ।

চেকদের সন্ধানী দলের শ' দুয়েক হাত পেছনে যে সৈন্য দলটা যাচ্ছিল প্রথম দফায় গুলি ছোটার সঙ্গে সঙ্গে তারা মাটিতে শুয়ে পড়ল। হাউইয়ের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল। তারই আলোয় গোলাম দেখতে পেল ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্য দিয়ে সৈন্যেরা পিঁপড়ের মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। এখন আর নোংরা কাদামাটির জন্য নাক সিঁটকোচ্ছে না, বরং আত্মরক্ষার তাগিদে তাকেই আঁকড়ে ধরছে। প্রতিটি খানাখন্দের কাছে লোক কিলবিল করছে, মাটির যেখানে এতটুকু ভাঁজ দেখতে পাচ্ছে তারই আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে, যে কোন গর্তের ভেতরে গিয়ে মাথা গুঁজছে। তা সত্ত্বেও ঘন ঘন গর্জনে মেশিনগানের গুলি যখন শ্রাবণের বন্যার মতো প্রবল ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বনভূমি ডুবিয়ে দিল তখন তারা আর টিকে থাকতে পারল না – কাঁধের মধ্যে যতদূর পারা যায় মাথা গুঁজে, শুঁয়োপোকার মতো মাটি আঁকড়ে হামাগুড়ি দিয়ে পিছু হটতে লাগল; হাত অথবা পা কোনটাই এতটুকু না বাঁকিয়ে, পেছনে কাদার ওপর দাগ রেখে সাপের মতো বুকে হেঁটে চলল। কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল। লাফাতে লাফাতে বনের ভেতরে পাইন গাছের ঝিরিঝিরি ছুঁচালো পাতাগুলো এলোপাতাড়ি কেটে ছেঁটে, গাছের গায়ের চিলতে উড়িয়ে দিয়ে সাপের মতো হিসহিস শব্দে মাটিতে গেঁথে যায় বিস্ফোরক গুলি, সশব্দে ফেটে পড়ে।

কোম্পানির প্রথম অর্ধাংশ যখন পরিখার দ্বিতীয় লাইনের কাছে ফিরল, তখন দেখা গেল সতেরো জন খোয়া গেছে। একটু দূরে বিশেষ স্কোয়াড্রনের কসাকদের

ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তারা অর্ধেক কোম্পানিটার খানিকটা ডান ধার দিয়ে যাচ্ছিল, হুঁশিয়ার হয়েই এগোচ্ছিল। আগেভাগে সান্ত্রীগুলোকে সরিয়ে দেবার ফলে জার্মানদের ওপর অতর্কিতে হানা দিতেও পারত তারা, কিন্তু চেকদের সন্ধানী দলের ওপর যখন গুলি ছোঁড়া শুরু হল তখনই গোটা সেক্টর জুড়ে জার্মানরা সতর্ক হয়ে পড়ে। এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে জার্মানরা দু'জন কসাককে মেরে ফেলল, একজনকে আহত করল। কসাকরা তাদের আহত সঙ্গীটিকে ও মৃত দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। লাইনে সার বেঁধে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে।

'আমাদের নিজেদের লোক বলে কথা, গোর দিতে হয়।'

'ওর জন্যে আমাদের চিন্তা করতে হবে না, আমাদের ছাড়াই ওরা গোর দিতে পারবে।'

'যারা মরে গেছে তাদের আর কিসের পরোয়া? যারা বেঁচে আছে তাদের কথা বরং চিন্তা কর।'

আধঘণ্টা পরে রেজিমেন্টের সদর দপ্তর থেকে হুকুম এলো: 'গোলা দাগিয়া গোলন্দাজরা পথ পরিষ্কার করিবার পর ব্যাটেলিয়নকে বিশেষ কসাক স্কোয়াড্রনের সহিত মিলিয়া শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ হানিয়া পরিখার প্রথম সারি হইতে বাহির করিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।'

গোলন্দাজদের ক্ষীণ আক্রমণপর্ব চলল দুপুর বারোটা পর্যন্ত। কসাক আর পদাতিক সৈন্যরা সেন্ট্রি-পোস্ট বসিয়ে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে বিশ্রাম করতে লাগল। ভর দুপুর বেলা তারা আক্রমণে নামল। বাঁ দিকে, প্রধান সেক্টরে কামানের ঘোর গর্জন – সেখানে ফের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

ডানদিকের রক্ষণভাগের একেবারে শেষপ্রান্তে আছে বৈকালের অপর তীরের কসাকরা। বাঁ দিকে চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেন্ট, সেই সঙ্গে বিশেষ কসাক স্কোয়াড্রন। তাদের পেছনে ফানাগোরিইস্কি গ্রেনাডিয়ার রেজিমেন্ট। তারও পরে আছে চেম্বার্স্কি, বুগুল্‌মিন্স্কি আর ২০৮ ও ২১১ নম্বর পদাতিক বাহিনী, পাভ্‌লোগ্রাদ ও ভেন্‌গ্রোভ রেজিমেন্ট। ৫৩ নম্বর ডিভিশনের রেজিমেন্টগুলোকে মাঝখানে থেকে আক্রমণের গতিবৃদ্ধির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঁ দিকের গোটা রক্ষণভাগ অধিকার করে আছে ২ নম্বর তুর্কীস্তান রাইফেল-ডিভিশন। সমস্ত সেক্টর জুড়ে গুলিগোলার গর্জন উঠল – রুশীরা সর্বত্র আক্রমণ শুরু করে দিল।

স্কোয়াড্রনটা আল্‌গা লাইন করে চলেছে। তার বাঁ পাশটা এসে মিশেছে ডান পাশের চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেন্টের সঙ্গে। ট্রেঞ্চের সামনের উঁচু মাটির স্তূপ কসাকদের চোখে পড়তে না পড়তে জার্মানরা ঝড়ের বেগে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

স্কোয়াড্রনের কেউ মুখে কোন আওয়াজ করল না। মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ে রাইফেলের কার্তুজের খোপ থেকে গুলি উজার করে দিয়ে উঠে আবার ছুটতে থাকে। পরিখাগুলো পঞ্চাশ পাখানেক দূরে থাকতে তারা শেষ বারের মতো মাটিতে শুয়ে পজিশন নিল, মাথা একবারও না তুলে গুলি ছুঁড়তে লাগল। জার্মানরা পরিখার সমস্ত লাইন জুড়ে খুঁটির ওপর কাঁটাতারের জাল ছড়িয়ে রেখেছিল। আফোন্‌কা ওজেরভ দুটো গ্রেনেড ছুঁড়তে সে দুটো কাঁটাতারের জালের গায়ে লেগে ফিরে এসে ফাটল। ওজেরভ আরও একটা ছোঁড়ার জন্য সামান্য উঁচু হল, কিন্তু একটা গুলি তার বাঁ কাঁধের ঠিক নীচে ঢুকে পাছার ওপরের ত্রিকোণ হাড়ের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কাছেই শুয়ে ছিল ইভান আলেক্সেয়েভিচ, সে দেখতে পেল আফোন্‌কা মুহূর্তের জন্য পাদুটো গোটাল, তারপর স্থির হয়ে গেল। হাত-কাটা আলেক্সেইর ভাই প্রোখর শামিল মারা গেল। তারপর মারা গেল গ্রামের এককালের মোড়ল মানিৎস্‌কোভ। পরের মুহূর্তেই একটা গুলি ছুটে এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল শামিলদের বাঁকা-পা ঝুঁটিওয়ালা পড়শী ইয়েভ্‌লাম্তি কালিনিনকে।

আধঘণ্টার মধ্যে দু'নম্বর ট্রুপের আটজন লোক খোয়া গেল। স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার একজন মেজর আর দু'জন ট্রুপ-অফিসার মারা যাওয়ার পর সেনাপতিছাড়া হয়ে স্কোয়াড্রন পিছু হটতে লাগল। গুলিগোলার নাগাল থেকে দূরে সরে আসার পর কসাকরা সকলে এক জায়গায় এসে জড় হল – তখন দেখা গেল তাদের অর্ধেকসংখ্যক লোক নেই। চের্নোইয়ার্স্কির সৈন্যরা পিছু হটল করল। এক নম্বর ব্যাটেলিয়নে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল আরও মারাত্মক। তা সত্ত্বেও রেজিমেন্টের সদর দপ্তর থেকে হুকুম এলো: 'অবিলম্বে পুনরায় আক্রমণ শুরু করা চাই, যে-কোন উপায়ে হউক শত্রুপক্ষকে পরিখার প্রথম সারি হইতে বিতাড়ন করিতে হইবে। সূচনায় যে পরিস্থিতি ছিল তাহা পুনরুদ্ধারের উপর সমগ্র ফ্রণ্ট লাইন ব্যাপী অপারেশনের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করিতেছে।'

স্কোয়াড্রন ফাঁকাফাঁকা হয়ে সারি বেঁধে ছড়িয়ে পড়ল। ফের এগিয়ে চলল। পরিখাগুলো শ'খানেক পা দূরে থাকতেই জার্মানদের প্রচণ্ড গুলিগোলার আঘাতে তাদের শুয়ে পড়তে হল। আবার ইউনিটগুলো হাল্‌কা হয়ে যেতে থাকে। সৈন্যেরা পাগল হয়ে মাটির সঙ্গে লেগে শুয়ে থাকে। মৃত্যুর বিভীষিকায় তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই কেউ মাথা তুলল না, নড়াচড়া করল না।

সন্ধ্যার মুখে চের্নোইয়ার্স্কি রেজিমেন্টের আধা-কোম্পানির সৈন্যরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ছুটতে লাগল। 'ঘেরাও হয়ে পড়েছি!' – ওদের এই চিৎকার কসাকদের কানে গেল। তারাও উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে হোঁচট খেতে খেতে, অস্ত্রশস্ত্রের মায়া ত্যাগ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে একটা নিরাপদ

জায়গায় চলে আসার পর ইভান আলেক্সেয়েভিচ গোলার আঘাতে ভাঙা একটা পাইন গাছের নীচে ধপ্ করে পড়ে গেল। সবে একটু দম নিয়েছে, এমন সময় গাভ্রিলা লিখভিদভকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে আসছে, এক হাত শূন্যে তুলে বাতাসে কী যেন আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছে, আরেক হাত মুখের ওপর এমন ভাবে বোলাচ্ছে যেন অদৃশ্য একটা মাকড়সার জাল মুখের সামনে থেকে সরানোর চেষ্টা করছে। সঙ্গে না আছে কোন রাইফেল, না কোন তলোয়ার। চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে ঘামে-ভেজা, গাঢ় বাদামী রঙের সোজা চুলের সারি। ফাঁকা জায়গাটার চারধারে একটা চক্কর দিয়ে সে এগিয়ে এলো ইভান আলেক্সেয়েভিচের দিকে। ভাসা-ভাসা, দুর্বোধ্য চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাটিতে বিঁধিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার হাঁটুদুটো অল্প অল্প কাঁপছে, অর্ধেক ভাঁজ হয়ে পড়েছে। ইভান আলেক্সেয়েভিচের মনে হল লিখভিদভ বুঝি আকাশে ওড়ার উদ্দেশ্যে এই ভাবে হাঁটু ভেঙে আলগা হয়ে বসতে যাচ্ছে।

'আচ্ছা, দেখ দেখি . . .' ইভান আলেক্সেয়েভিচ কী যেন বলার চেষ্টা করল। কিন্তু লিখভিদভের মুখের পেশীগুলো কুঁচকে উঠল।

'হল্ট!' চিৎকার করে উঠল সে। উটকো হয়ে বসে হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে উঁচু করে তুলল, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'শোনো! আমি একটা গান গেয়ে শোনাই তোমাকে। ভগবানের জীব এতটুকুন এক পাখি পেঁচানীর কাছে উড়ে এসে বলল:

পেঁচী, ওরে পেঁচী, বল্ দেখি মোরে,
তোর চেয়ে বড় তোর চেয়ে মানী,
কারে আমি গণি?
ঈগল পাখি সে আমাদের রাজা,
মেজর বুঝি বা চিল তরতাজা,
ক্যাপ্টেন বলি শিক্‌রে পাখিরে,
উরালদেশীরা রামঘুঘু কি রে?
রক্ষী সেনারা – সুখের পায়রা,
সীমান্ত সেনা – তিলে ঘুঘু তারা,
কাল্‌মিক যত যেন গো শালিক,
দাঁড়কাক যেন বেদের মেয়েরা,
বনেদী ঘরের মেয়েরা ছাতার,
পায়দল সেনা – তারা বালিহাঁস,
রঙ্গিনী যারা তারা বুনোহাঁস . . .

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' ইভান আলেক্সেয়েভিচের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। 'লিখভিদভ, কী হল কী তোমার? . . . তোমার কি অসুখ করেছে? অ্যাঁ?'

'আহা, বিরক্ত করো না!' লিখভিদভের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। একটা অর্থহীন হাসিতে প্রসারিত হয়ে ওঠে তার নীল ঠোঁটদুটো, আগেকার মতোই উদ্ভট সুর করে বলে যেতে থাকে:

রঙ্গিনী যারা তারা বুনোহাঁস,
রামপাখীগুলো বোকা হাঁদারাম,
যত ব্যাঙ সব রগুড়ের গ্যাঙ,
গোলা পায়রারা হয় গোলাবাজ,
কাক কুচকুচে - জামা কড়কড়ে,
যত জেলে - সব লোক এলেবেলে। . . .

ইভান আলেক্সেয়েভিচ লাফিয়ে উঠল।

'চলে এসো, চলে এসো, আমাদের স্কোয়াড্রনে ফিরে যাই। নইলে জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে যাব! শুনতে পাচ্ছ?'

এক ঝটকায় লিখভিদভ ওর হাত ছাড়িয়ে নিল। তার মুখ দিয়ে গরম লালা ঝরতে লাগল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে চিৎকার করে সে চালিয়ে যেতে লাগল:

বুলবুলিগুলো - গাইয়ে সরেস,
চাতক পাখিরা - দানব বিশেষ,
শ্যামা-চন্দনা - নাদা ভুঁড়িদার,
নীলকণ্ঠটা - তহশীলদার,
চড়াই হয়েছে কুলি-সর্দার। . . .

তারপর হঠাৎই তার গলা ভেঙে গেল। ভাঙা ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলায় সে গান শুরু করে দিল। গান ত নয় যেন নেকড়ের গর্জন। খিচানো দাঁতের ফাঁক দিয়ে, মুখ বিদীর্ণ করে বাড়তে বাড়তে বেরিয়ে আসছে সে আওয়াজ। ধারাল কষের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে মুক্তাবিন্দুর মতো চকচক করছে মুখের লালা। এই কিছু সময় আগে পর্যন্ত যে-লোকটা একজন বন্ধু ছিল তার চোখের উন্মাদগ্রস্ত তেরছা দৃষ্টি দেখে, মাথার ঘনবিন্যস্ত চুল আর মোমের মতো এঁটে-থাকা কানজোড়ার দিকে তাকিয়ে ইভান আলেক্সেয়েভিচ আতঙ্কে শিউরে উঠল। লিখভিদভ এখন কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে আর্তনাদ করছে:

যশের তূর্য বাজে শোনো ওই,
দানিউব নদী পার হয়ে যাই;
তুর্ক-সুলতান মানে পরাজয়,
খ্রীষ্টান যত নিস্তার পায়।
পঙ্গপালের মতো ঝাঁক ধরে
উড়ি পাহাড়ের মাথার ওপরে।
দন-কসাকেরা আমরা কেবলি
ঘোর গর্জনে ছুড়ি গোলাগুলি।
টার্কী পাখিরা, অত কেন চাল?
ছাড়িয়ে নেব রে চামড়া ও ছাল।
ছেলেমেয়ে আর বিবিগুলো শেষে
ধরে নিয়ে যাব আমাদের দেশে।

'মার্তিন! এদিকে এসো দেখি একবার মার্তিন?' ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে মার্তিন শামিলকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে ইভান আলেক্সেয়েভিচ চেঁচিয়ে ডাকল তাকে।

ডাক শুনে রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এলো মার্তিন।

চোখের ইশারায় উন্মাদগ্রস্তকে দেখিয়ে ইভান আলেক্সেয়েভিচ বলল, 'ওকে নিয়ে যেতে একটু সাহায্য কর। দেখতে পাচ্ছ ত ওর অবস্থাটা? একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে।'

ভেতরকার জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা হাতা দিয়ে শামিল তার আহত পা'টা ব্যাণ্ডেজ করে নিল। লিখভিদভের দিকে না তাকিয়ে এক দিক থেকে তার হাত চেপে ধরল, ইভান আলেক্সেয়েভিচ – আরেক দিক থেকে। এই ভাবে তারা ওকে নিয়ে চলল।

পঙ্গপালের মতো ঝাঁক ধরে
উড়ি পাহাড়ের মাথার ওপরে।

লিখভিদভ চিৎকার করছিল বটে, তবে এখন আগের তুলনায় শান্ত। শামিল যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চোখমুখ কোঁচকাল। তাকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল।

'এখন আর গোলমাল কোরো না ত বাপু! খ্রীষ্টের দোহাই, ওসব ছাড়! অনেক উড়েছ, আর নয়!'

টার্কী-পাখিরা অত কেন চাল?
ছাড়িয়ে নেব রে চামড়া ও ছাল।

পাগলটা ওদের দু'জনের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল। মুখে তার অবিরাম সেই গান। শুধু থেকে থেকে সে তার মাথার দু'পাশের রগ টিপে ধরতে থাকে, দাঁত কড়মড় করে। উন্মত্ততার গরম নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত মাথাটা একপাশে কাত করে মুখের ঝুলে-পড়া চোয়ালটা নাড়াতে থাকে।

চার

স্তখোদ নদীর তেরো-চৌদ্দ ক্রোশ ভাটিতে তুমুল লড়াই চলেছে। দু'সপ্তাহ ধরে কামানগুলোর প্রচণ্ড গর্জন আর আর্তনাদের এতটুকু কামাই নেই। সার্চলাইটের আলোর বিচ্ছুরণে রাত্রে বহু দূরের বেগনী আকাশ ফালা ফালা হয়ে যায়, আকাশের গায়ে রামধনু রঙের আভা ফুটে ওঠে, মিটমিট করতে থাকে। দূর থেকে যারা আগুনের শিখা আর যুদ্ধের বিস্ফোরণের রক্তিমাভা লক্ষ করে, তাদের মনে এমন একটা ভীতির ভাব সংক্রামিত হয় যার কোন ব্যাখ্যা নেই।

১২ নম্বর কসাক রেজিমেন্ট যে সেক্টরে ছড়িয়ে আছে সেটা একটা জঙ্গলময় জলা জায়গা। দিনের বেলায় অগভীর পরিখাগুলোর ভেতর অস্ট্রিয়ানদের ইতস্তত ছুটোছুটি করতে দেখে সেই দিক লক্ষ্য করে কসাকরা কখন-সখন গুলি ছোঁড়ে। রাত্রে জলাভূমিতে সুরক্ষিত হয়ে তারা নিদ্রা যায় কিংবা তাস খেলে। সেই সময় শুধু পাহারাদাররা লক্ষ করে যেখানে লড়াই চলছে সেখান থেকে ছলকে উঠছে কমলা রঙের আলোর ছটা। দেখে তাদের গা ছমছম করে।

এই রকম এক হিমেল রাতে যখন দূরাগত আলোর বিচ্ছুরণ আকাশের গায়ে বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, গ্রিগোরি মেলেখভ সুড়ঙ্গ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, যোগাযোগের ট্রেঞ্চ ধরে এগিয়ে চলল বনের দিকে। পরিখার পেছনে একটা ছোট টিলার কালো খুলির ওপর খোঁচা খোঁচা সাদা চুলের মতো খাড়া হয়ে আছে বনের গাছপালা। বনের ভেতরে এসে গন্ধমাখা বিস্তীর্ণ মাটির বুকে সে শুয়ে পড়ল। সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরটা তামাকের ধোঁয়ার আর কটু গন্ধে ছেয়ে আছে। সেখানে জনা আষ্টেক কসাক একটা ছোট টেবিলের ধারে বসে তাস পেটাচ্ছে, টেবিলের মাথার ওপর জাজিমের মতো ঝুলছে তামাকের বাদামী ধোঁয়া। কিন্তু এখানে, এই বনের ভেতরে, টিলাটার মাথার ওপরে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে – এত নিঃশব্দে যেন কোন অদৃশ্য পাখির ডানা থেকে এসে উড়ে লাগছে। হিমে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া ঘাসপাতা থেকে উঠে আসছে এক অবর্ণনীয় বিষাদের ঘ্রাণ। গোলার আঘাতে কুৎসিত ভাবে ছাঁটা গাছপালার মাথার ওপর আঁধার জমে উঠছে, আকাশের গায়ে জ্বলে জ্বলে নিভে আসছে কৃত্তিকার ধূমায়মান বহ্নি, ছায়াপথের

এক পাশে জোয়াল ঊর্ধ্বমুখে তোলা উপুড় করা গাড়ির মতো পড়ে আছে সপ্তর্ষিমণ্ডল, শুধু এখনও স্থির ম্লান জ্যোতিতে মিটমিট করছে ধ্রুবতারা।

গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে তারাটার দিকে তাকাল। আলোটা হিমশীতল ও ম্লান হলে কী হবে, চোখে তীব্র খোঁচা মারে, চোখের পাতার নীচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে ওই রকমই শীতল অশ্রুকণা।

এখানে, এই টিলার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে কেন যেন তার মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা, যেদিন সে ভাটির-ইয়াব্‌লনোভ্‌স্কি গ্রাম থেকে ইয়াগদ্‌নোয়ে'তে আক্সিনিয়ার কাছে গিয়েছিল। আক্সিনিয়ার মুখটাও তার মনে পড়ল – সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় মুচড়ে উঠল বুকের ভেতরটা। স্মৃতি ফুটিয়ে তুলল কালের ছোঁয়ায় মুছে যাওয়া অস্পষ্ট সেই মুখের রেখাগুলো, যা তার পরম প্রিয় অথচ দূরের। হৃৎপিণ্ড হঠাৎ দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে। গ্রিগোরি মনে মনে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে সেই মুখটি, শেষবারের মতো যেমন সে দেখেছিল – বেদনায় বিকৃত, গালের ওপর চাবুকের লাল দাগ। কিন্তু স্মৃতি নাছোড়বান্দা হয়ে এগিয়ে দিতে থাকে আর একখানা মুখ – একপাশে সামান্য কাত হয়ে আছে, ঠোঁটে বিজয়ের দৃপ্ত হাসি। ওই ত আবার সে ছল করে, কামনাতুর ভঙ্গিতে ঘাড় ফেরাল, তলা থেকে কালো চোখের অগ্নিবানে জর্জরিত করছে গ্রিগোরিকে, কামনাব্যাকুল লাল টুকটুকে ঠোঁটদুটো অস্ফুট গদগদ ভাবে ফিসফিস করে আবেগজড়িত কী যেন সব বলে যাচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মুখ ঘুরিয়ে নিল। তামাটে ঘাড়ের ওপর ফাঁপানো চুলের পুরুষ্টু দু'গোছা চূর্ণকুন্তল . . . এক কালে গ্রিগোরি কত ভালোই না বাসত ওখানে চুমু খেতে! . . .

গ্রিগোরি শিউরে উঠল। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল সে যেন আক্সিনিয়ার চুলের মন-পাগল-করা মৃদু সুগন্ধ পাচ্ছে। পিঠ বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নাক ফোলাল সে, কিন্তু কই . . . না ত! ঝরাপাতার উত্তেজনাকর গন্ধ ওটা। দপদপ করতে করতে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, মিলিয়ে একাকার হয়ে যায় আক্সিনিয়ার মুখটা। গ্রিগোরি চোখ বুজল, এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর হাত রাখল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ভেঙে পড়া পাইন গাছটার পেছনে, আকাশের কিনারায় একটা সুন্দর নীল প্রজাপতির মতো নিশ্চল ওড়ার ভঙ্গিতে তিরতির করে কাঁপছে ধ্রুবতারা।

অসংলগ্ন নানা স্মৃতির টুকরোর আড়ালে চাপা পড়ে গেল আক্সিনিয়া। গ্রিগোরির মনে পড়ল আক্সিনিয়াকে ছেড়ে আসার পর তাতারস্কি গ্রামে পরিবারের লোকজনের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর কথা; রাত্রে নাতালিয়ার সর্বগ্রাসী কামাতুর সোহাগ – আগেকার কুমারীজীবনের শীতলতা যেন পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করছে;

দিনের বেলায় তার প্রতি বাড়ির লোকজনের বিশেষ মনোযোগ, যা প্রায় তোয়াজের পর্যায়ে পড়ে, আর প্রথম সেন্ট জর্জ ক্রস পাওয়া বীরকে গ্রামের লোকের সম্মান দেখানো। সর্বত্র – এমন কি বাড়িতেও গ্রিগোরি লক্ষ করত বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার তীর্যক দৃষ্টি – সকলে এমন ভাবে তাকে নিরীক্ষণ করত যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে এই সেই গ্রিগোরি এককালে একগুঁয়ে হাল্কা মেজাজের ছোকরা বলে যার পরিচয় ছিল। ময়দানে বুড়োরা সমবয়সীর মতো তার সঙ্গে কথা বলত, দেখা হলে সম্ভাষণের উত্তরে মাথার টুপি খুলত। পাড়ার মেয়ে-বৌরা তাদের সম্ভ্রমের ভাব গোপন না রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত গ্রেটকোট পরা একটু ঝুঁকে পড়া পৌরুষদীপ্ত এই মূর্তিটি আর তার বুকের ওপর ডোরাকাটা ফিতের সঙ্গে আঁটা ক্রসটা। সে লক্ষ করেছে তার পাশে পাশে পা ফেলে গির্জায় কিংবা বারোয়ারিতলায় যাবার সময় স্পষ্টতই গর্ব বোধ করত তার বাবা পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। গারান্‌জা যে সত্যের বীজ তার মধ্যে বুনেছিল, স্তাবকতা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের এই সমস্ত সূক্ষ্ম পাঁচমিশালী বিষের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে তা নষ্ট হয়ে গেল, তার চেতনা থেকে মুছে গেল। ফ্রন্ট থেকে গ্রিগোরি যখন গ্রামে এসেছিল তখন সে ছিল এক মানুষ, কিন্তু ফ্রন্টে যখন ফিরে গেল তখন আর এক মানুষ। তার নিজের কসাক ঐতিহ্য যা সে তার মায়ের দুধের সঙ্গে পেয়েছিল, সারা জীবন ধরে যা সে মনের মধ্যে লালনপালন করে আসছিল, তা মাথা তুলে দাঁড়াল মহত্তর মানবিক সত্যকে ছাড়িয়ে।

বিদায়বেলায় ঈষৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় উত্তেজিত ভাবে কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলেছিল, ‘আমি জানতাম রে গ্রিশ্‌কা, অনেক আগেই জানতাম যে তুই একজন কসাকের মতো কসাক হবি। তোর যখন এক বছর বয়স তখন সাবেকী কসাক প্রথামতো তোকে কোলে করে উঠোনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়েছিলাম . . . তোমার মনে আছে গিন্নি ? . . আর তুই শুয়োরের বাচ্চা, তোর ছোট্ট হাতের মুঠোয় খপ্ করে চেপে ধরেছিলি ঘোড়ার কেশর ! . . . তখনই আমি আন্দাজ করেছিলাম, তুই একটা কিছু হবি। হয়েছিসও তাই।’

কসাকের মতো কসাক হয়ে ফ্রন্টে ফিরে গেল গ্রিগোরি। মনে মনে যুদ্ধের অর্থহীনতার সঙ্গে আপস করতে না পারলেও সততার সঙ্গে রক্ষা করে চলছিল নিজের কসাক-গৌরব।

১৯১৫ সালের মে মাস। ওল্‌খোভ্‌চিক গ্রামের কাছাকাছি ঝলমলে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে আক্রমণের জন্য সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে জার্মান পদাতিক সৈন্যদল – ১৩ নম্বর জার্মান আয়রন রেজিমেন্ট। কটকট আওয়াজ তুলছে

মেশিনগান। ছোট্ট নদীর ধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা রুশ কোম্পানির চাকাওয়ালা ভারী মেশিনগান – ভীষণ আওয়াজ উঠছে সেখান থেকে। ১২ নম্বর কসাক রেজিমেন্ট আক্রমণের পাল্‌টা দিচ্ছিল। গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রনের কসাকদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে, এক লাইন থেকে আরেক লাইনে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে সে দেখতে পেল মধ্যদিনের আকাশে সূর্যের বলয়রেখাটি গলে ঝরে পড়ছে, ঠিক এই রকমই আরও একটা রেখা নদীর জলের একটা বদ্ধ জায়গায় আটকে পড়ে হলুদ ঢেউয়ের সফেন পুঞ্জের মতো দেখাচ্ছে। নদীর ওপারে, পপলার গাছগুলোর পেছনে ঘোড়া নিয়ে লুকিয়ে তৈরি হয়ে আছে লোকজন; সামনে জার্মানদের সারি, তাদের হেলমেটে তামার তৈরি ঈগলের হলুদ ঝলকানি। বাতাসে কাঁপছে গুলিগোলার নীলচে ধোঁয়ারেখা।

ধীরেসুস্থে গুলি ছুঁড়তে থাকে গ্রিগোরি, সযত্নে লক্ষ্য স্থির করে। ট্রুপ-অফিসার চিৎকার করে নিশানার নির্দেশ দিচ্ছে। একবার গুলি ছুঁড়ে পরের বার ছোঁড়ার আগে গ্রিগোরি কান পেতে সেই নির্দেশ শোনে, আবার তারই মাঝখানে তার ফৌজী শার্টের হাতার ওপর একটা ফুটকিওয়ালা কাচপোকা বসতে দেখে সেটাকে সন্তর্পণে সরিয়েও দেয়। তারপর আক্রমণ। . . . গ্রিগোরি তার রাইফেলের লোহা-বাঁধাই-করা কুঁদোর ঘা মেরে এক লম্বা জার্মান লেফ্‌টেনান্টকে ধরাশায়ী করল। তিনজন জার্মান সৈন্য তার হাতে বন্দী হল। মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ে নদীর দিকে দ্রুত ছুটতে বাধ্য করল তাদের।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে রাভা-রুস্‌স্কায়াতে কসাকদের একটা ট্রুপ নিয়ে অস্ট্রীয়দের দখল করে নেওয়া একটা কসাক-ব্যাটারী উদ্ধার করে সে। সেখানেই যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের একেবারে পেছনে চলে গিয়ে হাল্‌কা মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ে আক্রমণকারী অস্ট্রীয়দের পালাতে বাধ্য করে।

বাইয়ানেৎসে এসে এক লড়াইয়ে একজন মোটাসোটা অস্ট্রীয় অফিসারকে সে বন্দী করে। লোকটাকে একটা ভেড়ার মতো করে জিনের ওপর আড়াআড়ি চাপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। সর্বক্ষণ গ্রিগোরি অনুভব করতে থাকে অফিসারটার গা থেকে ভেসে আসছে মানুষের বিষ্ঠার দুর্গন্ধ, ভয়ে ভিজে যাওয়া তার থলথলে দেহটা কাঁপছে।

টিলার কালো ন্যাড়া মাথাটার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগোরির স্মৃতিতে বিশেষ করে বড় হয়ে দেখা দিল একটা ঘটনা, যখন মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল পরম শত্রু স্তেপান আস্তাখভের সঙ্গে। ১২ নম্বর রেজিমেণ্টকে যখন ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে পূর্ব প্রুশিয়ায় নিয়োগ করা হয় তখনকার ঘটনা সেটা। কসাকদের ঘোড়ার খুরে তছনছ হয়ে যাচ্ছে জার্মানদের সুন্দর সাজানো ক্ষেতখামার,

জার্মানদের বাড়ি ঘরদোর পুড়িয়ে দিচ্ছে কসাকরা। যে পথ ধরে কসাকরা চলেছে তার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে রক্তিম ধোঁয়ার মেঘ, জ্বলে জ্বলে নিভে আসছে পোড়া দেয়ালের কালো ধ্বংসস্তূপ আর ফাটলধরা ভাঙা টালির ছাদ। স্তলিপিন শহরের কাছাকাছি এসে রেজিমেন্টটা ২৭ নম্বর দন কসাক রেজিমেন্টের সঙ্গে মিলে আক্রমণ শুরু করে দিল। এক পলকের জন্য গ্রিগোরি দেখতে পেল তার দাদা পেত্রোকে। একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল দাড়িগোঁফ নিখুঁত কামানো স্তেপানকে এবং তাদের গাঁয়ের আরও কিছু কসাককে। যুদ্ধে দুটো রেজিমেন্টকেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। জার্মানরা ওদের ঘেরাও করে ফেলল। শত্রুর বেষ্টনী যখন আরও ছোট হয়ে এসেছে তখন তা ভেঙে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে একের পর এক বারোটা স্কোয়াড্রন ঝাঁপিয়ে পড়ল জার্মান লাইনের ওপর। সেই সময় গ্রিগোরি দেখতে পেল স্তেপানের কালো ঘোড়াটা গুলি খেয়ে মারা যাওয়ায় তড়াক করে ঘোড়া থেকে নেমে লাটুর মতো পাক খাচ্ছে সে। হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গ্রিগোরি, তারই আনন্দে অস্থির ও উল্লসিত হয়ে পড়ল; অতি কষ্টে ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টেনে থামাল। যখন স্তেপানকে পায়ের নীচে প্রায় দলে শেষ স্কোয়াড্রনটা ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে তখন গ্রিগোরি ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে এসে চিৎকার করে বলল, 'রেকাবটা চেপে ধর!'

রেকাবের বেল্টটা হাতে চেপে ধরে গ্রিগোরির ঘোড়ার পাশে পাশে প্রায় সিকি ক্রোশ ছুটতে হল স্তেপানকে।

'অত জোরে ঘোড়া ছুটিও না! দোহাই তোমার, অত জোরে ছুটিও না! খ্রীষ্টের দোহাই!' হাঁপাতে হাঁপাতে অনুনয় করে সে বলল।

জার্মানব্যূহ ভেদ করে বেশ ভালোয় ভালোয়ই বেরিয়ে এসেছিল ওরা। বেরিয়ে আসার পর যে বনের ভেতরে ঢুকে স্কোয়াড্রনের সকলে ঘোড়া থেকে নামছিল, সে জায়গাটা তখন হাত পাঁচেকের বেশি দূরে হবে না, এমন সময় একটা গুলি এসে বিঁধল স্তেপানের পায়ে; সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল, চিত হয়ে পড়ে গেল সে। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল গ্রিগোরির টুপি, সামনের চুলের ঝুঁটি এসে পড়ল তার চোখের ওপর। মাথাটা পেছনে ঝটকা দিয়ে চুল সরিয়ে গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকাল। দেখল স্তেপান খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গেল একটা ঝোপের কাছে, মাথার কসাক টুপিটা খুলে পাক মেরে ছুঁড়ে দিল ঝোপের ভেতরে, বসে পড়ে দু'ধারে টকটকে লাল ডোরা-কাটা প্যান্টের বোতাম চটপট খুলতে লাগল। টিলার নীচ থেকে ছুটে আসছে জার্মান পদাতিকদের একটা স্কোয়াড। গ্রিগোরি বুঝতে পারল স্তেপান বাঁচতে চায় – সাধারণ সৈন্য বলে নিজেকে চালান করার মতলবেই সে তার পরনের কসাক-প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলছে। জার্মানরা

সেই সময় কসাকদের কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে মেরে ফেলত – বন্দী করত না। . . . হৃদয়ের কাছে হার মানতে হল গ্রিগোরিকে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঝোপের দিকে ছুটে এলো। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল:

'উঠে পড়!'

স্তেপান এক ঝটকায় ক্ষণিকের জন্য চোখ তুলে যে ভাবে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়েছিল তা ভুলবার নয়। গ্রিগোরি তাকে জিনের ওপর চেপে বসতে সাহায্য করল, নিজে রেকাব মুঠো করে ধরে ঘোড়ার পাশে পাশে দৌড়াতে লাগল। ঘেমে নেয়ে উঠেছে ঘোড়াটা।

শন শন শব্দে গরম গুলির শিস কান ভেদ করে উড়ে যাচ্ছে, কড় কড় করে ফেটে পড়ছে। কিন্তু নীচে এসে ফেটে পড়ার এই শিস, তুরপুন চালানোর মতো এই কড়কড় আওয়াজ গ্রিগোরির মাথার ওপর, স্তেপানের কাগজের মতো ফেকাসে মুখের ওপর, তাদের দু'পাশ জুড়ে চলতে লাগল, পেছন দিক থেকে বাবলার ছড়া ফাটার মতো পটপট শব্দে তোড়ে আসতে লাগল রাইফেলের গুলি।

বনের মধ্যে আসার পর জিন থেকে নেমে পড়ল স্তেপান। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখটা। হাতের লাগাম এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তার ডান পায়ের হাইবুটের ভেতর থেকে রক্ত ঝরছিল। প্রতিটি পদক্ষেপে জখম পায়ের ওপর চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুটের ছেঁড়া তলির নীচ থেকে বেরিয়ে আসছিল ঘন লাল রক্তের ক্ষীণ ধারা। একটা ঝাঁকড়া ওক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল স্তেপান, আঙুলের ইশারায় গ্রিগোরিকে কাছে ডাকল। গ্রিগোরি কাছে আসতে স্তেপান বলল, 'রক্তে আমার বুট ভরে গেছে।'

গ্রিগোরি চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

'গ্রিশা . . . আজ যখন আমরা হামলা করতে গিয়েছিলাম . . . শুনছ গ্রিগোরি?' কোটরে-বসা চোখের দৃষ্টিতে গ্রিগোরিকে খুঁজতে খুঁজতে সে বলল। 'যখন আমরা আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম, তখন পেছন থেকে তিন তিনবার গুলি ছুঁড়েছিলাম তোমাকে লক্ষ্য করে। . . . কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে নয় আমি তোমাকে খুন করি।'

চোখে চোখ ঠেকে গিয়েছিল দু'জনের। ভেতরে বসে যাওয়া কোটর থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় চকচক করে উঠল স্তেপানের ধারাল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতের ফাঁক প্রায় আলগা না করে, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে স্তেপান বলল, 'তুমি আমাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ। . . . সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। . . . কিন্তু আক্সিনিয়ার জন্য ক্ষমা করতে পারছি না। . . . মন

তা পারবে না। . . . আমাকে উপরোধ কোরো না গ্রিগোরি। . . .’

‘আমি তোমাকে উপরোধ করছি না,’ গ্রিগোরি তখন উত্তরে বলেছিল।

আগের মতোই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল কোন আপস না করে।

আরও একটা ঘটনা। . . . মে মাসে ব্রুসিলোভ আর্মির অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গে লুৎস্কের কাছে তাদের রেজিমেন্ট ফ্রন্ট ভেঙে বেরিয়ে আসে, শত্রুব্যূহের পেছনে ঢুকে পড়ে তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, মারাত্মক আঘাত হানে, শত্রুপক্ষের আঘাতও সহ্য করে। ল্ভোভের উপকণ্ঠে গ্রিগোরি নিজের উদ্যোগে তার স্কোয়াড্রনকে দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে একটা অস্ট্রীয় হাউইট্জার ব্যাটারিকে লোকজন সমেত কাবু করে ফেলে। এক মাস পরে রাত্রে সাঁতার কেটে বুগ্ নদী পার হয়েছিল খবর আদায়ের জন্য শত্রুপক্ষের কোন লোককে ধরে আনার উদ্দেশ্যে। প্রহরারত এক সান্ত্রীকে দেখতে পেয়ে গ্রিগোরি তাকে আচমকা ধরে ভূপতিত করে ফেলে। অর্ধনগ্ন গ্রিগোরি তার ওপর ঝুলতে থাকে। শক্তসমর্থ, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার জার্মানটা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে যায়, কিন্তু তার আগেই গ্রিগোরি লোকটাকে বেঁধে ফেলে।

ঘটনাটার কথা মনে পড়তে গ্রিগোরি মৃদু হাসল।

সাম্প্রতিক কালে এবং বেশ কিছুকাল আগে লড়াইয়ের মাঠে সময় কি এধরনের কম দিন ছড়িয়েছে? বীরের মতো তার কসাক-গৌরব রক্ষা করে আসছে গ্রিগোরি। নিঃস্বার্থ বীরত্ব প্রমাণ করার সুযোগ সে ছাড়ে নি, জীবন বিপন্ন করেছে, কত রকম খামখেয়ালিপনাই না করেছে! ছদ্মবেশ ধরে অস্ট্রীয়দের ব্যূহের পেছনে ঢুকে গিয়ে বিনা রক্তপাতে তাদের ঘাঁটি থেকে সান্ত্রীদের সরিয়েছে, একজন দক্ষ কসাক ঘোড়সওয়ারের পক্ষে যা যা কৌশল দেখানো সম্ভব তার সবই দেখিয়েছে সে, মনে মনে অনুভব করেছে যুদ্ধের প্রথম দিকে মানুষের জন্য যে বেদনাবোধ তাকে পীড়ন করত তা বুঝি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। খরার সময়কার নোনা জমির মতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার মনটা, নোনা জমির ভেতরে যেমন জল ঢুকতে পারে না গ্রিগোরির মনেও তেমনি মায়ামমতার কোন স্থান নেই। নিরুত্তাপ অবজ্ঞাভরে নিজের জীবন এবং অপরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সে। এই কারণেই সাহসী বলে সমাজে তার খ্যাতি হয়েছে – চারটি সেন্ট জর্জ ক্রস আর চারটি মেডেল পেয়েছে। বিশেষ কোন কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান হলে সে গিয়ে দাঁড়ায় অসংখ্য যুদ্ধের গোলাবারুদের ধোঁয়ায় মলিন রেজিমেন্ট-ব্যানারের কাছে; কিন্তু সে জানে যে আগের মতো হাসতে আর সে পারবে না, জানে যে তার চোখ কোটরে বসে গেছে আর গালের হাড়দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে আছে, জানে যে কোন শিশুকে চুমু খেতে গিয়ে অকপটে তার নিষ্পাপ নির্মল চোখের দিকে

তাকানো তার পক্ষে কঠিন। হ্যাঁ, গ্রিগোরির জানতে বাকি নেই ফিতের ওপর আটকানো এই ক্রসের সারি আর নিজের পদন্নোতির জন্য কী মূল্য তাকে দিতে হয়েছে।

গ্রেটকোটের কিনারা পাশে গুঁজে বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে গ্রিগোরি শুয়ে রইল টিলার ওপর। স্মৃতি তার বশংবদের মতো অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটাল, যুদ্ধের সেই কুণ্ঠিত অসংলগ্ন স্মৃতিজালের সঙ্গে সূক্ষ্ম নীল সুতোর মতো জড়িয়ে গেল শৈশবের কোন এক সুদূর ঘটনা। মুহূর্তের জন্য বিষাদভরে সতৃষ্ণনয়নে গ্রিগোরি মনে মনে তাকাল সেই দিকে, পরক্ষণেই ফিরে এলো সাম্প্রতিক ঘটনায়। অস্ট্রীয়দের পরিখাগুলোর ভেতরে কে যেন ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে। বেশ পাকা হাত। মৃদু সুরের মূর্ছনা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে স্তখোদ নদী পার হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে, আলতো ভাবে পা ফেলে চলেছে বহু মানুষের রক্তে অসংখ্যবার ভেজা ধরনীর ওপর দিয়ে। ঊর্ধ্ব আকাশে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো দপদপ করছে তারা, অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে, জলাভূমির ওপর ইতিমধ্যে নুয়ে পড়েছে মাঝরাতের কুয়াশা। গ্রিগোরি পরপর দুটো সিগারেট টানল, এক ধরনের রুক্ষ মমতাভরে রাইফেলের বেল্টের ওপর হাত বুলাল, বাঁ হাতের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে অতিথিবৎসলা ধরণীর বুক ছেড়ে উঠল; ধীর পদক্ষেপে চলল পরিখার দিকে।

সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে তখনও তাস খেলা চলছে। গ্রিগোরি বাঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে দিল। অতীত ঘটনাসঙ্কুল, বহুকালের স্মৃতিবিজড়িত পায়ে-চলা-পথে আরও ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু তন্দ্রার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। যে রকম জবুথবু ভাবে সে শুয়ে পড়েছিল সেই ভঙ্গিতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল – শুষ্ক বাতাসে দগ্ধ অন্তহীন স্তেপভূমি, সর্বত্র ছেয়ে আছে গোলাপী আভা মেশানো বেগনীরঙের ফুল, নীল-লাল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সুগন্ধী লতার ফাঁকে ফাঁকে নাল-না-পরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ। . . . খাঁ খাঁ করছে স্তেপের প্রান্তর, গা ছম ছম করে তার নিঃশব্দতায়। কঠিন বালিমাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে গ্রিগোরি, কিন্তু নিজের পায়ের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে না, তাই ভয় লাগছে তার। . . . গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। বেকায়দায় শোয়ার ফলে গালে তেরছা হয়ে দাগ পড়েছে। মাথা তুলল সে। অপরিচিত কোন এক অপূর্ব ঘাসপাতার সুবাস মুহূর্তের জন্য নাকে লেগে মিলিয়ে যেতে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ঘোড়ার মতো ঠোঁট চিবুল। আবার ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে। আর কোন স্বপ্ন সে দেখল না।

পরদিন সকালে গ্রিগোরির যখন ঘুম ভাঙল তখন একটা দুর্বোধ্য ব্যাকুলতা তার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে।

'তোমাকে অমন গোমড়া দেখাচ্ছে কেন আজ? বাড়ির স্বপ্ন দেখেছ নাকি রাতে?' ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন জিজ্ঞেস করল তাকে।

'ঠিকই ধরেছ। স্তেপের স্বপ্ন দেখেছি। মনটা এমন খিচড়ে গেল... বাড়ি যেতে পারলে হত। জারের চাকরি করতে করতে ঘেন্না ধরে গেল।'

ঝুঁটিওয়ালা সায় দিয়ে হাসল। এতদিন গ্রিগোরির সঙ্গে একই সুড়ঙ্গ-ঘরে সে আছে, একটা শক্তিশালী জন্তু একই রকম শক্তিশালী আর একটা জন্তুকে যেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে গ্রিগোরিকেও তেমনই শ্রদ্ধা করে সে। ১৯১৪ সালে তাদের সেই যে প্রথম ঝগড়া হয় তার পর থেকে তাদের মধ্যে আর কোন সংঘাত বাধে নি। গ্রিগোরির চরিত্র ও মনের ওপর ঝুঁটিওয়ালার প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ উরিউপিনের জগৎ ও জীবনসংক্রান্ত ধ্যানধারণা ভীষণ ভাবে পালটে দিয়েছে। ব্যাপারটা তার পক্ষে কঠিন হলেও সে কিন্তু ধীরে ধীরে অবিচলিত ভাবে ঝুঁকছে যুদ্ধবিরোধিতার দিকে। আজকাল বিশ্বাসঘাতক জেনারেল আর জারের প্রাসাদে খুঁটি গেড়ে বসে থাকা জার্মানদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। একবার ত মুখ ফসকে বলেই ফেলে, 'খোদ মহারানীর শিরায় যখন জার্মান রক্ত বইছে তখন ভালো আর কিছু আশা কোরো না হে। সময় বুঝে এক টুসকিতে আমাদের বেচে দিতে পারে।...'

একদিন গারান্‌জার শিক্ষার সারমর্ম গ্রিগোরি তাকে বলেছিল, কিন্তু উরিউপিন তাতে কোন আমল দেয় নি।

'গানটা ত ভালোই, তবে গলাটা একটু কর্কশ ধরনের,' নিজের মাথার নীলচে রঙের টাকে চাপড় মেরে বাঁকা হাসি হেসে সে বলেছিল। 'মিশ্‌কা কশেভয় ত বেড়ার ওপরকার মোরগের মতো গলা ফুলিয়ে এই কথাই বলে যাচ্ছে। এই সব বিপ্লবের কোন মানে হয় না, যত রাজ্যের ভাঁড়ামি। মনে রেখো, আমাদের, কসাকদের যা দরকার তা হল আমাদের নিজেদের সরকার, অন্য কারও নয়। আমাদের দরকার হল মিকলাই মিকলাইচের* মতন একজন জবরদস্ত জার। ওসব চাষাভুষোর রাস্তা আমাদের রাস্তা নয় – হাঁস শুয়োরের দোস্ত কখনও হয় না। চাষীরা আরও বেশি করে জমি হাতানোর তালে থাকে, মজুররা চায় আরও বেশি মজুরী। কিন্তু আমাদের তারা কী দেবে শুনি? জমি আমাদের আছে এই এত। আর কী চাই আমাদের? মুশ্‌কিলটা এই যে ঘোড়ার মুখের খাবারের থলি খালি।

---

* গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকলাই নিকলায়েভিচ (১৮৫৬-১৯২৯) – প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে রুশ আর্মির সর্বোচ্চ অধিনায়ক। গৃহযুদ্ধের সময় বিদেশে পলায়ন করেন, সেখানে রাজতন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও ভ্রাঙ্গেলের সমর্থনে রাশিয়ার রাজসিংহাসনের একজন 'দাবিদার' হয়ে দাঁড়ান। – অনুঃ

আমাদের জারটা যে একটা রাঙামূলো তা গোপন করে কোন লাভ নেই। ওর বাপটা ছিল বেশ জবরদস্ত গোছের, কিন্তু এটা সেই পাঁচ সালের মতো একটা বিপ্লব যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বসে থাকবে, তারপর সবাই মিলে গড়াতে গড়াতে হুড়মুড় করে নেমে যাবে রসাতলে। এতে আমাদের ভালো হবে না। ভগবান না করুন, একবার যদি জারকে খেদাতে পারে, আমাদেরও ছেড়ে কথা কইবে না। তখন পুরনো রাগের ঝাল ঝাড়বে আমাদের ওপর, আমাদের জমিজমা কেড়ে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে শুরু করবে। চোখ কান খাড়া রাখতে হবে আমাদের। . . .'

'তুমি সব সময় এক-তরফা চিন্তা কর,' গ্রিগোরি ভুরু কোঁচকায়।

'বাজে বকছ তুমি। তোমার বয়স কম, দুনিয়ার হালচাল এখনও জান না। রোসো না, তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান করে ছাড়বে, তখন জানতে পারবে কার কথা সত্যি।'

সচরাচর এখানেই তাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটত। গ্রিগোরি চুপ করে যেত, ঝুঁটিওয়ালা চেষ্টা করত অন্য কোন কথা পাড়ার।

সেই দিন একটা অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল গ্রিগোরি। রোজকার মতো সেদিনও দুপুর বেলায় টিলার ওপাশ থেকে খাবারের গাড়ি এসে থেমেছে। যোগাযোগের ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে ঠেলাঠেলি করে কসাকরা দ্রুত সে দিকে ছুটল। তিন নম্বর ট্রুপের জন্য খাবার আনতে গিয়েছিল মিশ্‌কা কশেভয়। একটা লম্বা ডাণ্ডার সঙ্গে ধূমায়মান খাবারের পাত্রগুলো ঝুলিয়ে নিয়ে এলো সে। সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই চিৎকার করে বলল, 'না না, এ ভাবে চলতে পারে না, ভাইসব! ওরা ভেবেছে কী? – আমরা কুকুর না কি?'

'ব্যাপার কী?' ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন জিজ্ঞেস করল।

'পচা মাংস খাওয়াচ্ছে আমাদের!' রাগে চেঁচিয়ে ওঠে কশেভয়।

জট পাকানো বুনো লতার গোছার মতো সামনে ঝুলে থাকা সোনালি চুলের গোছা ঝট করে মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনে সরিয়ে দিল। একটা বাক্সের ওপর পাত্রগুলো রেখে উরিউপিনের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'নিজেই শুঁকে দেখ না বাঁধাকপি দেওয়া মাংসের ঝোলটায় কিসের গন্ধ।'

ঝুঁটিওয়ালা তার নিজের খাবারের পাত্রটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গন্ধ শুঁকল, নাক সিঁটকাল, মুখ বাঁকাল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝুঁটিওয়ালার অনুকরণে কশেভয়ও নাকের পাটা ফোলাল। তার ম্লান মুখ কুঁচকে ফুটে উঠল।

'বিচ্ছিরি গন্ধ মাংসটার,' ঝুঁটিওয়ালা রায় দিল।

বিতৃষ্ণাভরে পাত্রটা ঠেলে দিয়ে গ্রিগোরির দিকে তাকাল সে।

গ্রিগোরি এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। লম্বা নাকটা আরও লম্বা করে বাঁধাকপির ঝোলের ওপর ঝুঁকে বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণেই এক ঝটকায় সরে গেল। আলসেমির ভঙ্গিতে পায়ে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল কাছের পাত্রটা।

'এ কী? অমন করলে কেন?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন।

'কেন – দেখতে পাচ্ছ না নাকি? চেয়ে দেখ। কানা নাকি তুমি? এটা কী?' পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়া ঘোলাটে তরল পদার্থটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল গ্রিগোরি।

'আরে! এ যে পোকা কিলবিল করছে দেখছি! . . . আমার বুড়ি মায়ের দিব্যি . . . আমি দেখতেই পাই নি! এই হল গিয়ে আমাদের খাবার। বাঁধাকপির ঝোল ত নয়, এ যে দেখছি সেমাই। . . . নাড়িভুঁড়ির বদলে লম্বা লম্বা পোকা।'

মেঝের ওপর রক্ত-লাল মাংসের টুকরোর কাছে চর্বির তেলতেলে ফোঁটার মাঝখানে ছেঁড়া ছেঁড়া লম্বা সুতোর মতো নেতিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল কতকগুলো সেদ্ধ করা সাদা টোপা-টোপা পোকা।

'এক, দুই, তিন, চার,' কেন যেন ফিসফিস করে গুনল কশেভয়।

মুহূর্তের স্তব্ধতা। গ্রিগোরি দাঁতের ফাঁকে পিচ কেটে থুতু ফেলল। কশেভয় খাপ খুলে তলোয়ার বার করে বলল, 'এই ঝোলটাকে আমরা এক্‌খুনি গ্রেপ্তার করলাম। চল সব, রিপোর্ট করব স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে।'

'এই ত চাই! ঠিক কথা বলেছে!' ঝুঁটিওয়ালা সায় দিল।

তাড়াতাড়ি করে রাইফেলের মাথা থেকে সঙীনটা খুলতে খুলতে সে বলল, 'আমরা ঝোলটা নিয়ে যাব, আর গ্রিশ্‌কা, তুমি আসবে আমাদের পেছন পেছন, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারকে রিপোর্ট করবে।'

ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন আর মিশ্‌কা কশেভয় খোলা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে ঝোলভর্তি একটা পাত্র সঙীনের ডগায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। পিছনে চলল গ্রিগোরি। তার পিছন পিছন সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ট্রেঞ্চের আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল কসাকদের ধূসর সবুজ রঙের এক বিশাল ঢেউ।

'কী ব্যাপার?'

'কোন বিপদ-আপদ হয় নি ত?'

'নাকি শান্তির ব্যাপারে দরবার করতে এসেছে?'

'আহা, সাধ কত! আর কিছু চাই না?'

'কিছু পোকা-পড়া ঝোল বন্দী করে এনেছে ওরা!'

অফিসারের সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে এসে ঝুঁটিওয়ালা ও কশেভয় থামল। গ্রিগোরি

বাঁ হাতে টুপি ধরে হেঁট হয়ে 'শেয়ালের খোঁড়লের' ভেতরে পা বাড়াল।

একটা কসাক পেছন দিক থেকে উরিউপিনকে ধাক্কা দিচ্ছিল। তার দিকে ফিরে তাকিয়ে রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে সে বলল, 'ঠেলা দিও না!'

গ্রেটকোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে এলো স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার। সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে তার পিছন পিছন বেরিয়ে আসছিল গ্রিগোরি। হতভম্ব হয়ে এবং খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রিগোরির দিকে তাকাল সে।

'কী ব্যাপার বাবারা ?' কসাকদের মাথার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয় কম্যাণ্ডার।

গ্রিগোরি তার সামনে এগিয়ে এলো, সমবেত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সে উত্তর দিল, 'আমরা এক বন্দীকে এনেছি।'

'কিসের বন্দী ?'

'এই যে . . .' ঝুঁটিওয়ালার পায়ের কাছে রাখা ঝোলের পাত্রটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গ্রিগোরি বলল। 'এই যে সেই বন্দী। . . . শুঁকে দেখুন, আপনার কসাকদের কী খাওয়ানো হয়।'

একটা ভাঙাচোরা ত্রিকোণের আকার ধারণ করল তার ভুরু, তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে আবার সোজা হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গ্রিগোরির মুখের ভাব লক্ষ করল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, তারপর ভ্রূকুটি করে তাকাল ঝোলের পাত্রটার দিকে।

'ভাগাড়ের মাংস খাওয়াতে শুরু করেছে আমাদের!' রাগে জ্বলে উঠে তীব্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে মিশ্‌কা কশেভয়।

'কোয়ার্টার-মাস্টারকে বদল করতে হবে!'

'শালা শুয়োরের বাচ্চা!'

'ব্যাটা খেয়ে খেয়ে ফুলছে!'

'নিজে কিন্তু ষাঁড়ের কিডনি দিয়ে বাঁধাকপির ঝোল খায় . . .'

'আর আমাদের বেলায় কিনা পোকা !' কাছ থেকে কয়েকজন টিপ্পনী কাটল।

এতগুলো কণ্ঠের কোলাহল না নামা পর্যন্ত চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল কম্যাণ্ডার, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল :

'চুপ কর সব! এখন আর কথা নয়! যা বলার বলা হয়ে গেছে। কোয়ার্টার-মাস্টারকে আজই বদল করা হবে। তার কাজকর্মের ওপর তদন্ত কমিশন বসাব। মাংস যদি ভালো না হয় . . .'

'কোর্ট-মার্শাল করুন ওকে!' পেছন থেকে গর্জন ফেটে পড়ল।

নতুন করে আরও একটা চিৎকার-চেঁচামেচির তরঙ্গ উঠতে তার নীচে চাপা পড়ে যায় কম্যাণ্ডারের গলা।

রেজিমেণ্ট যখন মার্চ করছিল সেই সময়ই কোয়ার্টার-মাস্টারকে বদল করতে হল। কসাকরা সেই যে বিদ্রোহ করে বাঁধাকপির ঝোলকে ধরে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে এসেছিল তার কয়েক ঘণ্টা পরে ১২ নম্বর রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর পজিশন থেকে সরার নির্দেশ পেল। একটা নির্দিষ্ট যাত্রাপথ ধরে মার্চ করে তাদের যেতে হবে রুমানিয়ায়। রাতে কসাকদের জায়গায় এলো সাইবেরিয়ার রাইফেল-সেনারা। রিন্‌ভিচি শহরতলিতে আসার পর রেজিমেণ্ট ঘোড়া সংগ্রহ করল। পর দিন সকালেই ডবল-মার্চ করে যাত্রা করল রুমানিয়ার দিকে।

রুমানীয়রা একের পর এক পরাজয় বরণ করছিল। তাদের সাহায্যের জন্য বড় বড় খেপে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী পাঠানো হচ্ছিল। একটা ব্যাপার থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা গেল: যাত্রাপথের সময়সূচীতে যে-গ্রামে রেজিমেণ্টের রাতে আস্তানা গাড়ার নির্দেশ ছিল, মার্চের প্রথম দিনেই সন্ধ্যার আগে আগে সেনাবাহিনীর বাসস্থান তদারককারীদের সেখানে পাঠানো হলে তারা খালি হাতে ফিরে এলো – গ্রামটা ইতিমধ্যেই গোলন্দাজ আর পদাতিক সৈন্যদের ভিড়ে ছেয়ে গেছে, তিল ধারণের ঠাঁই নেই – তারাও চলেছে রুমানিয়া-সীমান্তের দিকে। আস্তানা খুঁজে বার করতে গিয়ে রেজিমেণ্ট আরও আড়াই ক্রোশ এগিয়ে যেতে বাধ্য হল।

সতেরো দিন মার্চ করে যেতে হল। খাবারদাবার না পেয়ে ঘোড়াগুলো শুকিয়ে গেল। ফ্রণ্ট-সংলগ্ন এলাকা যুদ্ধবিধ্বস্ত, সেখানে পশুখাদ্য নেই। অধিবাসীরা হয় পালিয়েছে রাশিয়ার অনেক ভেতরে, নয়ত লুকিয়েছে বনেজঙ্গলে। ঘরবাড়ির দরজা-জানলা হাঁ-করা, তার ভেতর দিয়ে বিষণ্ণ ভাবে তাকিয়ে আছে কালো নগ্ন দেয়ালগুলো। নির্জন পরিত্যক্ত রাস্তায় কদাচিৎ কসাকদের চোখে পড়ে দু'-একজন স্থানীয় অধিবাসী – ভীতসন্ত্রস্ত, গোমড়ামুখো – সেও আবার সশস্ত্র লোকজনকে দেখে লুকোবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একটানা মার্চ করার ফলে কসাকরা বিধ্বস্ত, শীতে তাদের হাড় কাঁপছে; নিজেদের আর ঘোড়াগুলোর দুর্দশার জন্য এবং যে-সব ধকল তাদের সহ্য করতে হচ্ছে তার জন্য রেগে গিয়ে তারা বাড়ির চাল থেকে খড় টেনে ছিঁড়ে নিতে লাগল। ধ্বংসের হাত থেকে যে-সব গ্রাম বেঁচে গেছে সেখানে খাবার যত সামান্যই থাক না কেন চুরি বাটপাড়ি করে সেগুলোও হাতাবার ব্যাপারে কারও কোন সঙ্কোচ দেখা গেল না। অফিসারদের কোন হুমকিও তাদের নিরস্ত করতে পারল না স্বেচ্ছাচারিতা ও চুরি বাটপাড়ি থেকে।

তারা যখন রুমানিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি, তখনই কোন একটা ছোটখাটো সমৃদ্ধ গ্রামের গোলা থেকে কী এক কৌশলে যেন ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন এক কুনকে যব চুরি করল। গোলার মালিক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলল, কিন্তু ঝুঁটিওয়ালা শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মাঝবয়সী বেস্‌সারাবিয়ানকে মারধর করে শেষ পর্যন্ত

ঘোড়ার জন্য যব নিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঁজরার কাছে ট্রুপ-অফিসার তাকে দেখতে পেল। ঝুঁটিওয়ালা তখন খাবারের থলে ঘোড়ার মুখে ঝুলিয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে তার গর্তে ঢোকা হাড়গোড়-বার-করা পাঁজরায় চাপড় মারছে, তার চোখের দিকে এমন ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে যেন ওটা একটা মানুষ।

'উরিউপিন, শালা শুয়োরের বাচ্চা! সব ফিরিয়ে দে বলছি! এর জন্যে তোকে গুলি করে মারা হবে পাজী বদমাশ! . . .'

উরিউপিন আড়চোখে ধোঁয়াটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল অফিসারের দিকে, মাথার টুপিটা আছড়ে মাটিতে ফেলে দিল। রেজিমেণ্টে এতকাল কাটানোর মধ্যে এই প্রথম তার বুক ফেটে বেরিয়ে এলো করুণ আর্তনাদ।

'কোর্ট-মার্শাল হবে হোক! গুলি করে মারুন! আমাকে এইখানে মেরে পুঁতে ফেললেও যব আমি ফেরত দেব না! আমার ঘোড়া কি না খেতে পেয়ে টেঁসে যাবে, অ্যাঁ? যব দেব না! একটা দানাও দেব না!'

ঘোড়াটা গোগ্রাসে যব চিবুচ্ছিল। উরিউপিন কথা বলতে বলতে কখনও সেটার মাথা, কখনও কেশর আঁকড়ে ধরছিল, কখনও বা চেপে ধরছিল হাতের তলোয়ারটা। . . .

অফিসার নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়াটার হাড়পাঁজরা উৎকট ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু ঘোড়াটা যে তেতে আছে, এখনই ওকে দানা খাওয়ানো কি ঠিক হচ্ছে?'

তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই ফুটে উঠল একটা বিমূঢ়তার ভাব।

'না, এতক্ষণে জুড়িয়ে এসেছে,' ঘোড়ার মুখের থলে থেকে ছড়িয়ে পড়া দানাগুলো মাটি থেকে খুঁটে হাতের ওপর জড় করে আবার থলেতে ঢালতে ঢালতে প্রায় ফিসফিস করে উত্তর দিল উরিউপিন।

* * *

নভেম্বরের শুরুর দিকেই রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছল নতুন পজিশনে। ট্রান্-সিলভানিয়ার পাহাড়ের ওপর দিয়ে হুহু গর্জন করে চলেছে মত্ত হাওয়া। গিরিখাতের ভেতরে ঘন হয়ে জমেছে হিমেল কুয়াশা, স্বল্প হিমের ছোঁয়া-লাগা পাইনের বন থেকে ভেসে আসছে গন্ধ। পাহাড়ে প্রথম ঝরে পড়া পরিষ্কার তুষারের বুকে হামেশাই জন্তুজানোয়ারের পায়ের চিহ্ন পড়ে মানুষের চোখে। যুদ্ধের ডামাডোলে ভয় পেয়ে রাজ্যের যত নেকড়ে, বল্‌গা হরিণ আর বুনো ছাগল বনের আস্তানা ছেড়ে পালাচ্ছে দেশের গহনে।

সাতই নভেম্বর ১২ নম্বর রেজিমেন্ট ৩২০ নম্বর চুড়োর দখল নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। আগের দিন পরিখাগুলোতে ছিল অস্ট্রীয়রা। কিন্তু আক্রমণের দিন সকালে তাদের জায়গায় এলো ফরাসী ফ্রন্ট থেকে সবে পাঠানো স্যাক্সন-ট্রুপ। অল্প অল্প তুষারকণা ঢাকা পাথুরে চড়াই বেয়ে পদাতিক-সার বেঁধে কসাকরা চলেছে। তাদের পায়ের তলায় ছড়িয়ে পড়ছে পাথরকুচি, ধোঁয়ার মতো উঠছে বরফের মিহি ধুলো। গ্রিগোরি চলছিল ঝুঁটিওয়ালার পাশে পাশে। মুখ কাচুমাচু করে অস্বাভাবিক রকমের সলজ্জ হাসি হেসে তাকে সে বলল, 'আজ কেন জানি নে কেমন যেন ঘাবড়ে যাচ্ছি। . . . মনে হচ্ছে আমি যেন এই প্রথমবার আক্রমণে নামছি।'

'বল কী!' আশ্চর্য হল ঝুঁটিওয়ালা।

চটা-ওঠা তোবড়ানো রাইফেলটা বেল্‌টে ঝুলিয়ে নিয়ে, যেতে যেতে গোঁফের ওপরকার জমাট বরফের কাঠি চুষতে থাকে উরিউপিন।

কসাকরা ভাঙাচোরা শেকলের মতো সার বেঁধে পাহাড়ে উঠছে, একটিও গুলি ছুঁড়ল না তারা। শত্রুপক্ষের পরিখার পাশের মাটির স্তূপগুলোও স্তব্ধ। ভয়াবহ সে স্তব্ধতা। সেখানে জার্মানদের বালিয়াড়ির পেছনে আছে জনৈক স্যাক্সন লেফটেনান্ট। বাতাসের ঝাপ্‌টায় তার মুখটা লাল। নাকের ছাল ওঠা। পুরো দেহটা পেছনে হেলিয়ে দিয়েছে। মুখে প্রশস্ত হাসি। সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে চেঁচিয়ে বলছে: 'Kameraden! Wir haben die Blaumäntel oft genug gedroschen! Da wollen wir's auch diesen einpfeffern, was es heißt mit uns'n Hühnchen zu rupfen! Ausharren! Schießt noch nicht.'*

কসাক স্কোয়াড্রনগুলো ঝঞ্ঝাবেগে আক্রমণের জন্য এগিয়ে চলেছে। তাদের পায়ের তলা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ঝুরঝুরে আলগা নুড়িপাথর। রোদে-জলে বাদামী-রঙ-ধরা বনাতের টুপির কিনারাগুলো গুঁজতে গুঁজতে অস্থির ভাবে হাসল গ্রিগোরি। তার লম্বা ঝুলন্ত নাকটা আর বহুকালের না-কামানো খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি-ভর্তি চুপসানো গালদুটো হলদেটে নীল। জমাট শিশিরকণায় ঢাকা ভুরুর নীচে পাথুরে কয়লার টুকরোর মতো ধিকিধিকি জ্বলছে চোখদুটো। তার অভ্যস্ত মানসিক স্থৈর্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে। যে বিশ্রী অনুভূতি আচমকা ফিরে এসেছে, মনে মনে তারই সঙ্গে যুঝতে যুঝতে চোখ কুঁচকে অস্থির দৃষ্টিতে পরিখার

---

* বন্ধুরা! এই নীলকোর্তাগুলোকে আমরা কয়েকবার ধরে পিটিয়েছি। এবারে এসো, আমাদের সঙ্গে লাগলে কী রকম হয় আরও একবার দেখিয়ে দিই। একটু ধৈর্য ধর! এখনই গুলি কোরো না। (জার্মান)

পাশের তুষার ছড়ানো সাদা স্তূপটার দিকে চেয়ে উরিউপিনকে সে বলল, 'চুপ করে আছে। ওদের আরও কাছে আসতে দিচ্ছে আমাদের। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, আর একথাও বলতে লজ্জা নেই. . . আচ্ছা এখুনি পিটটান দিলে কেমন হয়?'

'কী সব আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছ আজ?' বিরক্ত হয়ে ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন বলল। 'এ হল তাসের খেলার মতো ভাই – নিজের ওপর বিশ্বাস যদি না থাকে ত গেলে। তোমার মুখ হলদে হয়ে গেছে গ্রিশ্‌কা। . . . হয় তোমার অসুখ করেছে, নয়ত. . . আজই তুমি কোতল হবে। ওই দেখ! দেখলে ত?'

খাটো গ্রেটকোট আর চোখা ঝুঁটিওয়ালা হেলমেট-পরা এক জার্মান মুহূর্তের জন্য পরিখার ওপর সটান উঠে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রিগোরির বাঁ পাশে ইয়েলান্‌স্কায়া জেলা সদরের হাল্‌কা বাদামী চুল এক সুদর্শন কসাক চলতে চলতে একবার ডান হাতের দস্তানা খুলছিল ফের পরছিল। সে অনবরত এই কাজ করে যাচ্ছিল, দ্রুত পা ফেলছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন হাঁটু বাঁকাতে তার কষ্ট হচ্ছে। বেশ জোরে জোরে কাশছিল সে। তাকে দেখে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল: 'যেন রাতের বেলায় একা পথ চলছে. . . নিজেকে চাঙ্গা রাখার জন্য জোর করে কাশছে।' এই কসাকটার পেছনে দেখা যাচ্ছিল সার্জেণ্ট মাক্সায়েভের মেছেতা-পরা গাল। তারও পেছনে সঙীনের ফলাটা একপাশে হেলিয়ে শক্ত মুঠিতে রাইফেল বাগিয়ে ধরে চলেছে ইয়েমেলিয়ান গ্রোশেভ। গ্রিগোরির মনে পড়ে গেল কয়েক দিন আগে মার্চের সময় এই সঙীন দিয়েই ভাঁড়ার ঘরের তালা ভেঙে এক রুমানীয়র এক বস্তা ভুট্টা চুরি করেছিল ইয়েমেলিয়ান। মাক্সায়েভের প্রায় পাশে পাশে চলছিল মিশ্‌কা কশেভয়। লোভীর মতো সিগারেট টানছিল, ঘন ঘন নাক ঝাড়তে ঝাড়তে গ্রেটকোটের বাঁ দিকের কিনারার বাইরের ধারে আঙুল মুছছিল।

'জল পিপাসা পেয়েছে,' মাক্সায়েভ বলল।

'আমার পায়ের বুট আঁটো ঠেকছে, ইয়েমেলিয়ান। এ পরে হাঁটাই মুশকিল,' মিশ্‌কা কশেভয় অনুযোগ করল।

গ্রোশেভ ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'জুতো নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এখন ঠেলা সামলাও। জার্মানদের মেশিনগানের গুলি আমাদের ধুইয়ে দিল বলে।'

প্রথম গুলির দমকেই ধরাশায়ী হল গ্রিগোরি। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। জখম হওয়া হাতটা ব্যাণ্ডেজ করার জন্য পিঠের থলে থেকে ব্যাণ্ডেজের কাপড় বার করতে গেল, কিন্তু জামার হাতার ভেতরে কনুই থেকে গলগল করে গরম রক্ত বেরোতে থাকায় শক্তি হারিয়ে ফেলল। মাথাটা ভারী হয়ে এসেছে,

জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পাথরের পেছনে মাথা আড়াল করে তৎক্ষণাৎ সে তুলোর মতো নরম বরফের একটা কুণ্ডলী জিভ দিয়ে চাটতে লাগল। কাঁপা কাঁপা দুই ঠোঁটে লোভাতুরের মতো ঝুরঝুরে মিহি বরফ চেপে ধরে গিলতে লাগল, এক অস্বাভাবিক আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে কান পেতে শুনতে লাগল বুলেটের শুষ্ক ও তীক্ষ্ণ কটকট শব্দ আর গুলিগোলার সর্বগ্রাসী প্রবল গর্জন। মাথা তুলে দেখতে পেল তার স্কোয়াড্রনের কসাকরা আছাড় খেতে খেতে, পড়তে পড়তে পেছনে আর ওপরের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে, পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচের দিকে ছুটছে। একটা অবর্ণনীয়, অকারণ-অযৌক্তিক আতঙ্ক তাকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল: নীচে, যেখান থেকে রেজিমেণ্ট আক্রমণ শুরু করেছিল, তীক্ষ্ণ দাঁতের মতো বেরিয়ে থাকা পাইনবনের সেই সরু ফালিটার দিকে তাকে দৌড়াতেও বাধ্য করল। ইয়েমেলিয়ান গ্রোশেভ আহত ট্রুপ-অফিসারকে টানতে টানতে নিয়ে ছুটছিল। গ্রিগোরি তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। গ্রোশেভ অফিসারটিকে খাড়া ঢালের ওপর দিয়ে নিয়ে ছুটছিল; লেফ্‌টেনাণ্টের পাদুটো মাতালের মতো জড়িয়ে যাচ্ছিল। দু'-একবার গ্রোশেভের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুখ দিয়ে চাপ চাপ কালো রক্ত তুলল। স্কোয়াড্রনগুলো বন্যাস্রোতের মতো বনের দিকে গড়িয়ে নামল। ধূসর ঢালু পথের ওপর পড়ে রইল কিছু ধূসর মৃতদেহের স্তূপ। আহতদের মধ্যে যাদের কেউ উঠিয়ে নেবার অবকাশ পায় নি, তারা নিজেরাই গড়িয়ে নামছে। পেছন থেকে মেশিনগানের গুলি তাদের কচুকাটা করছে। সগর্জনে ফেটে খইয়ের মতো ছিটিয়ে পড়ছে গুলিগোলার প্রবল বন্যা।

মিশ্‌কা কশেভয়ের হাতের ওপর ভর রেখে গ্রিগোরি বনের ভেতরে ঢুকল। বনের ধারের ঢালু জমিতে ঘা খেয়ে বুলেটগুলো ঠিকরে উঠতে লাগল। জার্মানদের বাঁ পাশের রক্ষণভাগে একটা মেশিনগান থেকে ছর্‌ ছর্‌ করে ছুটছে গুলির ছর্‌রা। মনে হচ্ছিল গোড়ার দিককার জমাট বাঁধা পাতলা ভঙুর বরফের ওপর দিয়ে কেউ যেন সজোরে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছে, ঝনঝন আওয়াজ তুলে লাফাতে লাফাতে নামছে সেই পাথর।

গুম্‌-গুম্‌-গুড়ুম! . . .

'বেশ একচোট ঝেড়েছে আমাদের ওপর!' ঝুঁটিওয়ালা যে ভাবে চেঁচিয়ে উঠল তাতে মনে হল সে যেন উল্লসিতই হয়েছে। এক পরিখা থেকে আরেক পরিখার ওপর দিয়ে জার্মানরা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে দেখে একটা পাইন গাছের লালচে গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অলস ভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগল সে।

'আহাম্মকগুলোর শিক্ষা হওয়া উঠিত! উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া উচিত!' গ্রিগোরির

হাত থেকে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কশেভয় চিৎকার করে উঠল। 'মানুষ হল গিয়ে শুয়োরের পাল! তার চেয়েও খারাপ! শরীরের সব রক্ত ঢেলে দিয়ে যখন মুখ থুবড়ে পড়বে তখন বুঝতে পারবে কেন তাদের মাথায় পেরেক ঠোকা হচ্ছে!'

'এসব কি বলছ তুমি?' উরিউপিন ভুরু কোঁচকাল।

'যার বুদ্ধি আছে সে নিজেই বুঝতে পারবে, কিন্তু যে নিরেট... তাকে আর বলে কী হবে? হাতুড়ি ঠুকেও তার মাথায় কিছু ঢোকানো যাবে না।'

'মিলিটারীতে ঢোকার সময় তুমি যে শপথ নিয়েছিলে মনে আছে? শপথ নিয়েছিলে কিনা তুমি?' ঝুঁটিওয়ালা নাছোড়বান্দা হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কশেভয় সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কম্পিত হাতে মাটি থেকে কিছু বরফ খুঁড়ে নিয়ে লোভীর মতো গিলে ফেলল। মৃদু কাঁপতে লাগল, কাশতে লাগল।

পাঁচ

তাতারস্কি গ্রামের একপাশে সাদা মেঘের মৃদু তরঙ্গরেখায় কুঞ্চিত আকাশের বুকে গড়িয়ে পড়ছে শরতের সূর্য। সেখানে উর্ধ্বদেশে মৃদুমন্দ বায়ু মেঘগুলোকে শুধু আলতো ভাবে ঠেলে দিচ্ছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে পশ্চিম দিকে; কিন্তু গ্রামের বুকে, দনের গাঢ় সবুজ উপত্যকায়, ন্যাড়া মাথা বনজঙ্গলের ওপর সেই বাতাস প্রচণ্ড ঝাপ্‌টা দিচ্ছে, উইলো আর পপ্‌লার গাছের মাথা নুইয়ে দিচ্ছে, দনের বুকে প্রবল তরঙ্গ তুলছে, ডাঙার ওপর দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলছে রাশি রাশি লালচে ঝরাপাতা। খ্রিস্তোনিয়ার মাড়াই-উঠোনে অযত্নে চুড়ো করে রাখা গমের খড়ের গাদাটা বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেল। বাতাস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুড়োটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, সরু খুঁটিটা ছিটকে ফেলে দিল। তারপর হঠাৎই যেন জমি আঁচড়ানোর বিদেকাঠীতে বিঁধিয়ে নেবার মতো করে সোনালী খড়ের গাদাটা তুলে বয়ে নিয়ে চলল উঠোনের ওপর দিয়ে। রাস্তার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরপাক খাইয়ে খালি বড় রাস্তাটার ওপর ছড়িয়ে দিল দরাজ হাতে। শেষকালে খাড়া খাড়া এলোমেলো খড়ের সেই বোঝাটা ছুঁড়ে দিল স্তেপান আস্তাখভের ঘরের চালে। খ্রিস্তেনিয়ার বৌ মাথায় ওড়না জড়ানোর অবকাশ পেল না। এক লাফে উঠোনে বেরিয়ে এলো, দুই হাঁটুর মাঝখানে ঘাগরাটা চেপে ধরে মাড়াই-উঠোনে

বাতাসের অবাধ তাণ্ডব দেখল, তারপর আবার ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

তিন বছর হল এই যে যুদ্ধ চলছে গ্রামের ঘর-গেরস্থালিতে তার প্রভাব বেশ চোখে পড়ার মতো। যে সব বাড়িতে কোন পুরুষ নেই, সেখানে চালাগুলো হাঁ হয়ে আছে, উঠোনের বেড়াগুলো ভেঙে পড়ে ফোকলা হয়ে আছে, ধ্বংস এসে ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করছে, ছাপ ফেলে যাচ্ছে সেখানে। খ্রিস্তোনিয়ার বৌ আর তাদের নয় বছরের বাচ্চা ছেলেটা ঘর-সংসার সামলাচ্ছে। গেরস্থালির কাজে আনিকুশ্‌কার বৌ মাথা একেবারেই ঘামাত না। এখন আবার স্বামী-ছাড়া হওয়ায় নিজেকে নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে – জৌলুস ফেরানোর জন্য গালে রুজ মাখছে, রূপচর্চা করছে। গ্রামে পূর্ণবয়স্ক কসাক বেশি না থাকায় চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেদেরই ধরে ধরে সাধ মেটাচ্ছে। বাড়ির কাজে অবহেলার মূর্তিমান সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুর্দশাগ্রস্ত কাঠের গেটটা। এক সময় যে ওটার গায়ে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা মাখানো হত, রঙ-ওঠা বাদামী ছোপগুলো তার প্রমাণ। স্তেপান আস্তাখভের বাড়িটাকে পোড়ো বাড়ি বলা যেতে পারে। বাড়ির মালিক যাবার আগে জানলাগুলো তক্তা দিয়ে আটকে দিয়েছিল। ঘরের চাল জায়গায় জায়গায় ধসে পড়েছে, সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে ভাঁটুইগাছ। দরজার তালায় মরচে ধরেছে, খোলা গেটের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড গরম বা দুর্যোগের হাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য ছাড়া পাওয়া গোরুবাছুর যে-কোন সময় দুর্ভেদ্য আগাছা ও বুনো লতাপাতার ঘন জঙ্গলে ঢাকা উঠোনে ঢুকে পড়ে। ইভান তোমিলিনের ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়েছে রাস্তার ওপর, মাটিতে পোঁতা একটা দু'মুখো ডালের খুঁটি সেটাকে কোন রকমে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। দেখে মনে হয় কামানের নিশানদার হয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর এই বীরপুরুষটি যে-সমস্ত জার্মান ও রুশীদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে ভাগ্য যেন তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে তার ওপরে।

গ্রামের প্রতিটি রাস্তায়, অলিতে-গলিতে এই একই দৃশ্য। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে একমাত্র পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের বাড়ি আর উঠোনেরই সত্যিকারের শ্রী বলতে যা বোঝায় তাই আছে – সব কিছু গোছানো, সব ঠিকঠিক চলছে। কিন্তু আসলে এখানেও যে সব কিছু পুরোপুরি ঠিক আছে এমন বলা চলে না। গোলাবাড়ির ছাদের ওপরকার টিনের মোরগগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে, গোলাটাও একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলার কিছু কিছু চিহ্ন অভিজ্ঞ চোখে ধরা না পড়ে যায় না। বুড়ো একা হাতে সব করে উঠতে পারে না। চাষবাস কমে গেছে, বাদবাকি কাজের ত কোন কথাই নেই। শুধু কমে নি মেলেখভ পরিবারের লোকসংখ্যা। পেত্রো ও গ্রিগোরি এখনও ফ্রন্টে ফ্রন্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের জায়গায় গত বছর শরতের গোড়ার দিকে নাতালিয়া

জন্ম দিয়েছে যমজ সন্তানের। একটা ছেলে আর একটি মেয়ের জন্ম দিয়ে সে বেশ চালাকীর পরিচয় দিয়েছে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে খুশি করেছে। পোয়াতী অবস্থায় বেশ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তাকে – এমন অনেক দিন গেছে যখন পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় হাঁটতে পারে নি সে, চোখমুখ কুঁচকে পা টেনে টেনে নড়াচড়া করেছে। কিন্তু যন্ত্রণা সহ্য করেছে স্থির ভাবে – হাসিখুশিমাখা তামাটে রঙের শীর্ণ মুখখানার ওপর কখনও তার ছাপ পড়ে নি। যখন পায়ে বিশেষ করে খিঁচ ধরে যেত সেই সব মুহূর্তে তার কপালের দু'পাশের রগে ফুটে উঠত বিন্দু বিন্দু ঘাম। একমাত্র তা দেখেই ইলিনিচ্‌না অনুমান করতে পারত তার কষ্ট। মাথা ঝাঁকিয়ে ধমক দিয়ে বলত, 'আরে হতভাগী ছুঁড়ি, গিয়ে শুয়ে থাক না! নিজেকে অত কষ্ট দেওয়া কেন?'

সেপ্টেম্বরের এক নির্মল দিনে প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল নাতালিয়া।

'কোথায় চললে?' শাশুড়ী জিজ্ঞেস করল।

'জলামাঠে। গোরুগুলোকে দেখে আসি।'

দু'হাতে তলপেট চেপে ধরে গোঙাতে গোঙাতে, পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে দ্রুত পায়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এলো নাতালিয়া, তারপর বুনো কাঁটাগাছের একটা ঘন জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে সেখানে শুয়ে পড়ল। পেছনের গলিপথ দিয়ে যখন সে বাড়িতে ফিরে এলো ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা চটের কাপড়ে করে বয়ে এনেছে যমজ সন্তান।

'ওরে আমার আবাগী। এ কী কাণ্ড। . . . কোথায় ছিলে?' ইলিনিচ্‌না বিলাপ করে উঠল।

'লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছিলাম, তাই এখান থেকে চলে যাই। . . . বাপের বাড়ি যেতে ভরসা হল না। . . . আমি পরিষ্কার হয়ে এসেছি মা, ওদেরও চান করিয়েছি। . . . ধরুন ওদের,' ফেকাসে মুখে কৈফিয়তের সুরে নাতালিয়া বলল।

দুনিয়াশ্‌কা ছুটল দাই ডাকতে। দারিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা চালুনির ওপর কম্বল বিছাতে লেগে গেল। ইলিনিচ্‌না হেসে কেঁদে আর বাঁচে না, চেঁচিয়ে বলল, 'বৌমা, রাখ দেখি তোমার ওই চালুনি! ওরা কি বেড়ালছানা যে চালুনির ভেতরে রাখবে? . . . ভগবান, দুটো বাচ্চা! জয় ভগবান, একটা ছেলে! . . . নাতালিয়া, মা আমার! . . . আরে তোমরা ওকে বিছানা পেতে দাও না! . . .'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উঠোনে ছিল। যখন শুনতে পেল যে তার ছেলের বৌ যমজ সন্তান বিইয়েছে তখন প্রথমে অবাক হয়ে দু'হাত ছড়াল। তারপর উল্লসিত হয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে কেঁদে ফেলল। দাই সবে পড়িমরি করে

ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছে, বলা নেই কওয়া নেই তারই ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'ওরে বুড়ি মাগী, বাজে কথার আর জায়গা পাস নে!' বুড়ির নাকের কাছে লম্বা নখসুদ্ধ একটা আঙুল নাচাতে নাচাতে সে বলল। 'স্রেফ বাজে কথা বলছিস! মেলেখভদের বংশ অত সহজে লোপ পাবার নয়! একটা বেটী আর বেটা বিইয়েছে আমাদের বৌ। বেটার বৌয়ের মতো বেটার বৌ! জয় ভগবান! এত দয়ার শোধ আমি কী দিয়ে দেব আমার মা লক্ষ্মীকে?'

সে বছর বাড়-বাড়ন্তও হয়েছিল সংসারের। গোরুটা যমজ বাছুর বিয়োল, সন্ত মিখাইলের দিনে ভেড়াগুলোর দুটো করে বাচ্চা হল, ছাগলগুলোরও . . . এই রকম কাণ্ডকারখানা দেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবাক হয়ে নিজেই নিজেকে যুক্তি দিয়ে বলে, 'এই বছরটা একটা বরাতের বছর, বাড়-বাড়ন্তের বছর। যেদিকেই তাকাও জোড়ায়-জোড়ায়। এবারে আমাদের যা ছানাপোনা হল না . . . হো-হো-হো!'

এক বছর পর্যন্ত বাচ্চাদুটোকে মাই দিল নাতালিয়া। সেপ্টেম্বর মাসে মাই ছাড়িয়ে দিল ওদের। কিন্তু ভর শরতের আগে সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারল না। তার শীর্ণ মুখে ঝকঝক করতে থাকে দুধের মতো সাদা দাঁত। চোখে ফুটে ওঠে একটা তরতাজা উষ্ণ দীপ্তি। রোগা হওয়ার দরুন তার চোখদুটোকে এখন অস্বাভাবিক বড় দেখায়। নিজেকে সে অবহেলা করতে লাগল, ছেলেমেয়েদের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করে দিল। ঘরসংসারের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পায় ওদের পেছনেই দিতে থাকে। ওদের ধোয়ামোছা করে, জামাকাপড় কাচে, ওদের জন্য বোনে, রিফু করে। প্রায়ই খাটের ওপর একপাশে কাত হয়ে বসে, একটা পা ঝুলিয়ে দিয়ে বাচ্চাদুটোকে দোলনা থেকে তুলে নেয়, ঘাড়ের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঢলঢলে জামার ভেতর থেকে ফুটির মতো বড় বড় সাদা হলুদরঙের টৈটম্বুর স্তন বার করে এনে দুটো বাচ্চাকেই একসঙ্গে দুধ খাওয়ায়।

'ওরা অমনিতেই শুষে তোমার আর কিছু রাখে নি। বড্ড বেশি ঘন ঘন মাই দিচ্ছ আজকাল!' নাতি-নাতনীর নিটোল নাদুসনুদুস পায়ে চাপড় মারতে মারতে ইলিনিচ্না বলে।

'খাওয়াও, খাওয়াও! দুধের জন্যে অত মায়া করে কী হবে? ও দিয়ে ত আর সর-ননী হবে না!' মাঝখান থেকে অভব্যের মতো বলে ওঠে ঈর্ষাকাতর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

দন উপকূলসংলগ্ন বদ্ধ বেনোজলের মতো এই কয়েক বছর জীবনস্রোতে ভাঁটার টান ধরল। দিনগুলো নিরানন্দ, ক্লান্তিকর। একের পর এক অগোচরে আসে যায়, একটানা ব্যস্ততায়, কাজে, তুচ্ছ প্রয়োজনে, ছোটখাটো আনন্দে। আর

যারা লড়াইয়ে আছে তাদের জন্য গভীর বিনিদ্র উদ্বেগে কেটে যায়। যুদ্ধরত সেনাবাহিনী থেকে পেত্রো আর গ্রিগোরির চিঠি আসে কালেভদ্রে। যে সব খামে চিঠিগুলো আসে সেগুলো তেলচিটে আঙুলের ছাপ আর পোস্ট অফিসের ছাপে ভর্তি। গ্রিগোরির শেষ চিঠিটা মাঝখানে অন্য কারও হাতে পড়েছিল – চিঠির অর্ধেকটা বেগনী কালিতে নিখুঁত ভাবে লেপে দেওয়া হয়েছে, ছাইরঙা কাগজটার মার্জিনে কালি দিয়ে একটা দুর্বোধ্য চিহ্ন আঁকা। গ্রিগোরির চেয়ে পেত্রো বেশি ঘন ঘন লেখে। দারিয়ার কাছে লেখা তার চিঠিগুলো ধমকধামকে আর নষ্টামি ছাড়ার জন্য অনুনয়-বিনয়ে ঠাসা থাকে। বোঝা যায় স্ত্রীর অশোভন চালচলনের গুজব তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে। গ্রিগোরি চিঠির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে টাকাও পাঠায় – তার নিয়মিত মাইনে আর ক্রসের দরুন বাড়তি টাকা। ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবে বলে কথাও দেয় চিঠিতে, কিন্তু কিছুতেই কেন যেন আর আসা হয়ে ওঠে না। দুই ভাইয়ের পথ গেছে দুই বিপরীত দিকে। যুদ্ধ গ্রিগোরির ওপর গুরুভার হয়ে চেপে বসছে, তার মুখ থেকে গোলাপী আভা শুষে নিয়েছে। পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করছে তার মুখ। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার বাসনা তার নেই। এদিকে পেত্রো বেশ দ্রুত, স্বচ্ছন্দগতিতে ওপরের ধাপে উঠে যাচ্ছে। ১৯১৬ সালের শরতে সার্জেন্ট-মেজরের পদ পেয়েছে, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারকে পটিয়ে দুটো ক্রস বাগিয়েছে। আজকাল চিঠিতে লিখছে যাতে অফিসারদের ট্রেনিং-স্কুলে পাঠানো হয় তার জন্য তদ্বির-তদারক করছে। গ্রীষ্মকালে আনিকেই যখন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে তখন তার হাত দিয়ে একটা জার্মান-হেলমেট, একটা গ্রেটকোট আর নিজের একটা ছবি পাঠিয়েছিল। কার্ডবোর্ডের ছাইরঙা কাগজের টুকরোর ভেতর থেকে তাকিয়ে আছে আত্মতৃপ্ত পেত্রো, মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, মোমে পাকানো শণ রঙের গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে আছে। থ্যাবড়া নাকের নীচে সেই পরিচিত হাসিতে ফাঁক হয়ে আছে কঠিন ঠোঁটদুটো। জীবন প্রসন্ন হয়েছে পেত্রোর ওপর, যুদ্ধ তাকে উল্লসিত করে তুলেছে, কেননা নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে তার সামনে। একজন সাধারণ কসাক সে, ছোটবেলা থেকে ষাঁড়ের লেজে পাক দিয়ে জমি চষে বেড়াত – কখন কি অফিসারের পদ পাবার আর অন্য কোন মধুর জীবনের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত সে? . . . পেত্রোর জীবনের একটি কোনাতেই কেবল একটা বিশ্রী খিচ রয়ে গেল – গ্রামে কুৎসিত গুজব শোনা যাচ্ছে তার স্ত্রীকে নিয়ে। সেই বছর শরৎকালে স্তেপান আস্তাখভ ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়েছিল। রেজিমেণ্টে ফিরে এসে স্কোয়াড্রনের সকলের সামনে সে জাঁক করে বলে বেড়াতে লাগল পেত্রোর স্বামী-সঙ্গ-ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে তার ফুর্তিতে কাটানোর গল্প। বন্ধুদের মুখে শোনা সে সব গল্প বিশ্বাস করে না পেত্রো। তার মুখ কালো হয়ে উঠলেও

হেসে সে বলে, 'বাজে কথা বলছে স্তেপ্‌কা! গ্রিশ্‌কার জন্যে আমার ওপর শোধ নেবার চেষ্টা করছে।'

কিন্তু একদিন পরিখার সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে স্তেপান যখন বেরিয়ে আসছিল, দৈবাৎ হোক কিংবা ইচ্ছে করেই হোক, একটা কাজ-করা রুমাল তার হাত থেকে পড়ে গেল। পেত্রো তার পেছন পেছন আসছিল। নিপুণ হাতে লেসের কাজ-করা রুমালটা তুলে নিল পেত্রো। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল স্ত্রীর হাতের কাজ। ফের ঘোর শত্রুতা শুরু হল পেত্রো আর স্তেপানের মধ্যে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকল পেত্রো, মৃত্যু ওত্ পেতে রইল স্তেপানের জন্য - পেত্রো পারলে তলোয়ারের ঘায়ে খুলি ফাটিয়ে পশ্চিম দ্‌ভিনার তীরে তাকে শুইয়ে রেখে দেয়! কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ঘটনাচক্রে এক জার্মান-ঘাঁটি উড়িয়ে দেবার জন্য আর সকলের সঙ্গে স্তেপানও গেল, আর ফিরল না। তার সঙ্গে যে-কসাকরা গিয়েছিল তারা বলল যে এক জার্মান-সান্ত্রী হয়ত তাদের কাঁটাতারের বেড়া কাটার আওয়াজ শুনে থাকবে, তাইতে হাতবোমা ছুঁড়ে দেয়। কসাকরা অবশ্য ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে। স্তেপান এক ঘুসিতে জার্মান-সান্ত্রীকে কাত করে ফেলে, কিন্তু ওটার সঙ্গে আরেকটি যে সান্ত্রী ছিল সে গুলি চালায়, স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। কসাকরা দ্বিতীয় সান্ত্রীকে সঙীনে গেঁথে ফেলল, স্তেপানের সীসের মতো ভারী ঘুসি খেয়ে যে জার্মানটা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো। স্তেপানকেও তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল তারা, তাকে বয়ে নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল ওদের। কিন্তু বেজায় ভারী বলে তাকে ফেলে আসতে হল। আহত স্তেপান অনুনয় করে বলছিল, 'তোমরা আমাকে ফেলে যেয়ো না ভাই! ও ভাই, ফেলে যাচ্ছ কেন আমাকে?' কিন্তু সেই মুহূর্তে কাঁটাতারের ওপর দিয়ে মেশিনগানের গুলির ধারাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল, কসাকরাও বুকে হেঁটে ওখান থেকে নেমে এলো। পেছন থেকে স্তেপান ডেকেছিল, 'ভাই, আমার দেশ-গাঁয়ের লোক হয়ে তোমরা আমাকে ফেলে যাচ্ছ?' কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ঘায়ের চটা ছড়ে গেলে তার ওপর মলম লাগালে যেমন আরাম পাওয়া যায় স্তেপানের এই পরিণতির কথা শুনে তেমনি স্বস্তি পেল পেত্রো। তা সত্ত্বেও মনে মনে ঠিক করল: 'ছুটি পেয়ে একবার বাড়ি যাই না, দাশ্‌কা* মাগীর রক্তপাত করে ছাড়ব! আমি স্তেপান নই যে ছেড়ে দেব...' একবার ভাবল মেরেই ফেলবে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা বাতিল করে দিতে হল। 'হারামজাদীকে খুন করে আমার গোটা জীবনটাই নষ্ট করি আর কি! জেলে পচে মরতে হবে, আমার এত কালের সব

---

* দাশ্‌কা বা দাশা - দারিয়ার ডাকনাম। - অনুঃ

পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে, সব কিছু খোয়াব আমি। . . .' তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল স্রেফ ঠ্যাঙানি দেবে, এমন ঠ্যাঙানি দেবে যাতে মাগীর সারা জন্মের মতো লেজ নাড়ানোর সাধ ঘুচে যায়। 'চোখ খুবলে নেব কালসাপিনীটার, তাহলে শয়তান ছাড়া আর কেউ ওর ওপর নজর দেবে না।' পশ্চিম দ্‌ভিনার তীর, এঁটেল মাটি ভর্তি খাড়া পাড় থেকে খানিকটা দূরে পরিখার ভেতরে বসে বসে এই সঙ্কল্প করল পেত্রো।

শরৎ এসে গাছপালা আর ঘাস দলে মুচড়ে থেঁতলে দিয়ে গেল, সকালের জমাট শিশিরকণার ছুঁচ ফোটাতে লাগল, মাটি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলো। শরতের রাতগুলো ক্রমেই কালো আর দীর্ঘতর হতে থাকে। পরিখার ভেতরে বসে কসাকরা তাদের সামরিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে। শত্রুদের ওপর তারা দু'-এক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে, গরম জামাকাপড়ের জন্য সার্জেন্ট-মেজরদের গালিগালাজ করে, আধপেটা খেয়ে থাকে; কিন্তু প্রতিকূল পোলদেশ থেকে বহু দূরে যে দনভূমি আছে তার চিন্তা মুহূর্তের জন্যও তাদের কারও মাথা থেকে যায় না।

এদিকে দারিয়া মেলেখভা সেই শরৎকালে তার এতদিনের স্বামীহীন বুভুক্ষ জীবনের সবটুকু উশুল ক'রে নিচ্ছিল। মেরীমাতার অক্টোবর পার্বণের প্রথম দিনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ রোজকার মতন বাড়ির সকলের আগে ঘুম থেকে উঠল। কিন্তু আঙিনায় বেরিয়ে আসতে যা দেখল তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল – কোন্ শয়তানে কে জানে, গেটটা কব্‌জা থেকে খুলে ফেলেছে, রেখে দিয়েছে রাস্তার মাঝখানে, রাস্তার আড়াআড়ি পড়ে আছে সেটা। লজ্জার ব্যাপার! বুড়ো তৎক্ষণাৎ গেটটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল। সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর দারিয়াকে সে বাইরে গরমকালের রান্নাঘরের চালার নীচে ডেকে পাঠাল। কী কথাবার্তা হয়েছিল তাদের, তা কেউ জানে না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দুনিয়াশ্‌কা দেখতে পেল দারিয়া চোখের জল ফেলতে ফেলতে আলুথালু বেশে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে, তার মাথার ওড়নাটা খুলে কাঁধের ওপর পড়ে গেছে। দুনিয়াশ্‌কার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাঁধদুটো ঝাঁকাল সে। চোখের জলে ভেজা থমথমে মুখে ধনুকের মতো বাঁকা কালো ভুরুজোড়া কাঁপতে লাগল।

'দাঁড়াও না বুড়ো ভাম, এর শোধ আমি নেব!' ফুলে-ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল।

দারিয়ার ব্লাউজটা পিঠের দিকে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে, সাদা শরীরের ওপর ফুটে উঠেছে সদ্য আঘাতের দাগড়া দাগড়া লাল-নীল দাগ। ঘাগরার কিনারা নাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দাওয়ায় বেরিয়ে গেল দারিয়া, অদৃশ্য হয়ে গেল বারবারান্দায়। এদিকে রান্নাঘর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলো পান্তেলেই

প্রকোফিয়েভিচ। রাগে সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আছে। চলতে চলতে নতুন চামড়ার একটা লাগাম চার ভাঁজ করে গুটোতে লাগল।

দুনিয়াশ্‌কা শুনতে পেল তার বাপ খসখসে গলায় বলছে, 'খানকী মাগী, খুব কমের ওপর দিয়েই পার পেয়ে গেলি! . . . হারামজাদী! . . .'

বাড়িতে শৃঙ্খলা ফিরে এলো। দিন কয়েক দারিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' হয়ে ঘুরে বেড়াল। বাড়িতে সকলের আগে বিছানায় শুতে যায়। নাতালিয়ার সহানুভূতিমাখা দৃষ্টি দেখে নিরুত্তাপ হাসি হাসে, কাঁধ আর ভুরু নাচায়, যেন বলতে চায়, 'রোসো না, কী হয় দেখই না।' চারদিনের দিন ঘটল সেই ঘটনাটা, যা জানল শুধু দারিয়া আর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। এর পর থেকে দারিয়া বিজয়গর্বে মুখ টিপে টিপে হাসে, আর বুড়ো অপকর্মের দরুন মার খাওয়া বিড়ালের মতো সারা সপ্তাহ ধরে মুখ বেজার করে গুম হয়ে ঘুরে বেড়ায়। গিন্নিকে সে এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ বলল না, এমন কি স্বীকারোক্তির সময় ঘটনাটা এবং তার পরে মনের ভেতর যে পাপ-চিন্তার উদয় হয় তা-ও ফাদার ভিস্‌সারিওনের কাছে গোপন রাখল।

ঘটনাটা ছিল এই রকম। মেরীমাতার অক্টোবর পার্বণের ঠিক পরে পরেই দারিয়ার চরিত্র পুরোপুরি শুধরেছে বলে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ইলিনিচ্‌নাকে বলল, 'দাশ্‌কাটাকে বেশি লাই দিয়ো না তুমি! বেশি করে কাজের ভার চাপাও ওর ওপর। কাজের মধ্যে থাকলে আর ছোঁক ছোঁক করে ঘোরার সময় পাবে না। নয়ত ওটা হয়ে উঠেছে একটা তেল চুকচুকে মাদী ঘোড়া। মাথায় শুধু ঘুরছে রাস্তায় ঘাটে ছেনালি করে বেড়ানোর মতলব।'

এই উদ্দেশ্য নিয়ে বুড়ো মাড়াই-উঠোন পরিষ্কার করার আর পেছনের উঠোনে পুরনো লাকড়ি গুছিয়ে রাখার কাজে দারিয়াকে লাগিয়ে দিল। তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ভুষির ঘর পরিষ্কার করতে গেল। সন্ধ্যার কিছু আগে আগে ঠিক করল ঝাড়াই-কলটা চালাঘর থেকে বয়ে এনে ভুষি-ঘরের ভেতরে রাখবে। তাই সে ডাকল, 'দারিয়া!'

'কী বাবা?' ভুষি-ঘরের ভেতর থেকে দারিয়া সাড়া দিল।

'এসো, ঝাড়াই-কলটা বয়ে নিয়ে যাই।'

মাথার ওড়নাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে, ব্লাউজের কলারের নীচে ঢুকে যাওয়া ভুষি ঝেড়ে ফেলে ভুষি-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দারিয়া, মাড়াই-উঠোনের গেট পেরিয়ে চলল চালাঘরের দিকে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের গায়ে তুলোয়-ঠাসা আটপৌরে গরম কোর্তা, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া প্যান্ট। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে চলল দারিয়ার আগে আগে। উঠোনে জনপ্রাণী নেই। শরৎকালে ভেড়ার গা আঁচড়ে যে পশম পাওয়া গেছে তাই দিয়ে সুতো পাকাচ্ছে দুনিয়াশ্‌কা আর তার মা,

নাতালিয়া ময়দা মেখে রাখছে। গ্রামের পেছনে নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে গোধূলির রাঙা আলো, গির্জায় সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। স্বচ্ছ আকাশের একেবারে ঊর্ধ্বেই চাপ হয়ে জমে আছে ঘন লাল রঙের স্থির একটুকরো মেঘ। দনের ওপাড়ে পাতাবিহীন ধূসর পপ্‌লার গাছগুলোর ডালে ডালে পোড়া ন্যাকড়ার মতো ঝুলছে কালো কালো দাঁড়কাক। সন্ধ্যার ভঙ্গুর, শূন্যগর্ভ নিস্তব্ধতার মধ্যে যে-কোন আওয়াজ তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট শোনায়। গোয়াল থেকে একটানা ভেসে আসছে কাঁচা গোবর আর খড়ের গন্ধ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কঁকাতে কঁকাতে দারিয়ার সঙ্গে ধরাধরি করে বাদামী-লাল রঙের রঙচটা বিবর্ণ ঝাড়াই-কলটা ভুষির ঘরের এক কোনায় এনে রাখল। স্তূপ থেকে খানিকটা ভুষি ঝুরঝুর করে ছড়িয়ে পড়তে বিদাকাঠি দিয়ে আঁচড়ে সরিয়ে দিল সে, তারপর বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

'বাবা!' প্রায় ফিসফিস করে চাপা গলায় দারিয়া তাকে ডাকল।

ঝাড়াই-কলটার পেছনে পা বাড়াল সে, কোন কিছু সন্দেহ না করে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কী ব্যাপার?'

ব্লাউজ হাঁ করে খোলা দারিয়ার। শ্বশুরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাতদুটো মাথার পেছনে নিয়ে চুলের গোছাটা ঠিক করে নিল। ভুষি-ঘরের দেয়ালের ফোকর দিয়ে তার ওপর এসে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের রক্ত-রাঙা আলো।

'এই যে বাবা, এখানে, কী যেন . . . এদিকে এগিয়ে এসে দেখুনই না,' এই বলে একপাশে বেঁকে শ্বশুরের কাঁধের ওপর দিয়ে চোরা চাউনিতে তাকাতে লাগল খোলা দরজাটার দিকে।

বুড়ো তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। দারিয়া হঠাৎ দু'হাত সামনে ছুঁড়ে দিয়ে শ্বশুরের গলা জড়িয়ে ধরল, দু'হাতের আঙুলে আঙুল লটকে তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পিছু হটতে লাগল, ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'এইখানে বাবা, এইখানে . . . নরম আছে। . . .'

'কী হল তোমার?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে দারিয়ার বাহুবন্ধন থেকে গলাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু দারিয়া আরও বেশি জোর খাটিয়ে নিজের মুখের কাছে তার মাথাটা টানতে লাগল, তার দাড়িতে গরম নিঃশ্বাসের হল্‌কা ছড়িয়ে হাসতে হাসতে ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগল তাকে।

'ছাড় বলছি খানকী!' বুড়ো জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল ছেলের বৌয়ের টানটান পেটের শক্ত চাপ।

তাকে আঁকড়ে ধরে দারিয়া চিত হয়ে পড়ে গেল, টেনে আনল নিজের বুকের ওপর।

'মোলো যা! মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে দেখছি! ... ছাড় বলছি!'

'কেন, ইচ্ছে করে না?' হাঁপাতে হাঁপাতে দারিয়া বলল। হাতের মুঠো আলগা করে দিয়ে শ্বশুরের বুকে এক ধাক্কা মারল। 'ইচ্ছে করে না? ... নাকি সে ক্ষ্যাম্তা নেই? ... তাই বলি কি আমার বিচার করতে এসো না! ... বুঝলে?'

তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দ্রুত হাতে ঘাগড়াটা ঠিক করে নিল, পিঠ থেকে আটার ভুষি ঝেড়ে হতভম্ব পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মুখের ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'সেদিন আমাকে মারলি যে বড়? কেন? আমি কি ছুঁড়ি? তোর যখন কম বয়স ছিল তখন কি এমন ছিলি না? আজ এক বচ্ছর হয়ে গেল সোয়ামির সঙ্গে দেখা নেই। আমাকে কি তাহলে কুকুরের সঙ্গে করতে হবে, অ্যাঁ? ঘেঁচু তোর, ল্যাংড়া! এই যে ধর্!' বলে একটা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে ভুরু নাচিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজার কাছে এসে আরও একবার খুঁটিয়ে চারধার দেখে নিল, ব্লাউজ আর ওড়নার ধুলো ঝেড়ে নিয়ে শ্বশুরের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'ও ছাড়া আমার পোষাবে না বাপু। ... পুরুষমানুষ দরকার আমার। তোর যদি ইচ্ছে না হয় ... নিজেই যোগাড় করে নেব আমি। কিন্তু তুই চুপ করে থাক।'

শরীরটা দোলাতে দোলাতে দ্রুত পায়ে মাড়াই উঠোনের গেট পর্যন্ত চলে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাল না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তখনও দাঁড়িয়ে রইল ঝাড়াই-কলের বাদামী রঙের ঘষটানো পাশটাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি চিবুতে লাগল, হতভম্ব হয়ে মুখ কাচুমাচু করে ভুষি-ঘরের চারপাশ আর পায়ের তালিমারা জুতোজোড়ার দিকে তাকাল। যা ঘটে গেল তার ধাক্কায় ভেবাচেকা খেয়ে সেই মুহূর্তে সে মনে মনে ভাবল, 'তাহলে কি ওর কথাই ঠিক? ওর সঙ্গে পাপের ভাগ নেওয়াই হয়ত আমার উচিত ছিল? কে জানে?'

ছয়

নভেম্বর মাসে হিম জাঁকিয়ে বসেছে। আগেভাগেই বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। তাতারস্কি গ্রামের মাথার শেষপ্রান্তে বাঁকের দিকে দন জমে অচল হয়ে থেমে আছে। বরফের পাতলা নীল মচমচে আস্তরণের ওপর দিয়ে কদাচিৎ

দু'-একজন পথচারী সাহস করে ওপাড়ে যায়। ভাটির দিকে শুধুমাত্র কিনারাগুলোতে বুদ্বুদের মতো বরফের সর জমেছে, মাঝখানে বয়ে চলেছে প্রবল জলধারা। সবজে রঙের ঢেউগুলো একটা আরেকটার গায়ে এসে পড়ছে, সাদা ঘূর্ণিস্রোত হয়ে ভেঙে পড়ছে। কালা দরীর উলটো দিকের জলায়, বিশ হাত জলের তলায়, ডোবা গাছপালার মাঝখানে অনেক আগেই শীতকালের নিদ্রার জন্য আশ্রয় নিয়েছে বোয়াল মাছগুলো। তাদের মাথার কাছে আছে রুই-কাতলা - সেগুলোর গা হড়হড়ে। শুধু দনের বুকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ছোট মাছগুলো, বাঁধের সঙ্কীর্ণ জলাধারার ওপর ছটফট করছে পাইক মাছ। নুড়িগুলোর ওপর শুয়ে পড়েছে স্টার্লেট মাছ। গ্রামের জেলেরা আরও কঠিন, আরও জমাট বরফ পড়ার আশায় আছে - বরফ যখন প্রথম শক্ত হয়ে আসবে তখনই সুযোগ বুঝে ঝপাঝপ দামী মাছ হাতানো যাবে।

নভেম্বরে মেলেখভরা গ্রিগোরির একটা চিঠি পেল। রুমানিয়ার কুভিন্স্কি থেকে লিখছে যে প্রথম লড়াইয়েই জখম হয়েছে সে, গুলি লেগে তার বাঁ হাতের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে, তাই চিকিৎসার জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের নিজেদের এলাকায়, কামেন্স্কায়া জেলা সদরে। চিঠিটার পর পরই মেলেখভদের বাড়িতে দেখা দিল আরেক বিপদ। বছর দেড়েক আগে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের টাকার বিশেষ দরকার হয়েছিল, তাই সের্গেই প্লাতোনভিচ মোখভের কাছে খত লিখে একশ' রুব্‌লের চাঁদির টাকা ধার নিয়েছিল। এই বছরের গরমকালে বুড়োর ডাক পড়ল মোখভদের দোকানে। ৎসা-ৎসা আতিওপিন নাকের ওপর সোনার পিঁশনে-চশমা এঁটে চশমার কাচের ফাঁক দিয়ে মেলেখভের দাড়ির দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী পান্তেলেই প্রকোফিৎস, টাকাটা ত্সোধ করার ইত্সে আত্সে কি ?'

দোকানের প্রায়-খালি তাকগুলো আর পুরানো রং-চটা কাউন্টারের ওপর দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে আমতা আমতা করে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল, 'সবুর কর না একটু, ইয়েমেলিয়ান কনস্তান্তিনভিচ, একটু গুছিয়ে নিই - শোধ করে দেব।'

এই পর্যন্ত তাদের কথা হয়েছিল। কিন্তু গুছিয়ে নেওয়া আর বুড়োর হয়ে উঠল না - ফলন ভালো হল না, বেচবার মতো হৃষ্টপুষ্ট গোরুবাছুরও বিশেষ ছিল না। তারপর হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসে হাজির হল আদালতের পেয়াদা - টাকা বাকী পড়ার অভিযোগ এসেছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের নামে। পেয়াদার এক কথা: 'একশ'টা রুব্‌ল ফেল।'

পেয়াদার ঘরে টেবিলের ওপর একটা লম্বা কাগজ। এক নিঃশ্বাসে পেয়াদা গড়গড় করে পড়ে গেল:

আদালতের হুকুমনামা

মহামান্য সম্রাটের আজ্ঞানুক্রমে আমি, দনেৎস্ক মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ৭ নং থানার শান্তিরক্ষার্থ নিযুক্ত হাকিম, ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে ঋণপত্রের দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া সার্জেণ্ট পান্তেলেই মেলেখভের ১০০ রুব্ল ঋণগ্রহণ বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী সের্গেই মোখভের আনীত দেওয়ানী মামলার বিচার করতঃ এবং দেওয়ানী ন্যায়বিধির ৮১, ১০০, ১২৯, ১৩৩ ও ১৪৫ নং ধারা অনুসরণক্রমে এতদ্দ্বারা তাহার বিনা উপস্থিতিতে রায়দান করিতেছি:

১৯১৫ সালের জুন মাসের ২১ তারিখে সার্জেণ্ট পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মেলেখভ ঋণপত্রের দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া ব্যবসায়ী সের্গেই প্লাতোনভিচ মোখভের নিকট হইতে যে একশত রুব্ল ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, বাদীর স্বার্থে বিবাদীর নিকট হইতে সেই পরিমাণ অর্থ এবং আদালতের কার্যনির্বাহের ব্যয়বাবদ উপরন্তু তিন রুব্ল আদায় করা হউক। আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নহে, উহা গরহাজিরায় গৃহীত রূপে গণ্য হইবেক।

দেওয়ানী বিচারব্যবস্থার ১৫৬ নং ধারার ৩ নং উপধারার ভিত্তিতে গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্ত আইনমোতাবেক অবিলম্বে কার্যকরী হইবেক। মহামান্য সম্রাটের আজ্ঞানুক্রমে দনেৎস্ক মহকুমার ৭ নং থানার শান্তিরক্ষার্থ নিযুক্ত হাকিম এতদ্দ্বারা এই মর্মে আদেশ জারী করিতেছেন যে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংস্থা উক্ত সিদ্ধান্তের যথাযথ আইনসঙ্গত প্রয়োগে বাধ্য থাকিবেন। আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার নিমিত্ত ভারপ্রাপ্ত আমলাকে তাহার কর্তব্য পালনে সকল পুলিশ, সামরিক ও স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ অতিসত্বর আইনসঙ্গত আনুকূল্য প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

পেয়াদার মুখ থেকে আদালতের হুকুমনামা শোনার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সেই দিনই টাকা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি যাবার অনুমতি চাইল। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে সে সোজা রওনা দিল তার বেয়াই কোর্‌শুনভের কাছে। বারোয়ারিতলায় দেখা হয়ে গেল হাত-কাটা আলিওশা শামিলের সঙ্গে।

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চালিয়ে যাচ্ছ তাহলে প্রকোফিচ? হালচাল কেমন?' সম্ভাষণ জানায় তাকে শামিল।

'এই চালিয়ে যাচ্ছি আর কি।'

'কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে?'

'বেয়াইয়ের কাছে চলেছি। একটু কাজ আছে।'

'আচ্ছা! ওরা বেশ আনন্দে আছে কিন্তু। শোনো নি? মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের ব্যাটা ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসেছে। লোকে বলছে ওদের মিত্‌কা নাকি বাড়ি এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'ওই রকমই গুজব শুনেছি বটে,' সঙ্গে সঙ্গে শামিল চোখ টিপল, গাল কোঁচকাল। তামাকের বটুয়াটা বার করে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'এসো খুড়ো, তামাক খাওয়া যাক! কাগজ আমার, তামাক তোমার।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দোটানায় পড়ে গেল। তামাক টানতে টানতে ভাবতে লাগল যাওয়া উচিত হবে কিনা। শেষকালে যাওয়াই সাব্যস্ত করল। হাত-কাটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল।

'মিত্‌কাও কিন্তু একটা ক্রস পেয়েছে! তোমার ব্যাটাদের পাল্লা ধরার তালে আছে। আমাদের গাঁয়ে এখন এই সব ক্রস পাওয়া লোকজন মুড়ি-মুড়কির মতো ছড়িয়ে আছে!' পেছন থেকে গলা ফাটিয়ে শামিল বলল।

ধীরেসুস্থে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষপ্রান্তে বেরিয়ে এলো পান্তেলেই প্রকো-ফিয়েভিচ। জানলা দিয়ে কোর্‌শুনভদের বাড়ির ভেতরে তাকাল, তারপর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। বেয়াই নিজে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। বুড়ো কোর্‌শুনভের মেছেতা-পরা মুখটা আনন্দে যেন ধুয়ে অনেক সাফসতুর হয়ে গেছে। এখন আর তেমন বেশি দাগ তার মুখে দেখা যাচ্ছে না।

'আমাদের সুখবরটা শুনেছ ত?' বেয়াইয়ের হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল।

'পথে আসতে আলিওশা শামিলের মুখে শুনলাম। বেয়াই, আমি কিন্তু তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা কাজে. . .'

'আরে রাখ তোমার কাজ! চল, ঘরে চল – আমাদের সেপাইটাকে একটু আশীর্বাদ করবে! সত্যি কথা বলতে গেলে কি আজ আনন্দের দিনে আমরা সামান্য একটু মদ খেয়েছি। . . . আমার গিন্নির কাছে পালা-পার্বণের জন্যে একটা দামী বোতল তোলা ছিল।'

ঢিবলে নাকের দু'পাশ ফুলিয়ে একটু হেসে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল, 'সে আর আমাকে বলতে হবে না। আমি দূর থেকেই টের পেয়েছি।'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ দরজাটা হাঁ করে খুলে দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে

বেয়াইকে আগে ঢুকতে দিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চৌকাট পেরিয়ে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সোজা মিত্কার চোখে চোখ পড়ে গেল। টেবিলের ধারে সামনের কোণটায় বসে ছিল মিত্কা।

'এই যে এখানে আমাদের সেপাই!' মিত্কা উঠে দাঁড়াতে তার কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেঁদে আকুল হয়ে চেঁচিয়ে বলল গ্রিশাকা দাদু।

'তুমি এসেছ বলে আমরা ভারী খুশি, কসাকের পো!'

মিত্কার হাতের লম্বাটে তালুটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। অবাক হয়ে পেছনে সরে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

'আরে কী দেখছেন অমন করে, তালই মশাই?' হাসতে হাসতে খসখসে হেঁড়ে গলায় মিত্কা বলল।

'দেখছি – দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে আর গ্রিশ্কাকে ত একই দিনে পল্টনে বিদেয় দিয়ে এলাম, বাচ্চা ছেলে ছিলে। কিন্তু এখন . . . ইশ্, দ্যাখ কাণ্ডখানা! . . . দস্তুরমতো কসাক . . . একেবারে আতামান-গার্ডের যুগ্যি!'

লুকিনিচ্না জলভরা চোখে মিত্কার দিকে তাকিয়ে ছিল। গেলাসে ভোদ্কা ঢালতে গিয়ে চোখে দেখতে না পাওয়ার খানিকটা ভোদ্কা কানা বয়ে ছল্‌কে পড়ে গেল।

'বুদ্ধির ঢেঁকি আমার! অমন ভালো জিনিস কিনা ফেলে নষ্ট করছ!' গিন্নির ওপর তম্বি করল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ।

'তোমাদের আনন্দের জন্যে, আর মিত্রি মিরোনিচ, তুমি যে বাড়ি এসেছ এই সৌভাগ্যের জন্যে!'

এই বলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার চোখের নীল সাদা অংশটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিল। চোখের পাতা পিটপিট করতে করতে এক নিঃশ্বাসে পেটমোটা গেলাসটা খালি করে দিল। হাতের চেটো দিয়ে ধীরে ধীরে ঠোঁট আর গোঁফ মুছতে মুছতে শূন্য গেলাসের তলায় জ্বলন্ত দৃষ্টি হানল সে। মাথাটা আবার পেছনে হেলিয়ে যে সামান্য ছিটেফোঁটা গায়ে লেগে ছিল সেটুকু ঝেড়ে ফেলে দিল কালো দাঁত-বার-করা মুখের হাঁ'র ভেতরে। মাত্র তখনই দম নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চোখ কুঁচকে থেকে পরম পরিতৃপ্তিভরে শশা কামড়ে খেতে শুরু করল। বেয়ান আরও একটা গেলাস তার দিকে এগিয়ে দিল। এই গেলাসটা পেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো এমন বুঁদ হয়ে গেল যে তাকে দেখে হাসি পায়। মুখ টিপে হাসতে হাসতে তাকে লক্ষ করতে থাকে মিত্কা। বিড়ালের মতো কটা চোখের মণি কখনও সরু হয়ে সবুজরঙের চিলতে

ফাটলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, কখনও বা বড় হয়ে উঠছে, গাঢ় রং ধরছে তাতে। এই কয় বছরের মধ্যে এত বদলে গেছে সে যে তাকে চেনাই যায় না। পাতলা ছিপছিপে চেহারার যে মিত্‌কাকে তারা তিন বছর আগে পল্টনে বিদায় দিয়েছিল, এই কালো-গোঁফ জোয়ান কসাকটার মধ্যে আজ তার প্রায় কিছুই নেই। বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে সে, কাঁধদুটো তার চওড়া হয়েছে, সামান্য কোলকুঁজো হয়ে গেছে, বেশ গায়ে-গতরে হয়েছে, ওজন দু'মণের কম হবে না মোটেই। মুখের চেহারা আর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে যাওয়ায় তাকে বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। কেবল চোখদুটো রয়েছে সেই একই রকম – চঞ্চল, অস্থির। মা হেসে-কেঁদে অস্থির হয়ে বলিরেখা-আঁকা পাণ্ডুর হাত দিয়ে থেকে থেকে ছেলের কদমছাঁট-দেওয়া সোজা চুল আর সরু ধবধবে কপাল স্পর্শ করতে করতে সেই চোখের তারার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

'ক্রস নিয়ে বাড়ি ফিরলে তাহলে?' নেশার ঝোঁকে মুখে হাসি টেনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল।

'ক্রস পায় নি, এমন কসাক আজকাল কে আছে?' ভুরু কুঁচকে মিত্‌কা বলল। 'ক্রিউচ্‌কোভ ত স্রেফ হেড-কোয়ার্টারের আশেপাশে ঘুরঘুর করেই তিনটে ক্রস পেয়ে গেল।'

'আমাদের এই ছেলেটা নিজের মান-সম্মান নিয়ে চলে,' চটপট বলে উঠল গ্রিশাকা দাদু। 'হারামজাদা হয়েছে একেবারে আমার মতন, ওর দাদুর মতন। কারও সামনে মাথা নোয়ানো ওর ধাতে নেই।'

'যতদূর জানি, এর জন্য ক্রস মেলে না।' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খানিকটা দমে গেল। এমন সময় মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তাকে ভেতরের বড় ঘরে টেনে নিয়ে গেল; প্যাঁটরার ওপর পাতা আসনে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নাতালিয়া আর নাতি-নাতনিদুটো কেমন আছে? বেঁচে-বর্তে আছে ত? ভগবানের জয় হোক! তা বেয়াই, তুমি না বললে কী একটা কাজে এসেছ? কী সেই কাজ? বলে ফেল – নইলে আরও এক পাত্তর চড়াব, তখন নেশা পেয়ে বসবে তোমাকে।'

'কিছু টাকা দাও। ভগবানের দোহাই! আমাকে বাঁচাও ভাই, নইলে আমাকে সর্বস্ব খোয়াতে হবে . . . এই টাকার ব্যাপারে।'

মদের ঝোঁকে আত্মসম্মানবোধ বেশ খানিকটা বিসর্জন দিয়েই পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনুনয় করল। বেয়াই তাকে থামিয়ে দিল।

'কত দরকার?'

'একশটা পাত্তি।'

'একশটা কত'র? পাত্তি ত অনেক রকমের হতে পারে।'

'পুরো একশ' রুব্‌ল।'

'সেই কথাই বল।'

সিন্দুক ঘেঁটে একটা তেলচিটে রুমালের পুঁটলি বার করল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। পুঁটলিটা খুলল, খসখস করে দশ রুব্‌লের কড়কড়ে দশটা নোট গুনে আলাদা করে তার হাতে তুলে দিল।

'তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব বেয়াই! . . . একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমাকে।'

'কী বল! নিজেদের লোক বলে কথা – একদিন না একদিন শোধবোধ হয়ে যাবে।'

মিত্‌কা বাড়িতে কাটাল পাঁচ দিন। রাতগুলো সে কাটাতে লাগল আনিকুশ্‌কার বৌয়ের কাছে। মেয়েমানুষের প্রচণ্ড তাগিদের কথা ভেবে মিত্‌কার বড় অনুকম্পা হয় – বিশেষত সাদামাঠা এই মেয়েমানুষটার ওপর। কোন সময় 'না' নেই তার। দিনের বেলায় পাড়ায় আত্মীয়স্বজন এর-ওর বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। শক্তসমর্থ লম্বা শরীরটা ঠাণ্ডায় কাবু হয় না এটা দেখানোর জন্যেই যেন টুপিটা একপাশে কাত করে মাথায় দিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে একটামাত্র হাল্‌কা ট্রেঞ্চ-জ্যাকেট গায়ে গ্রামের রাস্তায় কোমর দুলিয়ে হেঁটে বেড়ায় সে। একদিন সন্ধ্যার আগে আগে মেলেখভদের বাড়িতেও এসে হাজির হল। উনুনের গনগনে-আঁচে-গরম রান্নাঘরে বয়ে নিয়ে এলো হিমের ঘ্রাণ আর ফৌজী শরীরের উগ্র গন্ধ। সেখানে বসে গ্রামের খবরাখবর আর যুদ্ধ নিয়ে খানিকটা কথাবার্তা বলল, পাটকাঠির মতো সরু, সবজে চোখদুটো কোঁচকাল দারিয়ার দিকে চেয়ে, তারপর চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মিত্‌কা ঘরে ঢোকার পর থেকে দারিয়া একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবারে সে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যেতে দারিয়া মোমবাতির শিখার মতো কেঁপে উঠল। শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল, ওড়নাটা মাথায় জড়াতে যাচ্ছিল – এমন সময় ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় চললে বৌমা?'

'একটু বাইরে যাব . . . দরকার পড়েছে।'

'চল আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাথা নীচু করে এমন ভাবে বসে রইল যেন ওদের কথাবার্তা তার কানেই যায় নি। চোখের পাতা নামিয়ে খেঁকশিয়ালীর ধূর্ত চাউনির ঝলক আড়াল করে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দারিয়া। পেছন পেছন জবুথবু হয়ে কঁকাতে কঁকাতে পা টেনে টেনে চলল তার শাশুড়ী। মিত্‌কা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে হাইবুট ঘষটে খসখস আওয়াজ করছিল, দু'হাতের আঁজলার মধ্যে আগুন আড়াল করে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গলা খাঁকারি দিচ্ছিল। দরজার খিল খোলার আওয়াজ শুনে দাওয়ার দিকে পা বাড়াতে গেল সে।

'কে, মিত্‌কা নাকি? আমাদের বাড়ির উঠোনে পথ হারিয়ে ফেললি নাকি?' ইলিনিচ্‌না তাকে ডেকে খোঁচা দিয়ে বলল। 'তা দরজার খিলটা বাইরে থেকে আটকে দিস কিন্তু, নইলে হাওয়ায় সারা রাত আছড়াবে। . . . উঃ, যা হাওয়া! . . .'

'পথ-টথ কিছুই হারাই নি। . . . আটকে দিচ্ছি,' একটু চুপ করে থেকে শেষকালে বিরক্ত হয়ে মিত্‌কা বলল। গলা খাঁকারি দিয়ে সোজা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল আনিকুশ্‌কার বাড়ির দিকে।

পাখির মতো ভাবনাচিন্তাহীন জীবন মিত্‌কার। আজ ত ভালো ভাবে বাঁচা যাক, কাল কী হবে তা কাল দেখা যাবে। পল্টনের কাজে তার তেমন কোন চাড় নেই। ভয়লেশহীন হৃৎপিণ্ডের ভেতরে উত্তেজনায় রক্ত টগবগ করলে কী হবে, কারও অনুগ্রহলাভের বিশেষ কোন সুযোগ সে সন্ধান করে নি। তবে তার আর্মি-রেকর্ডের কাগজটা খানিকটা কলঙ্কিত। দু'-দু'বার অভিযুক্ত হয়েছিল সে। একবার রুশ নাগরিক কোন এক পোলবংশের মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্য, আরেকবার লুটতরাজের জন্য। তিন বছরের যুদ্ধের মধ্যে অসংখ্যবার শাস্তি ও জরিমানা দণ্ড হয়েছে তার। একবার ত কোর্ট-মার্শাল তাকে গুলি করে মারার রায়ই দিয়ে বসেছিল প্রায়। কিন্তু বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার অদ্ভুত কৌশল মিত্‌কার জানা ছিল। রেজিমেন্টের মধ্যে তার কুখ্যাতি থাকলেও তার ফুর্তিবাজ হাসিখুশি স্বভাব, অশ্লীল গান (এই ব্যাপারে মিত্‌কা ছিল একজন প্রথম সারির ওস্তাদ), বন্ধুপ্রীতি ও সারল্যের জন্য কসাকরা তাকে ভালোবাসত, অফিসাররা তাকে ভালোবাসত তার ডাকাবুকো বেপরোয়া স্বভাবের জন্য। নেকড়ের মতো হাল্‌কা চালে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় মিত্‌কা, ওই জানোয়ারের সঙ্গে স্বভাবের অনেকখানি মিল আছে তার – কাত হয়ে হেলেদুলে পায়ে পায়ে চলার সেই ভঙ্গি, সেই রকমই চোখের সবুজ মণি আর আড়চোখের চাউনি; এমনকি মাথা ঘোরানো পর্যন্ত – শেল-শক লেগেছিল মিত্‌কার ঘাড়ে, তাই পেছন ফিরে কিছু দেখতে গেলে ঘাড়টা নাড়াতে পারে না সে, মোটা শরীরটা ঘোরাতে হয়। চওড়া হাড়ের ওপর টানটান পাকানো মাংসপেশীর ঠাসবুনট, চলনটা হাল্‌কা, কুণ্ঠাজড়িত। স্বাস্থ্য আর বলের একটা কটু গন্ধ ভেসে আসত তার দেহ থেকে – এরকমই গন্ধ ছাড়ে চষা মাঠের চাপ চাপ কালো জমি। মিত্‌কার কাছে জীবনটা ছিল সোজা, মারপ্যাঁচহীন, চষা-জমির মতো সামনে চলে গেছে। তার ওপর দিয়ে সে চলত নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়ে। তার চিন্তাভাবনাও ছিল সেই রকমই আদিম, সহজসরল। খিদে পেলে চুরি করা যেতে পারে, করাই উচিত – এমন কি বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও। খিদে পেলে চুরি করতও সে; জুতো ছিঁড়ে গেছে – সবচেয়ে সহজ কাজ কোন জার্মান বন্দীর পা থেকে জুতো খুলে নেওয়া। কুকাজের জন্য সে সাজা পেয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করতে

হয় – মিত্‌কা তা করতও – স্কাউটিং-এ চলে যেত, জার্মানদের ঘাঁটিতে ঢুকে তাদের সান্ত্রীদের কাবু করে ধরে নিয়ে আসত আধ-মরা অবস্থায়, আগ বাড়িয়ে যেত আরও অনেক বড় বড় ঝুঁকির কাজে। ১৯১৫ সালে বন্দী হয়েছিল, তখন চওড়া তলোয়ারের ঘা খেয়ে সে জখম হয়। কিন্তু রাত্রে যে-চালাঘরে তাকে রাখা হয়েছিল নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে তার চাল ভেঙে পালিয়ে যায়। এই কাজ করতে গিয়ে তার হাতের আঙুলের একটা নখও আস্ত ছিল না। পালানোর সময় কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির একটা সাজ স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে সঙ্গে নিতে ভোলে নি। ঠিক এই কারণেই অনেক কিছু করেও পার পেয়ে গেছে মিত্‌কা।

ছয় দিনের দিন মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তার ছেলেকে গাড়ি করে নিয়ে গেল মিল্লেরোভো স্টেশনে। সেখান থেকে তাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিল। কান পেতে শুনল, সবুজ রঙের সারবন্দী বাক্সগুলো ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করতে করতে দূরে সরে চলে গেল। ফোলা-ফোলা ক্লান্ত চোখদুটো না তুলে চাবুকের হাতল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্ল্যাটফর্মের কাছের তেলকাট ছড়ানো মাটি খোঁচাল। লুকিনিচ্‌না ছেলের জন্য কাঁদল, গ্রিশাকা দাদু কাতরাল, ভেতরের ঘরে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ল, হাতের চেটোয় শিকনি ঝেড়ে লম্বা কোটের তেলচিটে কিনারায় মুছে ফেলল। আনিকুশ্‌কার বিরহিনী বৌও কাঁদল; কাঁদল মিত্‌কার কামতপ্ত বিশাল শরীরের কথা মনে করে, সৈনিকপ্রবরের কাছ থেকে যে গনোরিয়া রোগ সে পেয়েছিল তার যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে।

বাতাস যেমন ঘোড়ার কেশরে জট পাকায় সময়ও তেমনি জট পাকাল দিনগুলো নিয়ে। বড়দিনের আগে হঠাৎ বরফ গলতে শুরু করল। দিনরাত একটানা বৃষ্টি পড়তে লাগল, দন এলাকার পাহাড়ের ঢাল বয়ে জল নেমে কলকল বেগে ছুটে চলল শুকনো খাতগুলোর ওপর দিয়ে। দনের ভেতরে সবু হয়ে এগিয়ে যাওয়া যে-সমস্ত জমির বরফ গলে গেছে সেখানে সবুজ হয়ে জেগে উঠল গত বছরের ঘাস আর শেওলা-পড়া খড়িমাটির চাঙড়। দনের কিনারে কিনারে যে সব জায়গায় বরফ ক্ষয়ে গেছে সেখানে ফেনার পুঞ্জ দেখা দিল। বরফ মড়ার মতো নীলবর্ণ ধারণ করল, ফুলে ফেঁপে উঠল। কালো মাটির নগ্ন বুক থেকে এক অবর্ণনীয় মিষ্টি গন্ধ ছড়াল। সদর রাস্তায় আগের বছরকার গাড়ির চাকার দাগে জলের বুড়বুড়ি উঠতে লাগল। গ্রামের পেছনের গিরিখাতগুলোতে সবে ধস নামায় সেখানকার এঁটেল মাটি হাঁ হয়ে রইল। চির থেকে দক্ষিণে বাতাস বয়ে আনল ঘাস-পাতা পচার একটা বিশ্রী ক্লান্তিকর গন্ধ। দুপুরের দিকেই দিগন্তের বুকে ঝাপসা দেখা দিল বসন্তকালের মতো সুস্নিগ্ধ নীল ছায়া। গ্রামে বেড়ার গায়ে গায়ে ফেলা ছাইগাদাগুলোর কাছে জল জমে তার গায়ে কাঁপন দেখা দিল।

মাড়াই-উঠোনে খড়ের গাদার কাছে মাটি গলতে শুরু করেছে। পাশ দিয়ে যেতে গেলে ভেজা খড়ের একটা মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধ ধক করে নাকে এসে লাগে। ঘরবাড়ির খড়ের চালা থেকে বরফের কাঠি ঝুলছে, ছাঁচ বয়ে সারাদিন ধরে গড়িয়ে পড়ছে আলকাতরা রঙের জলের ধারা। বেড়ার ওপরে বসে ছাতার পাখিগুলো গলা ফাটিয়ে কিচিরমিচির করে চলেছে। গ্রামের পাল ধরানোর যে ষাঁড়টা মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের বাড়ির উঠোনে শীতকালের আশ্রয় নিয়েছিল, অকাল-বসন্তের পীড়নে কাতর হয়ে সেটা ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল। ষাঁড়টা শিঙের গুঁতোয় বেড়া ভেঙে ফেলল, পোকায় খাওয়া ওক কাঠের একটা লাঙলে গা ঘষল, রেশমের মতো নরম তলপেটটা দোলাল, উঠোনে ঝুরঝুরে গলা বরফ ছিটোতে লাগল খুর দিয়ে।

বড়দিনের পরের দিন দনের বরফে ভাঙন ধরল। ভয়ঙ্কর কড়কড় মড়মড় শব্দ করতে করতে মাঝখানের স্রোত বরাবর ভেসে চলল বরফের চাঙড়। ভাসমান তুষারস্তরগুলো এক‌েকটি নিদ্রালু মৎস্যদানবের মতো পারের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। দনের ওপারে উত্তেজনা-জাগানো দখিনা বাতাসের তাড়া খেয়ে পপ্‌লার গাছগুলো যেন অস্থিরগতিতে সামনে ছোটার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে চাপা সোঁ সোঁ হিসহিস গর্জন।

কিন্তু রাত্রের দিকে পাহাড় গর্জন করতে শুরু করল, কাকগুলো উড়তে উড়তে বারোয়ারিতলায় এসে জড় হল। খ্রিস্তোনিয়ার শুয়োরটা এক গোছা খড় মুখে করে মেলেখভদের বাড়ির পাশ দিয়ে ধাঁ করে ছুটে চলে গেল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মনে মনে সিদ্ধান্ত করল বসন্তের সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল, কালই শুরু হবে শীতের দৌরাত্ম্য। রাত্রে বাতাসের গতি ঘুরে গেল, বাতাস বইতে শুরু করল পুব দিক থেকে। ছোট ছোট যে ডোবাগুলোর জমাট-বাঁধা জলের স্তর এর আগে বরফ গলার ফলে ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছিল এখন হাল্‌কা হিমে সেখানে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বরফের সর পড়ল। সকাল হতে না হতেই বাতাস বইতে শুরু করল মস্কোর দিক থেকে। দেখতে দেখতে হিম এসে জেঁকে বসল। আবার শুরু হল শীতের রাজত্ব। কেবল দনের মাঝ বরাবর বড় বড় সাদা পাতার আকারে বরফের ভাসন্ত টুকরোগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল বরফ-গলার কথা। টিলার মাথার ওপর বে-আব্রু মাটির বুক থেকে উঠতে লাগল ধোঁয়া ধোঁয়া হিমেল বাষ্প।

বড় দিনের কিছু পর পরই জেলা সদরের এক সভায় স্থানীয় এক কেরানি পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে জানাল যে গ্রিগোরির সঙ্গে কামেন্‌স্কায়াতে তার দেখা হয়েছিল, গ্রিগোরি তাকে অনুরোধ করে সে যেন তার পরিবার-পরিবর্গকে জানায় যে শিগগিরই বাড়ি আসছে।

সাত

ফাঁকা ফাঁকা চকচকে লোমে ঢাকা ছোট ছোট তামাটে হাতদুটো দিয়ে সব দিক থেকে জীবনকে হাতড়ে দেখা সের্গেই প্লাতোনভিচ মোখভের অভ্যাস। জীবন কখন কখন রঙ্গ করে তার সঙ্গে, কখনও বা ডুবন্ত মানুষের গলায় ঝোলা পাথরের মতো ভারী হয়ে চেপে বসে। জীবনে অনেক কিছু দেখেছে সের্গেই প্লাতোনভিচ, অনেকবার অনেক রকম সঙ্কটে পড়তে হয়েছে তাকে। অনেক কাল আগেকার কথা – তখনও সে মজুতের কারবার করত – একবার কসাকদের কাছ থেকে নামমাত্র দামে ফসল কিনে পরে গাড়ি বোঝাই করে দেড় হাজার মণ পোড়া গম গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে অপয়া খাদে ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে। ১৯০৫ সালের কথাও মনে পড়ল তার – সেই সময় শরৎকালের এক অন্ধকার রাতে গ্রামেরই কোন এক লোক শিকারী বন্দুকের ছর্‌রা চালিয়ে দেয় তার ওপর। মোখভ বড়লোক হল, দেখতে দেখতে সর্বস্বান্তও হল। শেষকালে কোন রকমে ষাট হাজার রুব্‌ল জমলে সেই টাকাটা ভোল্‌গা-কামা ব্যাঙ্কে রেখে দিল। কিন্তু এখন বহুদূর থেকে সে টের পেল একটা বিরাট আলোড়নের দিন যেন আসন্ন, তাকে ঠেকাতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই। সেই দুর্দিনের অপেক্ষায় রইল সের্গেই প্লাতোনভিচ। তার অনুমান কিন্তু ভুল হল না। সতেরো সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা – গ্রামের স্কুল-মাস্টার ক্ষয়রোগে একটু একটু করে আসন্ন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে – সেই সময় সের্গেই প্লাতোনভিচের কাছে আক্ষেপ করে সে বলেছিল, 'বিপ্লব নাকের ডগায় এসে গেছে, অথচ এখনই কিনা আমি অতি বাজে, চূড়ান্ত রকমের সেণ্টিমেণ্টাল একটা রোগে মারা যেতে বসেছি! বড় আফসোসের কথা সের্গেই প্লাতোনভিচ! . . . আফসোস থেকে গেল যে কী ভাবে আপনার পুঁজি লোপ পায় আর তাড়া খেয়ে আপনাকে সুখের বাসাটি ছেড়ে পালাতে হয় সেটা চোখে দেখে যেতে পারলাম না।'

'এতে আফসোসের কী আছে?'

'নয়ত কী? যাই হোক না কেন, আপনি ত জানেন, আপনার সব কিছু ছারখার হয়ে যেতে দেখে বেশ ভালোই লাগবে।'

'উঁহু সেটি চলছে না ভাই! তুমি বরং এখনই মর, আমি কাল অবধি সবুর করব!' ভেতরে ভেতরে রেগে গরজাতে গরজাতে সের্গেই প্লাতোনভিচ উত্তর দিল।

রাস্‌পুতিন আর জার-পরিবারকে নিয়ে রাজধানীর নানা কেচ্ছা-কাহিনী সেই জানুয়ারীতেই গ্রামে গ্রামে ও জেলা সদরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের সংবাদ যখন সের্গেই প্লাতোনভিচের কানে এলো

তখন তার অবস্থা হল জালে-পড়া বনমোরগের মতো। কসাকরা চাপা উদ্বেগের সঙ্গে সংবাদটা গ্রহণ করল, অপেক্ষা করতে লাগল কী হয়। সেদিন মোখভের বন্ধ দোকানঘরের সামনে গ্রামের যত বুড়ো আর অল্পবয়সী কসাকরা সন্ধে পর্যন্ত ভিড় করে রইল। বিশাল চেহারার, কটা-গোঁফ, সামান্য ট্যারা-চোখ কিরিউশ্‌কা সল্‌দাতভ নামে এক কসাক মানিৎস্‌কোভ মারা যাওয়ার পর তার জায়গায় গ্রামের মোড়ল হয়েছে। খবরটা শোনার পর সে দমে গেছে। দোকানঘরের সামনে যে উত্তেজিত আলোচনা চলছে তাতে প্রায় কোন অংশই তাকে নিতে দেখা গেল না। ট্যারা-চোখের দৃষ্টি কসাকদের ওপর বুলোতে বুলোতে হতবুদ্ধির মতো মাঝে মাঝে সে বলে উঠতে লাগল, 'কী যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটছে! . . . বোঝ কাণ্ড! . . . এখন আমাদের অবস্থাটা কী হবে? . . .'

জানলা থেকে দোকানের বাইরে ভিড় দেখে সের্গেই প্লাতোনভিচ গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ করবে বলে মনস্থ করল। নকুলের চামড়ার কোটটা গায়ে দিয়ে অনাড়ম্বর রুপোর অক্ষরে নাম খোদাই করা বাদামী রঙের ছড়িতে ভর দিয়ে বাড়ির সদর দরজার সামনে বেরিয়ে এলো সে। নানা কণ্ঠের গুঞ্জন উঠল দোকানঘরের আশপাশ থেকে।

'এই যে প্লাতোনভিচ, তুমি ত লেখাপড়া জানা লোক, আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তুমিই বল দেখি আমাদের, এরপর কী হবে?' ঠাণ্ডায়-জমে-যাওয়া নাকের কাছটা কুঁচকে কতকগুলো তেরছা ভাঁজ ফেলে মুখে উৎকণ্ঠার হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল মাত্‌ভেই কাশুলিন।

সের্গেই প্লাতোনভিচ মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাতে বুড়োরা সসম্ভ্রমে মাথার টুপি খুলল, সরে দাঁড়িয়ে তাকে ভিড়ের মাঝখানে ঢোকার পথ করে দিল।

'জারকে ছাড়াই চালাতে হবে এখন,' আমতা-আমতা করে বলল সের্গেই প্লাতোনভিচ।

বুড়োরা সকলে একসঙ্গে কলবল করে উঠল:

'জারকে ছাড়া! সে কী করে হয়?'

'আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা অ্যাদ্দিন কাটিয়ে এলো জারের রাজত্বে – আর এখন কিনা জারের দরকার নেই?'

'মাথা কাটলে কি আর পা বেঁচে থাকে?'

'কোন্ ধরনের সরকার হবে আমাদের শুনি?'

'আহা অমন আমতা-আমতা করছ কেন, প্লাতোনিচ? মন খুলেই কথা বল না কেন আমাদের সঙ্গে। . . . ভয়ের কী আছে?'

'ও নিজেই হয়ত জানে না,' 'চালিয়াত' আভ্‌দেইচ হেসে মন্তব্য করল। সঙ্গে

সঙ্গে আরও গভীর হয়ে উঠল তার গোলাপী দুই গালের টোল।

সের্গেই প্লাতোনভিচ বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পুরনো রবারের জুতোজোড়ার দিকে। বেশ কষ্ট করে দাঁতের ফাঁকে পিচ কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'দেশ শাসন করবে স্টেট-দুমা*। আমাদের দেশ হবে প্রজাতন্ত্র।'

'হা ভগবান, কোন্ জাহান্নামে এসে ঠেকেছি আমরা!'

'স্বর্গীয় দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের আমলে আমরা যেমন তাঁর সেবা করে এসেছি...' আভ্‌দেইচ কিছু একটা বলতে শুরু করেছিল এমন সময় বুড়ো বগাতিরিওভ কঠোর ভাবে তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব আমরা শুনেছি। এখানে কথাটা তা নিয়ে নয়।'

'কসাকদের তাহলে দফারফা হয়ে গেল।'

'আমরা যতক্ষণে এখানে ধর্মঘট নিয়ে ব্যস্ত থাকব ততক্ষণে জার্মানরা সেণ্ট পিটার্সবুর্গের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।'

'ওরা যখন সকলে সমান এই কথা বলছে, তার মানে চাষাভুষোদের সঙ্গে আমাদের সমান করে দিতে চায়।...'

'বলা যায় না আমাদের জমিজমায়ও হাত পড়তে পারে...'

সের্গেই প্লাতোনভিচ জোর করে মৃদু হাসল, চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োদের উৎকণ্ঠিত মুখগুলো দেখল। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতায় বিরক্তিতে তার মনটা ছেয়ে গেল। সে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বাদামীরঙের দাড়িটা দু'ভাগ করল, তারপর কার ওপর কে জানে, রেগে গিয়ে বলল, 'এখন দেখতে পাচ্ছ ত তোমরা, কোথায় নিয়ে এসেছে ওরা রাশিয়াকে! ওরা চাষাদের সঙ্গে তোমাদের সমান করে দেবে, তোমাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে কেড়ে নেবে। শুধুই কি তাই? পুরনো দিনের অপমানের শোধ নিতেও ছাড়বে না। বড়ই কঠিন দিন আসছে সামনে।... শাসনক্ষমতা কাদের হাতে গিয়ে পড়ে তারই ওপর নির্ভর করছে সব কিছু। তবে একেবারে ধ্বংসের পথেও টেনে নিয়ে যেতে পারে আমাদের।'

'বেঁচে থাকলে দেখতে পাব!' বগাতিরিওভ মাথা ঝাঁকাল, থোকা থোকা লোমশ ভুরুর তলা থেকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল সের্গেই প্লাতোনভিচের দিকে। 'তুমি তোমার নিজের লাইনে ভাবছ প্লাতোনিচ, কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে এতে আমাদের সুবিধেই হবে?'

'সুবিধেটা কী করে হবে শুনি?' তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সের্গেই প্লাতোনভিচ।

---

* স্টেট-দুমা - জার-আমলের রাশিয়ায় আইন ও প্রশাসন কার্যপরিচালনসংক্রান্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সভা। - অনুঃ

'নতুন সরকার হয়ত লড়াইয়ে ক্ষ্যান্ত দিতে পারে।. . . এমনও ত হতে পারে? কী বল?'

সের্গেই প্লাতোনভিচ হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া ভঙ্গিতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির সাজানোগোছানো নীলরঙা দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে অসংলগ্ন ভাবে তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল টাকাপয়সা ও আটাকলের কথা, ব্যবসার মন্দার কথা। মনে পড়ল লিজা এখন মস্কোয়, ভ্লাদিমিরের শিগগিরই ফিরে আসার কথা নোভোচের্‌কাস্স্ক থেকে। ছেলেমেয়ের জন্য উদ্বেগের ভোঁতা খোঁচাটুকুতে তার অস্থির অসংলগ্ন চিন্তার কোন ব্যাঘাত ঘটল না। এই ভাবে বাড়ির দাওয়ায় উঠতে উঠতে তার মনে হল এই একদিনে হঠাৎই যেন জীবনটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এমন কি বেদনাভারাতুর চিন্তায় সে নিজেও যেন ভেতরে ভেতরে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। লালায় ভরে উঠল তার মুখ, মুখের ভেতরে সে অনুভব করল মরচের মতো টক টক স্বাদ। দোকানঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ানো বুড়োদের দিকে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দাওয়ার কাজ-করা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে সের্গেই প্লাতোনভিচ থুতু ফেলল। পায়ের খসখস আওয়াজ তুলে বারান্দা বয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। খাবার ঘরে স্ত্রী আন্না ইভানভ্‌নার সঙ্গে তার দেখা হল। বর্ণহীন চোখের চিরাচরিত উদাসীন দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'চায়ের আগে একটু জলখাবার খাবে কি?'

'না, না! কিসের জলখাবার!' সের্গেই প্লাতোনভিচ বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়িয়ে বলল।

কোটটা গা থেকে খোলার সময়ও সে অনুভব করতে লাগল মুখের ভেতরে সেই মরচে-মরচে স্বাদ, মাথার ভেতরে একটা নিরানন্দ শূন্যতা।

'লিজার চিঠি।'

একটা ছটফটে দৌড়বাজ ঘোড়ার ভঙ্গিতে পা ফেলে (এত বড় গৃহস্থালীর চাপে পড়ে বিয়ের ঠিক পর থেকে এই ভাবে হাঁটাই তার অভ্যাস হয়ে গেছে) শোবার ঘরে এসে ঢুকল আন্না ইভানভ্‌না। তার হাতে একটা সীল-খোলা খাম।

ভারী খামটা থেকে আতরের গন্ধ ভেসে আসছিল, তাইতে নাক কোঁচকাল সের্গেই প্লাতোনভিচ। মেয়ের সম্পর্কে এই প্রথম মনে মনে ভাবল, 'মেয়েটার মাথায় কিছু নেই, একেবারে বোকা বলেই মনে হচ্ছে।' বুড়ো বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে চিঠিটা পড়ল, 'মেজাজ' কথাটার ওপর নজর পড়তে কেন যেন থেমে গিয়ে তার ভেতর থেকে কোন এক দুর্বোধ্য গূঢ় তাৎপর্য বার করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। চিঠির শেষে মেয়ে টাকা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে। চিঠির শেষ ছত্র

ক'টি পড়ে ফেলল সের্গেই প্লাতোনভিচ। তখনও তার মাথার ভেতরটা টনটন করছে শূন্যতার উপলব্ধিতে। সকলের আড়ালে নিঃশব্দে কাঁদার ইচ্ছে হল তার হঠাৎ। চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো পেছনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে যেন জীবনটা, এই মুহূর্তে সের্গেই প্লাতোনভিচের সামনে যেন প্রকাশ করে দিচ্ছে তার শূন্যগর্ভ অসারতা।

'ও আমার অপরিচিত,' মেয়ের কথা ভেবে তার মনে হল। 'আমিও ওর অপরিচিত। পারিবারিক টান যতটা আছে সে হল টাকার প্রয়োজনে। . . . নোংরা মেয়ে, উপপতি আছে। . . . অথচ যখন ছোট ছিল মাথায় রেশমি চুল এই মেয়েটি আমার কত আপনজনই না ছিল! হা ভগবান! কেমন করে পাল্‌টে যায় সব কিছু! . . . এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত আহাম্মকই রয়ে গেলাম! কোথায় ভাবলাম ভবিষ্যতে আমার জীবনটা সুখের হবে, কিন্তু কাজের বেলায় হয়ে রইলাম রাস্তার ধারের একটা পোড়ো মন্দিরের মতো একা, নিঃসঙ্গ। টাকাপয়সা যা আয় করেছি সৎপথে করি নি – সৎপথে করা সম্ভবও নয়! – জাল জুয়োচুরি করেছি, লোকের কাছ থেকে নিংড়ে নিয়েছি। এখন বিপ্লব এসেছে, কালই আমার চাকরবাকররা যে আমাকে আমার নিজের বাড়ি থেকে বার করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কী? . . . সব উচ্ছন্নে যাবে! আমার ছেলেমেয়ে? . . . ভ্লাদিমিরটা একটা হাঁদা। . . . তাছাড়া, হ্যাঁ, কী-ই বা মানে হয় এসবের? কিছুই আসে যায় না, বোধহয় . . .'

অর্থহীন উদ্ভট চিন্তার মধ্যেও কোন্ এক যোগসূত্র ধরে স্মৃতিতে জেগে উঠল আটাকলের একটা ঘটনা। বহুকাল আগে ঘটেছিল সেটা। একজন কসাক গম ভাঙাতে নিয়ে এসেছিল আটাকলে। কিন্তু ভাঙানো আটায় বেশি রকমের ঘাটতি দেখতে পেয়ে লোকটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, আটাভাঙার টাকা দিতে অস্বীকার করে। সের্গেই প্লাতোনভিচ সেই সময় মেশিন-ঘরে ছিল, গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলো। কী হয়েছে জানার পর কয়ালকে আর মিল কর্মীদের হুকুম দিল ভাঙানো আটা যেন লোকটাকে ফেরত দেওয়া না হয়। বেঁটেখাটো বিশ্রী চেহারার কসাক আটার বস্তার লেজের দিকটা ধরে নিজের দিকে টানছে, ওধারে নিজের দিকে টানছে মিলের কর্মী জাভার। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, ইয়া চওড়া তার বুকের ছাতি। কসাকটা জাভারকে ঠেলা মারল, জাভার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশাল হাতের মুঠো তেরছা করে পাকিয়ে দিল বসিয়ে কসাকের মাথার পাশের রগ ঘেঁষে। কসাক পড়ে গেল। পরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। তার বাঁ ধারের রগের কাছটা ছড়ে গেছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ সের্গেই প্লাতোনভিচের দিকে পা বাড়িয়ে একটা কাতর নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিসফিস

করে বলল, 'নিয়ে যা, নিয়ে যা ওই আটা! গেল্ গে!' তারপর বেরিয়ে গেল। তার কাঁধদুটো তখনও কাঁপছে।

আপাত দৃষ্টিতে তার চিন্তার সঙ্গে কোন যোগসূত্র না থাকলেও এই ঘটনা এবং তার ফলাফলের কথা মনে পড়ে গেল সের্গেই প্লাতোনভিচের। কসাকে বৌ এসে আটা ফেরত চাইল। জোর করে চোখের জল বার করে কেঁদে ভাসাল সে, আরও যারা গম ভাঙাতে এসেছিল তাদের সহানুভূতি আদায় করার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে বিলাপ করে বলল, 'ওগো ভালোমানুষেরা, তোমরাই বল, কী ব্যাপার এটা? কোন্ অধিকার আছে ওদের? আটা ফেরত দাও বলছি!'

'ভালোয় ভালোয় চলে যাও বলছি খুড়ি, নইলে মাথার একগাছি চুলও থাকবে না!' মুখ টিপে হেসে বলল জাভার।

সের্গেই প্লাতোনভিচের বিশ্রী লাগল, বিরক্তি লাগল যখন সে দেখতে পেল ওই কসাকটার মতোই দুবলা চেহারার বেঁটেখাটো মানুষটি, তারই মিলের কয়াল গোলাম ঘুষোঘুষি লড়াইয়ে নেমে পড়ল জাভারের সঙ্গে। জাভারের হাতে কষে মার খাওয়ার পর সের্গেই প্লাতোনভিচের কাছে এসে সে তার পাওনা তাকে মিটিয়ে দিতে বলল, চাকরী ছেড়ে দিল। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে পড়া-চিঠিটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে এই সব ঘটনা দ্রুত গতিতে একের পর এক সের্গেই প্লাতোনভিচের মাথার ভেতরে ঝলক দিতে থাকে।

সেই দিনটা শেষ বেলায় একটা বিশ্রী জ্বালাধরা ব্যথা রেখে গেল। রাত্রে সের্গেই প্লাতোনভিচের ভালো ঘুম হল না, অচেতন বাসনা আর যত রাজ্যের উদ্ভট উদ্ভট চিন্তাভাবনার কবলে পড়ে বিছানায় ছটফট করতে লাগল। ঘুম যখন এলো ততক্ষণে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। সকালে উঠে যখন শুনতে পেল যে ইয়েভ্গেনি লিস্ত্নিৎস্কি ফ্রন্ট থেকে ইয়াগদ্নোয়েতে তার বাবার কাছে এসেছে, তখন ঠিক করল সেখানেই যাবে, গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে হবে আসল অবস্থাটা কী, যে সমস্ত উদ্বেগজনক অনুমান তিক্ত পুঞ্জাকারে মনের ভেতরে জমেছে, সেগুলো দূর করতে হবে। ইয়েমেলিয়ান পাইপ টানতে টানতে শহরে যাবার স্লেজে তেজী ঘোড়াটা যুতল, গাড়ি হাঁকিয়ে প্রভুকে নিয়ে চলল ইয়াগদ্নোয়ে।

গ্রামের মাথার ওপর একটা কমলা রঙের খুবানির মতো। সূর্যটা টসটসে হয়ে উঠেছে, তার নীচে ধিকি ধিকি করে জ্বলতে জ্বলতে ধোঁয়া তুলছে মেঘের রাশি। টসটসে পাকা ফলের গন্ধে ভুরভুর করছে কনকনে হিমেল বাতাস। ঘোড়ার খুরের নীচে মচমচ করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার বরফ, ঘোড়ার নাক থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে বাতাসে পেছনে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার কেশরের গায়ে এসে জমছে জমাট শিশিরকণা হয়ে। গাড়ির দ্রুতবেগ আর

ঠাণ্ডার আমেজে সের্গেই প্লাতোনভিচ ঢুলতে থাকে, এপাশ ওপাশ দুলতে থাকে। আসনের গালিচামোড়া পিঠে ঘসা খেতে থাকে তার পিঠ। গ্রামের বারোয়ারিতলায় কালো হয়ে জমেছে ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে কসাকদের একটা ভিড়, ধূসর-বাদামী ভোদড়ের লোমের পাড় লাগানো শীতের কোর্তা গায়ে ভেড়ার মতো দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের বৌ-ঝিরা।

ভিড়ের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে স্কুল-মাস্টার বালান্দা। সবুজ-রঙ-ধরা মুখের সামনে ধরে রেখেছে একটা রুমাল। তার পশুলোমের খাটো কোর্তার বোতামে লাল ফিতে বাঁধা। উত্তেজনায় চোখদুটো চকচক করছে। বালান্দা বলে চলেছে:

'. . . তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অভিশপ্ত স্বৈরতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে! এখন থেকে কেউ আর চাবুক মেরে মজুরদের ঠাণ্ডা করতে তোমাদের ছেলেদের পাঠাবে না। রক্তচোষা জারের চাকরী করার কলঙ্ক থেকে তোমরা রেহাই পেলে। সংবিধান সভা হবে শোষণমুক্ত নয়া রাশিয়ার হর্তাকর্তা। সংবিধান সভাই গড়ে তুলতে পারবে আরেক জীবন - সে জীবন হবে আলোর জীবন!'

পেছন থেকে স্কুল-মাস্টারের কোর্তার খুঁট ধরে টানছে তার প্রণয়িনী, নীচু গলায় অনুনয়-বিনয় করে বলছে, 'মিতিয়া, হয়েছে, থাম! বুঝতে পারছ না, তোমার পক্ষে ভালো নয়? ঠিক নয়! আবার কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোবে . . . মিতিয়া!'

কসাকরা হতবুদ্ধি হয়ে মাটিতে চোখ নামিয়ে বালান্দার কথা শুনে যাচ্ছে, হাসি গোপন রেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করছে। তারা ওকে বক্তৃতাটা আর শেষই করতে দিল না। সামনের সারি থেকে কে একজন সমবেদনার সঙ্গে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, 'আলোর জীবন যে হবে সে ত দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু তুমি বেচারা তদ্দুর যেতে পারবে না। বরং বাড়ি যাও, বাইরে আজ বড় বেশি তাজা হাওয়া।'

থতমত খেয়ে কথার মাঝখানে তালগোল পাকিয়ে ফেলল বালান্দা। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ল ভিড়ের মাঝখান থেকে।

ইয়াগদ্‌নোয়ে সের্গেই প্লাতোনভিচ পৌঁছুল দুপুরবেলা। ঘোড়াটাকে মুখের লাগাম ধরে আস্তাবলের পাশে রাখা বেতে-বোনা জাবনা-পাত্রের কাছে নিয়ে এলো ইয়েমেলিয়ান। স্লেজগাড়ি থেকে নামতে এবং ভেড়ার চামড়ার কোটের কিনারা গুটিয়ে ভেতর থেকে রুমাল বার করতে প্রভুর যতটা সময় লাগল সেই অবসরে ঘোড়ার সাজ খুলে ফেলে তার গায়ের ওপর ঢাকনা চাপিয়ে দিল। বাড়ির দাওয়ায় সের্গেই প্লাতোনভিচকে অভ্যর্থনা জানাল ছাইরঙের ওপর বাদামী ফুটকিওয়ালা একটা ঢ্যাঙা বোর্জোই কুকুর। শিরাওঠা লম্বা লম্বা ঠ্যাঙগুলো টানটান করে অচেনা লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে সে হাই তুলল। আরও কতকগুলো কুকুর

দাওয়ার আশেপাশে কালো কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল। বোর্জোই কুকুরটার দেখাদেখি একই রকম অলস ভঙ্গিতে তারাও উঠে দাঁড়াল।

'গোল্লায় যাক! এ যে দেখছি এক দঙ্গল!' তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেল সের্গেই প্লাতোনভিচ।

শুকনো খটখটে, খোলামেলা বাইরের ঘরখানার মধ্যে কুকুর আর ভিনিগারের ঝাঁঝাল গন্ধ। একটা সিন্দুকের মাথার ওপরে, বিস্তীর্ণ ডালপালাছড়ানো হরিণের শিঙের গায়ে ঝুলছে ফৌজী অফিসারের আস্ত্রাখান টুপি, রুপোর থোপনা লাগানো মাথা-ঢাকা আর একটা ককেশীয় পশমের আঙরাখা। সের্গেই প্লাতোনভিচ ভেতরে উঁকি মেরে দেখল – মুহূর্তের জন্য তার মনে হল একটা কালো লোমশ মূর্তি যেন হতভম্ব ভঙ্গিতে কাঁধদুটো উঁচু করে সিন্দুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পাশের একটা ঘর থেকে একজন মোটাসোটা কালো-চোখ স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো। সের্গেই প্লাতোনভিচ যখন ওপরের জামাকাপড় ছাড়ছে তখন তাকে বেশ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল; তার রোদে-পোড়া তামাটে, সুশ্রী মুখের গম্ভীর ভাব বদল না করে সে জিজ্ঞেস করল, 'নিকলাই আলেক্সেয়েভিচকে চাই? আমি এক্ষুনি গিয়ে বলছি।'

স্ত্রীলোকটি দরজায় টোকা না দিয়েই সটান হল-ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল, ঢোকার পর ভালো করে বন্ধ করে দিল পেছনের দরজাটা। এই মুটিয়ে-যাওয়া সুশ্রী চেহারার, কালো-চোখ মেয়েমানুষটিকে আক্সিনিয়া আস্তাখভা বলে চিনতে বেশ কষ্ট হল সের্গেই প্লাতোনভিচের। আক্সিনিয়া কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিনতে পেরেছিল, চিনতে পেরে আরও শক্ত করে লাল টুকটুকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। দুধের মত সাদা নিরাবরণ হাতের কনুই সামান্য নাড়াতে নাড়াতে অস্বাভাবিক রকমের সোজা হয়ে হল্-ঘরের দিকে হেঁটে গিয়েছিল। মিনিটখানেক বাদে সে আবার বেরিয়ে আসতে তার পেছন পেছন খোদ বুড়ো লিস্ত্‌নিৎস্কিকেও দেখা গেল। মুখে অভ্যর্থনার মাপা হাসি টেনে বিগলিত ভঙ্গিতে হেঁড়ে গলায় বুড়ো বলে উঠল, 'আরে বণিকমশাই যে! কী মনে করে? আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক...' সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে হল-ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল অতিথিকে।

সের্গেই প্লাতোনভিচ মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল। বড় বড় লোকদের সম্মান দেখানোর এই কায়দাটা বহুকাল হল তার রপ্ত আছে। হল-ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। পাঁশনের তলায় চোখদুটো কুঁচকে তাকাতে তাকাতে তার দিকে এগিয়ে এলো ইয়েভ্‌গেনি লিস্ত্‌নিৎস্কি।

'বাঃ বেশ করেছেন, সের্গেই প্লাতোনভিচ! দেখে বড় খুশি হলাম! কী ব্যাপার? বুড়িয়ে যাচ্ছেন যেন, অ্যাঁ?'

'মোটেই না, মোটেই না ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ! আমার ত আশা আছে আপনার ওপরও টেক্কা মেরে বেঁচে যাব। তা আপনি কেমন আছেন? সুস্থ আছেন ত? সব ভালো?'

ইয়েভ্‌গেনি হাসল। হাসতে গিয়ে ঝলক দিয়ে উঠল তার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলো। হাত ধরে টেনে এনে অতিথিকে একটা চেয়ারে বসাল। একটা ছোট টেবিলের ধারে তারা বসল, ছোটখাটো কিছু কথাবার্তার বিনিময় চলতে লাগল দু'জনের মধ্যে, কথাবার্তা বলতে বলতে দু'জনেই দু'জনের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল শেষ যখন তাদের দেখা হয়েছিল তার পর কার কতটা চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে এবারে বুড়ো কর্তা ঘরে এসে ঢুকল। একটা বড় বাঁকানো পাইপ দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে ধোঁয়া ছাড়ছে সে। সের্গেই প্লাতোনভিচের চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জরাগ্রস্ত অস্থিসার লম্বা হাতের চেটোটা টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের গাঁয়ের হালচাল কী? শুনেছেন ত. . . সুখবর?'

সের্গেই প্লাতোনভিচ চোখ তুলে তাকাল, জেনারেলের নিখুঁত কামানো থুতনিতে ঝুলে থাকা মাংসের ভাঁজ আর ঘাড়টা ওপরে-নীচে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না শুনে আর উপায় কী?'

'কী মারাত্মক ভাবেই না আগে থেকে স্থির হয়ে ঘটনা এদিকে গতি নিল! . . .' ধোঁয়া গিলতে গিয়ে জেনারেলের কণ্ঠমণিটা কেঁপে উঠল। 'যুদ্ধের শুরুতেই আমি এটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। যাই বল না কেন. . . এ রাজবংশের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। আমার এখন মনে পড়ে গেল মেরেজ্‌কোভ্‌স্কির* কথা . . . মনে আছে তোর, ইয়েভ্‌গেনি? – 'পিওত্‌র ও আলেক্সেই'?** কথা বার করার জন্য যখন যুবরাজ আলেক্সেইয়ের ওপর নির্যাতন চলে তখন সে তার বাবাকে বলেছিল, 'আমার রক্ত তোমার বংশধরদের ওপর ঝরে পড়বে।''

'কিন্তু কী ঘটছে তা বোঝার মতো কিছুই ত আমাদের ওখানে পাওয়া যায় না,' উত্তেজিত হয়ে সের্গেই প্লাতোনভিচ বলল। চেয়ারে উস্‌খুস করে উঠল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে চলল, 'আজ এক হপ্তা হল খবরের কাগজের দেখা

---

* দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচ মেরেজ্‌কোভ্‌স্কি (১৮৬৬-১৯৪১) – রুশ লেখক। ধর্মীয় ও মরমী চিন্তাপ্রসূত উপন্যাসাদির লেখক। ১৯২০ সালে দেশান্তরী হন। – অনুঃ

** জার মহামতি পিওতরের পুত্র আলেক্সেই পেত্রোভিচ (১৬৯০-১৭১৮) – দুর্বলচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্তমনা আলেক্সেই পিতা পিওত্‌র প্রবর্তিত সংস্কারের বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেন। বিদেশে পলায়ন করেন। পরে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হলে তাঁর বিচার হয়, বিচারে তাঁর ওপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। কারাগারেই মারা যান। – অনুঃ

নেই। নানা রকমের অবিশ্বাস্য সব গুজব চলছে, তাতে বিভ্রান্তই হতে হয়। বাস্তবিকই কী বিপদ! ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ ছুটিতে বাড়ি এসেছেন শুনে ঠিক করলাম গিয়ে দেখা করে আসি, জিজ্ঞেস করে জানার চেষ্টা করি ব্যাপার-স্যাপার কী ঘটছে, কীই বা আশা করা যেতে পারে।'

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইয়েভ্‌গেনির নিখুঁত কামানো ধবধবে মুখের ওপর থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। সে বলল, 'মারাত্মক ঘটনা। . . . সৈন্যদের মনোবল আক্ষরিক অর্থে ভেঙে পড়েছে। লড়াই তারা করতে চায় না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, সাধারণ ভাবে সৈন্য বলতে যা বোঝায় এ বছর তার আর কিছুই নেই। তারা সব হয়ে উঠেছে গুণ্ডা-বদমাশ, একদল বুনো-বর্বর আর বেআদব। . . . এই ত বাবার কথাই ধরুন না কেন . . . উনি এটা ধারণাই করতে পারেন না। আমাদের আর্মির মনোবল যে কতদূর ভেঙে পড়েছে ওঁর পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। . . . খেয়ালখুশি মাফিক পজিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, লুঠতরাজ করছে, লোকজন খুন করছে, পল্টনের অফিসারদের খুন করছে, রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে। . . . সামরিক নির্দেশ না মানা আজকাল ত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।'

'মাছের পচন শুরু হয় মাথার দিক থেকে,' তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো লিস্তনিৎস্কি ছাড়ল।

'আমি কিন্তু তা বলব না,' ইয়েভ্‌গেনি ভুরু কোঁচকায়, শিরা-ওঠা একটা চোখের পাতা অস্থির ভাবে কাঁপতে থাকে। 'আমি তা বলব না। . . . আর্মির পচন শুরু হয়েছে নীচ থেকে, পচন ধরিয়েছে বলশেভিকরা। এমনকি কসাক ইউনিটগুলোও, বিশেষ করে যারা পায়দল সেপাইদের খুব কাছাকাছি তাদেরও মনোবল ঠিক অটুট নেই। লড়াই করে করে তাদের প্রচণ্ড ক্লান্তি ধরেছে, সেই সঙ্গে আছে বাড়ির প্রচণ্ড টান। . . . তার ওপর আছে বলশেভিকরা . . .'

'ওরা কী চায়?' সের্গেই প্লাতোনভিচ আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না।

'ওহ্! . . .' লিস্তনিৎস্কি কাষ্ঠহাসি হাসল। 'ওরা চায় . . . কলেরার জীবাণুর চেয়েও ওরা জঘন্য! জঘন্য এই অর্থে বলছি যে মানুষ সহজেই এর কবলে পড়ে, সৈন্যদের একেবারে ভেতরে গিয়ে ঢুকে বসে থাকে ওরা। আমি বলছি ওদের মতবাদের কথা। আলাদা করে রাখ আর যা-ই কর এ রোগের ছোঁয়াচ থেকে আর মুক্তি নেই। বলশেভিকদের মধ্যে প্রতিভাবান লোকজনও যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের কারও কারও সংস্পর্শে আসতেও হয়েছিল আমাকে। আবার একদল আছে যারা স্রেফ গোঁড়া, অন্ধ। তবে বেশির ভাগই হচ্ছে দায়-দায়িত্বহীন, নীতিজ্ঞানহীন লোকজন। বলশেভিক মতবাদের আসল কথা

নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সুযোগ পেলেই লুটপাট করা, ফ্রন্ট থেকে পালানো। তারা চায় সর্বোপরি ক্ষমতা দখল করতে, যে-কোন শর্তে এই যুদ্ধ – যাকে তারা নাম দিয়েছে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' – বন্ধ করে দিতে, এমনকি পৃথক সন্ধির শর্তেও ; তারপর জমি চাষীর হাতে আর কারখানা মজুরের হাতে তুলে দিতে। বলাই বাহুল্য পুরো ব্যাপারটা যেমন অবাস্তব কল্পনা তেমনি ডাহা মূর্খামিও। কিন্তু এরকম আদিম বস্তু দিয়েই সৈন্যদের মন জয় করা যায়।'

লিস্ত্‌নিৎস্কি বলে চলছিল ভেতরে ভেতরে একটা চাপা বিদ্বেষ নিয়ে। তার আঙুলের ফাঁকে নড়াচড়া করতে থাকে হাতির দাঁতের সিগারেট-হোল্‌ডারটা। সের্গেই প্লাতোনভিচ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এমন ভাবে শুনে যেতে থাকে যে মনে হয় এখনই বুঝি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবে। বুড়ো লিস্ত্‌নিৎস্কি তার সবুজাভ ধূসরবর্ণের গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে কালো লোমশ ফেল্‌ট-বুটের মশমশ আওয়াজ তুলে পায়চারী করতে থাকে হল-ঘরের মধ্যে।

এমনকি ক্যু-এর আগে ও কেমন করে রেজিমেন্ট ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল সে-কথাও বলল ইয়েভ্‌গেনি, তার ভয় ছিল কসাকরা প্রতিশোধ নেবে। পেত্রোগ্রাদের যে-সব ঘটনা সে নিজের চোখে দেখেছে তার কাহিনী বলল।

কথাবার্তায় কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো। তারপর সের্গেই প্লাতোনভিচের নাকের খাঁজের ওপর দৃষ্টি রেখে বুড়ো লিস্ত্‌নিৎস্কি জিজ্ঞেস করল, 'শরৎকালে আমাদের বইয়ারিনা ঘুড়ীর ছাইরঙা যে মদ্দা বাচ্চাটা দেখে গিয়েছিলে সেটা কিনবে কি?'

'এখন কি আর এসবের সময় নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ?' করুণ ভাবে ভুরু কোঁচকাল মোখভ, হতাশার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

এদিকে চাকরদের মহলে বসে বেশ মৌজ করে চা খাচ্ছিল ইয়েমেলিয়ান। একটা লাল রুমাল দিয়ে বীটের মতো লাল আভাধরা গালের ঘাম মুছতে মুছতে গ্রামের খবর বলছিল সে। একটা নরম শাল মুড়ি দিয়ে খাটের নক্সাকাটা বাজুতে বুক ঠেকিয়ে বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আক্সিনিয়া।

'আমাদের ঘরটা এতদিনে ধসে পড়েছে, তাই না?' আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'না, ধসে পড়বে কেন? খাড়া আছে। কী আর হবে ওটার?' প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে উচ্চারণ করে মর্মান্তিক উৎকণ্ঠার মধ্যে আক্সিনিয়াকে রেখে দিল সে।

'আমাদের পড়শি মেলেখভ্‌রা কেমন আছে?'

'আছে মোটামুটি।'

'পেত্রো ছুটিতে আসে নি?'

'আসে নি বলেই ত জানি।'

'আর গ্রিগোরি . . . ওদের গ্রিশ্‌কা?'

'গ্রিশ্‌কা এসেছিল বড়দিনের পর। গত বছর ওর বৌয়ের যমজ বাচ্চা হয়েছে। . . . আর গ্রিগোরি . . . বাড়ি এসেছিল ত বটেই . . . তবে জখম হয়ে।'

'জখম হয়েছিল?'

'তা নয়ত কী? হাতে চোট লেগেছিল। কামড়াকামড়ি করলে কুকুরের যেমন অবস্থা হয় ওর সারা গা তেমনি দাগড়াদাগড়া। ক্রুস বেশি না তলোয়ারের দাগ বেশি বোঝা দায়।'

'এখন দেখতে কেমন হয়েছে গ্রিশ্‌কা?' একটা শুকনো কান্নার আক্ষেপ গলার ভেতরে ঠেলে উঠতে ঢোক গিলল আক্সিনিয়া, কেশে ঠিক করে নিল বুজে-আসা গলাটা।

'আগের মতোই . . . বাঁকা নাক আর শামলা রং। আগাগোড়া একটা তুর্কী-যেমন হওয়ার কথা।'

'না না আমি সে কথা বলছি না। . . . বলছিলাম কি, বুড়িয়ে গেছে নাকি?'

'তা আমি কী করে জানব ছাই? তা একটু বুড়োটে হয়েছে হয়ত। বৌ যমজ বাচ্চা বিইয়েছে-তাই তেমন একটা বুড়োটে হবার কথা নয় তার।'

'বড্ড ঠাণ্ডা এখানে . . .' কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠে এই কথা বলে বেরিয়ে গেল আক্সিনিয়া।

আট বারের বার পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে আক্সিনিয়াকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল ইয়েমেলিয়ান। অন্ধ যেমন করে পা ফেলে সেই ভাবে ধীরে ধীরে একটা একটা করে শব্দের পিঠে শব্দ বসিয়ে বিড়বিড় করে সে বলল, 'বদগন্ধ নোংরা উকুন, যতদূর খারাপ হতে পারে। এই ত কিছুদিন আগেও বাপু চাষাড়ে জুতো পরে গাঁয়ের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে, এখন কিনা 'এখেনে' না বলে বলা হচ্ছে 'এখানে'! গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় এসব মাগী! . . . আমি হলে এই খান-কীগুলোকে . . . একটা কিলবিলে সাপ! জাহান্নামে যা! . . . 'বড্ড ঠাণ্ডা এখানে!' আহা কথা শোন! . . . মাদী ঘোড়ার শিকনি! আরে ছোঃ!'

এত বিরক্ত হয়ে গেল সে যে অষ্টমবারের পেয়ালাটা আর শেষ করতে পারল না। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে ক্রুস-প্রণাম করল, বেপরোয়া ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে ইচ্ছে করেই পরিষ্কার ধোওয়া-মোছা মেঝেটা জুতো দিয়ে নোংরা করতে করতে বাইরে চলে গেল।

ফেরার পথে প্রভুর মতোই সেও বেজার হয়ে রইল সারাক্ষণ। আক্সিনিয়ার ওপর যে রাগ তার হয়েছিল সেটা ঝাড়তে লাগল ঘোড়ার ওপরে। 'বাউণ্ডুলে' 'নেংচা' ইত্যাদি চোখা চোখা বিশেষণে তাকে ভূষিত করতে করতে চাবুকের ডগা

দিয়ে তার লজ্জাস্থানে সপাসপ বাড়ি মারতে লাগল। ইয়েমেলিয়ান আজ তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করল, পথে মনিবের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। সের্গেই প্লাতোনভিচও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে স্তব্ধতা রক্ষা করে চলল।

আট

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের* ঠিক আগে আগে কোন একটি পদাতিক ডিভিশনের দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে সংরক্ষিত এক নম্বর ব্রিগেড এবং তার সঙ্গে যুক্ত ২৭ নম্বর দন কসাক রেজিমেণ্টকে ফ্রণ্ট-লাইন থেকে তুলে আনা হল; রাজধানী পেত্রোগ্রাদ আর তার উপকণ্ঠে যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল তা দমন করার জন্য এদের কাজে লাগানোই এর উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিগেডটাকে সরিয়ে নেওয়া হল ফ্রণ্ট-লাইনের পেছনে, শীতের জামাকাপড় দেওয়া হল ব্রিগেডের সকলকে, একদিন বেশ করে খাওয়ানোদাওয়ানো হল, পরের দিনই গাড়ির কামরা বোঝাই করে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল মিন্‌স্ক অভিমুখে। কিন্তু ঘটনা এগিয়ে চলল আরও দ্রুতগতিতে। এমনকি যাত্রার দিনেই জোর গুজব শোনা যেতে লাগল যে সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তরে সম্রাট নাকি সিংহাসন ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে এক দলিলে সই করেছেন।

মাঝপথেই ফিরিয়ে আনতে হল ব্রিগেডটাকে। রাজ্‌গোন স্টেশনে ২৭ নম্বর রেজিমেণ্ট গাড়ি থেকে নামার নির্দেশ পেল। গাড়িতে গাড়িতে বোঝাই হয়ে আটকে আছে রেললাইন। প্ল্যাটফর্মে ঘোরাফেরা করছে সৈন্যদল। তাদের গ্রেটকোটের ওপর লাল ফিতে আঁটা, কাঁধে চমৎকার নতুন রাইফেল – বুশ ধাঁচের বটে, তবে ইংলণ্ডে তৈরি। সৈন্যদের অনেককেই উত্তেজিত দেখাল, তারা সতর্ক দৃষ্টিতে কসাকদের স্কোয়াড্রন সাজানো দেখতে লাগল।

মেঘলা দিন শেষ হয়ে আসছে। স্টেশনের দালানগুলোর ছাদ থেকে কলকল করে জল ঝরছে। রেললাইনের মাঝে মাঝে জল জমেছে, তেল চকচকে ডোবাগুলোর ওপর ভেড়ার পশমী চামড়ার মতো ধূসর তুলতুলে আকাশের ছায়া

* ১৯০৫-১৯০৭ সালের জারতন্ত্র উচ্ছেদকারী বিপ্লবের পর রাশিয়ায় দ্বিতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯১৭ সালের ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারী (বর্তমান পঞ্জী অনুযায়ী ৮-১২ মার্চ) সংঘটিত হয়। দেশের বিকাশের মূল সমস্যাসমূহ (স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ) সমাধানের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা, জারতন্ত্রের পররাষ্ট্র নীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতির ব্যর্থতা (যুদ্ধে পরাজয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ) এই বিপ্লবের কারণ। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। – অনুঃ

পড়েছে। ইঞ্জিনগুলো শান্টিং করার গর্জন চাপা আর ক্ষীণ শোনাচ্ছে। একটা গুদামঘরের পেছনে ব্রিগেড-কম্যাণ্ডারকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে কসাক রেজিমেণ্টটা ঘোড়ায় চড়ে সারি বাঁধল। ঘোড়াগুলোর পা খুরের ওপরকার লোম পর্যন্ত ভিজে গেছে, সেখান থেকে ধোঁয়ার মতো ভাপ উঠছে। কাকগুলো নির্ভয়ে সারিটার পেছনে এসে বসল, ঘোড়ার নাদ ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল, ঠোকরাতে লাগল।

রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে একটা কালো কুচকুচে ঘোড়ায় চেপে কসাকদের কাছে এগিয়ে এলো ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার। ঘোড়ার মুখের রাশ টেনে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল স্কোয়াড্রনগুলোকে। তারপর দস্তানা-খোলা হাতটা অস্থির ভাবে নাড়াতে নাড়াতে একটা একটা করে যেন কথা ঠেলতে লাগল; অনিশ্চিত চাপা গলায় সে বলতে শুরু করল, 'জেলার কসাক-ভাইরা! জনগণের ইচ্ছায় সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাইয়ের রাজত্বের . . . অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ . . . পতন হয়েছে। শাসনক্ষমতা এসেছে স্টেট-দুমার সাময়িক কমিটির হাতে। আর্মিকে এবং সেইসঙ্গে তোমাদেরও এই সংবাদ শান্ত ভাবে . . . অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ . . . মেনে নিতে হবে। . . . কসাকদের কাজ হল বাইরের . . . অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ . . . মানে, বাইরের শত্রুর হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা। যে-গণ্ডগোল শুরু হয়েছে আমরা তা থেকে দূরে সরে থাকব, বে-সামরিক জনসাধারণ নিজেরাই নতুন সরকার গড়ার পথ বেছে নিক। আমাদের উচিত হবে দূরে সরে থাকা! যুদ্ধ আর রাজনীতি আর্মির পক্ষে বেমানান। . . . এই রকম তোলপাড়ের সময় . . . যখন সমস্ত কিছুর . . . অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ . . . ভিত নড়ে ওঠে, তখন আমাদের কঠোর হতে হবে . . .' এই পর্যন্ত বলে বক্তৃতায় অনভ্যস্ত, অপদার্থ বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল আমতা-আমতা করতে লাগল, একটা লাগসই উপমা হাতড়াতে লাগল; তার ভুরু কুঁচকে উঠল, তৈলচিক্কণ মুখের ওপর ফুটে উঠল বলতে-না-পারার যন্ত্রণা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল স্কোয়াড্রনগুলো। '. . . কঠোর হতে হবে . . . অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ . . . ইস্পাতের মতো। কসাক হিশেবে তোমাদের সামরিক কর্তব্য হল নিজেদের ওপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলা। আমরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করব বীরের মতো, যেমন আমরা আগেও করেছি। কিন্তু এখানে, ওই পেছনে . . .' পেছনের দিকে হাত দিয়ে ঝেঁটানোর ভঙ্গি করে সে বলল, 'স্টেট-দুমাই নির্ধারণ করুক দেশের ভাগ্য। আগে লড়াই শেষ করে আসি, তারপর আমরাও অংশ নেব দেশের অভ্যন্তরীণ জীবনে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমাদের . . . অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ . . . তা করা উচিত হবে না। আর্মিকে আমরা দিয়ে দিতে পারি না। . . . আর্মিতে রাজনীতির কোন স্থান থাকতে পারে না!'

এখানে, এই স্টেশনেই কয়েক দিন পরে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল

সাময়িক সরকার।* সেনাবাহিনীর লোকজনে স্টেশন গিজগিজ করছে। তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে সাময়িক সরকারের লোকেরা স্থানীয় লোকজন নিয়ে বড় বড় দল করে জমায়েত হতে লাগল, মিটিং করতে লাগল। শেষকালে সভাসমিতিতে যে বক্তৃতা তারা শুনেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল, প্রতিটি সন্দেহজনক কথা মনে করে করে বোঝার চেষ্টা করল। সকলের মনেই কেন যেন এই প্রত্যয় জন্মেছে যে স্বাধীনতা যদি এসেই থাকে তার অর্থ হবে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া। এই ধারণা ওদের মনের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে উঠল। ফলে রাশিয়ার কর্তব্য যে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া একথা তাদের বুঝিয়ে বলা অফিসারদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

ক্যু-এর পর সেনাবাহিনীর ওপরের মহলে যে-বিভ্রান্তি পেয়ে বসেছিল, তার প্রভাব নীচের মহলেও দেখা দিল। অর্ধেক পথে একটা ডিভিশন যে আটকে পড়ে আছে সে কথা, তার অস্তিত্বই যেন বিলকুল ভুলে বসে আছে ডিভিশনের সদর দপ্তর। ইতিমধ্যে ব্রিগেডকে যে আট দিনের রসদ দেওয়া হয়েছিল, সৈন্যরা তা খেয়ে শেষ করে বসে রইল। তারা এখন দঙ্গল বেঁধে ধারেকাছের গ্রামে-গঞ্জে হানা দিতে লাগল, কোথা থেকে যেন বাজারে চোলাই মদ বিক্রি শুরু হয়ে গেল, নিম্নপদস্থ ও উচ্চপদস্থ মাতাল অফিসার এক নৈমিত্তিক দৃশ্য হয়ে দাঁড়াল।

স্থানান্তরের ফলে নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষেত্র থেকে ছিটকে পড়েছে কসাকরা, কামরার ভেতরে থেকে থেকে তাদের হাঁপ ধরে গেল, কবে তাদের দন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে তারই জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তারা। দ্বিতীয় দফার সংরক্ষিত দলটিকে ভেঙে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই মর্মে একটা গুজব ইতিমধ্যে বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। ঘোড়াগুলোকে যত্ন করার ব্যাপারে তাদের আর তেমন মনোযোগ নেই, ভর সন্ধে পর্যন্ত সারাটা দিন কাটাতে লাগল বাজারের চত্বরে ঘুরে ঘুরে। ফ্রন্ট-লাইনে আসার সময় জার্মান কম্বল, সঙিনের ফলা, করাত, গ্রেটকোট, চামড়ার মিলিটারী ব্যাগ, তামাক – এক কথায়, বিক্রি করার উপযোগী যা যা অতিরিক্ত জিনিস হাতে পেয়েছিল, সব বেচতে শুরু করে দিল।

অবশেষে ফ্রন্টে ফিরে যাওয়ার হুকুম এসেছে শুনে সৈন্যদের মধ্যে প্রকাশ্য অসন্তোষ শুরু হয়ে গেল। দু'নম্বর স্কোয়াড্রনটি যেতে প্রায় অস্বীকারই করল। কসাকরা গাড়িতে ইঞ্জিন জুড়তে দেবে না। কিন্তু রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার যখন

* ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর সংগঠিত সরকার। সংখ্যালঘু বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আর পেত্রোগ্রাদ পরিষদের নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমে সাবেকী রাষ্ট্রীয় দুমা বা আলোচনাসংস্থার প্রতিনিধিরা এখানে স্থান পান। – অনুঃ

তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে বলে হুমকি দিল, তখন এই উত্তেজনাও থিতিয়ে এলো, সকলে শান্ত হয়ে গেল। মিলিটারী ট্রেনগুলো যাত্রা করল ফ্রন্টের দিকে। ট্রেনের কামরাগুলোর ভেতরে কথাবার্তা চলতে লাগল।

'এসব কী ব্যাপার ভাই? 'স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা' খুব বলা হচ্ছে, অথচ যুদ্ধের বেলায়? – তার মানে আবার সেই খুন ঝরবে?'

'আবার সেই পুরনো প্যাঁচ শুরু হয়েছে!'

'তাহলে জার কোন্ অপরাধ করেছিল? জারকে সরানো হল কেন?'

'জারের আমলে যতটা ভালো থাকা আমাদের উচিত ছিল এখনও ততটাই ভালো থাকব আমরা। . . .'

'একই পায়জামা, এপিঠ-ওপিঠ যেদিক থেকে খুশি ঘুরিয়ে পর।'

'যা বলেছ!'

'আর কদ্দিন চলবে এরকম? . . .'

'আজ তিন বছর হয়ে গেল ঘাড় থেকে রাইফেল নামার নাম নেই!'

কোন একটা জংশন স্টেশনে কসাকরা কামরা ছেড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল: দেখে মনে হল যেন আগে থেকেই এই জন্য তারা গোপনে গোপনে তৈরি হয়ে ছিল। রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারের অনুনয়-বিনয়, হুমকি, কোনটাতেই কান না দিয়ে তারা এক মিটিং শুরু করে দিল। কসাকদের ধূসর গ্রেটকোটের জটলার মাঝখানে ঘুরে ঘুরে প্রবীণ স্টেশন-মাস্টার আর কম্যাণ্ডাণ্ট বৃথাই তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে কামরায় ফিরে যাবার জন্য অনুনয়-বিনয় করল। কসাকরা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের এক সার্জেন্টের বক্তৃতা শুনল। এর পর বক্তৃতা দিতে উঠল মান্‌জুলভ নামে বেঁটেখাটো সুন্দর গড়নের এক কসাক। তার ফেকাসে-রঙ-ধরা মুখটা ক্রোধে বেঁকে গেছে, কষ্ট করে ভেতর থেকে সে উগড়ে দিতে লাগল জ্বালাময়ী শব্দগুলো।

'কসাক-ভাইসব! এমন চলতে দেওয়া যায় না! ফের আমাদের সব কিছু গুলিয়ে দিয়েছে ওরা। আমাদের ধোঁকা দেওয়ার মতলবে আছে! বিপ্লব যদি হয়েই থাকে, সবাইকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েই থাকে, তাহলে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া উচিত, কেননা লোকে যুদ্ধ চায় না, আমরা কসাকরাও চাই না! হক কথা বলছি কিনা? ঠিক বলেছি?'

'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!'

'চুলোয় যাক!'

'আমাদের সবার জেরবার হয়ে গেল!'

'আরে পেন্টলুনই খসে পড়ার জো . . . কিসের লড়াই?'

'লড়াই চা-আ-ই না!'

'বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমরা!'

'ইঞ্জিন খুলে দাও! চল্‌ ত রে ফেদোত!'

'ভাইসব একটু অপেক্ষা কর। দাঁড়াও! ও কসাক-ভাইরা, শুনছ? শয়তানে পেল নাকি তোমাদের? বলি, তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেল নাকি? . . . ও ভাই!' হাজার লোকের গলার ওপর গলা চড়ানোর চেষ্টায় প্রাণপণ চিৎকার করে বলল মান্‌জুলভ। 'দাঁড়াও বলছি। ইঞ্জিন ধরো না! ইঞ্জিনে আমাদের কোন কাজ নেই। আসল ব্যাপার হল এই ধোকাবাজী। . . . আমাদের মহামান্য রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার কাগজপত্তর দেখান – আমরা দেখতে চাই সত্যি সত্যিই ফ্রন্টে আমাদের ডাক পড়েছে, নাকি এটা নেহাৎই ওদের একটা খামখেয়াল?'

রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার আত্মসংবরণ করতে পারল না। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল, রেজিমেন্টকে ফ্রন্টে তলব করে যে-টেলিগ্রাম ডিভিশন কর্তৃপক্ষ তাকে পাঠিয়েছিল উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে সেটা পড়ে শোনাল সে। একমাত্র তার পরই কসাকরা ট্রেনে উঠতে রাজী হল।

একই কামরায় চলেছে তাতার্‌স্কি গ্রামের ছয়জন কসাক – সকলেই ২৭ নম্বর রেজিমেন্টের। পেত্রো মেলেখভ, মিশ্‌কা কশেভয়ের আপন খুড়ো নিকলাই কশেভয়, আনিকুশ্‌কা, ফেদোত বদভ্‌স্কোভ, জিপসীদের মতো দেখতে কালো কোঁকড়ানো দাড়ি আর হাল্কা খয়েরি রঙের খেপাটে চোখ মের্কুলভ; সেই সঙ্গে কোর্‌শুনভ্‌দের প্রতিবেশী মাক্সিম্‌কা গ্রিয়াজ্‌নোভ – চরিত্রহীন, ফুর্তিবাজ স্বভাবের কসাক সে, যুদ্ধের আগে সারা জেলায় একজন ডাকসাইটে ঘোড়াচোর বলে তার কুখ্যাতি ছিল। কসাকরা সারাক্ষণ তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে: 'এই মের্কুলভটাকে ঘোড়াচোর বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যায় – জিপসীদের মতো দেখতে, হুবহু মিলে যায় . . . কিন্তু ও ঘোড়া চুরি করে না। এদিকে মাক্সিমের কাণ্ডটা দেখ – ঘোড়ার লেজটা চোখে পড়ল কি অমনি তেতে উঠল!' মাক্সিম্‌কা একথায় লাল হয়ে ওঠে, তিসিফুলের মতো নীল চোখদুটো কুঁচকে উত্তরে কদর্য ঠাট্টা করে বলে, 'মের্কুলভের মা'র সঙ্গে একটা জিপসী রাত কাটিয়েছিল, তাইতে আমার মা'র হয়ত হিংসে হয়ে থাকবে – নইলে এপথে আমি কস্মিনকালে যেতাম না . . . মরে গেলেও না! . . .'

কামরার ভেতরে মুখোমুখি হাওয়া এসে হুটোপুটি খাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে ঘোড়ার জাবনা-পাত্র বানানো হয়েছে, তারই ধারে ঢাকনা-গায়ে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কামরার মাঝখানে জমে-যাওয়া মাটির ঢিবির ওপর কাঁচা কাঠের ধোঁয়া উঠছে, ঝাঁঝাল ধোঁয়া ভাসতে ভাসতে দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কসাকরা জিন পেতে আগুনের চারপাশে বসেছে, বুটের ভেতরে জড়িয়ে পরার ন্যাকড়ার

ফালিগুলো ঘামে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ছে – সেগুলোকে তারা শুকিয়ে নিচ্ছে। ফেদোত বদভ্স্কোভ তার বাঁকাবাঁকা খালি পাদুটো আগুনে সেঁকছে। তার কাল্মিক ধাঁচের তেকোনা মুখের ওপর ফুটে উঠেছে পরিতৃপ্তির হাসি। গ্রিয়াজ্নোভ জুতো-সেলাইয়ের সুতো দিয়ে তার জুতোর ছেঁড়া তলিটা চটপট সেলাই করছে। বিশেষ কাউকে লক্ষ না করে তামাকের ধোঁয়াচ্ছন্ন খসখসে গলায় সে বিড়বিড় করে চলেছে।

'. . . যখন ছোট ছিলাম তখন শীতের সময় আমি শুতাম উনুনের ওপর বিছানা পেতে। আমার ঠাকুমা (তখনই তার বয়স একশ' পেরিয়ে গেছে) হাতড়ে হাতড়ে আমার মাথার উকুন বাছতে বাছতে বলত, 'ওরে মাক্সিম্কা, সোনা আমার! আগেকার দিনে মানুষ এখনকার মতো কাটাত না – তারা জীবন কাটাত বেশ ভালো ভাবে, আইনমাফিক চলত তারা, তাই কোন বিপদ-আপদও তাদের হত না। কিন্তু তুই দাদু, বড় হয়ে বেঁচে থেকে দেখবি এমন একটা সময় আসছে যখন গোটা দুনিয়াটা ঢাকা পড়ে যাবে তারে, নীল আকাশে উড়তে থাকবে লোহার নাকওয়ালা পাখি, কাকে যেমন তরমুজ ঠুকরে খায় মানুষ তেমনি মানুষকে ঠোকরাবে। আকাল আর মহামারী লেগে যাবে, ভাই ভাইয়ের বিপক্ষে যাবে, ছেলে যাবে বাপের বিপক্ষে। . . . আগুন লাগার পর ঘাসের অবস্থা যেমন হয় মানুষও ঠিক ততটুকুই থাকবে।' সে ত দেখাই যাচ্ছে. . .' একটু থেমে মাক্সিম আবার বলল, 'আসলে তা-ই ঘটতে চলেছে। টেলিগ্রাফ বার করেছে – সে-ই হল তোমার তার! আর লোহার পাখি – সে হল এরোপ্লেন। আমাদের জাত ভাইদের কম ঠুকরেছে নাকি? আর দুর্ভিক্ষ? – তাও হবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় আমার লোকেরা অর্ধেক জমিতে ফসল বুনছে, প্রত্যেক গেরস্থেরই এই অবস্থা। গাঁয়ে রয়ে গেছে শুধু বুড়ো আর কচি বাচ্চারা। ফলন না হলেই টের পাবে 'আকাল' কাকে বলে।'

'কিন্তু ওই যে বললে ভাই যাবে ভাইয়ের বিপক্ষে – এটা কেমন যেন উদ্ভট, তাই না?' আগুনটা উস্কে দিতে দিতে মেলেখভ জিজ্ঞেস করল।

'রোসো না, তাও ঘটবে।'

'সরকার-টরকার টিকবে না, ওরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরবে,' ওদের কথার মাঝখানে বলল ফেদোত বদভ্স্কোভ।

'তখন আবার ব্যাটাদের ঠাণ্ডা করতে আমাদেরই ডাক পড়বে।'

'আরে বাপু তুই আগে জার্মানদেরই সুজুত কর্ না,' হাসতে হাসতে বলল কশেভয়।

'নয়ই বা কেন? আরও কিছুটা লড়াই চালিয়ে যেতে পারি. . .'

মেয়েমানুষের মতো মাকুন্দা মুখখানা ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে কুঁচকে আনিকুশ্‌কা বলে উঠল, 'রানীমার লোমশ শ্রীচরণে মাথা ঠেকাই, আর কত কাল আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারি বলতে পার?'

'যতদিন না তোমার গালে লোম গজায়, ব্যাটা হিজড়ে,' টিটকিরি দিয়ে বলল কশেভয়।

ওরা সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। ধোঁয়া গলায় গিয়ে বিষম লেগে যেতে খক খক করে কাশতে লাগল পেত্রো। জলভরা চোখে আনিকুশ্‌কার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল তাকে।

'লোম . . . ওটা একটা বাজে জিনিস . . .' থতমত খেয়ে বিড়বিড় করে বলল আনিকুশ্‌কা। 'যেখানে দরকার নেই সেখানে জন্মায়। . . . অমন পা নাচানোর কোন অর্থ হয় না কশেভয়। . . .'

'না না আর নয়! সহ্যের একটা সীমা আছে!' হঠাৎ ফুঁসে উঠল গ্রিয়াজ্‌নোভ। 'আমরা এখানে দুর্দশা ভোগ করছি, উকুনের কামড় খেয়ে মরছি, ওদিকে আমাদের বাড়ির লোকেরা অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাও আবার কী সাঙ্ঘাতিক! কাটলে এক ফোঁটাও রক্ত বেরোবে না।'

'তুমি অমন ক্ষেপে উঠলে কেন হঠাৎ?' গমরঙের গোঁফ চিবুতে চিবুতে ঠাট্টার ভঙ্গিতে পেত্রো জিজ্ঞেস করল।

'ক্ষেপে ওঠে কী আর সাধে? . . .' কোঁকড়ানো জিপসী-দাড়ির আড়ালে হাসিটুকু ভালোমতো গোপন করে গ্রিয়াজ্‌নোভের হয়ে উত্তর দিল মের্কুলভ। 'দেখতেই ত পাচ্ছ, কসাকদের কেমন বিরক্তি ধরে গেছে, বাড়ির জন্যে তাদের প্রাণ কেমন কাঁদছে। . . . এ হল সবুজ মাঠে রাখালের গোরু চরানোর মতো – রোদের তাপে শিশির যখন সবে শুকোতে শুরু করেছে তখনও কিছু নয় – গোরু বাছুরগুলো ঠিকই থাকে, ঘাস খায়; কিন্তু সূর্য যেই মাথার ওপর উঠল, অমনি ডাঁশের ভনভনানি শুরু হয়ে গেল, গোরুগুলোকে অস্থির করে তুলল – এখানেও তেমনি। . . .' মের্কুলভ ধূর্তের মতো চোখ তুলে দৃষ্টিবাণ হানল কসাকদের ওপর, তারপর পেত্রোর দিকে ঘুরে বলতে শুরু করল, 'তখনই ত গোরুগুলোর মধ্যে হাম্বা হাম্বা ডাক পড়ে যায় সার্জেন্ট-মশাই। সে ত তুমি নিজেই জান! তুমি ত আর কলমপেশা বাবু নও। নিজেই তুমি লেজে পাক দিয়ে কত গোরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছ। অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা বাছুর হয়ত লেজ গুটিয়ে পিঠে তুলে হাম্বা ডাক ছাড়ল – তারপর যা ছুটটা দিল! তার পেছন পেছন ছুটল গোটা পালটা। রাখাল ছোটে, থামাবার জন্য 'এই এই' করে চেঁচায়। কিন্তু কিসের কী? গোরুর পাল বানের জলের মতো হুহু করে ছুটতে থাকে, যেমন আমরা নেজ্‌ভিস্কাতে

বানের জলের মতো ছুটেছিলাম জার্মানদের দিকে – তার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। সেখানে তুমি তাদের আটকাবে কী করে?'

'এসব কথার অর্থ কী?'

মের্কুলভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। আলকাতরার মতো কালোরঙের দাড়ির গোছা আঙুলে জড়িয়ে নির্মম ভাবে টান মারল। তার মুখে আর সেই হাসি নেই। এবারে সে শান্ত ভাবে বলল, 'আজ তিন বছর হল আমরা যুদ্ধ করছি . . . তাই ত? তিন বছর হয়ে গেল আমরা ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে আছি। কিসের জন্যে, কেন? কেউ বলতে পারে না। তাই আমি বলি কি আজ হোক কাল হোক কোন এক গ্রিয়াজ্‌নোভ কিংবা মেলেখভ ফ্রন্ট থেকে কেটে পড়বে, তার পেছন পেছন কাটবে রেজিমেন্ট, রেজিমেন্টের পেছন পেছন পুরো আর্মি। এটা ঘটবেই!'

'এই তাহলে কথা! . . .'

'হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই বলতে চাইছি! আমি অন্ধ নই, দেখতে পাচ্ছি সব কিছু ঝুলছে একটা সরু সুতোয়। কেউ শুধু একটু চেঁচিয়ে বললেই হল: 'ব্যস্!' – সঙ্গে সঙ্গে সব খসে পড়বে, কাঁধ থেকে পুরনো কোর্তা যেমন খসে পড়ে। যুদ্ধের এই তৃতীয় বছরে আমাদের এখানেও যেন সূর্য মাথার ওপর উঠেছে।'

'তুমি একটু রয়ে সয়ে বলতে পারতে বাপু!' বদভ্‌স্কোভ উপদেশ দিল। 'আমাদের পেত্রো আবার সার্জেন্ট-মেজর কিনা!'

'কোন বন্ধুর আমি কখনও অপকার করি নি,' পেত্রো জ্বলে ওঠে।

'আরে রাগ করছ কেন? ঠাট্টা করে বললাম আর কি।' বদভ্‌স্কোভ থতমত খেয়ে যায়। খালি-পায়ের গাঁট-গাঁট আঙুলগুলো এদিক-ওদিক নাড়ায়, তারপর পায়ের চটাস চটাস আওয়াজ করতে করতে ঘোড়ার জাবনার দিকে এগিয়ে গেল।

এক কোনায়, চেপে-সমান-করা কতকগুলো খড়ের গাঁটরির কাছে চাপা গলায় কথা বলছিল অন্যান্য গ্রামের কিছু কসাক। তাদের মধ্যে মাত্র ফাদেয়েভ ও কার্গিন – এই দু'জনেই ছিল কার্গিন্‌স্কি গ্রামের, বাকি সাতজন বিভিন্ন গ্রাম ও জেলার লোক।

কিছুক্ষণ পরে ওরা গান ধরল। চির-নদী অঞ্চলের কসাক আলিমভ – সে-ই হল মূল গায়েন। একটা নাচের গান ধরতে গিয়েছিল সে, কিন্তু কে যেন তার পিঠে এক থাবড়া বসিয়ে কর্কশ গলায় গর্জন করে উঠল, 'আঃ থামাও!'

'এই বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানোরা, আগুনের ধারে চলে এসো!' কশেভয় ওদের আমন্ত্রণ জানাল। ধুনির ভেতরে কিছু কাঠের ছিলকে ফেলে দেওয়া হল (একটা ছোট স্টেশন থেকে ভেঙে নেওয়া বেড়ার অবশিষ্টাংশ)। আগুনের আঁচ উঠতে গানও জমে উঠল:

অভিযানের কোন্ এক ঘোড়া চিঁহি চিঁহি ডাকে,
গির্জাঘরের দ্বারের কাছে তৈয়ার হয়ে, কাকে?
আঙ্গিনাতে কাঁদছে বুড়ি, সঙ্গে তাহার নাতি।
যোবতী বৌ চোখের জলে খাচ্ছে হুটোপুটি।
ভজনঘরের পবিত্র দ্বার ঠেলে
আসছে কসাক ত্রস্ত চরণ ফেলে,
বধূ তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরে,
ভাইপো দিল বর্শা হাতে তুলে।...

পাশের কামরায় অ্যাকর্ডিয়ান বাজছে, কসাক-নাচের ওপর হাপরের ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়ছে। কাঠের মেঝের ওপর নির্মম ভাবে আছড়াচ্ছে সরকারের দেওয়া বুটের হিল। কে যেন বিশ্রী গলায় গাঁক গাঁক করে গাইছে:

কী করুণ এ জীবন! আহা বড় দায়!
জারের জোয়াল-কাঁধে প্রাণটা যে যায়!
কসাকের গর্দান গেল কেটে ছড়ে-
স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে সে কী করে?
দন দেশে পুগাচিওভ-করে সে জাহির
ভাটির এলাকা ছেয়ে বাণী মুক্তির:
'আতামান, কসাকেরা হও আগুয়ান!...'

অন্য আরেকজন প্রথম জনের গলা ছাপিয়ে, বিকট সুর চড়িয়ে দ্রুত উচ্চারণে ফেটে পড়ল:

জারের সেবায় মোরা বড় নিষ্ঠাবান,
বৌ ছেড়ে আঁকুপাঁকু করে যে পরান।
সয়ে যাব সেই ব্যথা-পেয়ে যাব মাগ।
তখন জারেরে... মোরা লাগাব যা তাক!
ওরে ঢাল, জ্বালা ওরে, জ্বালা রে আগুন!
বল্ আহা, হাস্ হাহা, হিহি-হোহো সবে!

তাতারস্কির কসাকদের গান অনেকক্ষণ হল থেমে গেছে, ওরা কান পেতে শুনতে লাগল পাশের কামরার হৈ-হুল্লোড় সমানে বেড়ে চলেছে। কসাকরা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল, সমবেদনার ভঙ্গিতে হাসল। পেত্রো মেলেখভ আর সংযত থাকতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠল।

'ওঃ দ্যাখ কাণ্ড, শয়তান ভর করেছে ওদের কাঁধে!'

মের্কুলভের হলুদ ছিটের ফুলকি-ঝরা খয়েরি চোখদুটো খুশিতে ঝলমল করে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, তালটা ধরার চেষ্টা করল। বুটজুতোর ডগা দিয়ে জনারের মিহি দানা ঢালার মতো আওয়াজ তুলে তাল ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ দুম্ করে পা আছড়ে আলগোছে বসে পড়ে স্প্রিং-য়ের মতো স্বচ্ছন্দে বোঁ করে একটা পাক খেল। এরপর একে একে সবাই পালা করে নাচল – হাত-পা নাড়াচাড়া করতে শরীরও গরম হল সকলের। পাশের কামরায় কিন্তু ততক্ষণে বাজনা থেমে গেছে, এখন সেখান থেকে ভেসে আসছে কর্কশ গলার প্রচণ্ড গালিগালাজ। এদিকে এই কামরায় তাতার্স্কির লোকেরা বেদম নাচ চালিয়ে যাচ্ছে, নাচের হুল্লোড়ে ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠছে। নাচতে নাচতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে একবার উদ্ভট জটিল ভঙ্গি করে একপাক ঘুরতে গিয়ে আনিকুশ্কা যখন দড়াম করে আগুনের ওপর চিত্পাত হয়ে পড়ে গেল একমাত্র তখনই ওদের নাচ থামল। হো-হো করে হাসতে হাসতে সকলে ধরাধরি করে আনিকুশ্কাকে তুলল, মোমবাতির পোড়া টুকরোর আলোর কাছে ধরে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার নতুন পাত্লুনটা – পেছনটা পুড়ে ঝাঁই হয়ে গেছে, তুলোয় ঠাসা গরম কোর্তার কিনারাগুলোও ঝলসে গেছে আগুনে।

'পাতলুনটা খুলে ফেল হে!' সমবেদনার সুরে তাকে পরামর্শ দিল মের্কুলভ।

'বলিস কী জিপ্সী! মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কী পরে থাকব তাহলে আমি?'

মের্কুলভ জিনের থলে হাতড়ে মেয়েদের পরনের একটা মোটা কাপড়ের সায়া বার করল। আবার আগুনটাকে উসকে দিল ওরা। মের্কুলভ পেছনে হেলে সরু কাঁধের দুটো পাশ ধরে পোশাকটা তুলে দেখাল, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তার হাসিটা কাতরানির মতো শোনাল।

'এই যে! . . . ওঃ! ওঃ! স্টেশনে বেড়ার গা থেকে ঝেড়ে দিয়েছি। . . . জুতোর ভেতরে জড়িয়ে পরার ন্যাকড়া করব বলে রেখে দিয়েছিলাম। . . . ওঃ! কিন্তু এখন আর ছিঁড়ব না! . . . নিয়ে নাও!'

আনিকুশ্কাকে জোরজার করে সায়াটা পরাতে গেলে সে গালিগালাজ করতে লাগল। তাতে সকলে আনন্দে ডগমগ হয়ে মোটা গলায় এত জোরে হেসে উঠল যে আশেপাশের কামরাগুলোর দরজা থেকে কৌতূহলী কসাকরা মাথা গলিয়ে ঈর্ষামেশানো স্বরে অন্ধকারের মধ্যে হেঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী তোমাদের?'

'ঘোড়ার মাথা!'

'তোমাদের অত ফুর্তিটা কিসের?'

'রাঁড়-মাগীদের জারগুলো কোন নতুন খেলার খোঁজ পেয়েছে বুঝি?'

পরের স্টেশনে সামনের কামরা থেকে অ্যকর্ডিয়ান-বাজিয়েকে টেনে নিয়ে এলো ওরা, আর সব কামরা থেকেও কসাকরা এসে পিলপিল করে জুটল সেখানে, তাদের ঠেলাঠেলিতে ঘোড়ার জাবগুলো ভেঙে গেল, ঘোড়াগুলোকে তারা ঠেলে দিল দেয়ালের ধারে। মাঝখানের ছোট্ট গোল জায়গাটার মধ্যে আনিকুশ্‌কা তার খেল দেখাতে লাগল। সাদা সায়াটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোন বিশাল চেহারার মেয়েমানুষের হবে। আনিকুশ্‌কার গায়ে ওটা বেশ বড় হয়েছে, তার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু লোকের হাসির হুল্লোড়ে উৎসাহিত হয়ে সে নেচে চলেছে। নাচতে নাচতে যখন একেবারে হয়রান হয়ে পড়ল একমাত্র তখনই ক্ষান্ত দিল।

এদিকে রক্তে-ভেজা বেলোরুশিয়ার মাথার ওপর গভীর শোকে অশ্রুপাত করে চলে তারারা। রাতের আকাশের কালিমা গভীর হাঁ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভেসে চলেছে। ঝরাপাতা, ভ্যাপসা পচা কাদা আর মার্চ মাসের বরফ মেশানো উগ্র গন্ধে ভরপুর মাটির বুকে হুটোপুটি খাচ্ছে বাতাস।

নয়

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রেজিমেণ্ট আবার ফ্রণ্টের কাছাকাছি চলে এলো। একটা জংশন স্টেশনে মিলিটারী-ট্রেনগুলো থেমে গেল। সার্জেণ্ট-মেজররা ঘুরে ঘুরে ট্রেন থেকে নামার নির্দেশ দিল। কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মের ওপর তক্তা ফেলে দিতে কসাকরা তার ওপর দিয়ে চটপট ঘোড়াগুলোকে নামিয়ে নিয়ে এলো। তারপর জিন চাপানো হল তাদের ওপর। তাড়াহুড়োয় অনেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র কামরায় ভুলে ফেলে এসেছিল, এখন সেগুলোর জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেল, এলোমেলো খড়ের গাদাগুলো সরাসরি লাইনের মাঝখানের ভিজে বালির ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। দস্তুরমতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল সকলে।

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের আর্দালি পেত্রো মেলেখভকে ডেকে বলল, 'স্টেশন-ঘরে যাও, কম্যাণ্ডার ডাকছেন।'

গ্রেটকোটের বেল্‌টটা ঠিকঠাক করে নিয়ে ধীরেসুস্থে পেত্রো পা বাড়াল প্ল্যাটফর্মের দিকে। আনিকুশ্‌কা ঘোড়াগুলোর পাশে পাশে চলছিল। পেত্রো যাবার সময় তাকে বলে গেল, 'আমার ঘোড়াটাকে একটু দেখো আনিকেই।'

আনিকুশ্‌কা কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখল পেত্রোকে চলে যেতে। অমনিতেই তার মুখটা গোমড়া, কিন্তু আজ তার মুখে স্বাভাবিক বিষণ্ণতা

ও ক্লান্তির সঙ্গে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা উদ্বেগের ভাব। এঁটেল গেরিমাটি আর জলকাদা ছিটে নোংরা হয়ে গেছে পেত্রোর বুটজোড়া, সেই দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে সে চিন্তা করতে লাগল কী এমন কারণ ঘটতে পারে যার জন্য রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের কাছে তার তলব পড়ল। পেত্রোর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল একটা ছোটখাটো দলের ওপর। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে ফুটন্ত জলের একটা বালতির কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। এগিয়ে যেতে দূর থেকেই তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল পেত্রো। জনা বিশেক সৈন্য জোয়ানগোছের কটা-চুল এক কসাককে ঘিরে আছে। লোকটা বালতির দিকে পিঠ করে যে ভাবে জবুথবু হয়ে উদ্ভট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে তার ওপর দিয়ে বেশ একচোট গেছে। পেত্রো গলা বাড়িয়ে দেখতে পেল খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির জঙ্গলে ঢাকা একটা অস্পষ্ট চেনা-চেনা মুখ। '৫২' সংখ্যা লেখা সার্জেণ্টের নীল কাঁধপটি লাগানো, কসাক রক্ষিবাহিনীর এই কটা-চুল লোকটাকে কবে কোথায় যেন দেখেছে বলে পেত্রোর মনে হল।

'কী করে এমন দুর্বুদ্ধি মাথায় এলো তোমার? তার ওপর আবার সার্জেণ্টের পটি সেলাই করা তোমার কাঁধে...' মুখে মেছেতার দাগওয়ালা চালাক চতুর চেহারার একজন স্বেচ্ছাসৈনিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে জেরা করতে শুরু করেছে কটা-চুল কসাকটাকে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে হিংস্র উল্লাস।

'কী ব্যাপার?' সামরিক বাহিনীর যে স্বেচ্ছাসেবীটি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল তার কাঁধে হাত দিয়ে কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করল পেত্রো। লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে উত্তর দিল, 'পল্‌টন থেকে কেটে পড়ার তালে ছিল।... তোমাদের কসাকদেরই একজন।'

স্মরণশক্তির ওপর আরও জোর খাটিয়ে পেত্রো মনে করার চেষ্টা করল কোথায় দেখেছে আতামান রক্ষিদলের কটা-গোঁফ, কটা-ভুরু চওড়া মুখের এই সেপাইটিকে। মিলিটারীর স্বেচ্ছাসেবী লোকটার খোঁচামারা প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আতামান রক্ষিবাহিনীর সেপাইটি গোলার খোল কেটে তৈরি একটা তামার মগে করে নির্বিকার চিত্তে এক ঢোক এক ঢোক করে গরম জল খাচ্ছে আর শুকনো কালো সেঁকা রুটি জলে ভিজিয়ে চিবুচ্ছে। চোখজোড়ার মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান। ড্যাবডেবে চোখদুটো কুঁচকে আছে, রুটি চিবুতে চিবুতে আর ঢোকে ঢোকে জল গিলতে গিলতে সে ভুরু নাচাচ্ছে, কখনও নীচে কখনও বা এপাশে-ওপাশে তাকাচ্ছে। তার পাশে রাইফেলের সঙীন বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার একজন সৈনিক – তাকে পাহারা দিচ্ছে। মগের জলটুকু নিঃশেষে পান করার পর আতামান রক্ষিবাহিনীর ধরাপড়া কসাকটা ক্লান্ত চোখ

মেলে তাকাল। সৈন্যদের মুখের দিকে তাকাতে যখন দেখতে পেল যে তারা অভদ্র ভাবে তাকেই নিরীক্ষণ করছে, তখন তার শিশুর মতো সরল নীল চোখদুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল, কঠিন হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে জিভ চাটল, তারপর এতটুকু ভেঙে না পড়ে কর্কশ ভারী গলায় চিৎকার করে বলল, 'তামাসা দেখতে এসেছ নাকি? শালা শুয়োরের বাচ্চা সব, তোমাদের জ্বালায় কি কিছু গেলারও উপায় নেই! কখনও কোন মানুষ দেখ নি?'

সৈন্যরা হেসে উঠল। ঠিক এই সময়, সচরাচর যেমন ঘটে থাকে, লোকটার গলা কানে যেতে না যেতেই আশ্চর্যরকম স্পষ্ট তাকে চিনতে পারল পেত্রো – আতামান রক্ষিদলের এই কসাকটি ইয়েলান্‌স্কায়া জেলা সদরের বুবেজিন গ্রামের লোক, ফোমিন তার পদবী; ইয়েলান্‌স্কায়ায় বছরে একবার করে যে মেলা বসে, যুদ্ধেরও আগে একবার সেখানে তিনবছুরে একটা এঁড়ে বাছুর নিয়ে পেত্রো আর তার বাবার সঙ্গে লোকটার দরকষাকষি হয়েছিল।

'ফোমিন! ইয়াকভ ফোমিন!' ভিড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল পেত্রো।

হতভম্ব হয়ে আনাড়ির মতো ভঙ্গি করে লোকটা বালতির গায়ে মগটা নামিয়ে রেখে দিল, চিবুতে চিবুতে কুণ্ঠাজড়িত হাসি-হাসি চোখে পেত্রোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে ত চিনতে পারলাম না ভাই . . .'

'তোমার বাড়ি বুবেজিনে না?'

'হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। তোমার বাড়ি কি তাহলে ইয়েলান্‌স্কায়া জেলায়?'

'আমার বাড়ি অবশ্য ভিওশেন্‌স্কায়ায়, কিন্তু আমার মনে আছে তোমার কথা। বছর পাঁচেক আগে আমি আর আমার বাবা মেলায় তোমার কাছ থেকে একটা এঁড়ে বাছুর কিনেছিলাম।'

সেই আগের মতোই শিশুসুলভ সরল ও বিমূঢ় হাসি ফোমিনের মুখে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'নাঃ, মনে করতে পারলাম না . . . মনে করতে পারছি না তোমাকে,' স্পষ্ট দুঃখের সঙ্গেই সে বলল।

'বায়ান্ন নম্বরে ছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'পল্‌টন ছেড়ে পালাচ্ছিলে? কেন এ কাজ করতে গেলে ভাই?'

এই সময় ভেড়ার চামড়ার টুপিটা মাথা থেকে খুলে তার ভেতর থেকে জরাজীর্ণ একটা বটুয়া বার করল ফোমিন। ঝুঁকে পড়ে টুপিটা বগলে গুঁজল, সিগারেট পাকানোর জন্য কাগজের একটা কোনা ছিঁড়ে নিল; একমাত্র তখনই

তার জলে-ভেজা কাঁপা-কাঁপা চকচকে চোখের কঠোর দৃষ্টি যেন বিঁধে ফেলল পেত্রোকে।

'আর সইতে পারলাম না ভাই...' অস্ফুটস্বরে সে বলল।

লোকটার চোখের দৃষ্টির খোঁচা খেয়ে পেত্রো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, হলদেটে গোঁফজোড়া মুখে পুরে চিবুতে লাগল।

'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে দেশোয়ালী ভাইরা, আর কথা নয়। শেষকালে তোমাদের জন্য আমাকে আবার ফেসাদে না পড়তে হয়,' গাঁট্টাগোট্টা পাহারাদার সেপাইটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্দুক কাঁধে তুলে বলল, 'আচ্ছা এবারে চল দেখি বাপ!'

ফোমিন তড়বড় করে মিলিটারী-থলির ভেতরে মগটা গুঁজে ফেলল, অন্য দিকে তাকিয়েই বিদায় নিল পেত্রোর কাছ থেকে; ভালুকের মতো থপথপ করে হেলেদুলে পা বাড়াল কম্যাণ্ডাণ্টের অফিসের দিকে।

স্টেশনে, আগে যেখানে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ক্যান্টিন ছিল, সেখানে রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার আর দু'জন স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার একটা ছোট টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে।

'তুমি আমাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ মেলেখভ।' বিরক্তিভরে ক্লান্ত চোখদুটো পিটপিট করল কর্ণেল।

পেত্রো জানতে পারল যে তার স্কোয়াড্রনটা ডিভিশন কর্তৃপক্ষের হেফাজতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তার অবশ্যকর্তব্য হবে কসাকদের ওপর কড়া নজর রাখা, তাদের মতিগতির যে-কোন রকম পরিবর্তন চোখে পড়লে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের গোচরীভূত করতে হবে। অপলক দৃষ্টিতে কর্ণেলের চোখের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল পেত্রো, কিন্তু ফোমিনের জলে-ভেজা কাঁপা-কাঁপা দৃষ্টি আর অস্ফুটস্বরে বলা সেই কথাগুলো 'আর সইতে পারলাম না ভাই...' তার স্মৃতিতে দৃঢ়সংলগ্ন হয়ে গেঁথে রইল।

ভাপ-ওঠা গরম স্টেশন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো পেত্রো, ফিরে চলল তার স্কোয়াড্রনের কাছে। এখানে স্টেশনের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় দলের সার বাঁধা গাড়ি। নিজের কামরায় আসতে আসতে পেত্রো রেজিমেন্টের গাড়ির সহায়ক ইউনিটের কসাকদের আর স্কোয়াড্রনের কামারকে দেখতে পেল। কামারের ওপর চোখ পড়ামাত্র ফোমিন আর ওর সঙ্গে সেই কথাবার্তা পেত্রোর স্মৃতি থেকে বেরিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, ঘোড়ার খুরে নতুন নাল পরানো সম্পর্কে কামারের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে সে তার পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। এই মুহূর্তে প্রত্যহের উদ্বেগ ও আশঙ্কা আবার অধিকার করে বসল পেত্রোর মন। কিন্তু এমন সময় একটা লাল কামরার কোনা থেকে বেরিয়ে এলো একজন

স্ত্রীলোক। একটা নরম তুলতুলে সাদা পশমের সুন্দর ওড়না তার গায়ে জড়ানো। পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক এই অঞ্চলের মেয়েদের মতো নয়। দেহের ভঙ্গিটি আশ্চর্য পরিচিত, তাই পেত্রো মন দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ না করে পারল না। স্ত্রীলোকটি হঠাৎ তার দিকে মুখ ঘোরাল, বয়সের তুলনায় উচ্ছল তনুদেহের স্নিগ্ধ হিল্লোল তুলে কাঁধ দোলাতে দোলাতে তারই দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল। মুখটা চিনতে পারার আগেই পা ফেলার হালকা লীলায়িত ভঙ্গি দেখে পেত্রো তার বৌকে চিনতে পারল। একটা তৃপ্তিকর চিনচিনে ঠাণ্ডার আমেজ তার হৃৎপিণ্ডে এসে পৌঁছাল। ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত হওয়ায় আনন্দের মাত্রাটাও রীতিমতো প্রবল হয়ে উঠল। গাড়ির ইউনিটের যারা তাকে লক্ষ করছে তারা যাতে মনে না করে যে তার বিশেষ আনন্দ হয়েছে সেই জন্য ইচ্ছে করেই পায়ের গতি মন্থর করে দিয়ে পেত্রো এগিয়ে গেল। সংযত ভঙ্গিতে সে তার বৌকে জড়িয়ে ধরল, তিন বার চুমু খেল তাকে, কী যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল তাকে, কিন্তু অন্তরের গভীর উত্তেজনা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো। ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, তার মুখ দিয়ে বাক্য সরল না। শেষকালে আমতা-আমতা করে বলল, 'আশা করি নি . . .'

'তুমি কেমন পালটে গেছ গো! কোথায় যেন একটা বদল হয়ে গেছে তোমার! . . .' দারিয়া গালে হাত দিয়ে বলল। 'তোমাকে কেমন যেন পর-পর লাগছে। . . . দেখছ, তোমাকে দেখার জন্যেই এলাম। বাড়ির ওরা কেউ আসতে দেবে না আমাকে। . . . বলে, 'যাবে কী করে?' আমি ভাবলাম, না, যাবই, আমার আপনজনের সঙ্গে দেখা করবই। . . .' স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভেজা-ভেজা চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তড়বড় করে সে বলে চলল।

ইতিমধ্যে কামরাগুলোর সামনে কসাকদের ভিড় জমে উঠেছে। ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে তারা গলা খাঁকারি দিল, মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল, নিজেদের ভাগ্যের কথা ভেবে তাদের মুখগুলো থমথমে হয়ে উঠল।

'ভাগ্য আজ পেত্রোর দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। . . .'

'আমার নেকড়ে-মাগীটা আর আসছে না, অন্য কোথাও আস্তানা গেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'কী দরকার একজনকে দিয়ে, যখন দশজনকে নিয়ে মজা লুটতে পারছে!'

'আহা মেলেখভটা যদি এক রাতের জন্য ওর বৌকে বন্ধুদের দিতে পারত! . . . আমাদের দুর্দশা দেখে ওর মায়াও হয় না! . . . হুম্!'

'চল হে, চল সব! ওর শরীরের সঙ্গে কেমন লেপটে আছে দেখলেও মাথায় রক্ত ছুটে যায়!'

সেই মুহূর্তে পেত্রো ভুলে গেল যে বৌকে মারাত্মক ভাবে মেরে শায়েস্তা করবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। লোকজনের সামনে সে তাকে আদর করল, তামাকের ছোপ ধরা মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দারিয়ার ছবির মতো ভ্রূধনুতে হাত বুলাল, উল্লসিত হয়ে উঠল সে। দারিয়াও ভুলে গেল যে মাত্র দু'রাত আগে ড্রাগুন-দলের এক ভেটেরিনারি-কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে একটা রেলের কামরায় সে রাত কাটিয়ে এসেছে। ভেটেরিনারি-কম্পাউণ্ডারটি দারিয়ার সঙ্গে একই কামরায় খার্কভ থেকে ফিরছিল তার রেজিমেণ্টে। লোকটার গোঁফজোড়া ছিল অস্বাভাবিক রকমের কালো আর ঝাঁকড়া। . . . কিন্তু সে ত দু'রাত আগেকার ঘটনা। এখন অকৃত্রিম আনন্দে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অকপট স্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল সে।

দশ

ছুটি থেকে ফেরার পর মেজর ইয়েভ্গেনি লিস্ত্নিৎস্কি ১৪ নম্বর দন কসাক রেজিমেণ্টে যোগদানের নির্দেশ পেল। যেখানে সে আগে চাকরী করত সেই পুরনো রেজিমেণ্ট থেকে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের আগেই বড় লজ্জাজনক উপায়ে তাকে পালিয়ে যেতে হয়, তাই সেখানে না ফিরে সে সোজা চলে গেল ডিভিশনের সদর দপ্তরে। সদর দপ্তরের প্রধান ডাকসাইটে অভিজাত দন-কসাক পরিবারের ছেলে এক অল্পবয়সী কসাক। সহজেই সে তার বদলির ব্যবস্থা করে দিল।

নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে একান্তে ডেকে নিয়ে লিস্ত্নিৎস্কিকে সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি মেজর, পুরনো পরিবেশে কাজ করতে আপনার অসুবিধে হবে, কেননা কসাকরা আপনার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে আছে, তাদের কাছে আপনার নামটাই একটা অভিসম্পাত; তাই বলাই বাহুল্য, আপনার পক্ষে বিশেষ বিচক্ষণতার কাজ হবে যদি চৌদ্দ নম্বর রেজিমেণ্টে চলে যান। সেখানে বেশ ভালো ভালো বাছাই করা অফিসাররা আছে, তাছাড়া যে-সমস্ত কসাক সেখানে আছে তারা বেশ শক্ত চরিত্রের, একটু ভোঁতা ধরনের – বেশির ভাগই উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসা মহকুমার দক্ষিণের নানা জেলা-সদরের লোক। সেখানে গেলে আপনি ভালো থাকবেন। আপনি নিকলাই আলেক্সেয়েভিচের ছেলে, তাই না?' একটু চুপ করে থাকার পর জেনারেল জিজ্ঞেস করল। কথার সমর্থন পেয়ে প্রসঙ্গের জের টেনে বলে চলল, 'আমার দিক থেকে আমি আপনাকে এই বলে আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার মতো অফিসারদের আমরা মূল্য দিয়ে থাকি। আজকাল অফিসারদের মধ্যে পর্যন্ত

বেশির ভাগ লোক সুবিধাবাদী। নিজের বিশ্বাসকে বদল করার চেয়ে, কিংবা একই সঙ্গে দুই ভগবানের পুজো করার চেয়ে সোজা কাজ আর কিছু নেই,' তিক্তকণ্ঠে সদর দপ্তরের প্রধান তার বক্তব্য শেষ করল।

লিস্তনিৎস্কি সানন্দে গ্রহণ করল এই বদলির প্রস্তাব। সেই দিনই সে রওনা দিল দ্‌ভিন্‌স্কে, যেখানে আছে ১৪ নম্বর রেজিমেণ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার কর্ণেল বীকাদোরভের সামনে সে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করল। ডিভিশনের সদর দপ্তরের প্রধান যে তাকে ঠিক কথাই বলেছে তা জানতে পেরে সে খুশি হল। এখানকার বেশির ভাগ অফিসারই রাজতন্ত্রী। কসাকদের এক-তৃতীয়াংশ আবার উস্ত্-খোপিওর্‌স্কায়া, কুমিল্‌জেন্‌স্কায়া, গ্লাজুনোভ্‌স্কায়া ও অন্যান্য জেলার সনাতন ধর্মমতাবলম্বীদের দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। তাদের মতিগতি আদৌ বিপ্লবাত্মক নয়। সাময়িক সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ তারা নিয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছায়। চারপাশের উত্তাল ঘটনাপ্রবাহ বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই, বুঝতে তারা চায়ও না। যারা একটু নিরীহ আর তোষামুদে ধরনের সেই সব কসাকই রেজিমেণ্ট-কমিটি আর স্কোয়াড্রন-কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছে। . . . নতুন পরিবেশে এসে আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লিস্তনিৎস্কি।

অফিসারদের মধ্যে এমন দু'জনের সাক্ষাৎ পেল যাদের সঙ্গে এর আগে আতামান রক্ষী-রেজিমেণ্টে কাজ করেছে সে। এরা আর সকলের চেয়ে বিশিষ্টতা রক্ষা করে চলত। বাকি সকলের মধ্যে বেশ মিলমিশ আর ঐক্য আছে, রাজবংশের পুনঃস্থাপন নিয়ে তারা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে।

প্রায় দু'মাস ধরে দ্‌ভিন্‌স্কে বিশ্রাম নেওয়ার পর রেজিমেণ্টটা নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে একটিমাত্র বজ্রমুষ্টির মতো সংহত হয়ে উঠল। এর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্কোয়াড্রনগুলো রিগা থেকে দ্‌ভিন্‌স্ক পর্যন্ত ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এপ্রিলে কোন একজন মনোযোগী লোকের হাতে পড়ে সবগুলো স্কোয়াড্রন এক হয়েছে – রেজিমেণ্ট এখন দস্তুরমতো প্রস্তুত। অফিসারদের কঠোর তত্ত্বাবধানে কসাকরা ট্রেনিং নেয়, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ায়, বাইরের সমস্ত রকম প্রভাব থেকে দূরে সরে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন কাটায়।

রেজিমেণ্টটা আসলে যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে এ সম্পর্কে কসাকদের মধ্যে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। কিন্তু অফিসাররা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াত যে অদূর ভবিষ্যতে কোন এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির শক্ত হাতে পড়ে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেবে তাদের এই রেজিমেণ্টটা।

কাছেই ফ্রণ্ট। সেখানকার অবস্থা করুণ। মারাত্মক উত্তেজনার বিকারে আর্মি ধুঁকছে। সামরিক সরবরাহের ঘাটতি, খাদ্যদ্রব্যের অভাব। সৈন্যেরা লক্ষ লক্ষ হাত

বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে 'শান্তি' নামে এক ভৌতিক শব্দকে। দেশের সাময়িক শাসনকর্তা কেরেন্‌স্কির* প্রতি সৈন্যদের মনোভাব বিমিশ্র ধরনের। তবে তার ক্ষিপ্ত বকুনি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল জুন আক্রমণের** পথে। সেখানে এসে হোঁচট খেল তারা। সৈন্যদের মধ্যে যে ক্রোধ দানা বেঁধে উঠেছিল, ভূগর্ভের উষ্ণ প্রস্রবণের তাড়নায় উচ্ছ্বসিত ঝরনার জলের মতো তা গলে টগবগ করতে লাগল।

এদিকে দ্‌ভিন্‌স্কে কসাকরা শান্ত নির্বিঘ্ন জীবন কাটাচ্ছে। তাদের ঘোড়াদের পাকস্থলীতে দিব্যি যই আর মকাই জীর্ণ হচ্ছে। ফ্রন্টে যে কষ্ট তাদের ভুগতে হয়েছিল কসাকদের স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে তার ঘা শুকিয়ে যেতে লাগল। অফিসাররা নিয়মমাফিক তাদের ক্লাবে হাজির হয়, খানাপিনাও মন্দ হয় না, রাশিয়ার ভাগ্য নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলে তাদের মধ্যে।

এই ভাবে কাটল জুলাইয়ের প্রথম কয়েক দিন পর্যন্ত। তিন তারিখে নির্দেশ এলো 'এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে এগিয়ে যাও!' রেজিমেন্টের গাড়িগুলো পেত্রোগ্রাদের দিকে এগোতে শুরু করল। সাতই জুলাই তারিখেই রাজধানীর কাঠ-বিছানো ঘোড়া-চলা-পথের ওপর কসাকদের অশ্বখুরের খটাখট আওয়াজ উঠল।

নেভ্‌স্কি এভিনিউয়ের বাড়িগুলোতে রেজিমেন্ট আস্তানা গাড়ল। লিস্তনিৎস্কির স্কোয়াড্রনের জায়গা হল কোন এক বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের একটা খালি বাড়িতে। সকলে অধীর হয়ে সানন্দে কসাকদের জন্য অপেক্ষা করছিল – কসাকদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট বাড়িগুলো শহরের কর্তৃপক্ষ আগে থেকে যেরকম যত্ন করে সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছেন সেটাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নতুন চুনকাম করা দেয়ালগুলো ধবধব করছে, মেঝেগুলো ঝকঝক তকতক করছে, ধোওয়া-মোছা মেঝেগুলো, কাঠের বাঙ্কগুলো নতুন বানানো হয়েছে – সেগুলো থেকে কাঁচা পাইন কাঠের গন্ধ ভেসে

---

* আলেক্সান্দর ফিওদরভিচ কেরেন্‌স্কি (১৮৮১-১৯৭০) – রুশ রাজনীতিকর্মী, আইনজীবী। চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার শ্রমদল নামে পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উপদলীয় নেতা। ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী। সাময়িক সরকারে প্রথমে আইনমন্ত্রী এবং পরে সমর ও নৌমন্ত্রী হন। অবশেষে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ অধিকার করেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত বিরোধী বিদ্রোহের সংগঠক। বিদেশে পলায়ন করেন। – অনুঃ

** ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে রুশ সেনাবাহিনীর আক্রমণের ঘটনা। বুর্জোয়া সাময়িক সরকার তার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য এবং জনসাধারণের উপর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বলশেভিকদের প্রভাব দুর্বল করার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তির দাবিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। জুলাই মাসে অস্ট্রো-জার্মান সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতে রুশবাহিনীর পরাভব ঘটে। তার ফলে মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। – অনুঃ

আসছে। আধা মাটির নীচের তল-কুঠুরিগুলোও আলোবাতাস-খেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় আরামেরই বলা যেতে পারে। চোখ কুঁচকে পিঁশনে চশমার ফাঁক দিয়ে দালানের ভেতরটা বেশ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লিস্ত্‌নিৎস্কি, চোখধাঁধানো সাদা ঝকঝকে দেয়ালের পাশ দিয়ে খানিকটা হাঁটল, শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এলো যে এর চেয়ে আরামের, ভালো ব্যবস্থা আর হতে পারে না। কসাকদের অভ্যর্থনার ভার পড়েছে পুরপ্রতিষ্ঠানের এক বেঁটেখাটো ফিটফাট জামাকাপড় পরা প্রতিনিধির ওপর। তাকেই সঙ্গে নিয়ে বাড়িঘরদোর দেখার পর সন্তুষ্ট হয়ে আঙিনার দরজার দিকে পা বাড়াল লিস্ত্‌নিৎস্কি, ঠিক এই সময় ঘটে গেল একটা অপ্রীতিকর ঘটনা। দরজার হাতলটা সে ধরেছে, এমন সময় দেখতে পেল ছুরি বা ওই জাতীয় ধারাল কোন জিনিস দিয়ে কে যেন নিপুণ হাতে দেয়ালের গায়ে আঁচড় কেটে এঁকে রেখেছে একটা ছবি – একটা কুকুর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আছে, সেই সঙ্গে একটা ঝাঁটা। বোঝাই যাচ্ছে দালানকোঠা সাজানোর কাজে যে মজুরেরা ছিল তাদের কোন একজন এর তাৎপর্যটা জানত। . . .

'এটা কী?' পুরপ্রতিষ্ঠানের যে প্রতিনিধিটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল ভুরু নাচিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল লিস্ত্‌নিৎস্কি।

ইঁদুরের মতো ছটফটে চোখদুটো ছবিটার ওপর দ্রুত বুলিয়ে নিল সে, ভয়ঙ্কর ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তার মুখের ওপর এত প্রচুর পরিমাণে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল যে মনে হল তার শার্টের কড়া কলপ দেওয়া কলারটাতেও বুঝি গোলাপরঙ ধরেছে: 'মাফ করবেন মেজর . . . কোন শয়তানের কারসাজি . . .'

'আশা করি আপনার অজ্ঞাতেই এখানে ওপ্রিচ্‌নিকের* চিহ্ন আঁকা হয়েছে?'

'কী যে বলেন! কী যে বলেন! সে আর বলতে! . . . এ হল বলশেভিকদের চালাকি। . . . হতভাগা পাজীটার কী আস্পর্ধা! এক্‌খুনি দেয়াল ফের চুনকাম করতে বলে দিচ্ছি। কী সাঙ্ঘাতিক! মাফ করবেন . . . এমন একটা ঘটনা, যার কোন মাথামুণ্ডুই বুঝতে পারছি না। . . . বিশ্বাস করুন এই ইতরামির জন্য আমার নিজেরই কেমন লজ্জা লাগছে। . . .'

লজ্জায় অপমানে বিমূঢ় এই কর্মচারীটির অবস্থা দেখে বাস্তবিকই মায়া হল লিস্ত্‌নিৎস্কির। তার হিমশীতল অকরুণ দৃষ্টিতে কিছুটা প্রসন্ন ভাব দেখা দিল। সংযত ভাবে সে বলল, 'শিল্পী তার হিসাবে একটা ছোটখাটো ভুল করে বসেছে – কসাকরা ত আর রুশ ইতিহাস জানে না। তবে তাই বলে এ জাতীয় মনোভাবের

---

* জার ভয়ঙ্কর ইভানের রাজত্বকালে 'ওপ্রিচ্‌নিক' নামে পরিচিত তাঁর কুখ্যাত নৃশংস দেহরক্ষীদের ঘোড়ার জিনে কুকুরের মাথা আর ঝাঁটা লাগানো থাকত। এর অর্থ হল জারের শত্রুদের ওপর তারা দাঁত বসিয়ে দেবে, ঝেঁটিয়ে তাদের উৎখাত করবে। – অনুঃ

উৎসাহ আমরা দিতে পারি না।' কর্মচারীটি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেয়ালের সামনে দাঁড়াল, সযত্নে কাটা শক্ত নখ দিয়ে চুনকাম-করা দেয়াল থেকে চেঁছে তুলতে লাগল ছবিটা, দেয়ালের চুন মিহি সাদা ধুলোর মতো তার গায়ের দামী বিলিতি ওভারকোটটার ওপর এসে জমতে লাগল, পোশাকটা নোংরা করে দিল। লিস্ত্‌নিৎস্কি তার পিঁশনে-চশমার কাচ মুছতে মুছতে মৃদু হাসল, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা তিক্ত বিরক্তিকর বিস্বাদে ছেয়ে গেল তার মনটা।

'এই ত এই ভাবেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছে আমাদের। বাইরের এত চাকচিক্যের আড়ালে যা লুকিয়ে আছে তা তাহলে এই! . . . সারা রাশিয়ার কাছে কি তাহলে আমাদের পরিচয় ওপ্রিচ্‌নিক?' উঠোনের ওপর দিয়ে পা ফেলে আস্তাবলের দিকে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল লিস্ত্‌নিৎস্কি। পুরসভার কর্মচারীটি দ্রুত পায়ে তার পেছন পেছন আসতে আসতে যে-সব কথা বলে যাচ্ছিল উদাসীন ভাবে, বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে সেগুলো শুনে যেতে লাগল সে।

আঙিনায় গভীর প্রশস্ত ইঁদারার ভেতরে তেরছা হয়ে পড়ছে সূর্যের কিরণ। আশেপাশের বহুতল ঘরবাড়ির জানলাগুলো থেকে ঝুঁকে পড়ে বাসিন্দারা কসাকদের দেখছে। সারা উঠোনটা ছেয়ে গেছে কসাকদের ভিড়ে – স্কোয়াড্রনের লোকজন আস্তাবলে তাদের ঘোড়াগুলো রাখছে। যে-সমস্ত কসাকের কাজ শেষ হয়ে গেছে তারা হাত-পা-ঝাড়া হয়ে ছোট ছোট দঙ্গল বেঁধে দেয়ালের ধারে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা উবু হয়ে বসে আছে।

'কী হল, তোমরা ঘরের ভেতরে যাচ্ছ না যে?' লিস্ত্‌নিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'এখনও অনেক সময় আছে হুজুর।'

'ওখানেও হাঁপিয়ে উঠতে হবে।'

'ঘোড়াগুলোকে আগে ঠিকমতো আস্তাবলে ওঠাই, তারপর যাব।'

আস্তাবল হিশেবে ঠিক করা গুদামঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লিস্ত্‌নিৎস্কি। তারপর পুরপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সঙ্গের সেই কর্মচারীটার প্রতি আগেকার বিদ্বেষের ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় তার দিকে ফিরে কঠোর স্বরে বলল, 'যার সঙ্গে পারেন যোগাযোগ করে আরেকটা দরজা কেটে বার করুন। নইলে আমাদের চলবে না। একশ' কুড়িটা ঘোড়ার জন্যে তিনটে দরজা – এ চলে না। কোন বিপদ দেখা দিলে ঘোড়াগুলোকে বার করতে আধ ঘণ্টা লেগে যাবে আমাদের। . . . তাজ্জব ব্যাপার! আগে থাকতে এটা কেউ খেয়াল করতে পারল না! বিষয়টা রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারকে জানাতে বাধ্য হব আমি।'

একটি নয়, দু'-দুটি দরজা সেইদিনই কেটে বার করা হবে তৎক্ষণাৎ সেই আশ্বাস পাওয়ার পর লিস্ত্‌নিৎস্কি লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিল। ঝামেলা

পোহানোর জন্যে শুষ্ককণ্ঠে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিনের বেলায় ঘরবাড়ি তদারকের লোকজন নিয়োগ করতে বলে দোতলায় স্কোয়াড্রনের অফিসারদের জন্য সাময়িক ভাবে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলল। খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গায়ের ফৌজী শার্টের বোতাম খুলল সে, টুপির কানাতের তলা থেকে ঘাম মুছল। দালানের ভেতরে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার আমেজ উপলব্ধি করে খুশিতে ভরে উঠল তার মনটা। ক্যাপ্টেন আতারশ্চিকভ ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না।

'আর সকলে গেল কোথায়?' ধুলোবালি ভরা বুটজুতোসুদ্ধ পাদুটো ধপ্ করে ফেলে ক্যাম্পখাটের ওপর আছড়ে পড়ে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'বাইরে গেছে। পেত্রোগ্রাদ দেখতে বেরিয়েছে।'

'তুমি যাও নি যে?'

'ধুৎ, কোন মানে হয়! আসতে না আসতেই শহর দেখার জন্যে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়া! কয়েকদিন আগে এখানে যা ঘটে গেছে তারই বৃত্তান্ত আমি পড়ছি। বেশ লাগছে কিন্তু!'

লিস্তনিৎস্কি চুপচাপ শুয়ে রইল, পিঠের কাছে অনুভব করতে লাগল ঘামে ভেজা শার্টের ঠাণ্ডা আমেজ। পথ চলার ধকলে সে এতই ক্লান্ত যে উঠে হাতমুখ ধুতেও তার আলস্য লাগছিল। শেষকালে নিজের ওপর একরকম জোর খাটিয়েই সে উঠে পড়ল, তার আর্দালিকে ডাকল। ভেতরের জামাকাপড় বদলাল, অনেকক্ষণ ধরে হাতমুখ ধুল, ভালো করে নাক ঝাড়ল, রোঁয়া-তোলা তোয়ালে দিয়ে রোদে পুড়ে ছাই-ছাই রঙ-ধরা ঘাড়টা আগাগোড়া ঘষে ঘষে মুছল।

'হাতমুখ ধুয়ে ফেল ভানিয়া, দেখবে কেমন ঝরঝরে লাগবে,' আতারশ্চিকভকে পরামর্শ দিল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তা খবরের কাগজে কী লিখছে শুনি?'

'না, হাতমুখ ধোওয়াটাই বোধহয় ঠিক হবে। মন্দ নয়–বলছ? . . . খবরের কাগজে কী আছে জিজ্ঞেস করছ? বলশেভিকরা কী করছে তার রিপোর্ট, সরকারী ব্যবস্থা . . . পড়েই দেখ না।'

হাতমুখ ধুয়ে মেজাজ খুশ হওয়ার পর লিস্তনিৎস্কি পড়ার জন্য কাগজটা নিতে যাবে, এমন সময় রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের কাছে তার ডাক পড়ল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠল সে, কাচা নতুন শার্ট গায়ে দিল। তলোয়ার এঁটে নিয়ে নেভ্স্কি এভিনিউতে বেরিয়ে পড়ল সে। রাস্তা পার হওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে স্কোয়াড্রনের বাসস্থানটা ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বাইরে থেকে দেখতে গেলে আশেপাশের আর দশটা বাড়ির সঙ্গে বাড়িটার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পাঁচতলা দালান। পাথরের টালি বসানো, ওই রকমই আর সব দালানের সঙ্গে একই সারির। একটা সিগারেট ধরিয়ে লিস্তনিৎস্কি ধীরে ধীরে

এগিয়ে চলল ফুটপাত ধরে। পুরুষদের সোলার টুপি, ডেকচি-মার্কা টুপি, কাপড়ের টুপি, মেয়েদের সাদাসিধে মার্জিত রুচির আর বাহারে টুপির ঘন ভিড় ফেনায়িত হয়ে উঠছে। একাকার এই বন্যার মাঝখানে কদাচিৎ ভেসে উঠছে কোন সৈনিকের মাথার টুপির গণতান্ত্রিক সবুজ চাপড়া, পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে বিচিত্রবর্ণের ঝলকের মধ্যে।

সমুদ্রের দিক থেকে প্রাণ-জুড়ানো তাজা মৃদুমন্দ বাতাস ভেসে আসছে, কিন্তু বিশাল বিশাল দালানকোঠার কঠিন স্তূপের গায়ে ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো তরল প্রবাহে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অনুজ্জ্বল আকাশটা ইস্পাতের মতো দেখাচ্ছে, বেগনী আভা ধরেছে তাতে। আকাশের গায়ে মেঘ ভাসতে ভাসতে চলেছে দক্ষিণের দিকে। দুধের মতো সাদা মেঘের ঝুঁটিগুলো দেখতে দাঁতের মতো ধারাল, জায়গায় জায়গায় উঁচুনীচু। শহরের বুকে একটা ভ্যাপসা গুমোট চেপে বসেছে - আসন্ন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। রাস্তার তেতে-ওঠা পিচ, পোড়া পেট্রোল, কাছের সমুদ্র, মেয়েদের গায়ের গন্ধদ্রব্যের উত্তেজনাকর মৃদু গন্ধ আর যে-কোন জনবহুল শহরের বৈশিষ্ট্যসূচক, নানা জাতের গন্ধের বিশ্লেষণাতীত মিশ্রণ বাতাস ভারী করে তুলেছে।

সিগারেট টানতে টানতে ফুটপাতের ডান দিক ধরে ধীর পদক্ষেপে চলেছে লিস্তনিৎস্কি। থেকে থেকে অনুভব করছে সামনা-সামনি যে-সব লোক পড়ে যাচ্ছে তারা আড়চোখে সসম্ভ্রমে তার দিকে দৃষ্টিপাত করছে। গোড়ায় কোঁচকান জামা আর ময়লা টুপিটার জন্য তার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা লাগছিল, কিন্তু পরে ভেবে দেখল বাইরের চেহারার জন্য সঙ্কোচ করা ফ্রন্টলাইনের একজন লোকের আদৌ সাজে না, বিশেষত তার নিজের ত নয়ই - সবে আজ সে ট্রেন থেকে নেমেছে।

দোকান আর কাফেগুলোর ঢোকার মুখে মাথার ওপর তেরপলের শামিয়ানা খাটানো। সেখান থেকে জলপাইয়ের মতো হলদে অলস মন্থর ছায়া এসে পড়েছে ফুটপাতের ওপর। দমকা বাতাসে দোল খাচ্ছে রোদে-জ্বলা শামিয়ানাগুলো, ফুটপাতের ওপরকার ছোপগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে, রাস্তার চলমান মানুষজনের পায়ের নীচ থেকে দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। দুপুর পেরিয়ে গেলে কী হবে এখনও নেভ্স্কি এভিনিউ লোকের ভিড়ে গমগম করছে। যুদ্ধের এই ক'বছরে শহরের জীবনযাত্রায় অনভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল লিস্তনিৎস্কি। এখন সে উল্লসিত হয়ে তৃপ্তিভরে গিলতে লাগল বহুকণ্ঠের চিৎকার-চেঁচামেচি, উচ্চকিত হাসি, মোটরের ভেঁপু, খবরের কাগজের ফিরিওয়ালাদের হাঁকডাক। ভালো জামাকাপড় পরা, আত্মতৃপ্ত এই সব মানুষের ভিড়ে নিজেকে একান্ত ঘনিষ্ঠ আপনার জনের মধ্যে বলে মনে হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না ভেবে পারল না, 'ব্যবসায়ী, ফাটকার দালাল, নানা শ্রেণীর সরকারী আমলা আর জমিদারমশাইরা, যাদের ধমনীতে নীল রক্ত বইছে সেই

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা – কী ফুর্তি, কী আনন্দ, কতই না সুখ এখন তোমাদের সকলের! কিন্তু কী অবস্থা তোমাদের ছিল তিন-চার দিন আগে? ঠিক এই এভিনিউ ধরে, এই রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে যখন গলিত ধাতুস্রোতের মতো সাধারণ লোকজন আর সৈন্যদের ঢেউ খেলে গিয়েছিল তখন কেমন লাগছিল তোমাদের? বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে, আমি তোমাদের জন্য খুশি, আবার খুশিও নই। তোমাদের এই এখনকার সৌভাগ্যের জন্য কী করে আনন্দ প্রকাশ করব তাও জানি না। . . .'

নিজের বিমিশ্র অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এলো যে এমন ভাবনাচিন্তা আর উপলব্ধির কারণ হচ্ছে যুদ্ধ – সেখানে যে-জীবন যাপন করতে হয়েছে তা এই আহারপুষ্ট, পরিতৃপ্ত নরনারীর ভিড় থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

রাস্তায় মোটাসোটা এক তরুণের দাড়িগোঁফছাড়া গোলাপী গালের দিকে চোখ পড়ে যেতে লিস্ত্‌নিৎস্কি মনে মনে ভাবল, 'এই যে হৃষ্টপুষ্ট যুবকটি – ফ্রন্টে যায় নি কেন এ? সম্ভবত কোন কারখানার মালিক কিংবা ঘোরেল ব্যবসায়ীর ছেলে, আর্মির বেগার থেকে ঠিক কেটে বেরিয়ে এসেছে ব্যাটা বজ্জাত! দেশের জন্য খাটতে ওর ভারি বয়ে গেছে! দেশের 'প্রতিরক্ষার জন্য' কাজ করছে, দিব্যি চর্বি বাগাচ্ছে, মেয়েদের সঙ্গে লীলাখেলায় মেতে থাকতে আরাম পায়। . . .'

'কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, তুমি তাহলে কাদের সঙ্গে আছ?' নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল সে, তারপর মনে মনে হেসে সিদ্ধান্ত করল, 'অবশ্যই এই লোকগুলোর সঙ্গে! এরা আমার অংশ, আমিও এদের অংশ, এদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। . . . ওদের যা কিছু ভালো, যা কিছু মন্দ সবই অল্পবিস্তর আমার মধ্যেও আছে। এই হৃষ্টপুষ্ট ধর্মের ষাঁড়টার চেয়ে আমার গায়ের চামড়া হয়ত কিছুটা পাতলা, হয়ত এই কারণেই সব ব্যাপারে আমার মনে বড় বেশি প্রতিক্রিয়া ঘটে, আমি কষ্ট পাই, অবশ্যই এই কারণে আমি নিজের সততা বজায় রেখে 'প্রতিরক্ষার কাজে' না গিয়ে যুদ্ধে এসেছি, ঠিক এই কারণেই গত শীতকালে মগিলিওভে যখন আমি দেখতে পেলাম সিংহাসনচ্যুত সম্রাট মোটরগাড়ি করে আর্মি হেড কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, যখন দেখতে পেলাম তাঁর ঠোঁটে বিষাদের ছায়া, দেখলাম অসহায়ের মতো এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে শিথিল ভাবে কোলের ওপর পড়ে আছে তাঁর হাতদুটো, ভাষায় যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন আমি বরফের ওপর পড়ে একটা বাচ্চাছেলের মতো গড়াগড়ি দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। . . . হ্যাঁ, এটা ত ঠিকই, খোলাখুলি বলতে গেলে বিপ্লবকে আমি মেনে নিতে পারছি না, গ্রহণ করতে পারছি না! আমি মনেপ্রাণে তার বিরুদ্ধে। . . . পুরনো ধ্যানধারণার জন্য দরকার হলে প্রাণ দেব, এতটুকু দ্বিধা

না করে, নিজেকে বিন্দুমাত্র জাহির না করে স্রেফ একজন সৈনিকের মতো প্রাণ দিয়ে দেব। প্রশ্ন করতে পারি কি ক'জন লোক এটা করবে?'

সেই ফেব্রুয়ারীতে দিনান্ত বেলার বিচিত্র বর্ণসুষমা, মগিলিওভে গভর্ণরের বাড়ি, লোহার রেলিং-এর গায়ে জমাট হিমকণা, আর ওপাশে হিমের আবছায়া কুহেলি-ঢাকা অস্তগামী সূর্যের সোনাগলা আলোর বিন্দু ছিটানো তুষাররাশি উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠল লিস্ত্‌নিৎস্কির স্মৃতিতে, গভীর আলোড়ন তুলল তার মনে, পাণ্ডুর হয়ে উঠল তার মুখ। নীপারের অপর তীরে দূরের গড়ানে পাড় ছাড়িয়ে আকাশটাতে আসমানী, সিঁদুরে আর ম্লান সোনালি রঙের প্রলেপ লেগেছে; দিগন্তের বুকে তুলির প্রতিটি রেখা এত সূক্ষ্ম, এমনই অশরীরী যে সেদিকে তাকালে চোখ টাটায়। গাড়ি-ঘোড়া বার হওয়ার বড় ফটকটার মুখে জেনারেল-স্টাফ-অফিসার, ফৌজী আর অসামরিক লোকজনের একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে। . . . ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা ঢাকা মোটরগাড়ি। গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনের ওধারে মনে হল যেন বসে আছেন ফ্রেডেরিক্‌স* আর জার। জার সীটের গায়ে হেলান দিয়ে আছেন। চোখমুখ বসে গেছে, কেমন যেন একটা বেগনী আভায় ছেয়ে গেছে তাঁর সারা মুখ। পাণ্ডুর ললাট ঘিরে কালো অর্ধবৃত্তাকারে ভেড়ার চামড়ার তেরছা লম্বা টুপি – সঙ্গের পাহারাদার কসাক রক্ষিসৈনিকদের ধরনের।

রাস্তার লোকজন অবাক দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে দেখছে লিস্ত্‌নিৎস্কিকে। তাদের পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলল সে। এখনও সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে জারের হাতখানা কালো টুপির কানাত থেকে সামরিক অভিবাদনের ভঙ্গিতে নেমে আসছে, এখনও তার কানে বাজছে গাড়িটার নিঃশব্দ চলার বেগ আর যে ভাবে জনতা নীরবে শেষ সম্রাটকে বিদায় জানাচ্ছে তাদের সেই অপমানজনক তূষ্ণীম্ভাব। . . .

যে বাড়িতে রেজিমেন্টের সদর দপ্তরের জায়গা হয়েছে তার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল লিস্ত্‌নিৎস্কি। ওর গালের মাংসপেশী তখনও কাঁপছে, চোখ জলে ভরে উঠছে, লাল টকটক করছে, কাঁদতে কাঁদতে ফুলে উঠেছে। দোতলার সিঁড়ির চাতালে এসে সে পরপর দুটো সিগারেট টেনে নিল, পিঁশনে-চশমার কাচ মুছল, তারপর এক এক লাফে দুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ছুটতে ছুটতে তেতলায় গিয়ে উঠল।

রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার একটা ম্যাপে দাগ কেটে দেখিয়ে দিল পেত্রোগ্রাদের কোন্ এলাকার সরকারী ভবনগুলিকে পাহারা দিতে হবে লিস্ত্‌নিৎস্কির স্কোয়াড্রনকে।

* কাউন্ট ফ্রেডারিক্‌স – জারের রাজসভার জনৈক মন্ত্রী। – অনুঃ

এক এক করে সেগুলোর উল্লেখ করল সে, কোন্ সময় কত সান্ত্রী বসাতে হবে এবং বদল করতে হবে পুঙখানুপুঙখ ভাবে তা বুঝিয়ে দিল। পরিশেষে রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার তাকে বলল, 'শীত-প্রাসাদে কেরেন্‌স্কিকে. . .'

'কেরেন্‌স্কির কোন কথা বলবেন না আমাকে!' লিস্তনিৎস্কি চাপাস্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে উঠল তার মুখখানা।

'নিজেকে সামলে চলা দরকার ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ! . . .'

'কর্ণেল আমি আপনাকে অনুরোধ করছি. . .'

'কিন্তু মাই ডিয়ার. . .'

'আমি অনুরোধ করছি আপনাকে!'

'আপনার নার্ভের অবস্থা . . .'

'পুতিলভ কারখানায় কি এখনই টহলদার দল পাঠাতে বলেন?' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

কর্ণেল ঠোঁট কামড়াল, একটু হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তরে বলেন, 'এক্ষুনি পাঠান! এতটুকু দেরি না করে একজন ট্রুপ-অফিসারের ওপর ভার দিয়ে পাঠিয়ে দিন।'

সদর দপ্তর থেকে লিস্তনিৎস্কি যখন বেরিয়ে এলো তখন তার মনোবল বলতে আর কিছু নেই, অতীতের স্মৃতিভারে আর রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথাবার্তায় মুষড়ে পড়েছে সে। বাসস্থানের প্রায় কাছাকাছি আসার পর পেত্রোগ্রাদে অবস্থানরত চার নম্বর দন রেজিমেন্টের একটা কসাক টহলদার দলকে দেখতে পেল। ট্রুপ অফিসারের হাল্‌কা বাদামী রঙের ঘোড়ার মুখের সাজ থেকে বিষণ্ণ ভাবে ঝুলে আছে কিছু তাজা ফুল। অফিসারের শনের মতো গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা।

'দেশের উদ্ধারকর্তারা দীর্ঘজীবী হোক!' কোন এক অত্যুৎসাহী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফুটপাত থেকে নেমে এসে টুপি নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করে বলল।

অফিসারটি ভদ্র ভাবে টুপির কানাতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল। টহলদার দলটি জোর কদমে এগিয়ে চলল। যে ভদ্রলোকটি কসাকদের অভিনন্দন জানিয়েছিল লিস্তনিৎস্কি তার উত্তেজিত মুখ আর থুতু-ওঠা ভিজে ঠোঁটের দিকে তাকাল, তাকিয়ে দেখল তার গলার সযত্নে-বাঁধা জমকাল ফুলদার টাইটা, তারপর ভুরু কুঁচকে, ঘাড় গুঁজে চট করে ঢুকে পড়ল তার বাসস্থানের ফটকের ভেতরে।

এগার

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি হিশেবে জেনারেল কর্নিলভের* নিয়োগ ১৪ নম্বর রেজিমেন্টের অফিসারমণ্ডলী সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। লৌহকঠিন চরিত্রের জন্য জেনারেল সকলের ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাদের মনে হল, সাময়িক সরকার যে-অচলাবস্থার মধ্যে দেশকে এনে ফেলেছে তা থেকে নিঃসন্দেহে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারবেন তিনি।

তাঁর নিয়োগকে বিশেষ করে উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানাল লিস্তনিৎস্কি। স্কোয়াড্রনের জুনিয়র অফিসার আর ঘনিষ্ঠ চেনাপরিচিত কসাকদের মারফত সে জানতে চেষ্টা করল এ ব্যাপারে কসাকদের মনোভাবটা কী, কিন্তু যে খবর পেল তা খুশি হওয়ার মতো নয়। কসাকরা হয় চুপ করে রইল, নয়ত তাদের উত্তরগুলো হল উদাসীন ধরনের।

'আমাদের কাছে সবই সমান।'

'কে জানে লোকটা কী রকম! . . .'

'যদি শান্তি আনার চেষ্টা করে তাহলে অবশ্য . . .'

'তিনি উঁচু পদ পেলেন বলে আমাদের কী সুবিধেটা হবে? . . .'

কয়েক দিনের মধ্যেই অসামরিক জনসাধারণ ও সামরিক মহলে যে-সমস্ত অফিসারের মোটামুটি ব্যাপক যোগাযোগ ছিল, তাদের মধ্যে জোর গুজব রটে গেল যে কর্নিলভ নাকি ফ্রন্টে নতুন করে মৃত্যুদণ্ড চালু করতে চাইছেন এবং আর্মির ভাগ্য ও যুদ্ধের পরিণতি যার ওপর নির্ভর করে এমন বেশ কিছু কড়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে সাময়িক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। এও শোনা গেল যে কর্নিলভকে কেরেন্স্কি ভয় পায়, ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতির পদে তাঁর বদলে আরেকটু নমনীয় কোন জেনারেলকে বসানোর জন্য সম্ভবত সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে সে। সামরিক মহলে পরিচিত বেশ কিছু জেনারেলের নাম এই প্রসঙ্গে শোনা যেতে লাগল।

প্রধান সেনাপতি পদে কর্নিলভের নিয়োগ জানিয়ে ১৯শে জুলাই তারিখে সরকারী ঘোষণা বেরোতে সকলে তাই অবাক হয়ে গেল। এর অল্প কয়েকদিন বাদে অফিসার সমিতির প্রধান কমিটিতে ব্যাপক পরিচয়ের অধিকারী সাব-অলটার্ণ আতার্শ্চিকভ দস্তুরমতো বিশ্বস্ত সূত্রের উল্লেখ করে এই মর্মে সংবাদ জানাল যে

---

* লাভ্র গেওর্গিয়েভিচ কর্নিলভ (১৮৭০-১৯১৮) - রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবের অন্যতম নেতা, জেনারেল। ১৯১৭ সলের জুলাই-আগস্টে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। আগস্টের শেষে বিদ্রোহ সংগঠন করেন। শ্বেতরক্ষী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর একজন সংগঠক। যুদ্ধে নিহত। - অনুঃ

সাময়িক সরকারের কাছে পেশ করার জন্য কর্নিলভ একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেছেন, তাতে প্রধান প্রধান যে সমস্ত ব্যবস্থার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন সেগুলো হল: ফ্রন্ট-লাইনের পশ্চাদ্ভাগের সেনাবাহিনী ও অসামরিক অধিবাসীদের সকলের ওপর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের অধিকার সমেত দেশের সমগ্র এলাকাকে সামরিক আইনের এক্তিয়ারভুক্ত করা; সামরিক প্রধানদের হাতে নতুন করে শাস্তিমূলক ক্ষমতা তুলে দেওয়া; সামরিক ইউনিটগুলিতে যে-সমস্ত কমিটি আছে তাদের কার্যকলাপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

সেই দিনই সন্ধ্যায় নিজের এবং অন্যান্য স্কোয়াড্রনের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সোজাসুজি ভাবে একটি চরম প্রশ্ন উত্থাপন করল লিস্তনিৎস্কি। কাদের সঙ্গে তারা চলেছে?

'ভদ্রমহোদয়গণ!' আবেগ দমন করে সে বলল। 'আমরা সবাই মিলেমিশে একটা পরিবারের মতো বাস করছি। আমরা সকলে একে অন্যের মনোভাব জানি, তবু এ পর্যন্ত বেশ কতকগুলো কঠিন প্রশ্ন আমাদের মধ্যে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আজ যখন সরকার আর সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন একটা প্রশ্ন সরাসরি না করে উপায় থাকে না – আমরা কার সঙ্গে আছি? কার পক্ষ সমর্থন করছি আমরা? কারও কাছ থেকে কোন কিছু গোপন না করে, আসুন, বন্ধু ভাবে আলোচনা করি আমরা।'

প্রথমে উত্তর দিল সাব-অল্টার্ণ আতারশ্চিকভ।

'জেনারেল কর্নিলভের জন্য আমি নিজের রক্ত দিতে এবং অন্যের রক্তপাত করতেও প্রস্তুত! তাঁর সততার মধ্যে এতটুকু খাদ নেই, একমাত্র তিনিই রাশিয়াকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে পারেন। আর্মিতে তিনি কী করছেন একবার চেয়ে দেখুন না! শুধু তাঁরই কল্যাণে আর্মি-কম্যাণ্ডারদের হাতের বাঁধন খানিকটা আলগা হয়েছে। অথচ এর আগে কী ছিল? ছিল শুধু কমিটিগুলোর একটানা দৌরাত্ম্য, শত্রুসৈন্যদের সঙ্গে ভাই-ভাই ভাবের প্রচার আর পল্টন থেকে ফেরার হওয়ার ঘটনা। এ সম্পর্কে কী কথা থাকতে পারে? যে-কোন ভদ্রসন্তানই কর্নিলভকে সমর্থন করবেন!'

মাত্রাতিরিক্ত চওড়া কাঁধ, বুকের ছাতি আর লিকলিকে পা আতারশ্চিকভের কথাগুলো ছিল রীতিমতো জ্বালাময়ী। বোঝাই যাচ্ছিল এ বিষয়ে তার অনুভূতিটা বেশ গভীর। কথা শেষ হলে টেবিলের চারধারে জড় হওয়া অফিসারদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রত্যাশাভরে সিগারেট-কেস-এর গায়ে সিগারেট ঠুকতে

লাগল। তার ডান চোখের নীচের পাতার ওপর মটরদানার সমান একটা খয়েরি রঙের আঁচিল বেরিয়ে আছে। ফলে ওপরের পাতাটা ভালোমতো বন্ধ হয় না। তাইতে প্রথম দৃষ্টিতে লোকের মনে এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে আতার্শ্চিকভের চোখে বুঝি সর্বক্ষণ দয়াদাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা জাগানো বাঁকা হাসি লেগে আছে।

'বলশেভিক, কেরেন্স্কি আর কর্নিলভের মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কর্নিলভের পক্ষ সমর্থন করব।'

'কর্নিলভ যে কী চান আমাদের পক্ষে বিচার করা কঠিন। শুধুই কি আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান, নাকি অন্য আরও কিছু ফিরিয়ে আনতে চান তিনি . . .'

'নীতিগত প্রশ্নের এটা কোন উত্তর হল না।'

'না, এটাই উত্তর!'

'যদি উত্তর হয় তাহলে বলব বুদ্ধিমানের মতো অন্তত নয়ই।'

'কিসের ভয় আপনি করছেন লেফ্‌টেনান্ট? রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার?'

'ভয় আমি করছি না, বরং তার উল্‌টো – সেটাই আমি চাই।'

'বেশ, তাহলে অসুবিধেটা কিসের?'

'ভদ্রমহোদয়গণ!' ঝড়-ঝাপ্‌টা খাওয়া রুক্ষ কঠিন গলায় বলে উঠল দল্‌গোভ। মাত্র কিছুদিন আগে সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়ে সার্জেন্ট-মেজর থেকে কর্ণেটের পদে উঠেছে সে। 'কী নিয়ে আপনাদের এত তর্কবিতর্ক? রাখঢাক না করে খোলাখুলি বললেই ত পারেন যে ব্যাচ্চা যেমন তার মায়ের আঁচল আঁকড়ে ধরে থাকে আমাদের, কসাকদেরও তেমনি উচিত হবে জেনারেল কর্নিলভকে আঁকড়ে ধরে থাকা। এই হল সোজা কথা, কোন রকম ছলচাতুরি নেই এর মধ্যে! ওঁকে ছাড়লে আমাদের সর্বনাশ হবে! রাশিয়া আমাদের ঘোড়ার নাদের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে। এক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে তা পরিষ্কার – উনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব।'

'এই হল কথার মতো কথা!'

তারিফ করে দল্‌গোভের পিঠ চাপড়াল আতার্শ্চিকভ, তারপর হাসি-হাসি চোখের দৃষ্টি হানল লিস্তনিৎস্কির ওপর। লিস্তনিৎস্কি উত্তেজিত হয়ে হাসতে হাসতে প্যান্টের হাঁটুর কাছের ভাঁজগুলো হাত দিয়ে পাট করতে লাগল।

'তাহলে অফিসার আর আতামান ভদ্রমহোদয়গণ?' গলার স্বর চড়িয়ে আতার্শ্চিকভ বলল। 'আমরা তাহলে কর্নিলভের পক্ষে? . . .'

'অবশ্যই!'

‘দল্‌গোভ এক কোপে জটিল গিঁটটা কেটে ফেলল।’

‘অফিসাররা সবাই কর্নিলভের পক্ষে!’

‘আমরা ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে চাই নে।’

‘বীরপুরুষ, কসাক লাভ্‌র গেওর্গিয়েভিচ কর্নিলভের স্বাস্থ্য কামনা করে – হিপ্‌, হিপ্‌, হুর্‌রে!’

অফিসাররা হাসতে হাসতে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে চা-পান করতে লাগল। খানিক আগেও যে চাপা উত্তেজনার ভাব ছিল সেটা কেটে গেল, কথাবার্তা মোড় নিয়ে গত কয়েক দিনের ঘটনার চারপাশে ঘুরতে লাগল।

‘আমরা না হয় এক কাট্টা হয়ে প্রধান সেনাপতির পক্ষ নিলাম, কিন্তু কসাকরা যেন একটু আমতা-আমতা করছে,’ ইতস্তত করে দল্‌গোভ বলল।

‘‘আমতা-আমতা’ করছে কী রকম?’ লিস্ত্‌নিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

‘ওই আর কি। আমতা-আমতা করছে – ব্যস, যত গোলমাল ত ওখানেই। . . . খানকীর বাচ্চাগুলো বাড়িতে ওদের মাগ-বৌদের কাছে ফিরে যেতে চায়। ওদের জীবন ত আর তেমন আরামের নয় . . .’

‘আমাদের কাজ হল কসাকদের দলে টানা!’ দুম্‌ করে টেবিলের ওপর একটা কিল মেরে লেফ্‌টেনাণ্ট চের্নোকুতভ বলে উঠল। ‘দলে টানা! নইলে আমরা অফিসাররা আছি কী করতে?’

‘কসাকদের ধৈর্য ধরে বোঝাতে হবে কাদের সঙ্গে পথ চলা উচিত তাদের।’

চামচ দিয়ে গেলাসের গায়ে ঠুন্‌ঠুন্‌ আওয়াজ করল লিস্ত্‌নিৎস্কি। অফিসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পর সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলতে লাগল, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে আতার্‌শ্চিকভ যেমন বললেন ঠিক তেমনি ভাবে বাস্তব অবস্থাটা কসাকদের বুঝিয়ে বলা। কমিটিগুলোর প্রভাব থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে কসাকদের। এক্ষেত্রে আমাদের চরিত্রকে ভেঙেচুরে আমূল পাল্‌টাতে হবে। যেমন অভিজ্ঞতা আমাদের বেশির ভাগ লোকের হয়েছিল ফেব্রুয়ারী ক্যু-এর পর, তার চেয়ে বেশি যদি নাও হয় অন্তত সেরকম ত বটেই। আগেকার দিনে, যেমন ধরুন, ১৯১৬ সাল হলে – একজন কসাককে আমি ধরে উত্তম মধ্যম দিতে পারতাম, তাতে লড়াইয়ের সময় পেছন থেকে সে আমাকে গুলি করে মারবে এমন ঝুঁকিও আমার থাকত। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর নিজেদের গুটিয়ে নিতে হয়েছে আমাদের, কেননা যদি কোন আহাম্মককে আমি মেরে বসি তাহলে পরের কোন উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় না থেকে সঙ্গে সঙ্গে এখানে এই ট্রেঞ্চের ভেতরেই সে আমাকে খুন করে ফেলতে পারে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমাদের উচিত

হবে . . .' লিস্তৃনিৎস্কি কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল, '. . . উচিত হবে কসাকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতানো। এরই ওপর নির্ভর করছে সব কিছু। এক নম্বর আর চার নম্বর রেজিমেণ্টে এখন কী কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তার কোন খবর রাখেন কি?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'হ্যাঁ সাঙ্ঘাতিকই বটে!' লিস্তৃনিৎস্কি বলে চলল। 'অফিসাররা আগেকার দেয়ালের আড়াল দিয়ে কসাকদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকত, ফলে একে একে প্রত্যেকটি কসাক বলশেভিকদের খপ্পরে এসে পড়েছে। শুধু কি তাই? তারা নিজেরাই, শতকরা নব্বইজন, বলশেভিক হয়ে পড়েছে। হাজার হোক, এটা ত স্পষ্ট যে-সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা সামনে আসছে সেগুলো এড়িয়ে যাবার উপায় আমাদের নেই। . . . যাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন, ৩রা ও ৫ই জুলাইয়ের ঘটনা* তাঁদের সকলের পক্ষে কঠোর সতর্কবাণী মাত্র। হয় আমাদের কর্নিলভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, নয়ত বলশেভিকরা শক্তি সঞ্চয় করে, নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে আরও একটা বিপ্লব ঘটাবে। ওরা দম নিচ্ছে, শক্তি সংহত করছে, আর আমরা ঢিল দিয়ে বসে আছি। . . . এটা কি চলতে দেওয়া যেতে পারে? ভবিষ্যতে যে ওলটপালট হতে যাচ্ছে তাতে একজন নির্ভরযোগ্য কসাক আমাদের কাজে লাগবে। . . .'

'কসাকদের ছাড়া অবশ্যই কানাকড়ি দাম নেই আমাদের,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল দল্‌গোভ।

'ঠিক কথা, লিস্তৃনিৎস্কি!'

'খুবই সত্যি কথা।'

'কবরের দিকে এক পা বাড়িয়ে আছে রাশিয়া। . . .'

'তুমি কি মনে কর আমরা তা বুঝতে পারছি না? বুঝতে পারি, কিন্তু কখন

---

* ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের ঘটনা – রাশিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট। ফ্রণ্টে রুশ সেনাবাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। প্রধান প্রধান ঘটনা: ৩রা জুলাই 'সমস্ত শাসনক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে!' – এই স্লোগান নিয়ে সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে পেত্রোগ্রাদে সৈনিক, শ্রমিক ও নাবিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটি উক্ত বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়ে তাকে শান্তিপূর্ণ চরিত্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরের দিন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ও মেনশেভিকদের অনুমোদনক্রমে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনী শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ৫ই জুলাই শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈন্যদের গ্রেপ্তার ও নিরস্ত্রীকরণ। এখান থেকেই সূচিত হল দ্বৈতশাসনের অবসান আর বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিসমাপ্তি। – অনুঃ

কখন কিছু করার আর ক্ষমতা থাকে না আমাদের। '১ নং হুকুমনামা'* আর 'অকোপ্‌নায়া প্রাভ্‌দা'** তাদের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছে।'

'এদিকে আমরা কোথায় তার অঙ্কুর পায়ে মাড়িয়ে পিষে ফেলব, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব, তা নয়, দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি!' আতার্‌শ্চিকভ চেঁচিয়ে বলল।

'না, মুগ্ধ আমরা হচ্ছি না, আসলে আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই!'

'কথাটা ঠিক নয়, কর্ণেট! আমাদের উৎসাহের একান্ত অভাব!'

'সত্যি নয়!'

'প্রমাণ করুন!'

'আস্তে, আস্তে, ভদ্রমহোদয়গণ!'

''প্রাভ্‌দার' অফিস তছনছ করে দিয়েছে। . . . কেরেন্‌স্কির বুদ্ধিটাই এরকম . . . চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।'

'এসব কী হচ্ছে? . . . বলি এটা বাজার নাকি? এমন ভাবে সবাই মিলে হট্টগোল করলে চলে?'

উল্‌টোপাল্‌টা চিৎকার-চেঁচামেচি শেষকালে আস্তে আস্তে থিতিয়ে এলো। কোন একটা স্কোয়াড্রনের জনৈক কম্যাণ্ডার অত্যন্ত আগ্রহসহকারে লিস্তনিৎস্কির কথাগুলো শুনছিল। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে সে বলল, 'আমি বলি কি, মেজর লিস্তনিৎস্কিকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দেওয়া হোক।'

'হিয়ার! হিয়ার!'

উঁচিয়ে থাকা হাঁটুর কোনা দু'হাতের মুঠো দিয়ে ঘসতে ঘসতে লিস্তনিৎস্কি বলে চলল, 'আমার কথা হল আগামী দিনের যুদ্ধ. . . গৃহযুদ্ধ যখন শুরু হবে – মাত্র এখনই বুঝতে পারছি তা অনিবার্য – তখন দরকার হবে বিশ্বস্ত কসাকদের। যে-সমস্ত কমিটি বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকেছে, চেষ্টা করে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে কসাকদের। এটা আমাদের কাছে ভীষণ জরুরি! তার কারণ নতুন করে ধাক্কা এলে এক নম্বর ও চার নম্বর রেজিমেণ্টের কসাকরা তাদের অফিসারদের গুলি করে খতম করবে। . . .'

'ঠিক কথা।'

---

* বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের চাপে পড়ে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি ১৯১৭ সালের ১ মার্চ তারিখে এই হুকুমনামা জারি করে। এর বলে মিলিটারী ইউনিটগুলিতে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থা প্রবর্তিত হয় এবং পুরানো জারপন্থী সেনাপতিমণ্ডলীর কার্যকলাপের উপর উক্ত সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু হয়। – অনুঃ

** 'অকোপ্‌নায়া প্রাভ্‌দা' ('পরিখার সত্যসমাচার') – বলশেভিকদের ফৌজী সংবাদপত্র। – অনুঃ

'ছেড়ে কথা কইবে না!'

'. . . আর তাদের অভিজ্ঞতা থেকে – বলতে গেলে বড়ই তিক্ত সে অভিজ্ঞতা – শিক্ষা নেওয়া উচিত আমাদের। এক নম্বর আর চার নম্বর রেজিমেণ্টের কসাকদের – যদিও এখন আর তারা কিসের কসাক? – ভবিষ্যতে প্রতি দু'জনে একজন করে ফাঁসিতে লটকাতে হবে, এমনকি দরকার হলে তাদের সকলকেই সাফ করে দিতে হবে। . . . মাঠ থেকে আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে! তাই বলি কি, আসুন, যে ভুলের জন্য পরে তাদের অনেক মূল্য দিতে হতে পারে তার হাত থেকে আমাদের নিজেদের কসাকদের বাঁচাই।'

লিস্ত্‌নিৎস্কির পর বলতে উঠল সেই স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারটি যে এতক্ষণ গভীর মনোযোগসহকারে শুনে আসছিল লিস্ত্‌নিৎস্কির বক্তৃতা। একজন বয়স্ক পুরনো অফিসার সে, নয় বছর রেজিমেণ্টে আছে, যুদ্ধে আহত হয়েছে চারবার। আগেকার দিনে মিলিটারীর চাকরি কী রকম কঠিন ছিল তার বর্ণনা দিতে লাগল সে। কসাক-অফিসারদের আড়ালে রাখা হত, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হত, তাদের পদোন্নতি হত ধীরগতিতে আর নিয়মিত পর্যায়ের অধিকাংশ অফিসারের কাছেই লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ছিল পদোন্নতির শেষ ধাপ। তার মতে, স্বৈরতন্ত্র উৎখাতের মুহূর্তে কসাক-নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল এটাই তার কারণ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সে বলল, কর্নিলভকে সর্বতোভাবে সমর্থন করা উচিত, কসাক সৈন্যসঙ্ঘের পরিষদ এবং অফিসারসঙ্ঘের মুখ্য সমিতি মারফত তাঁর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার।

'কর্নিলভ না হয় ডিক্টেটরই হোন – কসাক সৈন্যদের কাছে তা হবে পরিত্রাণের সামিল। জারের অধীনে আমরা যেমন ছিলাম তার চেয়ে হয়ত আমরা ভালোই থাকব তাঁর অধীনে।'

দেখতে দেখতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। শহরের মাথার ওপর পিঙ্গল মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়েছে নিত্যকার এক সাধারণ রাত্রি। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অ্যাডমিরাল্‌টি টাওয়ারের মাথার ওপরকার সূক্ষ্ম কালো চুড়ো, হলুদ আলোর প্লাবন।

ভোর পর্যন্ত অফিসারদের আলাপ-আলোচনা চলল। শেষকালে এই সিদ্ধান্ত হল যে অবসর সময়ে কসাকদের ব্যাপৃত রাখার জন্য এবং বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সপ্তাহে তিন দিন করে রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, ট্রুপ-অফিসারদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন অবশ্যই রোজ তাদের ট্রুপের লোকজনকে শারীরিক ব্যায়াম করিয়ে আর এটা-ওটা পড়িয়ে ব্যস্ত রাখে।

সভা ভঙ্গ হওয়ার আগে সকলে মিলে গাইল 'উঠেছে, জেগেছে প্রশান্ত দন,

সনাতন খ্রীষ্টীয় আমাদের দন', এই নিয়ে দশটা সামোভার চা শেষ করল, গেলাস ঠোকাঠুকি করে টুং টাং আওয়াজ তুলে ঠাট্টার ছলে স্বাস্থ্যকামনা করল। একেবারে শেষ মুহূর্তে দল্‌গোভের সঙ্গে কানাকানি করে কী যেন পরামর্শ করল আতার্‌শ্চিকভ, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'এখন মিষ্টিমুখ হিশেবে আমরা আপনাদের একটা পুরনো কসাক গান দিয়ে আপ্যায়ন করব। চুপ্‌, চুপ্‌! আস্তে! জানলাটা খুললে কিন্তু মন্দ হত না, তামাকের ধোঁয়ায় একেবারে ছেয়ে গেছে ঘরটা।'

দল্‌গোভের ফ্যাঁসফেঁসে ভাঙা ভাঙা মোটা গলা আর আতার্‌শ্চিকভের চমৎকার সুরে বাঁধা কোমল সপ্তমের সুর – দুয়ে মিলে গোড়ায় হোঁচট খেতে লাগল, গুলিয়ে ফেলতে লাগল, একজনের লয়ের সঙ্গে আরেকজনের লয় মেলে না; কিন্তু শেষকালে দুটো গলা উত্তাল হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, শোনা গেল এক অপূর্ব প্রাণ-মাতানো গান:

দর্পিত বটে আমাদের দন, প্রশান্ত দন, পিতা –
বিধর্মীরে সে করে নি প্রণাম, মস্কোর কাছে জীবনের রীতি
ধার সে মাগে নি কভু।
তুর্কীর সনে যুগে যুগান্তরে করেছে সম্ভাষণ
খোলা তলোয়ারে উড়ায়ে মাথার খুলি। . . .
দনের এ দেশ আমাদের মাতা, আমাদের স্তেপভূমি,
মেরীমাতা আর এই সনাতন খ্রীষ্টধর্মতরে,
শততরঙ্গ ধ্বনিতে মুখর মুক্ত দনের তরে
বছরে বছরে যুঝেছে কত না শত্রুসেনার সনে। . . .

দু'হাতের ফাঁকে আঙুল লাগিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে সুর চড়িয়ে গান টেনে নিয়ে চলেছে আতার্‌শ্চিকভ, তার গলায় সুর যে ভাবে ওঠা-নামা করছে তাতে দল্‌গোভের উৎসাহপূর্ণ মোটা গলাকে অনেক পিছে ফেলে এগিয়ে গেলেও মুহূর্তের জন্যও সে খেই হারাল না। তার মুখখানা দেখতে হল অস্বাভাবিক কঠোর। শুধু একবার, গানের শেষের দিকে লিস্তনিৎস্কি লক্ষ করল তার চোখের খয়েরি রঙের আঁচিলের ঢিবিটার ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা ঝলক খেলিয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা চোখের জল।

অন্য সব স্কোয়াড্রনের অফিসাররা চলে যাবার পর ঘরে আর যারা ছিল তারাও যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন আতার্‌শ্চিকভ এসে বসল লিস্তনিৎস্কির বিছানার ধারে। কপাটের মতো বিশাল, ফোলা বুকের ওপরকার পাতলুন আঁটার রঙচটা নীল বাঁধুনিদুটো হাতড়াতে হাতড়াতে ফিসফিস করে সে বলল, 'বুঝলে ইয়েভ্‌গেনি,

দনকে আমি ভয়ঙ্কর ভালোবাসি – যুগযুগান্তর ধরে গড়ে ওঠা এই পুরনো কসাক জীবনধারার সব কিছু ভালোবাসি। ভালোবাসি আমার কসাকদের, কসাক-মেয়েদের – সব কিছু, সব! স্তেপের সোমরাজ লতার গন্ধে আমার চোখে জল ভরে আসে। . . . আবার যখন সূর্যমুখী ফুল ফোটে, দনের বুক বয়ে ভেসে আসে বৃষ্টি-ধোওয়া আঙুরলতার গন্ধ. . . ওঃ কী ভীষণ কী দারুণ ভালোই না বাসি! . . . বুঝতে পারলে? কিন্তু এখন আমি ভাবছি, এই কসাকদেরই আমরা বোকা বানাচ্ছি না ত? আমরা কি এই পথেই ওদের চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই?'

'এসব কী বলছ?' সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করল লিস্তনিৎস্কি।

সাদা জামার কলারের তলা থেকে উঁকি মারছে আতারশ্চিকভের রোদে-পোড়া তামাটে ঘাড়টা, এতই কচি তাজা আর সরলতামাখা যে দেখে মমতায় মন ভরে ওঠে। খয়েরি রঙের আঁচিলটার ওপর ভারী হয়ে ঝুলছে চোখের ওপরের পাতার নীল কিনারা, পাশ থেকে শুধু দেখা যাচ্ছে একটা আধবোজা চোখের বাষ্পাচ্ছন্ন আলো।

'আমি ভাবছি, এটা কি কসাকদের দরকার?'

'তাহলে, সেক্ষেত্রে,. কী দরকার বলে তুমি মনে কর?'

'জানি না। . . . কিন্তু কেন তারা এমন ভাবে আপনা আপনী আমাদের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে? বিপ্লব যেন আমাদের ভেড়া আর ছাগল এই দু'ভাগে ভাগ করে দিল, যেন আমাদের দু'দলের স্বার্থ আলাদা আলাদা।'

'দেখতে পাচ্ছ,' সতর্ক ভাবে শুরু করল লিস্তনিৎস্কি। 'ঘটনাকে কে কী চোখে দেখছে তারই ওপর নির্ভর করছে এই পার্থক্যটা। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা অনেক বেশি, যে-কোন ঘটনাকে আমরা যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করতে পারি, কিন্তু ওদের কাছে সবই আরও আদিম, অনেক সহজ-সরল। বলশেভিকরা দিনরাত ওদের মাথায় ঢোকাচ্ছে যে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে – আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, তাকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হবে। ওরা কসাকদের লেলিয়ে দিচ্ছে আমাদের ওপর; আর যেহেতু কসাকরা ক্লান্ত, তাদের মধ্যে পশুত্বটা বেশি এবং মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের যে প্রখর নৈতিক চেতনা আমাদের আছে, ওদের যেহেতু তা নেই, তাই বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না যে বলশেভিক মতবাদের বীজ উর্বর মাটিতে এসে পড়ে। ওদের কাছে মাতৃভূমি কী? ধারণাটা আর যাই হোক ভাসা-ভাসা। তাদের বিবেচনায় 'দন-আর্মির এলাকা ফ্রন্ট থেকে অনেক দূরে, জার্মানরা সেখানে পৌঁছুতে পারবে না।' এখানেই ত যত গোলমাল। এই যুদ্ধ গৃহযুদ্ধে গড়ালে তার ফলাফল কী হতে পারে সে কথা ওদের ঠিকমতো বুঝিয়ে দিতে হবে।'

কথা বলতে বলতে লিস্তনিৎস্কি অর্ধচেতন ভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল

যে তার কথাগুলো ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছুচ্ছে না, আতারশ্চিকভ যে-কোন মুহূর্তে ঝিনুকের মতো তার সামনে মনের ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে পারে।

ঠিক তা-ই ঘটল। আতারশ্চিকভ অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল, কোন কথা না বলে বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এই মৌনাবলম্বী সহকর্মী অফিসারটির চিন্তা যে এখন কোন্ গোপন আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, শত চেষ্টা করেও লিস্তনিৎস্কি তা বুঝতে পারল না।

'ওর মনের কথাগুলো শেষ করতে দেওয়া উচিত ছিল আমার . . .' ক্ষুণ্নমনে ভাবল লিস্তনিৎস্কি।

আতারশ্চিকভ শুভরাত্রি জানিয়ে আর একটি কথাও না বলে বিদায় নিল। মুহূর্তের জন্য অকপটে কথা বলার একটা প্রবল বাসনা তার হয়েছিল, মানুষমাত্রেই যে অজ্ঞেয় রহস্যের কালো পর্দা দিয়ে অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে তার একটা প্রান্ত তুলে ধরে আবার নামিয়ে দিল।

অন্য আরেকজনের মনের ভেতরে কী গোপন রহস্য আছে তার কোন কূলকিনারা করতে না পেরে লিস্তনিৎস্কি বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল সে, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তুলোর মতো নরম ধূসর রঙের অন্ধকারের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল আক্সিনিয়াকে, আক্সিনিয়াকে দিয়ে কানায় কানায় ভরা তার ছুটির দিনগুলোকে। নানা সময় যে-সমস্ত নারীর পথ তার পথের সঙ্গে এসে মিশেছিল তাদের আকস্মিক টুকরো টুকরো স্মৃতি আর ভাবনায় মন শান্ত হয়ে আসতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বারো

লিস্তনিৎস্কির স্কোয়াড্রনে ইভান লাগুতিন নামে এক কসাক ছিল। বুকানভ্স্কায়া জেলা-সদরের লোক সে। রেজিমেন্টের ফৌজী বিপ্লবী কমিটির প্রথম নির্বাচনে লাগুতিন তার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। রেজিমেন্ট পেত্রোগ্রাদে পৌঁছুনোর আগে অবধি অসাধারণ কোন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নি; কিন্তু জুলাইয়ের শেষ দিকে ট্রুপ-অফিসার লিস্তনিৎস্কিকে জানাল যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রোগ্রাদ-সোভিয়েতের* সামরিক বিভাগে লাগুতিনের যাতায়াত আছে, সম্ভবত

* 'সোভিয়েত' কথাটির অর্থ 'পরিষদ'। বিপ্লবের পর থেকে অবশ্য মেহনতী বা উৎপাদক যৌথের নির্বাচিত এক ধরনের পার্লামেন্ট অর্থে ধরা হয়। অনুবাদে কোন কোন স্থলে 'পরিষদ'ও ব্যবহৃত হয়েছে। -অনুঃ

সোভিয়েতের সদস্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, কেননা প্রায়ই তাকে তার ট্রুপের কসাকদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গেছে, তাদের ওপর সে খারাপ প্রভাব ফেলছে। পাহারা আর টহলদারীর কাজে যেতে অস্বীকার করার দুটো ঘটনা ঘটেছে স্কোয়াড্রনে। এই দুটো ঘটনাকে কসাকদের ওপর লাগুতিনের প্রভাব বলে চালিয়ে দিল ট্রুপ-অফিসার।

লিস্তনিৎস্কি ঠিক করল লাগুতিনকে একবার ভালো করে জেনে নিতে হবে, বাজিয়ে নিতে হবে তাকে। খোলাখুলি কথাবার্তা বলার জন্য লোকটাকে ডেকে পাঠানো মূর্খামি, নেহাৎই হঠকারিতা হবে সেটা, তাই লিস্তনিৎস্কি সুযোগের অপেক্ষায় রইল। শিগগিরই সুযোগ মিলে গেল একটা। জুলাইয়ের শেষ দিকে পুতিলভ কারখানার আশেপাশের রাস্তাঘাট রাতে পাহারা দেবার পালা পড়েছে তিন নম্বর ট্রুপের।

ট্রুপ-অফিসারকে লিস্তনিৎস্কি আগে থাকতেই বলে রাখল, 'আমি যাব কসাকদের সঙ্গে। কালো ঘোড়াটার ওপর জিন চাপাতে বলবেন আমার জন্যে।'

লিস্তনিৎস্কির নিজের কথায়, 'বলা যায় না কখন দরকার হয়', তাই দুটো ঘোড়া রাখত সে। আর্দালির সাহায্যে ধরাচুড়ো পরে সে নীচে আঙিনায় নেমে এলো। ট্রুপের কসাকরা ততক্ষণে ঘোড়ায় উঠে বসেছে। আলোর নক্সাতোলা কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা রাস্তা তারা পেরিয়ে গেল। লিস্তনিৎস্কি ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ল, পেছন থেকে লাগুতিনকে ডাকল। লাগুতিন তার নগণ্য চেহারার ছোট ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে আড়চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেজরের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এলো।

'তোমাদের কমিটির খবর-টবর কী?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'নতুন কিছুই নেই।'

'তুমি কোন্ জেলার লোক লাগুতিন?'

'বুকানভ্স্কায়া।'

'গ্রাম?'

'মিত্ইয়াকিন।'

এবারে তাদের দু'জনের ঘোড়া পাশাপাশি চলতে লাগল। রাস্তার আলোয় আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কসাকটার দাড়িঢাকা মুখখানা দেখতে লাগল লিস্তনিৎস্কি। লাগুতিনের টুপির নীচ থেকে চোখে পড়ছে সুন্দর পাট করে আঁচড়ানো চুলের গোছা, তার ফোলাফোলা গালের ওপর খোঁচাখোঁচা কোঁকড়ানো দাড়ি, ভ্রূধনুর ফোলা ঢিবির তলায় অনেকটা গভীরে ঢাকা পড়ে আছে তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চতুর দৃষ্টি।

'লোকটাকে দেখে ত মনে হয় নেহাৎই সাদাসিধে। কিন্তু মনের ভেতরে কী

আছে কে জানে? কে বলতে পারে হয়ত পুরনো শাসনব্যবস্থা আর 'কর্পরালের লাঠির' সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর মতো আমাকেও সে ঘৃণা করে?' মনে মনে ভাবল লিস্তনিৎস্কি। কেন যেন লাগুতিনের অতীত জানার বাসনা হল তার।

'পরিবার আছে?'

'আছে হুজুর। বৌ আর দুই বাচ্চা।'

'আর ক্ষেতখামারি?'

'কিসের ক্ষেতখামারি আবার আমাদের?' বিদ্রূপের হাসি হেসে সখেদে বলল লাগুতিন। 'আমরা দিন আনি দিন খাই। বলদ খাটে কসাকের পেছনে আবার কসাক খাটে বলদের পেছনে – এই ভাবেই সারা জীবন পাক খেয়ে চলেছি আমরা। . . . আমাদের জমি আবার বালি-জমি কিনা,' একটু চুপ করে থেকে রুক্ষস্বরে যোগ করল সে।

লিস্তনিৎস্কিকে একবার বুকানভ্স্কায়া হয়ে সেরেব্রিয়াকোভো স্টেশনে যেতে হয়েছিল; তার মনে পড়ে গেল সদর রাস্তা থেকে খানিকটা তফাতে সেই সুদূর অঞ্চলটা – দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমতল ঘাসজমিতে ঢাকা খোপিওর নদের আঁকাবাঁকা খেয়ালী রেখায় ঘেরা। সেই সময় চার ক্রোশ দূর থেকে ইয়েলান্স্কায়ার সীমানাতেই টিলার চুড়ো থেকে তার চোখে পড়েছিল নিম্নভূমিতে বাগবাগিচার একটা আবছা শ্যামলিমা আর তার মাঝখানে মাংস ছাড়িয়ে-নেওয়া সাদা অস্থিখণ্ডের মতো খাড়া একটা ঘণ্টা-মিনার।

'আমাদের জমি বালি-ভর্তি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাগুতিন বলল।

'বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে বোধহয় তোমার, তাই না?'

'তা করবে না কেন হুজুর? নিশ্চয়ই, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যেতে চাই! যুদ্ধে ত আর আমাদের কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি!'

'শিগ্‌গির ফেরা কী আর হবে? . . .'

'আমার ত মনে হয়, হবে।'

'লড়াই এখনও শেষ হয় নি যে!'

'শিগ্‌গিরই শেষ হবে। শিগ্‌গিরই যে যার বাড়ি ফিরে যাব আমরা।' লাগুতিন তার গোঁ ধরে রইল।

'আরও খানিকটা লড়াই চলবে আমাদের নিজেদের মধ্যে। তোমার কী মনে হয়?'

জিনের কাঠামো থেকে চোখ না তুলেই একটু চুপ করে থেকে শেষকালে লাগুতিন জিজ্ঞেস করল, 'লড়াইটা কার সঙ্গে বলতে পারেন?'

'সে রকম লোকের কি আর কমতি আছে? . . . ধর না কেন, বলশেভিকদের সঙ্গেই।'

আবার বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল লাগুতিন। দেখে মনে হচ্ছিল ঘোড়ার খুরের একটানা খটাখট নাচের তালে তালে সে ঢুলছে। মিনিট তিনেক এরকম নীরবে তারা চলল। অবশেষে ধীরে ধীরে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে লাগুতিন উত্তর দিল।

'তাদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই।'

'কিন্তু জমির কী হবে?'

'সবাই ভাগ পাবার মতো যথেষ্ট জমি আছে।'

'বলশেভিকরা কিসের জন্যে চেষ্টা করছে তা তুমি জান?'

'ছিটেফোঁটা কানে এসেছে।'

'আচ্ছা, আমাদের জমি কেড়ে নেওয়ার জন্যে আর কসাকদের দাস ক'রে ফেলার মতলবে বলশেভিকরা যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়? হাজার হোক জার্মানদের সঙ্গে তুমি লড়াই করেছ, রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে গেছ, তাই না?'

'জার্মানদের ব্যাপার আলাদা।'

'আর বলশেভিকদের ব্যাপারটা?'

'কেন মেজর?' এবারে যেন কোন এক স্থির সিদ্ধান্তে আসার পর চোখ তুলে, লিস্তনিৎস্কির দৃষ্টির ভেতরে কিছু একটা অনুসন্ধানের দৃঢ় চেষ্টা করতে করতে লাগুতিন বলল। 'বলশেভিকরা আমার জমির শেষ টুকরোটা কেড়ে নিতে যাবে না। এক ভাগের যতটা পাওনা ঠিক ততটাই আছে আমার, আমার জমি তাদের কোন দরকার হবে না। . . . কিন্তু এই ধরুন, আপনার কথা যদি বলেন্ . . অধীনের অপরাধ নেবেন না হুজুর . . . আপনার বাবার আছে আশি হাজার বিঘা জমি।'

'আশি নয়, তিরিশ।'

'ওই একই হল। ধরলাম না হয় তিরিশই – সেটা কি খুব একটা কম হল? বলি, এটা কী রকম ব্যবস্থা? আর সারা রাশিয়ার কথা যদি ধরেন, আপনার বাবার মতো লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। তাহলেই একবার বিবেচনা করে দেখুন মেজর, পেটের খিদে কার না আছে? আপনি খেতে চান, আর সবাইও খেতে চায়। তা সে যে লোকই হোক না কেন। একমাত্র জিপসীই আমাদের শিখিয়েছে ঘোড়াকে খাওয়ানোর দরকার নেই – দানাপানি ছাড়া নাকি তার অভ্যেস হয়ে যাবে। কিন্তু তার সেই আদরের ঘোড়াটি অনেকদূর পর্যন্ত ওই ভাবে থাকা অভ্যেস করতে করতে শেষকালে দশ দিনের দিন দুম করে টেঁসে গেল। . . . জারের আমলে ব্যবস্থা বলতে যা ছিল সবই একপেশে, বাঁকা, গরিব মানুষের পক্ষে একেবারে জঘন্য। . . . আপনার বাবামশায়ের ভোগের জন্য ওঁরা কেটে

দিয়েছেন বিশাল এক টুকরো – তিরিশ হাজার বিঘা। অথচ দেখুন, একটা বৈ দুটো পেট ওঁর নেই। আমাদের আর দশটা লোকের মতো ওঁরও একটাই পেট। তাই লোকের কথা ভেবে দুঃখ হয় বৈ কি! . . . বলশেভিকরা ঠিক পথেই যাচ্ছে, আর আপনারা বলছেন কিনা লড়াই করতে হবে! . . .'

ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা চেপে রেখে শুনে যাচ্ছিল লিস্তনিৎস্কি। লাগুতিনের শেষের কথাগুলো শুনে কিন্তু তার মনে হতে লাগল যে এর বিরুদ্ধে জোরাল কোন যুক্তি খাড়া করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে মনে মনে উপলব্ধি করল যে অতি সাধারণ, মারাত্মক রকমের সহজসরল কতকগুলো যুক্তি দিয়ে কসাকটা তাকে ঘায়েল করে দিয়েছে, একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছে। নিজের ভুল সম্পর্কে একটা গভীর গোপন চেতনা তার মনের ভেতরে নাড়া খেয়ে উঠতে লিস্তনিৎস্কি থতমত খেয়ে গেল, রাগে জ্বলে উঠল।

'তুমি কি তাহলে বলশেভিক?'

'নামে কিছু আসে যায় না . . .' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে টেনে টেনে উত্তর দিল লাগুতিন। 'নামটা কোন ব্যাপার নয়, আসলে দেখতে হবে সত্য কোথায় আছে। মানুষের দরকার এই সত্য। কিন্তু তাকে চিরকাল গোপন করে রাখা হচ্ছে, মাটির তলায় গোর দেওয়া হচ্ছে। লোকে বলে সত্য অনেক দিন হল মারা গেছে।'

'বুঝলাম চাষীমজুর আর লালফৌজ প্রতিনিধিদের সোভিয়েত কী ঢোকাচ্ছে তোমার মাথায়। . . . ওদের সঙ্গে তোমার যে এত দহরমমহরম সেটা তাহলে অমনি নয়?'

'না মেজর, জীবন নিজেই আমাদের মতন ধৈর্যবান লোকদের ভেতরে এসব পুরে দিয়েছে, বলশেভিকদের হাতে কেবল সলতেটা ধরানোর অপেক্ষা – এই যা।'

'ওসব গল্পকথা ছাড় ত! এ নিয়ে বাচালতা করা সাজে না!' এবারে বেশ রেগে গিয়ে বলল লিস্তনিৎস্কি। 'আমার কথার জবাব দাও তুমি! এই যে আমার বাবার জমির কথা, সাধারণ ভাবে জমিদারদের ভূসম্পত্তির কথা তুমি বলছিলে, সে ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তোমার যদি দুটো জামা থাকে, আর আমার যদি একটাও না থাকে, তাহলে তুমি কি বলতে চাও, তোমার কাছ থেকে একটা কেড়ে নেওয়া উচিত হবে আমার?'

লাগুতিনের মুখ লিস্তনিৎস্কি দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারল সে হাসছে।

'আমি নিজে আমার বাড়তি জামা দিয়ে দেব। ফ্রন্টে থাকতে শুধু বাড়তি জামা কেন, আমার গায়ের শেষ জামাটাও আমি দিয়ে দিয়েছি, খালি গায়ের ওপর গ্রেটকোট পরে থেকেছি। কিন্তু এই জমির প্রশ্ন যখন

ওঠে তখন কেন যেন কাউকে তেমন গা করতে দেখা যায় না। . . .'

'তার মানে, তোমার যতটা জমি আছে তাতে যথেষ্ট হচ্ছে না? কম পড়ছে নাকি তোমার?' গলার স্বর চড়াল লিস্তনিৎস্কি।

লাগুতিনের মুখ সাদা হয়ে গেল। লিস্তনিৎস্কির উত্তরে উত্তেজিত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় চিৎকার করে সে বলল: 'তুমি কি ভাবছ নিজের কথা ভেবে আমি হেদিয়ে মরছি? পোল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম আমরা – সেখানকার মানুষ কেমন করে জীবন কাটাচ্ছে? দেখ নি? আর চারপাশে যে-সব চাষাভুষো আছে তাদের জীবন কেমন কাটছে? . . . আমি যে নিজের চোখে দেখেছি! তাইতে ত রক্ত টগবগ করে ওঠে! . . . তুমি কি মনে কর ওদের কথা ভেবে আমার দুঃখ হয় না, হওয়া উচিত নয়? যখন ভাবি সামান্য পচা এক টুকরো জমি দিয়ে পোলদের কাজ চালাতে হচ্ছে তখন এই পোলদের জন্যেও হয়ত সত্যি সত্যি আমার মনে বড় দুঃখ হয়।'

লিস্তনিৎস্কির মুখ দিয়ে একটা কটু কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পুতিলভ কারখানার ধূসর রঙের বিশাল বাড়িগুলোর কাছ থেকে কান-ফাটানো 'ধর-ধর' চিৎকার উঠল, তারপর শোনা গেল ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ, কানে বাজল গুলির শব্দ। তাই শুনে চাবুক হাঁকিয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল লিস্তনিৎস্কি।

চৌরাস্তার মোড়ে তাদের ট্রুপটা দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। লিস্তনিৎস্কি আর লাগুতিন ঘোড়া ছুটিয়ে প্রায় একই সময় সেখানে এসে জুটল। কসাকরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। তাদের কোমরে বাঁধা তলোয়ার ঝনঝন করছে। ভিড়ের মাঝখানে একটা লোক ওদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করছে।

'ব্যাপার কী? এসব কী হচ্ছে?' ভিড়ের ভেতরে ঘোড়াটা ঢুকিয়ে দিয়ে গর্জন করে উঠে লিস্তনিৎস্কি।

'শালা ঢিল ছুড়ে. . .'

'ছুটে পালাচ্ছিল।'

'লাগাও ওকে, আর্জানভ!'

'শালা শুয়োরের বাচ্চা! ঢিল ছোড়াছুড়ি! – এ কি ছেলেখেলা পেয়েছ?'

ট্রুপ-সার্জেন্ট আর্জানভ জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে কালো জামাপরা একটা বেঁটেখাটো লোকের শার্টের কলার চেপে ধরে আছে। লোকটার কোমরের বেল্ট খসে পড়েছে। তিনজন কসাক ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তার হাতদুটো ধরে মোচড়াচ্ছে।

'কে তুমি?' ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল লিস্তনিৎস্কি।

ধৃত ব্যক্তি মাথা তুলল। তার অস্পষ্ট ফেকাসে মুখে নির্বাক বিকৃত ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে চেপে থাকে।

'কে তুমি?' লিস্ত্‌নিৎস্কি আবার জিজ্ঞেস করে। 'ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে পাজী বদমাশ? অ্যাঁ? চুপ করে আছিস যে বড়? আর্জানভ!'

আর্জানভ জিন থেকে টুক করে লাফিয়ে মাটিতে নামল, লোকটার জামার কলার ছেড়ে দিয়ে ধাঁ করে একটা ঘুসি লাগিয়ে দিল তার মুখের ওপর।

'লাগাও ধোলাই!' ঘোড়ার মুখ ঝট করে ঘুরিয়ে নিয়ে হুকুম দিল লিস্ত্‌নিৎস্কি।

ঘোড়া থেকে যারা মাটিতে নেমে পড়েছিল তাদের মধ্য থেকে তিন-চারজন কসাক হাত-পা বাঁধা লোকটাকে মাটিতে ফেলে চাবুক দিয়ে পেটাতে লাগল। লাগুতিন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল লিস্ত্‌নিৎস্কির কাছে।

'মেজর সাহেব! . . . এ কী করছেন . . . মেজর সাহেব?' কাঁপা কাঁপা আঙুলে সাঁড়াশির মতো শক্ত করে লিস্ত্‌নিৎস্কির হাঁটু চেপে ধরে চিৎকার করে বলল সে। 'এ কী করছেন? হাজার হোক একটা মানুষ ত! করছেন কী আপনারা?'

কোন উত্তর না দিয়ে লিস্ত্‌নিৎস্কি হাঁকিয়ে দিল তার ঘোড়াটা। লাগুতিন তখন কসাকদের কাছে ছুটে গেল, আর্জানভকে জাপ্‌টে ধরে তাকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল। নিজের তলোয়ারের সঙ্গে পা বেধে গিয়ে হোঁচট খেল সে। আর্জানভ ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল, 'অত গরম কেন? অত গরম দেখাতে এসো না বলছি! ব্যাটা ঢিল ছুড়ে মারবে, আর আমরা মুখ বুজে থাকব? . . . ছেড়ে দাও! . . . ছেড়ে দাও, নইলে ভালো হবে না বলছি! . . .'

লোকটা চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। একজন কসাক ঝুঁকে এক ঝটকায় কাঁধের রাইফেল তুলে নিয়ে তার শরীরে কুঁদোর ঘা বসিয়ে দিল। একটা নরম মচমচ আওয়াজ উঠল। মিনিট খানেক বাদে বন্য জন্তুর মতো একটা অস্ফুট চাপা চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল সদর রাস্তার ওপর। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ – শেষকালে আবার সেই কণ্ঠস্বর – তবে এবারে কচি, ভাঙা-ভাঙা, হাঁপাচ্ছে, যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে। একেকটি আঘাতের পর আর্তনাদের ফাঁকে ফাঁকে কাটা কাটা উচ্চারণে বলে যাচ্ছে, 'শুয়োরের বাচ্চা! . . . বিপ্লবের শত্রু! . . . মার্, কত মারবি! ওঃ! আ-আ-আ! . . .'

একের পর এক দুমদাম বাড়ি পড়তে থাকে।

লাগুতিন ছুটে ফিরে গেল লিস্ত্‌নিৎস্কির কাছে। তার হাঁটুর সঙ্গে লেপ্‌টে নখ দিয়ে জিনের একটা পাশ আঁচড়াতে আঁচড়াতে ধরা গলায় সে বলল, 'দয়া কর!'

'সরে যা বলছি!'

'মেজর! . . . লিস্ত্‌নিৎস্কি! . . . শুনছ? এর কৈফিয়ত দিতে হবে তোমাকে!'

'তোর মুখে থুতু ফেলি আমি!' হিসহিস করে কথাগুলো উচ্চারণ করে সোজা লাগুতিনের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিল লিস্ত্নিৎস্কি।

কসাকরা এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে ছুটে গিয়ে লাগুতিন চিৎকার করে বলল, 'ভাইসব! আমি রেজিমেন্টের বিপ্লবী কমিটির একজন মেম্বার। . . . আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, লোকটাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও! . . . কৈফিয়ত . . . কৈফিয়ত দিতে হবে এর জন্যে! . . . পুরনো জমানা আর নেই! . . .'

যুক্তিতর্কহীন অন্ধ ঘৃণা গাঢ় হয়ে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরল লিস্ত্নিৎস্কিকে। ঘোড়ার দু'কানের মাঝখানে চাবুক কষিয়ে সে ছুটে এলো লাগুতিনের কাছে। রিভল্‌বারের কালো চকচকে নলটা মুখের ওপর তুলে ধরে তেলের উৎকট গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'চোপ রও, বিশ্বাসঘাতক! বলশেভিক! গুলি করব!'

অনেক কষ্টে, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে রিভল্‌বারের ট্রিগার থেকে আঙুলটা ছাড়িয়ে নিল সে, ঘোড়াটাকে পেছনের দু'পায়ে খাড়া করে ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে ছুটিয়ে দিল।

এর কয়েক মিনিট পরে তার পেছন পেছন ঘোড়ার পিঠে চলল তিনজন কসাক। আর্জানভ আর লাপিন তাদের দুই ঘোড়ার মাঝখানে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একটা লোককে। লোকটার পাদুটো সমান ভাবে মাটিতে পড়ছে না, ভেজা জামাটা শক্ত হয়ে গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। কসাক দু'জন বগলের নীচে হাত গলিয়ে তাকে খাড়া করে রেখেছে। অল্প অল্প টলছে সে, রাস্তার পাথরের ওপর পা ঘস্‌টাচ্ছে। দুই কাঁধের তীক্ষ্ণ ফলা উঁচিয়ে আছে, মাঝখানে পেছন দিকে নেতিয়ে ঝুলছে তার থেঁতো-করা রক্তাক্ত মাথাটা। সাদা ফেকাসে থুতনিটা উঠে আছে ওপর দিকে। খানিকটা দূরে দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আরেক জন কসাক। একটা আলোকিত গলির মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেয়ে রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দিল সেই দিকে। অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে হাইবুটের গায়ে চাবুকের ঘা মেরে সংক্ষেপে কী যেন বলল সে। গাড়োয়ান বিনা বাক্যবায়ে বশংবদের মতো তড়িঘড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল রাস্তার মাঝখানে, যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর্জানভ আর লাপিন।

পর দিন ঘুম থেকে জেগে লিস্ত্নিৎস্কির চৈতন্য হল যে গতকাল সে একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছে। সে ভুল শোধরানোর আর কোন উপায় নেই এখন। কসাকদের দিকে যে লোকটা ঢিল মেরেছিল তাকে ধরে মারার দৃশ্যটি এবং অতঃপর তার আর লাগুতিনের মাঝখানে যা যা ঘটেছিল, মনে করতে গিয়ে সে ঠোঁট কামড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল, চিন্তিত ভাবে কাশল। জামাকাপড়

পরতে পরতে ভাবল, লাগুতিনকে ঘাঁটানো এখন ঠিক হবে না, রেজিমেন্ট-কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক যাতে খারাপ হয়ে না পড়ে সেটা দেখতে হবে। বরং অন্যান্য যে-সমস্ত কসাক উপস্থিত ছিল তাদের মন থেকে লাগুতিনের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটির ঘটনাটা যতদিন মুছে না যায় ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকা ভালো। তারপর তাকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিলেই চলবে।

'খুব হল কসাকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতানো!' নিজের কথাগুলো নিয়ে তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে মনে মনে ভাবল লিস্তনিৎস্কি। এর পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বিশ্রী ঘটনার স্মৃতিটা কিছুতেই আর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না সে।

আগস্টের প্রথম দিকে একবার চমৎকার রোদ-ঝলমলে এক দিনে আতারশ্চিকভের সঙ্গে লিস্তনিৎস্কি শহরে বেড়াতে বেরুল। অফিসারদের মিটিং-এর দিনে তাদের দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তারপর এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যার ফলে সেদিন যে বোঝাপড়াটা অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল তার কোন মীমাংসা হতে পারে। আতারশ্চিকভ আর মুখ খুলল না, প্রকাশের অনুপযোগী চিন্তাভাবনাগুলো মনের গহনে লালন-পালন করতে লাগল সে। লিস্তনিৎস্কি এর পর যখনই তার মনের কথা বার করার চেষ্টা করেছে, তখনই টেনে দিয়েছে সেই দুর্ভেদ্য যবনিকা, অপরের দৃষ্টি থেকে নিজের স্বরূপকে আড়াল দেবার জন্য বেশির ভাগ লোকই যার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত। লিস্তনিৎস্কির বরাবরই মনে হয়েছে যে অন্য লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় মানুষ তার বাহ্য রূপের আড়ালে আরও এমন একটা রূপ লুকিয়ে রাখে যা অনেক সময় অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-কোন মানুষের বাইরের খোলসটা ভেঙে ফেলতে পারলে মিথ্যার রঙ-না-চড়ানো, নিরাবরণ, আসল শাঁসটা ভেতর থেকে ঠিক বেরিয়ে আসবে। এই কারণে বিভিন্ন মানুষের রুক্ষ, কঠিন, নির্ভীক, নির্লজ্জ, সাফল্যতৃপ্ত, প্রফুল্লতায় ভরা বাহ্য রূপের আড়ালে কী আছে জানার জন্য সে সর্বদা ছটফট করত। এক্ষেত্রে, আতারশ্চিকভের কথা ভেবে লিস্তনিৎস্কি শুধু একটি অনুমানই করে নিয়েছে – যে-সব জটিল বিরোধ দেখা দিয়েছে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে কসাকদের যুক্ত করে ফেলেছে আতারশ্চিকভ। এই অনুমানের ফলে আতারশ্চিকভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতানোর চেষ্টা থেকে সে বিরত রইল, তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল।

নেভ্স্কি এভিনিউ ধরে চলতে চলতে দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে মামুলি দু'-একটা কথাবার্তা চলতে লাগল। চোখের ইঙ্গিতে একটা রেস্তোরাঁর দরজা দেখিয়ে লিস্তনিৎস্কি প্রস্তাব করল, 'কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'তা মন্দ হয় না,' আতারশ্চিকভ রাজি হল।

ভেতরে ঢুকে খানিকটা অসহায়ের মতো তারা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল – একটা টেবিলও খালি নেই। আতারশ্চিকভ ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ফিটফাট পোশাক-পরিচ্ছদ পরা মোটাসোটা চেহারার যে ভদ্রলোকটি জানলার পাশে টেবিলের ধারে দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বসে ছিল এবং এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের দু'জনকে দেখছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বিনীত ভাবে মাথার টুপিটা তুলে তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

'মাফ করবেন। যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের টেবিলটা নিতে পারেন। আমরা চলে যাচ্ছি।' তামাকের রং-ধরা ফাঁকা ফাঁকা দাঁতের পাটি বার করে মৃদু হাসল সে। হাত নেড়ে ভঙ্গি করে ওদের এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'অফিসারদের সেবা করতে পেরে আমি কৃতার্থ। আপনারা আমাদের গৌরব।'

মহিলা দু'জন উঠে দাঁড়াল। একজন লম্বা, তার মাথার চুল কালো। চুলের পাট ঠিক করতে লাগল সে। অন্যজনের বয়স একটু কম। হাতের ছাতাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভদ্রলোক দয়া করে টেবিল ছেড়ে জায়গা করে দেওয়ায় অফিসারদু'জন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। নামিয়ে দেওয়া পর্দার ফাঁক দিয়ে ভাঙা রোদের কিরণ হলদে ছুঁচের মতো এসে বিঁধছে টেবিলের ওপর। টেবিলের ওপর সাজানো তাজা ফুলের মন মাতানো মৃদু সুবাস ছাপিয়ে উঠছে খাবারের খোশবাই।

বরফ দেওয়া বীটশাকের ঝোলের ফরমাস দিল লিস্ত্নিৎস্কি। ঝোলের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে ফুলদানি থেকে একটা ফুল টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার হলদে-লাল পাপড়ি ছিঁড়তে লাগল সে। আতারশ্চিকভ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, ক্লান্ত ভাবে চোখদুটো নামিয়ে ঘনঘন চোখ মিটমিট করতে করতে পাশের টেবিলের পায়ার ওপর রোদের আলোর খেলা দেখতে লাগল।

তাদের খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় জোরে জোরে কথা বলতে বলতে দু'জন অফিসার এসে ঢুকল রেস্তোরাঁয়। সামনের জন খালি টেবিল খুঁজতে গিয়ে রোদে পোড়া মসৃণ তামাটে মুখটা লিস্ত্নিৎস্কির দিকে ফেরাল। অমনি আনন্দে ঝলমল করে উঠল তার টেরছা কালো চোখদুটো।

'আরে, লিস্ত্নিৎস্কি না? . . .' চেঁচিয়ে উঠল সে। তারপর মনের মধ্যে এতটুকু সন্দেহের ছায়া না রেখে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল লিস্ত্নিৎস্কির দিকে।

লোকটার কালো গোঁফের নীচে ঝকঝক করে উঠল সাদা ধবধবে দাঁতের সারি। লিস্ত্নিৎস্কি চিনতে পারল মেজর কাল্মিকোভকে। তার পেছনের অফিসারটি চুবোভ। লিস্ত্নিৎস্কি আন্তরিক খুশি হয়ে ওদের সঙ্গে করমর্দন করল। আতারশ্চিকভের সঙ্গে রেজিমেণ্টের এককালের সঙ্গীদু'জনের পরিচয়

করিয়ে দিয়ে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী মনে করে?'

মাথা পেছনে হেলিয়ে গোঁফ পাকাতে পাকাতে আড়চোখে ঘরের চারধারে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে কাল্‌মিকোভ বলল, 'একটা বিশেষ কাজের ভার নিয়ে এসেছি আমরা। পরে বলব। আগে তোমার কথা বল, শুনি। কেমন কাটছে চৌদ্দ নম্বর রেজিমেণ্টে?'

. . .ওরা সকলে একসঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরুল। কাল্‌মিকোভ আর লিস্তনিৎস্কি পেছনে পড়ে রইল, প্রথমেই যে গলিটা পড়ল মোড় নিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। আধঘন্টা বাদে দেখা গেল শহরের কোলাহলমুখর এলাকা ছাড়িয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তারা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে।

'আমাদের তিন নম্বর কোরটাকে রুমানিয়া ফ্রণ্টে রিজার্ভ হিশেবে রাখা হয়েছে,' উৎফুল্ল হয়ে বলতে শুরু করে কাল্‌মিকোভ। 'হপ্তা দেড়েক আগে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম আরেকজনের হাতে আমার স্কোয়াড্রনের ভার দিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট চুবোভের সঙ্গে আমাকে ডিভিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে, তাঁরা যেখানে পাঠানো দরকার পাঠাবেন আমাকে। চমৎকার! স্কোয়াড্রনের ভার বুঝিয়ে দিলাম। ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারে এলাম আমরা। জরুরী বিভাগের এক কর্ণেল - কর্ণেল ম. - তুমি তাকে জান, গোপনে আমাকে জানাল যে আমাকে অবিলম্বে দেখা করতে হবে জেনারেল ক্রিমভের সঙ্গে। আমি আর চুবোভ সঙ্গে সঙ্গে চললাম কোরের হেড কোয়ার্টারে। ক্রিমভের* সঙ্গে আমার দেখা হল। কোন্ কোন্ অফিসারকে তাঁর কাছে পাঠানো হচ্ছে আগে থাকতেই তিনি জানেন। তাই কোন রকম ভনিতা না করে সরাসরি তিনি জানালেন, 'সরকার এমন সব লোকদের হাতে পড়েছে যারা জেনেশুনেই দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারী চক্রীদলকে সরানো একান্ত দরকার, এমনকি সম্ভবত সাময়িক সরকারের বদলে মিলিটারী ডিক্টেটরশিপও বসানোর দরকার হতে পারে।' সম্ভাব্য প্রার্থী হিশেবে তিনি জেনারেল কর্নিলভের নাম করলেন। তারপর আমাকে পেত্রোগ্রাদে গিয়ে অফিসার সঙ্ঘের প্রধান কমিটির নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বললেন। এখন এখানে কয়েক শ' বিশ্বস্ত অফিসার দলে দলে এসে হাজির হয়েছে। আমাদের ভূমিকাটা কী বুঝতে পারছ? অফিসার সঙ্ঘের প্রধান কমিটি আমাদের কসাক সৈন্যসঙ্ঘের পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাচ্ছে। জংশন-স্টেশন আর ডিভিশনগুলোতে ঝটিতি আক্রমণের জন্য বিশেষ

---

* আলেক্সান্দর মিখাইলভিচ ক্রিমভ (১৮৭১-১৯১৭) - প্রতিবিপ্লবের অন্যতম সংগঠক। কর্নিলভ-অভ্যুত্থানের সময় প্রতিবিপ্লবী কোর্-এর সেনানায়ক। পেত্রোগ্রাদ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর গুলি করে আত্মহত্যা করেন। - অনুঃ

ব্যাটেলিয়ন* গড়ে তোলা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে যা যা কাজে লাগবে তার সঙ্গে . . .'

'কোথায় গিয়ে গড়াবে শেষ পর্যন্ত? তোমার কী মনে হয়?'

'বোঝ কাণ্ড! এখানে থেকেও, বলতে চাও অবস্থা কী বুঝতে পারছ না? একটা কু-দে-তা যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ক্ষমতা দখল করবে কর্নিলভ। আর্মি পুরোপুরি তার পক্ষে আছে। আমাদের ওখানে লোকে মনে করে কর্নিলভ আর বলশেভিকরা সমান পর্যায়ের দুই বিভিন্ন শক্তি। কেরেন্‌স্কির অবস্থা হয়েছে এ দুয়ের মাঝখানে যাঁতায় পড়ার মতো – একজন না একজন তাকে পিষবেই। এখনকার মতো তাই শুয়ে থাক আলিসার** বিছানায়। এক দিনের খলিফা সে।' কাল্‌মিকোভ একটু চুপ করে থেকে অন্যমনস্ক ভাবে তলোয়ারের হাতলের ঝালর ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'দাবার ছকে আমরা আসলে হলাম বড়ে, খেলোয়াড় চাল দিয়ে কোথায় পাঠাবে আমাদের আমরা তার কিছুই জানি নে। . . . এই আমার কথাই ধর না কেন, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে এখন কী ঘটছে তার কোন ধারণা নেই আমার। কিন্তু আমি জানি কর্নিলভ, লুকোম্‌স্কি, রমানোভ্‌স্কি, ক্রিমভ, দেনিকিন, কালেদিন, এর্দেলি এবং আরও অনেকের মধ্যে – জেনারেলদের মধ্যে – কোন এক গোপন যোগসাজস, একটা গোপন বোঝাপড়া আছে। . . .'

'কিন্তু আর্মি? . . . গোটা আর্মি কি কর্নিলভের পেছনে থাকবে?' পায়ের গতি আরও বাড়াতে বাড়াতে জিজ্ঞেস করে লিস্তনিৎস্কি।

'সৈন্যরা অবশ্যই থাকবে না। কিন্তু আমরা তাদের চালিয়ে নিয়ে যাব।'

'বামপন্থীদের চাপে পড়ে কেরেন্‌স্কি সুপ্রিম কম্যাণ্ডারকে হটাতে চাইছে সে কথা তুমি জান?'

'সে সাহস তার হবে না! তার পর দিনই তাকে নতজানু হতে হবে। অফিসার সঙ্ঘের প্রধান কমিটি এ বিষয়ে তার মতামত একেবারে স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিয়েছে।'

'গতকাল কসাক সৈন্যসঙ্ঘের পরিষদের এক প্রতিনিধিদল তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল,' মুচকি হেসে লিস্তনিৎস্কি বলল। 'তারা জানিয়ে দিয়েছে যে কর্নিলভকে সরানোর কোন চিন্তা পর্যন্ত কসাকরা বরদাস্ত করবে না। উত্তরে কেরেন্‌স্কি কী বলেছে জান? 'এটা একটা অভিসন্ধিমূলক রটনা। এরকম কোন ব্যবস্থাগ্রহণের ইচ্ছা সাময়িক সরকারের আদৌ নেই।' জনসাধারণকে যেমন আশ্বাস

---

* ঝটিতি আক্রমণের জন্য বিশেষ ব্যাটেলিয়ন বা 'শক' ব্যাটেলিয়ন – এগুলি গড়ে উঠত প্রধানত বিত্তবান শ্রেণীগুলি থেকে আগত উগ্র জাতীয়তাবাদী তরুণদের নিয়ে। মেয়েদেরও ওই রকম ব্যাটেলিয়ন ছিল। – অনুঃ

** জার দ্বিতীয় নিকলাইয়ের স্ত্রী আলেক্সান্দ্রা ফিওদরভ্‌নার প্রাক-বিবাহ নাম – প্রিন্সেস আলিসা। – অনঃ

দিচ্ছে সেই সঙ্গে শ্রমিক কৃষক ও লালফৌজী প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির দিকে বেশ্যার মতো চোখ ঠেরে হাসছে।'

কাল্‌মিকোভ হাঁটতে হাঁটতেই পকেট থেকে অফিসারের ফিল্‌ড নোটবই বার করে জোরে জোরে পড়ে শোনাল, ''সমাজকর্মীদের সভা রুশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছে। সভা ঘোষণা করিতেছে যে সেনাবাহিনীতে এবং সামগ্রিক ভাবে রাশিয়ায় আপনার মর্যাদাকে খর্ব করিবার যে কোন প্রচেষ্টা অপরাধরূপে গণ্য হইবে। এই সভা অফিসারদিগের, সেন্ট জর্জ ক্রসধারী সৈনিক ও কসাকদিগের কণ্ঠের সহিত নিজ কণ্ঠ মিলাইতেছে। আজিকার এই সুকঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে রাশিয়ার বিচার-বিবেচনাশীল সকল মানুষ আশাভরসা ও বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও রাশিয়ার উদ্ধারসাধনের যে মহান কর্মে আপনি ব্রতী হইয়াছেন ঈশ্বর তাহার সহায় হউন! রদ্‌জিয়ান্‌কো*।' আশা করি সব পরিষ্কার? কর্নিলভকে সরানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। . . . হ্যাঁ, ভালো কথা, গতকাল ওঁর আসার দৃশ্যটা দেখেছিলে?'

'আমি সবে রাতে এসে পৌঁছেছি ত্‌সার্‌স্কোয়ে সেলো থেকে।'

নিখুঁত সারি বাঁধা দাঁতের পাটি আর স্বাস্থ্যদীপ্ত গোলাপী মাঢ়ী বার করে কাল্‌মিকোভ হাসল। তার সরু চোখদুটো কুঁচকে গেল, চোখের কোনায় জেগে উঠল সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য সরু সরু কুঞ্চনরেখা।

'ক্লাসিক বলা যেতে পারে! তেকিনদের** একটা স্কোয়াড্রন ছিল তাঁর রক্ষী। মোটরগাড়িতে মেশিনগান। সব চলেছে শীত-প্রাসাদের দিকে। একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাবধান করে দেওয়া। . . . হা-হা-হা! লোমশ টুপির নীচে ওই তেকিনদের মুখগুলো যদি একবার দেখতে! ওঃ দেখার মতো বটে! নিজস্ব ধরনের একটা ছাপ রেখে যায় মনে!'

মস্কো-নার্ভা এলাকা ধরে খানিকটা ঘোরাফেরা করার পর ওরা যে যার পথে চলে গেল।

'আমাদের একে অন্যের চোখের আড়াল হলে চলবে না ইয়েভ্‌গেনি,' বিদায় নিতে গিয়ে কাল্‌মিকোভ বলল। 'সামনে দুর্দিন আসছে। শক্ত করে মাটিতে পা রাখতে হবে, নইলে খাড়া থাকতে পারবে না!'

* মিখাইল রদ্‌জিয়ান্‌কো (১৮৫৯-১৯২৪) - বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী দলের জনৈক নেতা। জনৈক বৃহৎ জমিদার। ১৯১১-১৯১৭ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ স্টেট-দুমার প্রতিনিধি। ১৯১৭ সালে স্টেট-দুমার সাময়িক কমিটির প্রতিনিধি। পরে দেশান্তরী হন। - অনুঃ

** তুর্কমেনদের সবচেয়ে বড় একটি গোষ্ঠী। - অনুঃ

লিস্তনিৎস্কি উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, এমন সময় সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে কাল্‌মিকোভ তাকে ডেকে বলল, 'ওহো তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আমাদের মের্কুলভকে মনে আছে ত তোমার?' সেই যে ছবি আঁকত?'

'হ্যাঁ। কী হয়েছে তার?'

'মারা গেছে, গত মে মাসে।'

'অ্যাঁ, বল কী!'

'শুধুই কি তাই? একেবারে বেঘোরে মারা যাওয়া যাকে বলে! এর চেয়ে মূর্খের মতো মারা কেউ যায় না। একজন স্কাউটের হাতে একটা হাতবোমা ফেটে গিয়েছিল, তার দু'খানা হাতই কনুই থেকে উড়ে গিয়েছিল। মের্কুলভের অবশিষ্ট বলতে পাওয়া গেছে তার খানিকটা নাড়িভুঁড়ি আর ফিল্‌ড গ্লাসের ভাঙা টুকরো। তিন বছর ধরে যমকে ফাঁকি দেওয়ার পর . . .'

কাল্‌মিকোভ চেঁচিয়ে আরও কী যেন বলল। কিন্তু একটা দমকা বাতাস উঠে ধুলোর ধূসর ঘূর্ণি তুলে শব্দের শেষের স্বরহীন কতকগুলো আওয়াজ ভাসিয়ে নিয়ে এলো। লিস্তনিৎস্কি সে দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরে তাকাতে তাকাতে সামনে এগিয়ে চলল।

তেরো

আগস্ট মাসের ৬ তারিখে সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তরের প্রধান জেনারেল লুকোম্‌স্কি আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের ফার্স্ট কোয়ার্টার-মাস্টার-জেনারেল জেনারেল রমানোভ্‌স্কির মারফত নেভেল – নিজ্‌নি সকোল্‌নিকি – ভেলিকিয়ে লুকি এলাকায় আদিবাসী ডিভিশনের সঙ্গে ৩ নম্বর ঘোড়সওয়ার কোর্‌ সমাবেশ করার নির্দেশ পেল।

'ঠিক এই এলাকাতেই পাঠানো কেন? এই ইউনিটগুলো যে রুমানিয়া ফ্রন্টের রিজার্ভ হিশেবে রাখা আছে!' হতবুদ্ধি লুকোম্‌স্কি জিজ্ঞেস করল।

'জানি না, আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ। সুপ্রিম কম্যাণ্ডারের যা আদেশ হয়েছে হুবহু আপনাকে জানালাম।'

'কবে পেয়েছেন আপনি?'

'গতকাল। রাত এগারোটার সময় সুপ্রিম কম্যাণ্ডার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন আজ সকালে যেন খবরটা আপনাকে দেওয়া হয়।'

লুকোম্‌স্কির অফিসঘরের অর্ধেক দেয়াল জুড়ে ঝুলছিল মধ্য ইউরোপের একটা স্ট্র্যাটেজিক ম্যাপ। পা টিপে টিপে জানলার ধারে খানিকটা পায়চারি করার পর

রমানোভ্স্কি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাপটার সামনে। লুকোম্স্কির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখতে দেখতে সে বলল, 'আপনি গিয়ে ওঁর কাছ থেকে বুঝে নিন না। . . . উনি এখন অফিসেই আছেন।'

টেবিল থেকে কাগজপত্র তুলে নিয়ে চেয়ারটা ঠেলে দিল লুকোম্স্কি। ভারী চেহারার সমস্ত প্রৌঢ় ফৌজী লোকের মতোই বিশেষ ভঙ্গিতে গটগট করে পা ফেলে ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেল সে। দরজার কাছে এসে রমানোভ্স্কিকে আগে বেরিয়ে যাবার জন্য পথ করে দিয়ে স্পষ্টই নিজের চিন্তাভাবনার ধারা অনুসরণ করে সে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলেছেন।'

কর্নিলভের ঘর থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এলো লম্বা লিকলিকে একজন কর্ণেল। লোকটা লুকোম্স্কির অপরিচিত। সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে একপাশে সরে গিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল সে। তার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার ভঙ্গিটি চোখে পড়ার মতো। চলতে চলতে শেল্‌শক পাওয়া একটা কাঁধ যে রকম ভয়ঙ্কর ভাবে সে নাচাচ্ছিল তা দেখলে হাসি পায়।

কর্নিলভের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এক প্রৌঢ় অফিসার। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে দু'হাতের চেটো তেরছা করে রেখে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন কর্নিলভ।

' . . . সেটাই আশা করা উচিত ছিল। আমার কথাটা বুঝতে পারলেন আপনি? দয়া করে প্সকোভ পৌঁছুনোমাত্র আমাকে খবর পাঠাবেন। যেতে পারেন।'

অফিসারটির পেছন পেছন দরজা যতক্ষণ বন্ধ না হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করার পর যুবকের মতো লঘু ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়লেন কর্নিলভ। আরেকটা চেয়ার টেনে লুকোম্স্কির দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিন নম্বর কোর্‌কে অন্য জায়গায় চালান করার যে-নির্দেশ আমি দিয়েছি রমানোভ্স্কির কাছ থেকে সে খবর আপনি পেয়েছেন ত?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে। কোর্ সমাবেশের জন্য আপনি বিশেষ করে এই এলাকা বেছে নিলেন কেন?'

লুকোম্স্কি মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখল কর্নিলভের রোদে-পোড়া তামাটে মুখটা। এশীয় চরিত্রের মুখ – নির্লিপ্ত, দুর্ভেদ্য। নাক থেকে পাতলা ঝোলা গোঁফে ঢাকা নির্দয় মুখবিবরের ওপরে, গালের দু'পাশে বাঁকা হয়ে নীচে নেমে এসেছে চিরপরিচিত বলিরেখা। কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো একগোছা চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। একমাত্র তারই ফলে মুখের রূঢ় কঠোর ভঙ্গির উপশম ঘটেছে।

টেবিলের ওপর একটা কনুইয়ের ভর রেখে ছোট্ট শুকনো হাতের তেলোয় চিবুক ঠেকিয়ে কর্নিলভ তার জ্বলজ্বলে মোঙ্গলীয় ধাঁচের

চোখদুটি কোঁচকালেন, আরেক হাতে লুকোম্স্কির হাঁটু স্পর্শ করলেন।

'ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের বিশেষ করে উত্তর ফ্রন্টের ওপাশে জড়ো না ক'রে আমি চাই এমন একটা এলাকায় তাদের জড়ো করতে যেখান থেকে দরকার হলে সহজেই উত্তর অথবা পশ্চিম ফ্রন্টে তাদের চালান করা যায়। আমার মনে হয় যে-এলাকাটা বাছাই করা হয়েছে তাতে এই দাবি অনেকাংশে মিটতে পারে। আপনার কি এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত আছে? যদি অন্য কোন মত পোষণ করে থাকেন তাহলে বলুন সেটা কী?'

লুকোম্স্কি অনিশ্চিত ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।

'পশ্চিম ফ্রন্টের জন্যে চিন্তা করার কোন যুক্তি দেখি না। তার চেয়ে বরং প্সকোভ এলাকায় ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের জড়ো করা ভালো।'

'প্সকোভ?' কর্নিলভ পুরো শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন। এমন ভাবে ভুরু কোঁচকালেন যে তার পাতলা বিবর্ণ ওপরের ঠোঁটটা সামান্য বেঁকে গেলেন। মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'না, প্সকোভ এলাকা ঠিক উপযুক্ত নয়।'

একজন শ্রান্ত ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষের মতো চেয়ারের দু'পাশের হাতলের ওপর দু'হাত রাখল লুকোম্স্কি। হুঁশিয়ার হয়ে বেছে বেছে শব্দ উচ্চারণ করে সে বলল, 'লাভ্‌র গেওর্গিয়েভিচ, আমি এক্ষুনি প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ দিচ্ছি, কিন্তু আমার মন বলছে আপনি সবটা ভাঙছেন না। . . . ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের জড়ো কবার জন্য যে জায়গা আপনি বেছে নিয়েছেন সেটা তখনই খুব ভালো হত যদি তাদের পেত্রোগ্রাদ কিংবা মস্কোয় পাঠানোর প্রশ্ন আসত। কিন্তু এ ভাবে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের রাখলে উত্তর ফ্রন্টের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে বলে মনে হয় না। একমাত্র এই কারণেই হবে না যে তাদের চালান করার অসুবিধা দেখা দেবে। আমি যদি কোন ভুল না করে থাকি, আপনি যদি সত্যি সত্যিই সবটা না ভেঙে থাকেন তাহলে আপনার কাছে আমার অনুরোধ – হয় আমাকে ফ্রন্টে যেতে দিন, নয়ত আপনার পরিকল্পনা পুরোপুরি ভেঙে বলুন। সদর দপ্তরের প্রধান একমাত্র তখনই তার পদে থাকতে পারে যদি তার ওপর কর্তৃপক্ষের পূর্ণ আস্থা থাকে।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে মাথা নীচু করে লুকোম্স্কির কথাগুলো শুনে গেলেন কর্নিলভ। কিন্তু তারই ফাঁকে লুকোম্স্কির আপাত শান্ত মুখের ওপর কুণ্ঠাজড়িত উত্তেজনার অদৃশ্যপ্রায় আভা তাঁর তীক্ষ্ণ নজর এড়াল না। উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলেন তিনি।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করেই আমি এটা করেছি। সে ব্যাপারে আমি আপনাকে এখনও কিছু বলি নি। . . . দয়া করে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদল চালানের নির্দেশ দিন, আর তিন নম্বর কোর্-এর কম্যাণ্ডারকে –

জেনারেল ক্রিমভকে এই মুহূর্তে এখানে ডেকে পাঠান। আপনার সঙ্গে আমার বিশদ কথাবার্তা হবে আমি পেত্রোগ্রাদ থেকে ফিরে আসার পর। বিশ্বাস করুন আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ, আপনার কাছ থেকে কিছু লুকানোর এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই।' শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললেন কর্নিলভ, তারপর দরজায় টোকা পড়তে চটপট সেদিকে ঘুরে সাড়া দিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

এসে ঢুকল দু'জন – জেনারেল-হেড কোয়ার্টারের অ্যাসিস্টেণ্ট কমিসার ফন্ ভিজিন, তার সঙ্গে বেঁটেখাটো গড়নের জেনারেল – শণের নুড়ির মতো মাথার চুল। লুকোমস্কি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। যেতে যেতে শুনতে পেল ফন্ ভিজিনের প্রশ্নে কর্নিলভের কড়া জবাব।

'জেনারেল মিলারের কেস নতুন করে বিবেচনা করে দেখার সময় আমার এখন নেই। কী বলছেন? . . . হ্যাঁ, আমাকে যেতে হচ্ছে।'

কর্নিলভের কাছ থেকে ফেরার পর অনেকক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল লুকোমস্কি। স্বল্প পাক-ধরা লম্বা ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল বাগানে বাতাস পাট করে দিচ্ছে বাদামগাছের ঘন আলুথালু মাথা, সূর্যের আলোয় চকচকে, নুয়ে-পড়া ঘাসের ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

এক ঘণ্টা পরে তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার কোর্-এর সদর দপ্তর সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তরের প্রধানের কাছ থেকে স্থান বদলের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ পেল। কোর্-এর কম্যাণ্ডার, জেনারেল ক্রিমভ এক সময় কর্নিলভের অনুরোধে ১১ নম্বর আর্মির কম্যাণ্ডারের পদে নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্থান বদলের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ যে দিন পেল সেই দিনই এক সাঙ্কেতিক তারবার্তায় আর্মির সদর দপ্তরে অবিলম্বে উপস্থিত হওয়ার জরুরী নির্দেশ পেল সে।

আগস্টের ৯ তারিখে তেকিনদের একটা স্কোয়াড্রনের রক্ষণাবেক্ষণে একটা বিশেষ ট্রেনে চেপে পেত্রোগ্রাদে রওনা দিলেন কর্নিলভ।

পর দিন সর্বাধিনায়কের অপসারণের, এমনকি তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন এই মর্মে গুজব পর্যন্ত রটে গেল আর্মির সদর দপ্তরে। কিন্তু ১১ তারিখ সকাল বেলায় কর্নিলভ মগিলিওভে ফিরে এলেন।

ফেরার সঙ্গে সঙ্গে লুকোম্‌স্কিকে তলব পাঠালেন। টেলিগ্রাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলো ভালো করে পড়ার পর তৈলচিক্কণ হাতের সরু কব্‌জির চারপাশে জড়িয়ে থাকা নিখুঁত সাদা জ্বলজ্বলে কাফগুলো সযত্নে ঠিক করে নিলেন, কলারটা ছুঁয়ে দেখলেন। এই শশব্যস্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে এমন একটা উদ্বেগের আভাস ছিল যা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

'হ্যাঁ, তখন যে কথা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এখন আমরা তা শেষ

করতে পারি,' অনুচ্চ স্বরে তিনি বললেন। 'যে বিবেচনা থেকে তিন নম্বর কোর্‌কে পেত্রোগ্রাদের দিকে চালাতে আমি বাধ্য হয়েছি এবং যে কথা আমি আপনার সঙ্গে এখনও আলোচনা করি নি সেই প্রসঙ্গে আমি ফিরে যেতে চাই। আপনি জানেন যে তেসরা আগস্ট যখন পেত্রোগ্রাদে সরকারের এক আলোচনা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম তখন কেরেন্‌স্কি আর সাভিন্‌কভ* আমাকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে আমি যেন প্রতিরক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্ন না তুলি, কেননা তাঁদের কথায়, মন্ত্রীদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যাদের বিশ্বাস করা যায় না। আমি সুপ্রিম কম্যাণ্ডার হয়ে সরকারের সামনে কাজের রিপোর্ট দিতে গিয়ে যুদ্ধের জরুরী পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। কেন? না, এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই যে আমি যা বলব কয়েকদিনের মধ্যে তা জার্মান হাই কম্যাণ্ডের কাছে জানাজানি হয়ে যাবে না! একে আপনি বলবেন সরকার? এর পর আমি কী করে বিশ্বাস করতে পারি যে এই সরকার দেশকে বাঁচাবে?' কর্নিলভ দৃঢ় পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে, চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে জায়গায় ফিরে এলেন। উত্তেজিত ভাবে টেবিলের সামনে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'কতকগুলো মেরুদণ্ডহীন কীট দেশ শাসন করছে একথা ভাবতে গেলেও দুঃখ হয়, মনে জ্বালা ধরে যায়। ইচ্ছাশক্তির অভাব, চরিত্রের দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা, দোদুল্যমানতা, কোন কোন সময় স্রেফ নীচতা – এইগুলোই আজ পরিচালনা করছে আমাদের সরকারের কার্যকলাপ – অবশ্য আদৌ যদি তাকে 'সরকার' বলা যায়। চের্নোভ** আর তারই মতো তাবৎ মহোদয়দের নীরব সমর্থনে বলশেভিকরা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে কেরেন্‌স্কিকে। দেখুন আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ, কী অবস্থায় আজ এসে পৌঁছেছে রাশিয়া! আপনি জানেন কোন্‌ নীতি আমাকে পথ দেখাচ্ছে। সেই নীতির নির্দেশ মেনে আমি আরেক ওলটপালট থেকে দেশকে বাঁচাতে চাই। তিন নম্বর ক্যাভালেরি কোর্‌কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হল যাতে আগস্টের শেষ দিকে পেত্রোগ্রাদের কাছাকাছি তাকে জড় করা যায়, তখন বলশেভিকরা নেমে পড়লে দেশের বিশ্বাসঘাতকগুলোকে এক হাত দেখে নেওয়া যাবে। অপারেশনের সরাসরি ভার তুলে দিচ্ছি জেনারেল ক্রিমভের হাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তেমন দরকার পড়লে শ্রমিক ও সৈনিক সোভিয়েতের সবগুলো প্রতিনিধিকে ধরে ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলাতে এতটুকু ইতস্তত

* বরিস ভিক্তরভিচ সাভিন্‌কভ (১৮৭৯-১৯২৫) – বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী। সাময়িক সরকারে সহকারী সমরমন্ত্রী। সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত ও প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের নেতা। – অনুঃ

** ভিক্তর মিখাইলভিচ চের্নোভ (১৮৭৩-১৯৫২) – বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তাত্ত্বিক। ১৯১৭ সালে সাময়িক সরকারের কৃষিমন্ত্রী, সংবিধান সভার প্রতিনিধি। প্রতিবিপ্লবী সরকারের সদস্য। পরবর্তীকালে দেশত্যাগী হন। – অনুঃ

করবেন না তিনি। সাময়িক সরকার . . . হুম্‌, দেখা যাবে কী সেই সরকার। আমি নিজের জন্যে এতটুকু ভাবি না। রাশিয়াকে বাঁচাতেই হবে। যে-কোন ভাবেই হোক, যে কোন মূল্যেই হোক না কেন তাকে বাঁচাতে হবে। . . .'

পায়চারী থামিয়ে লুকোম্‌স্কির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে কর্নিলভ আচম্‌কা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যে ব্যবস্থা নিতে চলেছি একমাত্র তাতেই যে দেশের আর আর্মির ভবিষ্যৎ নিরাপদ হওয়া সম্ভব এই বিষয়ে কি আপনি আমার সঙ্গে এক মত ? আপনি কি একাজে আমার সঙ্গে একেবারে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি আছেন ?'

চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়ে কর্নিলভের উষ্ণতাভরা শুকনো হাতটা শক্ত হাতের মুঠোয় সাবেগে চেপে ধরল লুকোম্‌স্কি।

'আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত! একেবারে শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আমি। সব দিক ভালো করে ভেবেচিন্তে, ওজন করে দেখার পর ঘা মারতে হবে। আমার ওপর কাজের ভার দিয়ে বিশ্বাস রাখতে পারেন লাভ্‌র গেওর্গিয়েভিচ।'

'পরিকল্পনা আমার তৈরি। ভেতরের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বিশদ করে দেখছেন কর্ণেল লেবেদেভ আর কেপ্টেন রোজেন্‌কো। আপনার ওপর কিন্তু বিরাট কাজের ভার, আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। সব কিছু আলোচনা করে দেখার মতো সময় আমাদের পরে হবে। তখন দরকার হলে সেই অনুযায়ী অদলবদল করা যাবে।'

এরপর কয়েক দিন ধরে দারুণ উত্তেজনা চলল সদর দপ্তরে। সহায়তার নানা প্রস্তাব নিয়ে প্রতিদিন মগিলিওভে গভর্ণরের বাড়িতে ফ্রন্টের বিভিন্ন ইউনিট থেকে এসে ভিড় করতে লাগল ধুলোমাখা খাকি ফিল্‌ড শার্ট গায়ে, রোদে পোড়া, ঝড়-ঝাপ্‌টা-খাওয়া চেহারার অফিসাররা। আসতে লাগল অফিসার সঙ্ঘ আর কসাক সৈন্যসঙ্ঘ পরিষদের সুবেশধারী প্রতিনিধিরা, দন অঞ্চল থেকে সেখানকার সেনাবাহিনীর প্রথম সহকারী কসাক আতামান কালেদিনের* বার্তাবহরা। আগন্তুকদের মধ্যে কিছু অসামরিক লোকজনও ছিল। যারা এসেছিল তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল যারা ফেব্রুয়ারীতে অধঃপতিত পুরনো রাশিয়াকে খাড়া করে তোলার কাজে কর্নিলভকে মনেপ্রাণে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু শকুনের মতো এমন কিছু কিছু লোকও ছিল যারা দূর থেকে প্রচুর রক্তপাতের আভাস পেয়ে, কার কৌশলী শক্ত হাত দেশের ধমনী উন্মুক্ত করবে আগে থাকতে তা আন্দাজ করে মগিলিওভে

* আলেক্সান্দর মাক্সিমভিচ কালেদিন (১৮৬১-১৯১৮) - দনে কসাক প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর নেতা, জেনারেল। ১৯১৭ সাল থেকে দন ফৌজ এলাকার আতামান ও ফৌজী সরকারের প্রধান। গুলি করে আত্মহত্যা করেন। - অনুঃ

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসেছে। তাদের আশা তারাও এখান থেকে একটা ভাগ ছিনিয়ে নিতে পারবে। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এই রকম লোকজন হিশেবে ব্রিন্‌স্কি, জাভোইকো ও আলাদিনের নাম আর্মির সদর দপ্তরে বারবার উচ্চারিত হতে লাগল। আর্মির সদর দপ্তরে এবং দন সেনাবাহিনীর অভিযানকালীন আতামানের সদর দপ্তরে এই মর্মে চাপা গুঞ্জন চলতে লাগল যে কর্নিলভ বড় বেশি বিশ্বাসপ্রবণ, আর তারই ফলে হঠকারিদের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অফিসারদের একটা ব্যাপক মহলে প্রধানত যে বিশ্বাসটা বজায় ছিল তা হল এই যে কর্নিলভ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে অধঃপতিত পুরনো রাশিয়ার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। তাই পুনঃসংস্থাপন যাদের প্রবল ভাবে কাম্য নানা প্রান্ত থেকে এমন বহু লোক এই পতাকাতলে এসে সমবেত হতে লাগল।

আগস্টের ১৩ তারিখে সরকারী বৈঠকে যোগদানের জন্য কর্নিলভ মস্কো যাত্রা করলেন।

দিনটা গরম, সামান্য মেঘলা। আকাশটা যেন নীলচে আভার এলুমিনিয়মে ঢালাই করা। একেবারে মাথার ওপর ভেড়ার লোমশ চামড়ার মতো মেঘ ঝুলছে, কিনারায় বেগনী রঙের ছটা। সেই মেঘ থেকে রামধনুর রঙে বিচ্ছুরিত হয়ে তেরছা হয়ে নামতে শুরু করল বৃষ্টির প্রবল ধারা। মাঠের ওপর দিয়ে, রেললাইন ধরে ঘটাং ঘটাং শব্দে ছুটে চলা গাড়ির ওপর দিয়ে, ম্রিয়মাণ পত্ররাশি ঘেরা রূপকথার জগতের মতো অস্পষ্ট ম্লান বনের মাথা, দূরের বার্চকুঞ্জের নিখুঁত জলরঙা ছবির পরিলেখ আর আগাগোড়া বিধবার বেশ পরা প্রথম শরতের ধরণী – সব একসা করে ভাসিয়ে ঝমঝম করে ঝরতে লাগল বৃষ্টি।

একের পর এক জায়গা সরে সরে যাচ্ছে। পেছনে ধোঁয়ার লালচে ধূসর রেখা টেনে এগিয়ে চলেছে ট্রেন। খোলা জানলার ধারে খাকি উর্দি পরা বেঁটেখাটো গড়নের জেনারেল: বুকের ওপর ঝুলছে সেন্ট জর্জ ক্রস। কয়লার মতো কালো টেরছা চোখ কুঁচকে জানলার বাইরে গলা বাড়িয়ে দিল সে। অঝোর ধারে বৃষ্টির উষ্ণ ফোঁটা পড়ে ভিজিয়ে দিল তার বহুকালের রোদে পোড়া মুখ আর কালো ঝোলা গোঁফ। এলোমেলো বাতাস বইতে লাগল, কপালের ওপর ছেলেমানুষের মতো ঝুলে থাকা চুলের গোছা ব্যকব্রাশ ক'রে আঁচড়াতে লাগল।

চৌদ্দ

কর্নিলভ মস্কো আসার আগের দিন কসাক সৈন্যসঙ্ঘের পরিষদের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে মেজর লিস্তনিৎস্কি সেখানে এসে উপস্থিত হল। মস্কোয় কসাক রেজিমেন্টের যে সদর দপ্তর ছিল সেখানে প্যাকেটটা দেওয়ার পর সে জানতে পারল যে পরের দিন কর্নিলভের আসার কথা আছে।

দুপুরবেলায় লিস্তনিৎস্কি এলো আলেক্সান্দ্রভ্স্কি স্টেশনে। ওয়েটিং রুমে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের খাবার ঘরে অপেক্ষমাণ লোকজন গিজগিজ করছে– বেশির ভাগই মিলিটারির লোক। আলেক্সান্দ্রভ্স্কি সামরিক কলেজ থেকে প্ল্যাটফর্মে সামরিক অভিনন্দনের ব্যবস্থা হচ্ছে। রেললাইনের মাথার ওপরকার সেতুর কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে মস্কোর মহিলাদের মৃত্যু বাহিনীর একটা ব্যাটেলিয়ন। বেলা তিনটে নাগাদ ট্রেন এসে পৌঁছুল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। তূরী-ভেরীর ভয়ঙ্কর নিনাদ, অসংখ্য লোকের পা চালানোর মসমস খসখস আওয়াজ। ভিড় দেখতে দেখতে উত্তাল হয়ে উঠে লিস্তনিৎস্কিকে ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মের ওপর। ঠেলাঠেলি করে ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসার পর সে দেখতে পেল সর্বাধিনায়কের কামরার সামনে দুই দল তেকিন-সৈন্য সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। রেলের কামরার উজ্জ্বল বার্ণিশ করা গায়ের ওপর তাদের লাল টকটকে লম্বা কোর্তাগুলো প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। জনকয়েক উর্দিপরা সামরিক লোককে সঙ্গে নিয়ে কর্নিলভ ট্রেন থেকে নামলেন, সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন, সেণ্ট জর্জ বীরদের সমিতি, সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসার সমিতি ও কসাক সৈন্যসঙ্ঘের পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সর্বাধিনায়ককে যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল তাদের মধ্যে দন-আতামান কালেদিন ও জেনারেল জাইওঞ্চকোভস্কিকে লিস্তনিৎস্কি চিনতে পারল, বাকিদের নাম ধরে ধরে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল তার চারপাশের অফিসাররা।

'রেল ও যোগাযোগ দপ্তরের উপমন্ত্রী কিস্‌লিয়াকোভ।'

'মস্কোর মেয়র রুদ্‌নেভ।'

'আর্মির সদর দপ্তরের কূটনৈতিক মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রিন্স ত্রুবেৎস্কোয়।'

'রাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের সদস্য মুসিন-পুশ্‌কিন।'

'ফরাসী মিলিটারী অ্যাটাশে কর্ণেল কাইয়ো।'

'প্রিন্স গলিৎসিন।'

'প্রিন্স মান্‌সিরিয়েভ. . .' বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছিল নামগুলো।

লিস্তনিৎস্কি দেখতে পেল কর্নিলভ এগিয়ে আসতে প্ল্যাটফর্ম বরাবর ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুবেশা মহিলারা তাঁর মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। একটা গোলাপফুল তাঁর উর্দির তকমার সঙ্গে পাপড়িতে আটকে ঝুলে রইল। কর্নিলভ ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে ইতস্তত করে শেষকালে ফুলটা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। উরাল অঞ্চলের এক দাড়িওয়ালা বুড়ো বারোটি কসাক বাহিনীর তরফ থেকে তোতলাতে তোতলাতে অভিনন্দনবাণী দিতে শুরু করল। শেষটা লিস্তনিৎস্কির আর শোনা হল না – ভিড়ের ধাক্কায় দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল সে। আরেকটু হলেই তলোয়ারের বেল্‌টটা ছিঁড়ে যেত। স্টেট-দুমার সদস্য রোদিচেভের বক্তৃতার পর কর্নিলভ আবার এগিয়ে চললেন, জনতা ভিড় করে তাঁকে ছেঁকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। অফিসাররা তাঁর সুরক্ষার জন্য হাতে হাত ধরে চারধারে একটা শেকল গড়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু ভিড়ের চাপে তা ভেঙে গেল। বহু মানুষ তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এক বিস্রস্তবসনা মোটাসোটা মহিলা কর্নিলভের হাল্‌কা সবুজ রঙের উর্দির হাতায় ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমু খাওয়ার চেষ্টায় টুক টুক করে তাঁর একপাশ থেকে ঠেলে এগিয়ে এলো। স্টেশন থেকে বেরোবার মুখে কান ফাটানো জয়ধ্বনির মধ্যে কর্নিলভকে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে চলল সকলে। কাঁধের জোর ধাক্কায় এক হোমড়া-চোমড়া চেহারার ভদ্রলোককে একপাশে ঠেলে দিল লিস্তনিৎস্কি – চোখের পাশ দিয়ে কর্নিলভের পালিশ করা চকচকে হাইবুট ঝলক দিতে চট করে চেপে ধরল সেটা। হাত বদলে বেশ জুত করে পাটা ধরে কাঁধে তুলে নিল। পায়ের সামান্য ভার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে, কেবল পায়ের তাল ও ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাণ্ডের কাংস্যধ্বনি আর জনতার প্রবল গর্জনে কানে তালা লাগার উপক্রম। ভিড়ের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ধীর স্রোতের টানে এগিয়ে চলল। ভিড়ের চাপে লিস্তনিৎস্কির গায়ের জামা বেল্‌টের নীচ থেকে উঠে এসেছিল – গেটের ঠিক মুখে এসে জামার ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে নিল সে। এবারে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তারা স্কোয়ারে এলো। সামনে লোকের ভিড়, সৈন্যদের সবুজ সারি, ঘোড়ার পিঠে সার বাঁধা কসাক স্কোয়াড্রন। টুপির কানাতে হাত ছোঁয়াল সে। বাষ্পাকুল চোখদুটো পিটপিট করতে লাগল। ঠোঁটের অপ্রতিরোধ্য কম্পন থামানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। অস্পষ্ট ভাবে তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইল ক্যামেরার খটখট, লোকজনের প্রবল উত্তেজনা, অফিসার শিক্ষানবিশ রাজপুরুষবর্গের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জেনারেলের স্যালুট নেওয়া, তাঁর ছোটখাটো সুঠাম মূর্তি আর মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখটা।

* * *

এক দিন পরে লিস্তুনিৎস্কি পেত্রোগ্রাদে রওনা দিল। কামরার ওপরের বাঙ্কে গ্রেটকোটটা বিছিয়ে জুতসই জায়গা করে নিল সে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল কর্নিলভের কথা ভাবতে ভাবতে।

'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বন্দীদশা থেকে পালান, যেন ঠিক জানতেন জন্মভূমির জন্য এত অপরিহার্য হবেন তিনি। কী মুখ! যেন একটা শিলাখণ্ড কেটে তৈরি! এতটুকু বাড়তি কিছু নেই! . . . চরিত্রও তাঁর তেমনি। তাঁর কাছে সম্ভবত সব পরিষ্কার, হিসাব করা। উপযুক্ত সময় এলে ঠিক আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আশ্চর্য, উনি যে আসলে কী তা-ও আমি জানি না! রাজতন্ত্রী? নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী। . . . আহা, আমাদের সকলের যদি তাঁর মতন এমন আত্মবিশ্বাস থাকত! . . .'

প্রায় ঠিক এই সময় মস্কোর সরকারী সম্মেলনে বিরতির ফাঁকে দু'জন জেনারেল বলশয় থিয়েটারের করিডরে নক্‌শা কাটা মেঝের ওপর একান্তে পায়চারি করতে করতে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছিল। একজন ছোটখাটো, মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ; অন্যজন ভারী ছেঁচা গড়নের, শক্তসমর্থ কাঁধ, চৌকো মাথায় খাড়া খাড়া কদমছাঁট চুল, রগের কাছে পাট করে আঁচড়ানো পাক ধরা চুলে টাকের আভাস। পাতলা কানদুটো মাথার পাশে লেপ্‌টে আছে।

'মিলিটারী ইউনিটগুলোতে যে-সমস্ত কমিটি আছে সেগুলো ভেঙে দেবার কথা বিবেচনা করেই কি ঘোষণাপত্রের এই ধারাটা?'

'হ্যাঁ, তা-ই বটে।'

'একটা যুক্ত ফ্রন্ট, অটুট ঐক্য সম্পূর্ণ অপরিহার্য। আমি যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছি সেগুলো কার্যকরী করা ছাড়া উদ্ধারের কোন উপায় নেই। ফৌজের যে গঠনপ্রকৃতি তাতে দেখা যাচ্ছে লড়াইয়ের ক্ষমতা তার নেই। এ ধরনের ফৌজ নিয়ে জয়লাভ ত হবেই না, এমনকি সেরকম কোন গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ ঘটলে তার মুখে দাঁড়াতেও পারবে না। বলশেভিকদের প্রচারের ফলে ইউনিটগুলোতে পচন ধরেছে। আর এখানে, ফ্রন্টের পেছনে কী অবস্থা হয়েছে? দেখতেই পাচ্ছেন, মজুরদের রাশ টানার ব্যবস্থা নেওয়ার যে-কোন চেষ্টা করতে গেলে কী প্রতিক্রিয়া ঘটছে তাদের মধ্যে? ধর্মঘট আর বিক্ষোভ-মিছিল। সম্মেলনের সদস্যদের পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে। . . . লজ্জার কথা! ফ্রন্টের পেছনের এলাকাকে মিলিটারীর আওতায় আনা, কঠোর হাতে পিটুনি ব্যবস্থা চালু করা, এই পচনের জন্য যারা দায়ী তাদের – সমস্ত বলশেভিকদের ধরে ধরে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা –

এই হচ্ছে আমাদের আশু কর্তব্য। ভবিষ্যতেও আপনার সমর্থন পাব ধরে নিতে পারি কি আলেক্সেই মাক্সিমভিচ?'

'আমি বিনা শর্তে আপনার পক্ষে।'

'সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। ধন্যবাদ। দেখছেন ত যখন অটল হয়ে, চূড়ান্ত ভাবে কাজে নামা দরকার, ঠিক তখনই সরকার কতকগুলো আধখেঁচড়া ব্যবস্থা নিয়ে আর গালভরা বুলি আউড়ে সন্তুষ্ট থাকছে। মুখেই শুধু বলে বেড়াচ্ছে, 'জুলাইয়ের সেই দিনগুলোর মতো কেউ যদি আবার গণশাসনক্ষমতার ওপর হামলা করতে আসে ডাণ্ডা মেরে, রক্ত ঝরিয়ে তাদের সেই প্রয়াস দমন করব।' না, আমরা অভ্যস্ত আগে কাজ করতে, পরে কথা বলতে। ওরা করছে তার উল্‌টোটা। বেশ ত, সময় আসছে যখন নিজেদের এই আধখেঁচড়া নীতির ফলভোগ করতে হবে ওদের। কিন্তু সেই অসম্মানজনক খেলায় যোগ দেওয়ার কোন অভিরুচি আমার নেই! আমি আগে যেমন খোলাখুলি যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলাম এখনও তেমনি আছি। বাচালতা আমার স্বভাবে নেই।'

বেঁটেখাটো জেনারেল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তার সঙ্গীর মুখোমুখি। কালেদিনের গাঢ় খাকি রঙের উর্দির একটা বোতাম মোচড়াতে মোচড়াতে উত্তেজনায় সামান্য তোতলাতে লাগল সে।

'মুখের জালি খুলে দিয়েছে, এখন নিজেরাই ভয় পাচ্ছে নিজেদের বিপ্লবী গণতন্ত্রকে। ফ্রন্ট থেকে রাজধানীর কাছাকাছি নিয়ে আসতে বলছে বিশ্বস্ত সৈন্যদলকে, আবার সেই সঙ্গে এই গণতন্ত্রের হিতের জন্য সত্যিকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও ভয় পাচ্ছে। এক পা আগে এক পা পিছে। . . . একমাত্র আমাদের শক্তি সম্পূর্ণ সংহত করে, প্রবল নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে সুবিধা নিংড়ে নিতে পারি সরকারের কাছ থেকে। আর তা যদি না পারি তাহলে দেখা যাবে! আমি ফ্রন্ট খুলে দিতেও ইতস্তত করব না। জার্মানরাই বরং ওদের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনুক!'

'দুতভের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। কসাকরা আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন দেবে লাভ্‌র গেওর্গিয়েভিচ। আমাদের এখন যা করতে হবে তা হল আমাদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রশ্ন মীমাংসা করা।'

'অধিবেশনের পর আমি আমার অফিসে আপনার জন্য এবং বাকি সকলের জন্য অপেক্ষা করব। আপনাদের দন অঞ্চলের হালচাল কেমন?'

ভারিক্কি চেহারার জেনারেলের নিখুঁত কামানো চৌকোনা চিবুকটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল। বিষণ্ণ নতদৃষ্টিতে তিনি সামনের দিকে তাকালেন। উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর চওড়া গোঁফজোড়ার ফাঁকে ঠোঁটের কোনাদুটো কেঁপে উঠল।

'কসাকদের ওপর আমার আগের সেই বিশ্বাস আর নেই। . . . তাছাড়া এই

মুহূর্তে হালচাল বিচার করাটা মোটের ওপর কঠিন। একটা আপসে আসতেই হবে। কসাক সমাজের বাইরের যে-সব চাষী কসাক-অঞ্চলে বসবাস করছে তাদের হাতে রাখতে গেলে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা ছাড়তেই হবে কসাকদের। এ সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে শুরুও করেছি। কিন্তু কতদূর সফল হব বলা যায় না। আশঙ্কা হচ্ছে কসাক আর বাইরের লোকদের মধ্যে যেখানে স্বার্থের সংঘাত ঘটবে সেখানেই ভাঙন দেখা দিতে পারে। . . . জমি। . . . আপাতত তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে দু'দলের চিন্তা।'

'ভেতর থেকে নিজের ওপর কোন দৈবদুর্বিপাক যাতে ঘনিয়ে না আসে তার জন্য হাতের কাছে কিছু বিশ্বস্ত কসাক ইউনিট রাখা আপনার একান্ত দরকার। আর্মির সদর দপ্তরে ফিরে গিয়ে লুকোম্স্কির সঙ্গে কথা বলব আমি, সম্ভব হলে ফ্রন্ট থেকে দন অঞ্চলে কয়েকটা রেজিমেন্ট পাঠিয়ে দেবার পথ খুঁজে বার করব।'

'তাহলে আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।'

'আচ্ছা তাহলে আজ আমাদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রশ্নটা মীমাংসা করা যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের পরিকল্পনা সফল হবে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা, জেনারেল। . . . সব কিছু সত্ত্বেও যদি তিনি মুখ তুলে না চান, তাহলে দন অঞ্চলে আপনাদের কাছে আশ্রয় পাব বলে ভরসা করতে পারি কি?'

'শুধু আশ্রয় কেন, প্রতিরক্ষাও। সেই স্মরণাতীতকাল থেকে আতিথেয়তার জন্যে, অতিথিকে সাদরে বরণ করার জন্যে কসাকদের খ্যাতি।' এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে এই প্রথম হাসলেন কালেদিন, তাঁর ভ্রূকুটিজড়িত দৃষ্টির বিষণ্ণ ক্লান্তির ভাব হ্রাস পেল।

এক ঘণ্টা পরে দন কসাকদের আতামান কালেদিন রুদ্ধশ্বাস শ্রোতাদের সামনে 'বারোটি কসাক বাহিনীর ঘোষণাপত্র' পড়ে শোনালেন।

সেই দিন থেকে দন অঞ্চলে, কুবানে, তেরেকে, উরালে, উসুরিতে, কসাকদের দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় কালো মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়ল এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতো।

পনেরো

জুন মাসের সংঘর্ষের সময় তোপের মুখে উড়ে গিয়েছিল একটা শহরতলি; সেই শহরতলির ধ্বংসস্তূপ থেকে আধক্রোশখানেক দূরে বনের পাশ দিয়ে এলোমেলো ভাবে ঘুরপাক খেয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা পরিখার সারি। বনের একেবারে শেষ প্রান্ত বরাবর এলাকাটা ছিল বিশেষ কসাক স্কোয়াড্রনের দখলে।

এর পেছনে; এল্‌ডার আর কচি বার্চগাছের দুর্ভেদ্য সবুজ বন ছাড়িয়ে চলে গেছে পচা ঘাসপাতায় ঢাকা মরচে-ধরা-রঙের জলাভূমি। যুদ্ধের আগেই কোন এক সময় জায়গাটা যে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছিল তার চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে সেখানে। লাল টুকটুকে হয়ে ঝুলছে বুনো গোলাপ ঝোপের ফলগুলো। খানিকটা ডান দিকে অন্তরীপের মতো সরু হয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে বনের যে অংশ তারই পেছনে গোলার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত একটা পাকা রাস্তা – কসাকদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এরকম আরও অনেক পথ তাদের পার হতে হবে। বনের শেষপ্রান্তে গুলির ঘায়ে ছিন্নভিন্ন কিছু অবাড়ন্ত লম্বা আগাছা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সেখানে বেঁকে পড়ে আছে গাছের দু'-একটা পোড়া গুঁড়ি। চোখে পড়ে পরিখার সামনের হলদে বাদামী মাটির বাঁধ। ধু ধু প্রান্তরের বুক চিরে এধারে ওধারে অনেক দূর পর্যন্ত বলিরেখার মতো ছড়িয়ে চলে গেছে পরিখাগুলো। পেছনের যে জলাভূমি সেখানেও খোঁড়াখুঁড়ির দাগ চোখে পড়ে, এমনকি ভাঙাচোরা পাকা সড়কটাও প্রাণচাঞ্চল্য আর বাতিল-করা পরিশ্রমের সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু বনের শেষপ্রান্তের জমিটা মানুষের চোখের সামনে এক নিরানন্দ অরুচিকর দৃশ্য তুলে ধরে।

মোখভের মিলের এক কালের ইঞ্জিন-ঠেলা মজুর ইভান আলেক্সেয়েভিচ সেদিন গিয়েছিল পাশের শহরতলিতে। সেখানেই আস্তানা নিয়েছিল প্রথম দলের রসদ সরবরাহ ইউনিটটা। ফিরল সে সেই সন্ধ্যার মুখে। পরিখার ভেতর দিয়ে নিজের সুড়ঙ্গ-ঘরে যাবার পথে তার ঠোকাঠুকি হয়ে গেল জাখার করলিওভের সঙ্গে। এলোপাতাড়ি হাত নাড়াতে নাড়াতে প্রায় ছুটে চলেছে জাখার, থরে থরে রাখা বালির বস্তাগুলোর খাঁজে খাঁজে আটকে যাচ্ছে তার কোমরে ঝোলানো তলোয়ারটা। ইভান আলেক্সেয়েভিচ এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাকে পথ করে দিল। কিন্তু জাখার তার উর্দির একটা বোতাম চেপে ধরে চোখের বুগ্‌ণ হলদেটে শ্বেতগোলক ঘোরাতে ঘোরাতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'শুনেছ? আমাদের ডান পাশের পল্টনটা চলে যাচ্ছে! ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে কি না তা-ই বা কে জানে?'

জাখারের কালো লোহার জমাট ধারার মতো দাড়ির জটা এলোমেলো হয়ে বিকট আকার নিয়েছে, তার দুই চোখে ফুটে উঠেছে বুভুক্ষু, ব্যাকুল আগ্রহ।

'ছেড়ে চলে যাচ্ছে কী রকম?'

'কী রকম – তা আমি জানি নে। শুধু এইটুকুই জানি যে চলে যাচ্ছে।'

'হয়ত ওদের বদলি করা হচ্ছে? চল না, ট্রুপ-অফিসারের কাছে গেলেই জানা যাবে।'

জাখার ফিরল। পেছল ভিজে মাটিতে পা হড়কাতে হড়কাতে সে চলল ট্রুপ-অফিসারের সুড়ঙ্গ-ঘরের দিকে।

এক ঘণ্টা পরেই পদাতিক বাহিনী এসে স্কোয়াড্রনের জায়গা নিতে স্কোয়াড্রনটা যাত্রা করল শহরতলির দিকে। পরদিন সকালে সহিসদের কাছ থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করে নিয়ে সবাই ঘোড়ায় চড়ল। তারপর ডবল মার্চ করে এগিয়ে চলল ফ্রন্ট-লাইনের পেছনে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। বিমর্ষ ভাবে মাথা নুইয়ে আছে বার্চ গাছগুলো। রাস্তা ঢুকে গেছে বনের ভেতরে। গত বছরের পচা ঝরাপাতার বিশ্রী ঝাঁঝাল গন্ধ আর ভিজে স্যাঁতসেঁতে স্পর্শ পেয়ে ঘোড়াগুলো নাকের আওয়াজ করতে থাকে, আরও তাড়াতাড়ি পা ফেলতে থাকে। ঝোপে ঝোপে ঝুলছে জলে-ভেজা বুনো ফলের গোলাপী থোকা, বৃষ্টির জলে ধোওয়া সাদা ফেনার মতো কিছু বনফুল অস্বাভাবিক সাদা দীপ্তি দিচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় গাছপালা থেকে ঘোড়সওয়ারদের গায়ে বড় বড় ভারী ভারী জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল। তাদের গায়ের গ্রেটকোট আর মাথার টুপিগুলো দেখতে দেখতে কালো কালো দাগে ভরে উঠল – যেন গুলির ছিটে লেগেছে। তামাকের ধোঁয়া ঘোড়সওয়ারদের সারির মাথার ওপর উঠে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যেতে থাকে।

'ব্যাটারা আমাদের বাগে পেয়ে যেখানে খুশি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।'

'ট্রেঞ্চে বসে থাকার সাধ এখনও মেটে নি বুঝি?'

'আচ্ছা সত্যি বল ত, কোথায় ওরা খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?'

'আবার হয়ত নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে।'

'কিন্তু দেখেশুনে সে রকম ত মনে হচ্ছে না।'

'যাক গে এসো ভাই, তামাক টানা যাক – সব দুঃখু ভুলে থাকা যাবে।'

'আমার দুঃখু আমি জিনের থলেতে বয়ে বেড়াই।...'

'মেজর সাহেব, ও মেজর সাহেব, একটা গান গাওয়া যেতে পারে কি?'

'অনুমতি পাওয়া গেছে? পাওয়া গেল?... শুরু কর্ তাহলে আর্খিপ।'

সামনের সারি থেকে কে যেন খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে শুরু করল:

কসাক-সেপাই খোশমেজাজে যাচ্ছে ফিরে বাড়ি,
কাঁধের 'পরে কাঁধপটি আর বুকে ক্রসের সারি।

গলাগুলো বসে যাওয়ায় ওরা সুর তেমন টানতে পারল না, গান থামিয়ে দিল। ইভান আলেক্সেয়েভিচের সঙ্গে একই সারিতে যাচ্ছিল জাখার করলিওভ। রেকাবের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করে চেঁচিয়ে সে বলল, 'ওহে অন্ধ বুড়োহাবড়ার দল! এ ভাবে কি কেউ গান গায়? গির্জার চারধারে ঘুরে

ঘুরে নাকি-কান্না গেয়ে ভিখ মেগে বেড়ালেই পার। কী আমার গায়েন!...'

'তাহলে তুমিই গাও না!'

'ওর ঘাড়টা ছোট, গলার জায়গা কোত্থেকে হবে?'

'খুব ত বড়াই করছিলে! – এখন কেটে পড়ছ যে বড়!'

করলিওভ তার উকুন বোঝাই কালো দাড়ির গোছা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল, মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল, মরিয়ার ভঙ্গিতে ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে এক ঝটকা মেরে উচ্চারণ করল গানের প্রথম কলিটা:

ও দন কসাক-বীর মাত উৎসবে...

স্কোয়াড্রনের সকলে যেন তার সুরে বাঁধা গলার চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠে একসঙ্গে ফেটে পড়ল:

তোমাদের সম্মানে, যশোগৌরবে!

বনের ভেতরকার পথ আর ভিজে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলল সেই গান:

সুজনের কাছে ওগো রাখ নিদর্শন,
দেখাও কেমনে করি শত্রু নিধন!
প্রবল আঘাত করি, শৃংখলাও মানি।
ফৌজী হুকুম মোরা একমাত্র মানি।
অফিসার পিতৃতুল্য – রাখি তার মান,
দর্পভরে অস্ত্র হাতে হই আগুয়ান!

'নেকড়ের কবরখানা' ওই পরিখাগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দে সারাটা পথ সকলে গান গাইতে গাইতে চলল। সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে ট্রেনে চাপল তারা। সামরিক ট্রেন এগিয়ে চলল প্স্কোভের দিকে। তারা যখন তিনটে স্টেশন পেরিয়ে গেল একমাত্র তারপরই জানতে পারল যে পেত্রোগ্রাদে হাঙ্গামা শুরু হওয়ায় তা দমন করার জন্য তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার কোর্-এর অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গে তাদের স্কোয়াড্রনটাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। এর পর তাদের আলোচনা থেমে গেল। ট্রেনের লাল কামরাগুলোর ভেতরে অনেকক্ষণের জন্য নেমে এলো একটা ঝিম ধরা স্তব্ধতা।

'এ যে দেখছি এক বিপদ থেকে আরেক বিপদের মুখে এসে পড়লাম!'

বোর্‌শ্চিওভ নামে লম্বা লিকলিকে এক কসাক ওদের বেশির ভাগের সাধারণ মনোভাব ব্যক্ত করল।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ কত্‌লিয়ারোভ গত ফেব্রুয়ারী থেকে স্কোয়াড্রন-কমিটির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। প্রথম যেখানে গাড়ি থামল, সেখানে নেমে পড়ে সোজা সে চলে গেল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে। বলল, 'কসাকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, মেজর!'

ইভান আলেক্সেয়েভিচের চিবুকের গভীর টোলটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু হেসে মেজর বলল:

'আমি নিজেই উত্তেজিত হয়ে আছি হে।'

'আমাদের কোথায় পাঠানো হচ্ছে?'

'পেত্রোগ্রাদ।'

'হাঙ্গামাকারীদের ঠ্যাঙানোর জন্যে?'

'তুমি কি ভাবলে তাদের সাহায্য করার জন্যে?'

'আমরা এর কোনটাই চাই নে।'

'আমরা কী চাই না চাই সে ব্যাপারে আদৌ আমাদের কেউ জিগ্‌গেস করে না।'

'কিন্তু কসাকরা . . .'

'কসাকদের আবার কী?' এবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তাকে বাধা দিয়ে বলল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার। 'আমি নিজেই জানি কসাকরা কী ভাবছে। তুমি কি মনে কর আমি খুশি হয়ে এ কাজ করছি? নিয়ে যাও এটা, স্কোয়াড্রনের সকলকে পড়ে শোনাও। পরের স্টেশনে আমি কসাকদের সঙ্গে কথা বলব।'

কম্যাণ্ডার একটা ভাঁজ করা টেলিগ্রাম তার হাতে দিল, তারপর স্পষ্টই বিরক্তিভরে ভুরু কুঁচকে টিনের কৌটো থেকে দানাদানা চর্বিওয়ালা মাংসের ডেলা চিবুতে লাগল।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ কামরায় ফিরে এলো। টেলিগ্রামটা এমন ভাবে হাতে করে নিয়ে এলো যেন ওটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।

'আর সব কামরার কসাকদের ডেকে আন।'

ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, কিন্তু তখনও কসাকরা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ইভান আলেক্সেয়েভিচের কামরায়। প্রায় জনা তিরিশেক লোক জুটল।

'আমাদের কম্যাণ্ডার একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে। আমি সবে পড়েছি।'

'বল, বল ওতে কী লেখা আছে? পড়ে শোনাও দেখি!'

'আর কথা না বাড়িয়ে পড়!'

'শান্তির কথা আছে কি?'

'স্-স্-স্!'

একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা নেমে এলো। তারই মধ্যে ইভান আলেক্সেয়েভিচ জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগল সর্বাধিনায়ক কর্নিলভের এক ঘোষণাপত্র। তারপর টেলিগ্রাফ অফিসের অসংখ্য ভুলভ্রান্তিতে ভরা শব্দসমেত বার্তাটি সকলের ঘর্মাক্ত হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

> আমি, সর্বাধিনায়ক কর্নিলভ সমগ্র জাতির সমক্ষে ঘোষণা করিতেছি যে আমার সৈনিকজনোচিত কর্তব্য, স্বাধীন রাশিয়ার একজন নাগরিক রূপে আমার আনুগত্য এবং আমার নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম পিতৃভূমির অস্তিত্বের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে সাময়িক সরকারের নির্দেশ পালন না করিতে এবং সৈন্য ও নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ভার নিজের উপর ন্যস্ত রাখিতে প্রবৃত্ত করিতেছে। আমার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ফ্রন্টের সমস্ত প্রধান সেনাপতিকর্তৃক সমর্থিত হইয়া আমি সমগ্র রুশ জনগণের নিকট ঘোষণা করিতেছি যে সর্বাধিনায়কের পদ হইতে আমার অপসারণ অপেক্ষা মৃত্যুকেও আমি বরণীয় বলিয়া মনে করি। রুশ জনগণের খাঁটি সন্তান সর্বদাই কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং দেশের জন্য সে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে সদাপ্রস্তুত।
>
> পিতৃভূমির অস্তিত্বের এই যথার্থ দুঃসময়ে, যখন উভয় রাজধানীরই* প্রবেশপথ বিজয়ী শত্রুসেনার জয়যাত্রার সম্মুখে উন্মুক্তপ্রায় তখন সাময়িক সরকার দেশের সার্বভৌম অস্তিত্বসম্পর্কিত পরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া প্রতিবিপ্লবের অলীক বিভীষিকার কথা বলিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে; অথচ দেশশাসনে অক্ষমতা, দুর্বল শাসনক্ষমতা এবং কার্যক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের দরুন সাময়িক সরকার নিজে সেই প্রতিবিপ্লবকেই আসন্ন করিয়া তুলিতেছে।
>
> জনগণের রক্তের সন্তান আমি, সকলের চক্ষের সমক্ষে আমার সমগ্র জীবন জনগণের নিঃস্বার্থ সেবায় দান করিয়াছি আমি। আমার জনগণের মহান ভবিষ্যতের মহান অধিকার রক্ষায়, স্বাধীনতার সমর্থনে না দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু বর্তমানে এই ভবিষ্যৎ ইচ্ছাশক্তিহীন দুর্বল হাতে রহিয়াছে। উৎকোচ ও বিশ্বাসঘা-

* মস্কো ও পেত্রোগ্রাদ। - অনুঃ

তকতার আশ্রয় লইয়া এক দুর্বিনীত শত্রু আমাদের উপর যদৃচ্ছ হুকুম জারি করিতেছে। শুধু স্বাধীনতা নয়, রুশ জনগণের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিনাশ করিতেছে। রুশ জনসাধারণ, জাগো, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ কোন্ অতল গহ্বরে দ্রুত তলাইয়া যাইতেছে আমাদের দেশ!

সমস্ত রকম হাঙ্গামা-গোলযোগ এড়াইয়া, রুশ রক্তপাতের সমস্ত সম্ভাবনা ও নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করিয়া, যাবতীয় অপমান, লাঞ্ছনা ভুলিয়া গিয়া আমি সমগ্র জাতির সমক্ষে সাময়িক সরকারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে চাই: সামরিক প্রধান দপ্তরে আমার নিকট আসুন আপনারা। সেখানে আপনাদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতেছি আমি। আসুন আমার সহিত মিলিয়া জাতীয় প্রতিরক্ষার এমন এক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করুন, গড়িয়া তুলুন, যাহা স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করিবে, এক পরাক্রান্ত স্বাধীন জাতির উপযুক্ত মহান ভবিষ্যতের দিকে রুশ জনগণকে পরিচালিত করিবে।

জেনারেল কর্নিলভ

পরের স্টেশনে সামরিক ট্রেনটা ছাড়তে কিছুক্ষণ দেরি হল। অপেক্ষমাণ কসাকরা কামরার বাইরে ভিড় করে কর্নিলভের টেলিগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কেরেন্স্কিরও একটা টেলিগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কেরেন্স্কির টেলিগ্রামখানা সবে পড়ে শুনিয়েছে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার। তাতে কর্নিলভকে দেশদ্রোহী ও প্রতিবিপ্লবী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কসাকরা বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার এবং ট্রুপ-অফিসাররাও অপ্রস্তুত।

'মাথার ভেতরে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে,' অনুযোগ করে বলল মার্তিন শামিল। 'ওদের মধ্যে কে যে দোষী কী করে বুঝব ছাই!'

'নিজেরা লাঠালাঠি করে মরছে, সৈন্যদেরও ঠেলে দিচ্ছে।'

'ওপরওয়ালাদের গায়ে বড় তেল হয়েছে।'

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'

'সব পড়ে গেছে একটা ঘূর্ণির পাকে। . . . সর্বনাশ!'

এক দল কসাক ইভান আলেক্সেয়েভিচের কাছে এসে দাবি জানাল:

'কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে জেনে এসো কী করা উচিত আমাদের।'

সবাই ভিড় করে চলল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে। অফিসাররা তখন তাদের কামরায় জড় হয়ে কিসের যেন একটা বৈঠকে বসেছিল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ

ভেতরে ঢুকে বলল, 'কম্যাণ্ডার, কসাকরা জানতে চায় এখন তাদের কী করা উচিত।'

'আমি এখুনি বাইরে যাচ্ছি।'

শেষ কামরার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল স্কোয়াড্রনের সকলে। কম্যাণ্ডার বেরিয়ে এসে কসাকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। ভেতর দিয়ে পথ করে যেতে যেতে মাঝখানে এসে সে হাত তুলল।

'আমরা আমাদের সরাসরি ওপরওয়ালা সুপ্রিম কম্যাণ্ডারের অধীন, কেরেন্‌স্কির অধীন আমরা নই। ঠিক কথা কিনা? তাই আমাদের উচিত কোন প্রশ্ন না তুলে আমাদের ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করা, পেত্রোগ্রাদের দিকে যাওয়া। নিদেনপক্ষে আমরা দ্‌নো স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে এক নম্বর দন কসাক ডিভিশনের কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে জানতে পারব পরিস্থিতি কী – তখন বোঝা যাবে। উতলা না হতে অনুরোধ জানাচ্ছি আমি। এই রকমই দিনকালের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা।'

কসাকদের শান্ত করার জন্য সৈনিকের কর্তব্য, দেশ, বিপ্লব সম্পর্কে আরও অনেকক্ষণ ধরে বকবক করে চলল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, দায়সারা গোছের উত্তর দিয়ে গেল তাদের প্রশ্নের। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। গাড়িতে ততক্ষণে ইঞ্জিন জোড়া হয়ে গেছে (কসাকরা জানতেও পারল না যে তাদের স্কোয়াড্রনের দু'জন অফিসার স্টেশন মাস্টারকে পিস্তলের ভয় দেখিয়েছিল বলেই ট্রেন তাড়াতাড়ি ছাড়া সম্ভব হল)। কসাকরা তাই যে যার কামরায় উঠে পড়ল।

পুরো একটা দিন টিকিয়ে টিকিয়ে দ্‌নো স্টেশনের দিকে এগিয়ে এলো সামরিক ট্রেনটা। রাত্রে আবার ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে উসুরি-কসাক আর দাগেস্তান-রেজিমেন্ট বোঝাই ট্রেনগুলোকে ছাড়া হতে লাগল। একপাশের লাইনে সরিয়ে রাখা হল ওদের গাড়িটা। রাতের উপলস্বচ্ছ অন্ধকার ভেদ করে আলোর ঝলক ফেলতে ফেলতে পাশ দিয়ে চলে গেল দাগেস্তান-রেজিমেণ্টের কামরাগুলো। অস্পষ্ট কথাবার্তার ঘড়ঘড় আওয়াজ, জুর্ণা-বাঁশির করুণ সুর, অচেনা গানের সুর কানে ভেসে এসে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

স্কোয়াড্রনটাকে ছাড়া হল সেই মাঝরাতে। স্বল্পশক্তির কয়লার ইঞ্জিনটা ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জলের পাম্প-ঘরের কাছে। ইঞ্জিনের জ্বালানি বাক্সটা থেকে আগুনের ফুলকির আভা ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। ইঞ্জিন-ড্রাইভার সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কী যেন দেখছে – মনে হয় যেন কিছু একটার প্রতীক্ষায় আছে। ইঞ্জিনের পাশের কামরার দরজা দিয়ে মাথা বার করে একজন কসাক চেঁচিয়ে বলল, 'এই গাভ্রিলা গাড়ি ছাড়্ বলছি, নইলে আমরা এক্ষুনি গুলি ছুঁড়তে শুরু করব!'

ড্রাইভার থু থু করে মুখ থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে কী ভাবে ওটা মাটিতে গিয়ে পড়ে বোধ করি তা দেখার জন্যই একটু চুপ করে রইল, তারপর গলা খাঁকারি দিল।

'ক'জনকে আর গুলি করে মারবে?' বলে জানলা থেকে সরে গেল।

কয়েক মিনিট পরে ইঞ্জিন ঝাঁকুনি দিতে হেঁচকা টান খেল কামরাগুলো, ঝনঝন করে উঠল গাড়ির বাফারগুলো। সেই ধাক্কায় কামরার ভেতরে ঘোড়াগুলো টাল সামলাতে না পেরে খুরের খটখট আওয়াজ তুলল। পাম্প-ঘর ছাড়িয়ে, আলোঝলমল জানলার গোটা কয়েক চৌখোপ আর রেলরাস্তার বাঁধের ধারের কালো কালো বার্চ গাছের সারি ছাড়িয়ে ট্রেন স্বচ্ছন্দগতিতে চলল। ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে কসাকরা ঘুমোতে লাগল। কদাচিৎ দু'-একজন জেগে রইল, আধ-খোলা দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানতে লাগল, পরম গরিমাময় আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাবনা ভাবতে লাগল।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ শুয়ে ছিল করলিওভের পাশে। দরজার ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে রইল রাশি রাশি ছুটে চলা তারার দিকে। গতকাল সব দিক ভালো করে বিবেচনা করার পর সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে যেমন করেই হোক পেত্রোগ্রাদের দিকে স্কোয়াড্রনের আরও এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে থাকে কী ভাবে কসাকদের নিজের মতে আনা যায়, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

কর্নিলভের ঘোষণাপত্রের আগেও সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে জেনারেলের পথ কসাকদের পথ নয়। সহজাত উপলব্ধি থেকে সে বুঝতে পারছিল যে কেরেন্‌স্কিকে মদত দেওয়াও ঠিক হবে না। অনেক ভেবেচিন্তে মাথা ঘামিয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল স্কোয়াড্রনকে পেত্রোগ্রাদ পৌঁছুতে দেওয়া হবে না; এতে যদি কারও সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তা বাধবে কর্নিলভের সঙ্গে – তবে কেরেন্‌স্কির পক্ষে নয়, তার সরকারের পক্ষেও নয়, কেরেন্‌স্কির পরে যে সরকার গড়ে উঠবে তার পক্ষে। তারা যে সরকার চায় কেরেন্‌স্কির পরে যে সেই সরকার আসবে, তাদের নিজেদের সরকার যে প্রতিষ্ঠিত হবে এই বিষয়ে তার এতটুকু সন্দেহ নেই। এই ত গত গ্রীষ্মকালেই পেত্রোগ্রাদে কার্যনির্বাহী কমিটির সামরিক বিভাগে তাকে যেতে হয়েছিল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের সঙ্গে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল সে ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্য তার স্কোয়াড্রন তাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ দেখে, কয়েকজন বলশেভিক কমরেডের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সে মনে মনে ভেবে দেখেছে: 'এই হাড়ের কাঠামোর ওপর আমাদের কিছু মজুরের রক্ত-মাংস জমলে তবেই তা হবে সত্যিকারের শাসনক্ষমতা। মরে গেলেও

একে ছাড়া চলবে না ইভান! একে আঁকড়ে থাক, যেমন করে শিশু আঁকড়ে থাকে মায়ের স্তনের বোঁটা!'

সেই রাত্রে ঘোড়ার গা ঢাকা কাপড়ের ওপর শুয়ে শুয়ে বড় বেশি ঘন ঘন তার মনে পড়তে থাকে সেই মানুষটির কথা, যে তাকে পথ দেখিয়েছিল, এই সুকঠিন পথের অন্ধিসন্ধি বুঝতে শিখিয়েছিল। তার কথা মনে পড়ে এমন এক গভীর, প্রবল ভালোবাসায় মনটা ভরে উঠল যা সে এর আগে কখনও অনুভব করে নি। আগামী কাল কসাকদের কী বলা উচিত হবে এই কথা ভাবতে ভাবতে ইভান আলেক্সেয়েভিচের মনে পড়ে গেল কসাকদের সম্পর্কে স্টক্‌মানের কথাগুলো। কথাগুলো সে প্রায়ই এমন ভাবে আওড়াত যেন সঠিক জায়গায় ঘা মেরে বোঝাতে চাইছে: 'কসাকরা হল মজ্জায় মজ্জায় রক্ষণশীল। কোন কসাককে বলশেভিক মতবাদের সত্যতা যখন বোঝাতে যাবে তখন এই ব্যাপারটা ভুললে চলবে না। সাবধানে, ভেবেচিন্তে, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কাজ করতে জানা চাই। গোড়ায় আমার সম্পর্কে তোমার আর মিশ্‌কা কশেভয়ের যেমন মনোভাব ছিল প্রথম প্রথম তোমাকেও তেমনি অবজ্ঞা করবে তারা। কিন্তু তাতে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। সমানে হাতুড়ির ঘা মেরে চল – শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই।'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ ধরে নিয়েছিল যে কসাকদের যদি কর্নিলভকে সমর্থন না করার যুক্তি দেয় তাহলে তাদের তরফ থেকে কিছু কিছু আপত্তির সম্মুখীন হতে হবে তাকে। কিন্তু সকালে নিজের কামরার সঙ্গীদের সঙ্গে যখন সে হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলতে শুরু করল, তাদের বোঝাল যে নিজেদের লোকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পেত্রোগ্রাদে না গিয়ে ফ্রন্টে ফিরে যাবার দাবি তোলাই তাদের উচিত হবে, তখন কসাকরা স্বেচ্ছায় রাজি হয়ে গেল, মহা উৎসাহে এই সিদ্ধান্ত নিল যে পেত্রোগ্রাদের দিকে আর তারা এগোবে না। ইভান আলেক্সেয়েভিচের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ছিল জাখার করলিওভ আর তুরিলিন নামে চের্নিশেভ্‌স্কায়া জেলা সদরের একজন কসাক। তারা দু'জন সারাদিন ধরে কামরায় কামরায় ঘুরে কসাকদের সঙ্গে কথা বলল। সন্ধ্যার দিকে কোন একটা ছোট স্টেশনের কাছাকাছি এসে যখন গাড়ির গতি কমে এলো তখন প্‌শেনিচ্‌নিকভ নামে তিন নম্বর ট্রুপের একজন সার্জেন্ট লাফিয়ে উঠে পড়ল ইভান আলেক্সেয়েভিচের কামরায়।

'প্রথম যে স্টেশনে গাড়ি থামবে সেখানেই নেমে পড়বে স্কোয়াড্রন!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে সে বলল ইভান আলেক্সেয়েভিচকে। 'কসাকরা কী চায় তা-ই যদি না জান, তাহলে কিসের ছাই তুমি কমিটির সভাপতি? অনেক বোকা বানিয়েছ আমাদের – আর নয়! আর যাব না আমরা!... অফিসাররা আমাদের গলায়

ফাঁস জড়াচ্ছে, অথচ তুমি হাঁ হুঁ কিছুই করছ না। এই জন্যেই কি আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি? অমন দাঁত কেলাচ্ছ কেন?'

'অনেক আগেই এ কথা বলা উচিত ছিল,' হাসতে হাসতে বলল ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

গাড়ি স্টেশনে থামতে সে-ই প্রথম টুপ করে লাফিয়ে নামল কামরা থেকে। তুরিলিনকে সঙ্গে নিয়ে চলল স্টেশন-মাস্টারের কাছে।

'আমাদের গাড়ি আর এগুতে দিও না। আমরা এখানে নামছি।'

'সে কী করে হয়?' হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল স্টেশন-মাস্টার। 'আমার কাছে হুকুম আছে... ট্রেন ছাড়ার...'

'চোপ্ রও!' কঠোর স্বরে তাকে বাধা দিয়ে বলল তুরিলিন।

স্টেশন-কমিটিকে খুঁজে বার করল তারা। কমিটির সভাপতি ভারী চেহারার কটা-চুল এক টেলিগ্রাফ-কর্মী। তাকে ওরা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ড্রাইভার স্বেচ্ছায় গাড়িটা পাশের খালি লাইনের ওপর সরিয়ে এনে রাখল।

তাড়াতাড়ি কামরার গায়ে তক্তা লাগিয়ে দিয়ে কসাকরা ভেতর থেকে ঘোড়াগুলোকে নামাতে লাগল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ লম্বা পাদুটো ফাঁক করে ইঞ্জিনের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল। তার রোদে পোড়া মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ছুটতে ছুটতে এলো ইভান আলে-ক্সেয়েভিচের কাছে। তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে।

'করছ কি তুমি?... তুমি কি জান না যে...'

'জানি!' মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। 'আর চেঁচিও না বাপু মেজর সাহেব!' তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, নাকের পাশদুটো কাঁপতে লাগল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের মুখের ওপর সাফ বলে বসল, 'অনেক গলাবাজি করেছ হে ছোকরা! আর নয়! এবারে আমরা তোমার ওপর ডাণ্ডা ঘোরাব। বুঝলে?'

'আমাদের সুপ্রিম কম্যাণ্ডার কর্নিলভ...' রাগে লাল হয়ে তোতলাতে তোতলাতে কী যেন বলতে গেল মেজর। কিন্তু ইভান আলেক্সেয়েভিচ তাকিয়ে রইল তার ছিন্নভিন্ন বুটজোড়ার দিকে - ঝুরঝুরে বালির অনেকখানি ভেতরে চলে গেছে সেদুটো। শেষ কালে এক ধরনের স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে হাত নেড়ে মেজরকে উপদেশ দিল:

'ক্রস ক'রে গলায় ঝুলিয়ে রাখ তাঁকে - আমাদের কোন দরকার নেই।'

মেজর জুতোর হিল ঠুকে ঘুরে উলটো দিকে ছুটে গেল তার নিজের কামরায়।

এক ঘণ্টার মধ্যে স্কোয়াড্রনটা যুদ্ধকালীন অবস্থার মতো রীতিমতো সুশৃঙ্খল ভাবে ঘোড়ায় চেপে স্টেশন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা দিল। একজন অফিসারও সঙ্গে গেল না। স্কোয়াড্রন পরিচালনার ভার নিয়েছে ইভান আলেক্সেয়েভিচ। দলের আগে আগে মেশিনগান চালকদের পাশে পাশে চলেছে সে আর তার সহকারী বেঁটেখাটো তুরিলিন।

আগেকার কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে যে ম্যাপ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাই দেখে অতি কষ্টে পথ চিনে তারা চলতে থাকে। চলতে চলতে শেষকালে গরিয়েলোয়ে নামে গ্রামে এসে পৌঁছুল, সেইখানেই রাতের জন্য থামল। সকলে মিলে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে তারা ফ্রণ্টে যাবে, কেউ যদি তাদের রোখার চেষ্টা করে তাহলে লড়াই করবে।

ঘোড়াগুলোর পা ছেঁদে দিয়ে সান্ত্রীর ঘাঁটি বসিয়ে কসাকরা শুয়ে শুয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। আগুন জ্বালাল না। বোঝা যাচ্ছিল ওদের বেশির ভাগই মনমরা হয়ে আছে। সচরাচর নিজেদের মধ্যে যে রকম কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টা হয় সে সব বন্ধ রেখে, এ ওর কাছ থেকে মনের কথা গোপন রেখে তারা শুয়ে পড়ল।

'আচ্ছা, ওরা যদি ভেবেচিন্তে দেখার পর মত পাল্টায়? যদি শেষকালে ফিরে গিয়ে নিজেদের অপরাধ কবুল করে?' গ্রেটকোটের নীচে গুঁড়িসুড়ি মেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবতে থাকে ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

তার ভাবনা যেন তুরিলিনের কানে গেল, এগিয়ে এলো সে।

'ঘুমোচ্ছ নাকি ইভান?'

'এখনও ঘুমোই নি।'

তুরিলিন উবু হয়ে তার পাশে বসল, হাতের সিগারেটটা অন্ধকারের মধ্যে ধিকি ধিকি আলো দিতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, 'কসাকরা কিন্তু ঘাবড়ে গেছে।.. ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে, এখন ভয় পাচ্ছে। গোলমাল ত আমরা পাকালাম, কিন্তু শেষকালে সামলাতে পারব ত? তোমার কী মনে হয়?'

'দেখা যাক না কি হয়,' শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। 'তুমি ভয় পাচ্ছ না ত?'

টুপির নীচে মাথার পেছনটা চুলকে নিল তুরিলিন। তারপর বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'সত্যি বলতে গেলে কি, একটু ভয় পাচ্ছি।... শুরু যখন করেছিলাম তখন পাই নি, কিন্তু এখন কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে।'

'তাহলে কাজের ফল ভোগ করার বেলায় যত দুর্বলতা।'

'কিন্তু ওদের শক্তি যে অনেক ইভান, সে ত তুমি জানই।'

ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। গ্রামে আলো নিভে গেল। উইলো-ঢাকা কূলকিনারাহীন বিস্তীর্ণ জলাভূমির কোথা থেকে যেন একটা বুনো হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ডাক ভেসে এলো।

'বড় হাঁস ডাকছে,' অন্যমনস্ক ভাবে এই কথা বলে আবার চুপ করে গেল তুরিলিন।

ঘাস-জমির ওপর বিরাজ করতে লাগল কোমল, মধুর নিশীথ স্তব্ধতা। শিশিরে ঘাস নুইয়ে পড়ছে। জলার গাছগাছরা, পচা নলখাগড়া, কাদামাটি আর শিশির-ভেজা ঘাসের মিশাল গন্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে এলো কসাকদের শিবিরে। কখন-সখন কানে ভেসে আসে ছাঁদা-পা ঘোড়াগুলোর পা নাড়াচাড়ার টুংটাং আর নাক-ঝাড়ার আওয়াজ, কোন ঘোড়ার গড়াগড়ি দেওয়ার ভারী আওয়াজ আর ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ। তারপর আবার ঘুম-ঘুম নিস্তব্ধতা, অনেক অনেক দূর থেকে কোন বুনো হাঁসের প্রায় অস্পষ্ট কর্কশ ডাক, তার উত্তরে কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে সঙ্গিনীর ডাক। অন্ধকারে অদৃশ্য ডানার দ্রুত সাঁই সাঁই শব্দ। রাত। নিস্তব্ধতা। তৃণভূমির কুয়াশাজড়ানো আর্দ্রতা। পশ্চিমে দিগন্তের বুকে উপছে উঠছে গাঢ় বেগুনি রঙের মেঘের পুঞ্জ। আকাশের মাঝখানে, প্রাচীন প্স্কোভ ভূমির মাথার ওপর উৎকীর্ণ হয়ে আছে ছায়াপথ – নিরন্তর মনে করিয়ে দিচ্ছে জ্বলন্ত অঙ্গার বিছানো একটা প্রশস্ত সড়কের কথা।*

ভোর হতেই স্কোয়াড্রন আবার যাত্রা শুরু করল। গ্রামের ভেতর দিয়ে তারা চলতে লাগল। মেয়েরা আর গোরু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে ছোট ছোট ছেলেরা অনেকক্ষণ ধরে পেছন থেকে দেখতে লাগল তাদের। ভোরের আলোয় ইঁটের মতো লাল রঙ ধরেছে একটা টিলায়। সেটার ওপর উঠল তারা। তুরিলিন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখার পর পা দিয়ে ইভান আলেক্সেয়েভিচের রেকাব ছুঁয়ে বলল, 'পেছনে তাকিয়ে দেখ। কিছু ঘোড়সওয়ার আসছে আমাদের পেছন পেছন।'

গোলাপী রঙের ফিনফিনে ধুলোর চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে তিনজন ঘোড়সওয়ার। গ্রাম ছাড়ানোর পর এখন তারা টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

'স্কোয়াড্রন, দাঁড়িয়ে পড়!' ইভান আলেক্সেয়েভিচ হুকুম দিল।

কসাকরা তাদের অভ্যাসমতো ধূসর রঙের চৌকো আকারে দ্রুত সার বেঁধে দাঁড়াল। সিকি ক্রোশ খানেকের মধ্যে আসতেই ঘোড়সওয়ার তিনজন ঘোড়ার কদম নামিয়ে আনল দুলকি চালে। তাদের একজন, এক কসাক অফিসার সাদা রুমাল বার করে মাথার ওপর নাড়াতে লাগল। কসাকরা এক দৃষ্টিতে তাদের এগিয়ে আসা দেখতে লাগল। অফিসারটির পরনে খাকি উর্দি। সে চলছিল আগে

---

* তাতার আক্রমণ প্রসঙ্গে এই উক্তি। – অনুঃ

আগে। লম্বা চের্‌কেসীয় কোর্তা গায়ে বাকি দু'জন খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল।

'কী ব্যাপার?' সামনাসামনি এগিয়ে এসে ইভান আলেক্সেয়েভিচ জিজ্ঞেস করল।

'তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই,' টুপির কানাতে হাত ছুঁইয়ে অফিসার উত্তর দিল। 'তোমাদের মধ্যে কার ওপর ভার আছে স্কোয়াড্রনের?'

'আমার ওপর।'

'এক নম্বর দন-কসাক ডিভিশন আমাকে ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছে, আর এরা দু'জন হল আদিবাসী ডিভিশনের প্রতিনিধি।' অফিসার চোখের ইশারায় পাহাড়ী লোকদুটোকে দেখিয়ে দিল। ঘোড়ার মুখের লাগাম শক্ত করে টেনে ধরে ঘেমে নেয়ে-ওঠা ঘোড়ার ভিজে চকচকে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'আলোচনা করার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে স্কোয়াড্রনের সকলকে ঘোড়া থেকে নামতে হবে। ডিভিশনের বড়কর্তা মেজর জেনারেল গ্রেকভের মৌখিক নির্দেশ আছে আমার কাছে।'

কসাকরা ঘোড়া থেকে নামল। আগন্তুকরাও নামল। কসাকদের ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল তারা, ভেসে উঠল একেবারে মাঝখানে গিয়ে। কসাকরা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট চক্র করে চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

প্রথমে কথা বলল কসাক অফিসারটি।

'কসাকরা! তোমরা যাতে ভেবেচিন্তে মত বদল কর একথাই বোঝানোর জন্য এবং তোমাদের আচরণের যে গুরুতর পরিণতি হতে পারে তা যাতে এড়ানো যায় সেইজন্যই আমাদের এখানে আসা। গতকাল ডিভিশনের সদর দপ্তর জানতে পারে যে তোমরা কারও কুমতলবে পড়ে নিজেদের খুশিমত ট্রেন ছেড়ে চলে এসেছ, তাই আজ আমাদের পাঠানো হয়েছে এই নির্দেশ তোমাদের জানিয়ে দিতে যে এখুনি দ্‌নো স্টেশনে ফিরে যেতে হবে। আদিবাসী ডিভিশনের ফৌজ আর অন্যসব ঘোড়সওয়ার-ইউনিটগুলো গতকাল পেত্রোগ্রাদ দখল করেছে – আজ এই মর্মে টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে। আমাদের আগুয়ানদল রাজধানীতে ঢুকে পড়েছে, সমস্ত সরকারী অফিস-কাছারি, ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন অফিস ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। সাময়িক সরকার পালিয়েছে, তার পতন হয়েছে বলেই ধরে নিতে হয়। একবার ভেবে দেখ্ কসাক ভাইরা! তোমরা কিন্তু ধ্বংসের পথে পা বাড়াচ্ছ! ডিভিশন-কম্যাণ্ডারের হুকুম যদি তোমরা না মান তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো হবে। তোমাদের আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য, লড়াইয়ের ময়দানে আদেশ অমান্য করার সামিল। তোমরা যদি বিনাবাক্যব্যয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নাও একমাত্র তাহলেই ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাত বন্ধ করা যাবে।'

প্রতিনিধিরা যখন এগিয়ে আসছিল তখন কসাকদের মেজাজের কথা চিন্তা

করে ইভান আলেক্সেয়েভিচ বুঝতে পেরেছিল যে আলোচনা না করতে যাওয়া ঠিক হবে না, আলোচনা এড়াতে গেলে অনিবার্য ভাবে ফল হবে উল্টো। তাই একটু ভেবে নিয়ে স্কোয়াড্রনের সকলকে ঘোড়া থেকে নামার হুকুম দিল সে এবং অন্যদের অলক্ষ্যে তুরিলিনকে চোখ টিপে ভিড় ঠেলে প্রতিনিধিদের কাছে এসে দাঁড়াল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ দেখতে পেল কসাকরা গোমড়া মুখে মাথা নীচু করে অফিসারের বক্তৃতা শুনছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে। জাখার করলিওভ বাঁকা হাসি হাসল। ঢালাই লোহার জমাট ধারার মতো তার কালো দাড়ির ঢল নেমেছে বুকের কাছে জামার ওপর। বোর্শ্চিওভ বাঁকা চোখে এক দিকে তাকিয়ে চাবুক হাতে নিয়ে খেলা করছে। প্শেনিচ্নিকভ ঠোঁট গোল করে পাকিয়ে হাঁ করে অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছে। মার্তিন শামিল নোংরা হাত দিয়ে গাল ঘসছে, ঘন ঘন চোখ পিটপিট করছে। তার পেছনে বাগ্রোভের হলুদ রঙের বোকা-বোকা মুখটা উঁকি মারছে। মেশিনগানচালক ক্রাম্নিকভ প্রত্যাশাভরে চোখ কোঁচকাচ্ছে। তুরিলিন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। কাঁধে জোয়ালের ভার টের পেলে ষাঁড়ের যেমন অবস্থা হয় মুখে মেছেতার দাগধরা ওব্নিজভ টুপিটা মাথার পেছনে সরিয়ে দিয়ে তেমনি মাথা দোলাচ্ছে। দু'নম্বর ট্রুপের সকলে মাথা না তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে; জনতা একসঙ্গে জটলা বেঁধে আছে, কারও মুখে কোন কথা নেই। উত্তেজনায় সকলে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে। লোকের মুখের ওপর হতবুদ্ধির তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। . . .

ইভান আলেক্সেয়েভিচ বুঝতে পারল এই মুহূর্তে কসাকদের মেজাজ এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যখন তাদের মোড় ঘুরতে আর দেরি নেই। আর কয়েকটি মিনিট – তারপরই এই কথার জাহাজ অফিসারটি স্কোয়াড্রনের সকলকে নিজের মতে এনে ফেলবে। অফিসারের বক্তৃতা যে প্রভাব ফেলেছে, যেমন করেই হোক তা কাটিয়ে দিতে হবে, এখনও পুরোপুরি প্রকাশ না পেলেও কসাকদের মনের ভেতরে ইতিমধ্যে যে সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে তাকে নড়িয়ে দিতে হবে। সে হাত তুলল, বিস্ফারিত অদ্ভুত সাদা দুটি চোখ ভিড়ের গায়ে বুলিয়ে নিল।

'ভাইসব! একটু অপেক্ষা কর!' তারপর অফিসারের দিকে ফিরে বলল, 'টেলিগ্রামটা কি তোমাদের কাছে আছে?'

'কোন্ টেলিগ্রাম?' অফিসার আশ্চর্য হয়ে বলল।

'ওই যে যাতে বলা হয়েছে পেত্রোগ্রাদ দখলে এসেছে।'

'টেলিগ্রাম? . . . না তা নেই। তাছাড়া টেলিগ্রামের কথা এখানে আসে কেন?'

'ও, নেই! তাই বল!' স্কোয়াড্রনের সকলে যেন এক সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

অনেকেই এবারে মাথা তুলল। আশায় আশায় তাকাল ইভান আলেক্সেয়েভিচের মুখের দিকে। গলার কর্কশ স্বর চড়াল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। বিদ্রূপভরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বিদ্বেষ ঢেলে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে তাতেই সকলের মনোযোগ কেড়ে নিল।

'নেই বলছ? তোমার মুখের কথায় আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? ওই দিয়ে বোকা বানাতে চাও আমাদের?'

'ধাপ্পা!' একটা চাপা গর্জন করে উঠল স্কোয়াড্রনের সকলে।

'টেলিগ্রামটা আমার নামে পাঠানো হয় নি! শোনো কসাক ভাইরা!' অফিসার বোঝানোর চেষ্টায় বুকের সঙ্গে হাতটা চেপে ধরল।

কিন্তু কে আর তার কথা শোনে? তার ওপর স্কোয়াড্রনের কসাকদের সহানুভূতি ও আস্থা আবার ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে ইভান আলেক্সেয়েভিচ কাচের ওপর হীরে চালানোর মতো কেটে কেটে বলতে লাগল, 'আর সঙ্গে থাকলেই বা কী হত? – তোমাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়! নিজেদের লোকজনের সঙ্গে লড়াই করার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আমরা যাব না! আমাদের লেলিয়ে দিতে চাও ওদের বিরুদ্ধে? সেটি হচ্ছে না! দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে মুখ্যু ভেবেছ নাকি? জেনারেলদের সরকার গড়ে তোলার কাজে আমরা মদত দিচ্ছি নে। সাফ কথা!'

কসাকরা সকলে একসঙ্গে হৈচৈ করে উঠল। ভিড়টা নড়েচড়ে সামনে এগিয়ে গেল। চিৎকার-চেঁচামেচি ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

'ওঃ খুব দিয়েছে!'

'বেশ একহাত নিয়েছে!'

'ঠিক করেছে! . . .'

'ঘাড় ধরে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয় এগুলোকে!'

'আহা, এসেছেন যেন বিয়ের ঘটকালি করতে! . . .'

'পেত্রোগ্রাদেই ত কসাকদের তিনটে রেজিমেন্ট আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে জনসাধারণের বিরুদ্ধে যাবার তেমন একটা চাড় যেন দেখা যাচ্ছে না।'

'শোনো ইভান, ওদের লাথি মেরে দূর করে দাও! কেটে পড়তে বল এখান থেকে!'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ প্রতিনিধিদের দিকে তাকাল। কসাক অফিসারটি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। তার পেছনে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী দু'জন। ওদের একজন সুঠাম তরুণ ইংগুশ অফিসার, তার জমকাল লম্বা চের্‌কেসীয় কোর্তার ওপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কালো

লোমের টুপির আড়াল থেকে চকচক করছে তেরছা কুতকুতে চোখজোড়া। অন্যজন প্রবীণ, কটা-চুল, এক ওসেতিন, অবহেলাভরে এক পা পেছনে রেখে, বাঁকা তলোয়ারের হাতলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, বিদ্রূপভরা চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কসাকদের। ইভান আলেক্সেয়েভিচ এখানেই আলোচনার ইতি টেনে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কসাক অফিসারটি তাকে ছাড়িয়ে গেল। ইংগুশ অফিসারের সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন বলে চড়া গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'দন-কসাকরা! উপজাতি ডিভিশনের প্রতিনিধিকে বলার অনুমতি দেবে ত তোমরা?'

ওদের সম্মতির কোন অপেক্ষা না করেই আলগোছে হিলছাড়া বুটজুতোপরা পা ফেলে মাঝখানে এগিয়ে এলো ইংগুশ অফিসারটি। একটু বিচলিত ভাব। কাজ-করা সরু বেল্টটা ঠিক করে নিল।

'কসাক ভাইসব! এত হৈ হাল্লা কিসের? রাগ দ্যাখাও ক্যানে? জেনারেলকে তোমরা চাও না, এই ত? বেশ! মোরা লড়াই কইরব। বয় আমরা পাই নি। মোটেই পাই নি। আজই গুঁইড়ে দেব তুমাদের। দুইডে পাহাড়ী রেজিমেণ্ট আছে মোদের পিছনে! বুঝ! কিসের হাল্লা, এত হাল্লা ক্যানে?' গোড়ায় কথা বলার সময় আপাত শান্ত ভাব সে বজায় রেখেছিল, কিন্তু শেষের দিকে অতিরিক্ত আবেগে উত্তপ্ত হয়ে সে গরম গরম কথা ছুঁড়তে থাকে। কণ্ঠ্যবর্ণে উচ্চারিত তার ভাঙা ভাঙা রুশ শব্দের সঙ্গে মাতৃভাষার শব্দ এসে মিশতে থাকে। 'তুমাদের ধোঁকায় ফেলিছে হুই কসাকড়া – ওডা বালশেভিক! তুমরা সামিল হইছ উয়ার পিছে! বাহা! মুই কি দিখি না? ওরে আরিস্ট কর! অস্তর কেইড়ে নাও ওডার!'

বেশ সাহসের ভঙ্গিতে ইভান আলেক্সেয়েভিচের দিকে আঙুল তুলে দেখায় সে। ভয়ঙ্কর রকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে ভেতরের ছোট গোল জায়গাটার মধ্যে ছটফটিয়ে বেড়াতে থাকে। তার ফেকাসে মুখের ওপর গভীর গোলাপী রঙের উচ্ছ্বাস খেলে যায়। তার সঙ্গী, কটা-চুল প্রবীণ অফিসারটি কিন্তু হিমশীতল শান্ত ভাব বজায় রাখল। কসাক অফিসারটি তলোয়ারের হাতলের ছিন্নভিন্ন ফুৎনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। আবার চুপ করে যায় কসাকরা, আবার তাদের সারিগুলোর মধ্যে একটা বিমূঢ় উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। ইংগুশ অফিসারটির ওপর, তার খিচানো সাদা দাঁতের পাটি আর কপালের বাঁ দিকের রগের চুল বয়ে তির্যক ধারায় গড়িয়ে পড়া ধূসর ঘামের ধারার ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। এক কথাতেই আলোচনা খতম করে দিয়ে কসাকদের নিয়ে চলে যেতে পারত সে, সেই মুহূর্তটি হেলায় হারিয়েছে ভেবে আফশোস হল তার। এই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করল তুরিলিন। ভিড়ের মাঝখানে লাফিয়ে এসে মরিয়ার মতো হাত নাড়াল সে, তাইতে জামার কলারের বোতাম

পট করে ছিড়ে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ খিচিয়ে গলা ফাটিয়ে গর্জন করে উঠল, মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলে থুথু ছিটিয়ে সে বলল, 'শালা বদমাশ!... হারামজাদা শয়তানের দল!... তোমাদের যত মিঠে মিঠে বুলি শোনাচ্ছে, আর তোমরাও কান খাড়া করে শুনছ!... অফিসাররা ওদের নিজেদের ইচ্ছে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়! তোমরা করছটা কী? বলি কী করছ তোমরা? ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা উচিত, আর তোমরা কিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের বুলি শুনছ?... ওদের ধড় থেকে মুণ্ডু খসিয়ে দাও, রক্তগঙ্গা বইয়ে দাও। তোমরা যতক্ষণ এখানে গুজুর গুজুর করছ ততক্ষণে ওরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে!... মেশিনগান চালিয়ে কচুকাটা করে দেবে!... মেশিনগান যখন চালাতে শুরু করবে তখন আর মিটিং করতে হচ্ছে না তোমাদের!... যতক্ষণ না ওদের ফৌজ এসে হাজির হচ্ছে, ততক্ষণ ইচ্ছে করে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে রাখছে।... আরে ধুৎ! তোমরা আবার কসাক কিসের? যত-সব ঘাগরা-পরা মাগীর দল!'

'ঘোড়ায় চাপ সবাই!' বজ্রকণ্ঠে হেঁকে ওঠে ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

ভিড়ের মাথার ওপর গোলার মতো ফেটে পড়ল তার চিৎকার। কসাকরা ছুটল ঘোড়ার দিকে। ছড়ানো স্কোয়াড্রনটা এক মিনিটের মধ্যেই আবার ট্রুপের কায়দায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'শোনো! কসাকরা শোনো!' কসাক অফিসার এপাশ-ওপাশ ছুটতে থাকে।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ কাঁধ থেকে এক ঝটকায় রাইফেলটা খুলে নিল। গাঁটধরা ফুলো ফুলো আঙুলে ট্রিগার চেপে ধরল। ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠতে তার মুখের কড়া ঠোঁটের ভেতর বিঁধিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

'আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা হবে এই ভাষায়!' এই বলে অর্থপূর্ণ ভাবে রাইফেলটা ঝাঁকাল সে।

একের পর এক দল বেঁধে কসাকরা রাস্তায় নেমে এলো! পেছন ফিরে তাকাতে তারা দেখতে পেল প্রতিনিধিরা ঘোড়ায় চড়ে বসে কী নিয়ে যেন পরামর্শ করছে নিজেদের মধ্যে। ইংগুশটি চোখ কুঁচকে কোন একটা বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক করছে আর ঘন ঘন হাত তুলছে। তার লম্বা চের্‌কেসীয় কোর্তার আস্তিন উলটে গিয়ে ভেতরকার সাদা ধবধবে রেশমী কাপড়ের আস্তরটা বরফের মতো ঝকঝক করে উঠছে।

শেষবারের মতো চোখ ফেরাতে ইভান আলেক্সেয়েভিচ দেখতে পেল রেশমী কাপড়ের সেই চোখ ধাঁধানো ঝলমলে টুকরোটা। অমনি তার চোখের সামনে কেন যেন ভেসে উঠল শুকনো বাতাসের ঝাপটায় উথাল পাঁথাল দনের বুক,

ফোলা কেশরের মতো সবুজ ঢেউয়ের রাশি, ঢেউয়ের মাথায় কাত হয়ে পাক খাওয়া গাঙচিলের সাদা ডানার ঝলক।

ষোল

আগস্টের ২৯ তারিখে ক্রিমভের কাছ থেকে যে সমস্ত টেলিগ্রাম পাওয়া গেল তাতেই কর্নিলভের বুঝতে আর বাকি রইল না যে অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

বেলা দুটো নাগাদ একজন বার্তাবহ অফিসার সামরিক প্রধান দপ্তরে এসে হাজির হল। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার পর রমানোভ্স্কিকে ডেকে পাঠালেন কর্নিলভ। উত্তেজিত হয়ে এক টুকরো কাগজ হাতের মধ্যে নিয়ে ডেলা পাকাতে পাকাতে তিনি বললেন, 'সব ভেস্তে গেল! আমাদের তুরুপের তাস মার খেল বলে।... ক্রিমভ সময়মতো কোর্‌কে পেত্রোগ্রাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না, ফলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। যে কাজটা এত সহজসাধ্য মনে হয়েছিল তার পদে পদে এখন দেখছি হাজারো বাধা।.. পরিণতি আগেই ঠিক হয়ে গেছে – আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।... এই যে দেখুন না, ট্রুপ চালানের ধারাটা!' এই বলে ঘোড়সওয়ার-কোর্ আর আদিবাসী ডিভিশন নিয়ে যে সমস্ত ট্রেন পেত্রোগ্রাদের দিকে যাচ্ছিল সেগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থানস্থলচিহ্নিত একটা ম্যাপ তিনি বাড়িয়ে দিলেন রমানোভ্স্কির দিকে। অনিদ্রার ফলে জেনারেলের উৎসাহদীপ্ত মুখটা কেমন যেন দুমড়ে গেছে। কথা বলতে বলতে তাঁর মুখের পেশীগুলো কেঁপে উঠল, একটা আঁকাবাঁকা রেখা খেলে গেল মুখের ওপর। 'এই হারামজাদা রেলের লোকগুলোই আমাদের পদে পদে বংশদণ্ড দিচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না এর ফল কী হতে পারে। আমরা যদি সফল হই তা হলে ওদের প্রত্যেক দশজনের একজনকে ধরে ধরে ফাঁসিতে লটকানোর হুকুম দেব আমি। ক্রিমভ যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সেটা পড়ে দেখুন।'

রমানোভ্স্কি তার বিশাল হাতের তালু ফোলা ফোলা তেলতেলে মুখের ওপর বোলাতে বোলাতে কাগজটা পড়তে লাগল। কর্নিলভ ততক্ষণে দ্রুত খসখস করে লিখে ফেললেন:

কসাক সেনাপতি আলেক্সেই মাক্সিমভিচ কালেদিন সমীপেষু –
নোভোচের্কাস্ক

সাময়িক সরকারের নিকট আপনার প্রেরিত তারবার্তার সারমর্ম আমি অবগত হইয়াছি। দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে এক নিষ্ফল সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার ফলে গৌরবমণ্ডিত কসাক সম্প্রদায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। মাতৃভূমির ধ্বংস অনিবার্য দেখিয়া, তাহাদের শ্রমে, তাহাদের শোণিতে যাহার বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটিয়াছে সেই দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাহারা অস্ত্রধারণ করিবে। আমাদের সম্পর্ক কিয়ৎকালের জন্য সীমিত রহিয়া যাইতেছে। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, আপনার স্বদেশপ্রীতি এবং কসাক মর্যাদাবোধ আপনাকে যেমন নির্দেশ দেয় তদনুযায়ী আমার সহিত সহযোগিতাপূর্বক কার্যসাধন করুন। ৬৫৮/২৯/৮/১৭

জেনারেল কর্নিলভ

'এই টেলিগ্রামটা এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন,' লেখা শেষ হওয়ামাত্র রমানোভ্স্কিকে তিনি বললেন।

'এর পরেও যাতে মার্চিং অর্ডারে যাত্রা চলতে থাকে সেই মর্মে প্রিন্স বাগ্রাতিওনকে নির্দেশ দিয়ে দ্বিতীয় আরও একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে বলেন কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঠান।'

রমানোভ্স্কি একটু চুপ করে থেকে ইতস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয় কি লাভ্‌র গেওর্গিয়েভিচ, অমন মুষড়ে পড়ার মতো কোন হেতু এখনও আমাদের নেই। ঘটনার পরিণতি খারাপ হতে পারে বলে আপনি মিছিমিছি আগে থাকতে ভেবে মরছেন। . . .'

একটা বেগনী রঙের ছোট্ট প্রজাপতি কর্নিলভের মাথার ওপর ফড়ফড় করে উড়ছিল। সেটাকে ধরার চেষ্টায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত ছুঁড়লেন জেনারেল। তাঁর হাতের আঙুলগুলো মুঠিবদ্ধ হয়ে গেল, মুখের ওপর ফুটে উঠল সামান্য চাঞ্চল্য ও ব্যগ্রতার চিহ্ন। বাতাসে চাঞ্চল্য খেলে যেতে তারই ধাক্কায় বিচলিত হয়ে প্রজাপতিটা পাখা মেলে দ্রুত খোলা জানলার দিকে ভেসে চলল। তা সত্ত্বেও কর্নিলভ কিন্তু ঠিক ওটাকে ধরে ফেললেন, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিলেন।

রমানোভ্স্কি তার নিজের মন্তব্যের উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল, কিন্তু কর্নিলভ অন্যমনস্ক ভাবে বিষণ্ণ হাসি হেসে বলতে শুরু করল, 'আজ আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। যেন আমি কোন এক রাইফেল-ডিভিশনের ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার হয়ে কার্পাথিয়ান এলাকায় আক্রমণ করতে গেছি। সদর দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে কোন এক খামারে এসেছি আমি। পোশাকী জামাকাপড় পরা একজন মাঝবয়সী কার্পাথীয় বুশী এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। লোকটা আমাদের যত্ন করে দুধ খেতে দিল, মাথার সাদা কম্বলের টুপি খুলে একেবারে খাঁটি জার্মান ভাষায় বলল, 'খাও জেনারেল! এই দুধের অসাধারণ দ্রব্যগুণ আছে।' আমি দুধ খেতে থাকি, এদিকে কার্পাথীয় বুশীটা যে অমন গায়ে-পড়া হয়ে আমার কাঁধে চাপড় মারছে তাতে এতটুকু অবাক হচ্ছি না। তারপর আমরা চললাম পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। এখন আর যেন কার্পাথিয়ার এলাকা বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন আফ্গানিস্তানের কোথাও হবে। উঠছি পাহাড়ী ছাগলদের চলার পথ ধরে। . . . হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রকমই কোন পথ বটে – আমাদের পায়ের নীচে ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে পাথর আর খয়েরি রঙের নুড়ি। নীচে গিরিখাতের ওপাশে চোখে পড়ছে সাদা রোদে ধোওয়া দক্ষিণদেশের অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য। . . .'

মুখোমুখি খড়খড়ি খোলা দু'পাশের জানলা দিয়ে একটা হাল্কা বায়ুস্রোত ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপরকার কাগজগুলোর ওপর খসখস আওয়াজ তুলল। কর্নিলভের কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি যেন কোন্ দূরে উধাও হয়ে গেছে, যেন নীপার ছাড়িয়ে পেতল-কাঁসার মতো হলদে রঙ-ধরা তৃণভূমিতে কাটাছাঁটা কোন এক নাবাল উপত্যকাভূমির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রমানোভ্স্কি জেনারেলের সেই দৃষ্টি অনুসরণ করল। নিজের অজানিতেই একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। অভ্রের মতো ঝকঝকে নীপারের নিবাত নিষ্কম্প বক্ষদেশ আর আসন্ন শরতের কোমল স্পর্শে ভাসা-ভাসা প্রান্তরের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল।

সতেরো

পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে লাগানোর জন্য তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার কোর্ আর আদিবাসী ডিভিশনের যে-সমস্ত ইউনিট পাঠানো হচ্ছিল তাদের নিয়ে আটটি রেললাইনের বিশাল এলাকা জুড়ে চলতে লাগল সামরিক ট্রেন। রেভেল,

তাসত্ত্বেও কুচকাওয়াজ করে রাস্তা ধরে এগোনোর ব্যাপারে বাগ্রাতিওন ইতস্তত করতে থাকে। কোর্-এর কম্যাণ্ডারদের কামরায় উঠে বসে থাকার হুকুম দিল সে।

ইয়েভ্গেনি লিস্ত্নিৎস্কি কোন এক সময় যে রেজিমেণ্টে ছিল, এক নম্বর দন-কসাক ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রেজিমেণ্টের সঙ্গে সেটাকেও রেভেল-ভে-জেন্‌বের্গ-নার্ভা লাইন বরাবর পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হচ্ছিল। ২৮ তারিখ বিকেল পাঁচটায় রেজিমেণ্টের দুটো স্কোয়াড্রন নিয়ে ট্রেন এসে পৌঁছুল নার্ভা স্টেশনে। সামরিক ট্রেনের কম্যাণ্ডার জানতে পারল নার্ভা আর ইয়াম্‌বুর্গের মাঝখানের রেল-রাস্তাটা ধ্বংস হয়ে গেছে, ফলে সে রাত্রে আর এগোনো সম্ভব নয়। রেলওয়ে ব্যাটেলিয়নের একটা ইউনিটকে বিশেষ ট্রেনে করে সেখানে পাঠানো হয়েছে। লাইন যদি সময়মতো চালু করা যায় তাহলে ভোরের দিকে ট্রেন ছাড়তে পারে। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, কম্যাণ্ডারকে এ ব্যবস্থা মেনে নিতে হল। শাপ-শাপান্ত করতে করতে সে তার কামরায় গিয়ে উঠল, খবরটা অন্যান্য অফিসারদের জানিয়ে দিয়ে চা খেতে বসে গেল।

মেঘলা রাত। একটা কনকনে ভিজে হাওয়া বইছে উপসাগর থেকে। রেললাইনের ওপরে, কামরায় কামরায় চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে কসাকরা, ইঞ্জিনের হুইসিলে চঞ্চল হয়ে উঠে কাঠের মেঝেতে পা ঠুকছে ঘোড়াগুলো। ট্রেনের একেবারে পেছনের কামরা থেকে অন্ধকারের মধ্যে অভিযোগের সুরে গান গেয়ে উঠল এক তরুণ কসাক, কার উদ্দেশ্যে কেউ জানে না।

> শহর আমার, পল্লী আমার, দাও মোরে বিদায়,
> বিদায় ওগো গ্রামটি আমার, জন্মেছি যেথায়!
> বিদায় আমার দাও যুবতী, সুন্দরী গো হায়!
> আকাশ রঙের ফুলটি ওগো, দিন যে আমার যায়!
> সকাল সাঁঝে বাহুর 'পরে এলিয়ে দিয়ে মাথা,
> পিয়ার সনে গুনগুনিয়ে হত কতই কথা।
> হায় রে এখন সকাল সাঁঝে কী যে ভীষণ তাড়া!
> অস্ত্র হাতে সেপাই আমি আছি হয়ে খাড়া। . . .

ধূসর চাপ বাঁধা রেলগুদামের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক। থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে গান শুনল; আলোর যতিচিহ্ন আঁকা রেললাইনগুলো নিরীক্ষণ করে দেখল, তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল ট্রেনটার দিকে। লাইনের কাঠের স্লিপারগুলোর ওপরে পা ফেলার মৃদু আওয়াজ উঠতে লাগল, কিন্তু যখন সে রেললাইন ছেড়ে দুরমুস-করা বেলেমাটির ওপর দিয়ে চলতে লাগল তখন

পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গেল। লোকটা যখন শেষ কামরাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যে কসাকটা গান গাইছিল হাঁক দিয়ে উঠল সে।

'কে যায়!'

'তোমার তাতে কী হে?' চলতে চলতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিল লোকটি।

'রাত দুপুরে এখানে ঘুরঘুর করছ যে? তোমাদের মতো গুণ্ডা-বদমাশগুলোকে আমরা ধরে ধরে খতম করি। কোথায় কী অসাবধানে পড়ে আছে তার জন্যে কেবল ছোঁক ছোঁক করা?'

লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে ট্রেনের মাঝামাঝি কামরাগুলো বরাবর চলে এলো। একটা কামরার দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ স্কোয়াড্রন এটা?'

'আসামীদের,' অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন হা-হা করে হেসে উঠল।

'ঠাট্টা নয়, কাজের কথা বলছি – স্কোয়াড্রন?'

'দু'নম্বর।'

'চার নম্বর ট্রুপ কোথায়?'

'ট্রেনের সামনে থেকে ছয়ের কামরা।'

ছয়ের কামরার দরজার কাছে তিনজন কসাক তামাক টানছিল। একজন উবু হয়ে বসে ছিল, দু'জন পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা চুপচাপ তাকিয়ে দেখতে লাগল একজন লোক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'এই যে ভাই, কী খবর? ভালো ত?'

'ভগবানের কৃপায়, ভালোই,' আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের একজন উত্তর দিল।

'নিকিতা দুগিন বেঁচে আছে? এখানে আছে কি?'

'এই যে আমি,' উবু হয়ে যে লোকটা বসে ছিল চড়া সুরেলা গলায় সাড়া দিল সে। সিগারেটটা জুতোর গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। 'চিনতে পারলাম না ত তোমাকে? কে তুমি? কোথা থেকে?' গ্রেটকোট গায়ে দোমড়ানো ফৌজী টুপি মাথায় অচেনা লোকটাকে ভালো করে দেখার জন্য দাড়িওয়ালা মুখখানা সামনে বাড়িয়ে দিল সে। তারপর হঠাৎ অবাক হয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, 'আরে ইলিয়া! বুনচুক যে! কী ডাকু! কোথা থেকে উদয় হলে?'

খসখসে হাতে বুনচুকের লোমশ হাতখানা চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় বলল, 'এরা সব আমাদের লোক, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কী করে এখানে এলে বল ত? ধুত্তোর ছাই, বলই না!'

বাকি সব কসাকদের সঙ্গে হাত মেলাল বুনচুক। তারপর ঢালাই লোহার

মতো ঢনঢনে, ভাঙা-ভাঙা গলায় উত্তর দিল, 'আসছি পেত্রোগ্রাদ থেকে। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি তোমাদের খোঁজে। কাজ আছে। আলোচনা করা দরকার। তুমি বেঁচে আছ, সুস্থ আছ দেখে আমি সত্যিই খুশি, ভাই।'

সে হাসল। তার ধূসর বিশাল চৌকো মুখের ওপর ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁতের সারি, ভিটেকপালের নীচে চোখের ওপর খেলে গেল খুশির আমেজভরা চাপা হাসির ঝিলিক।

'আলোচনা করা দরকার বলছ?' দাড়িওয়ালা দুগিনের চড়া কণ্ঠস্বর সুরে বেজে উঠল। 'তুমি একজন অফিসার হলে কী হবে আমাদের সঙ্গে মিশতে তোমার এতটুকু ঘেন্না হয় না, ঠিক বলি নি? এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ ইলিয়া। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। এতটুকু দরদ, এতটুকু ভালো কথা আমরা কারও কাছ থেকে কখনও পাই নি। . . .' তার কণ্ঠস্বরে একটা উদার প্রসন্ন হাসির সুর ফুটে উঠল।

বুন্‌চুকও উত্তরে সেই একই সুরে ঠাট্টা করে বলল, 'হয়েছে হয়েছে, আর জল ঘোলা করতে হবে না! তোমার সবেতেই মজা! দাড়ি ত এদিকে হাঁটু অবধি নেমে গেছে, কিন্তু হাসিঠাট্টার শেষ নেই।'

'দাড়ি আমরা যে কোন সময় চেঁছে ফেলতি পারি। যাক গে তুমি বল ত শুনি, পেত্রোগ্রাদের খবর কী? বিদ্রোহ কি শুরু হয়ে গেছে?'

'চল, কামরার ভেতরে যাই আগে,' বুন্‌চুকের কণ্ঠে প্রতিশ্রুতির আভাস।

ওরা কামরার ভেতরে ঢুকে পড়ল। পায়ে ঠোক্কর মেরে কাকে যেন জাগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় দুগিন বলল, 'উঠে পড় হে ছেলেছোকরারা! এক কাজের লোক আমাদের এখানে অতিথ হয়ে এসেছে। জলদি! চটপট উঠে পড় সেপাইরা!'

কসাকরা কঁকিয়ে কুঁথিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। বুন্‌চুক ঘোড়ার জিনের ওপর বসে ছিল। তামাক আর ঘোড়ার ঘামের গন্ধমাখা কার যেন বিশাল একজোড়া হাত অন্ধকারের মধ্যে সন্তর্পণে হাতড়ে হাতড়ে বুন্‌চুকের মুখখানা ছুঁয়ে দেখল। ঘন দরদরে গলায় লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বুন্‌চুক?'

'ঠিকই ধরেছ। চিকামাসভ নাকি?'

'আমি, আমি। বড় খুশি হলাম দোস্ত্!'

'বেশ, বেশ।'

'এক্ষুনি ছুটে গিয়ে তিন নম্বর ট্রুপের ছোকরাদের ডেকে আনব?'

'বেশ, যাও!'

তিন নম্বর ট্রুপের প্রায় সকলেই এসে হাজির হল, শুধু দু'জন রইল ঘোড়াগুলোর

কাছে। বুনচুকের কাছে এসে কসাকরা বাসী রুটির মতো খড়খড়ে হাত তার হাতে গুঁজে দিতে লাগল, লণ্ঠনের আলোয় তার বিশাল থমথমে মুখখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল। কেউ তাকে বুনচুক বলে, কেউ ইলিয়া মিত্রিচ, কেউ বা ডাকনাম ধরে ইলিউশা বলে তাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল বন্ধুসুলভ আন্তরিক শুভকামনার এক অখণ্ড সুর।

কামরার ভেতরটা গুমোট হয়ে উঠেছে। কাঠের তক্তার দেয়ালে দেয়ালে দপ দপ করে আলোর বিন্দু নাচছে, কিম্ভূতকিমাকার ছায়াগুলো দুলছে, আকারে বেড়ে চলছে, লণ্ঠনের আলো বিগ্রহের নীচের তেলের প্রদীপের মতো ধোঁয়া তুলছে।

বুনচুককে যত্ন করে সকলে আলোর কাছে বসাল। সামনের লোকজন উবু হয়ে বসল, বাকি লোকেরা গাদাগাদি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খনখনে গলায় দুগিন কাশল।

'তোমার চিঠি আমরা এই কিছু দিন হল পেয়েছি ইলিয়া মিত্রিচ। তাহলেও আমরা এর পরে কী করব সে ব্যাপারে তোমার উপদেশ শুনতে চাই। এদিকে আমাদের পেত্রোগ্রাদে পাঠানো হচ্ছে - কী করা যায় বল ত?'

দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এক কসাক। তার এক কানের কোঁচকানো লতিতে একটা মাকড়ি ঝুলছে। এ হল সেই কসাক যাকে একবার পরিখার মাটির পাঁচিলের গায়ের লোহার চাদরের ওপর চা গরম করতে দেখে লিস্তনিৎস্কি ধমক দিয়েছিল, অপমান করেছিল। কসাকটি বলল, 'ব্যাপারটা কি জান মিত্রিচ, এখানে নানা ধরনের উস্কানিদাতারা এসে আমাদের মত ফেরানোর চেষ্টা করছে - বলছে পেত্রোগ্রাদে যেয়ো না, নিজেদের মধ্যি লড়াই করাটা আমাদের ঠিক হবে না - এই রকম হেনতেন নানা কথা। আমরা ওদের কথা শুনে যাই, কিন্তু বিশ্বাস তেমন করতে পারি নে ওদের। অন্য জাতের লোক। ওরা আমাদের বেকায়াদায় ফেলতে চায় না কে বলবে? আমরা যদি অমান্যি করি তাহলে কর্নিলভ চের্কেসদের লেলিয়ে দেবে আমাদের ওপর - আবার সেই রক্তপাতই ঘটবে তখন। কিন্তু তুমি - তোমার কথা আলাদা - তুমি হলে গিয়ে আমাদের কসাক জাতের লোক, ওদের চেয়ে তোমাকে বেশি বিশ্বাস করি আমরা; এমনকি পেত্রোগ্রাদ থেকে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে আমাদের, আবার খবরের কাগজও পাঠিয়েছিলে তার জন্যে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। . . . সত্যি কথা বলতে গেলে কি সিগারেট পাকানোর কাগজের টানাটানি চলছিল, তাই যখন খবরের কাগজ পাই . . .'

'কী সব আজেবাজে বকবক করছিস, মুখ্যু কোথাকার?' ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিল একজন। 'তুই লেখাপড়া জানিস নে - তাই বলে কি ভাবিস সবাই তোর মতন

আকাট? যেন আমরা সিগারেট পাকানোর কাজেই খবরের কাগজ লাগিয়েছি! আগে আমরা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পড়ে ফেলি, ইলিয়া মিত্রিচ, তা-ই করেছি।'

'ব্যাটা শয়তান! যত উলটো-পালটা কথা!'

'সিগারেট পাকানোর জন্যে – কথা শোন একবার!'

'মুখ্যু আর কাকে বলে!

'আরে ভাই শোনো তোমরা! আমি সেই অর্থে বলি নি,' কানে মাকড়ি-লাগানো কসাকটি কৈফিয়তের সুরে বলল। 'প্রথমে যে আমরা খবরের কাগজ পড়েছি সে ত বটেই . . .'

'তুমি কি নিজে পড়েছ?'

'তা কী করে পড়ব? লেখাপড়া শেখা আমার কখনও হয়ে ওঠে নি। . . . আমি বলছিলাম কি, আমরা একসঙ্গে মিলে পড়েছি, তারপর সিগারেট পাকানোর জন্যে . . .'

বুনচুক ঘোড়ার জিনের ওপর বসে ছিল, কসাকদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল সে। বসে বসে কথা বলতে তার অসুবিধে হচ্ছিল, তাই উঠে দাঁড়াল। লণ্ঠনের দিকে পিঠ করে ধীরে ধীরে ঠেকে ঠেকে বলতে লাগল, 'পেত্রোগ্রাদে তোমাদের কিছু করার নেই। ওখানে বিদ্রোহ-টিদ্রোহ কিছু হয় নি। ওখানে তোমাদের কেন পাঠানো হচ্ছে জান? সাময়িক সরকারকে উৎখাত করার জন্যে। এই হল ব্যাপার। কে তোমাদের চালাচ্ছে? – জারের জেনারেল কর্নিলভ। কেরেন্স্কিকে হটাতে চায় কেন সে? – কেন আবার – নিজে সেই মসনদে বসবে বলে! দেখ ভাই, তোমাদের কাঁধ থেকে কাঠের জোয়াল ওরা খুলে দিতে চায়, কিন্তু তার বদলে যদি অন্য কোন জোয়াল লাগায় সেটা হবে ইস্পাতের! দুটো বিপদের মধ্যে যেটা তুলনায় কম, তাকেই বেছে নিতে হয়। তাই না? এবারে তাহলে নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ: জারের আমলে ঘুষি মেরে তোমাদের দাঁত ভেঙে দিত, তোমাদের দিয়ে লড়াই করিয়ে তোমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙত। কেরেন্স্কির সময়ও পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা চলছে, কিন্তু দাঁত অন্তত ওরা ভাঙছে না। সব ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে অন্য রকম চেহারা নেবে কেরেন্স্কির পরে, যখন ক্ষমতা যাবে বলশেভিকদের হাতে। বলশেভিকরা যুদ্ধ চায় না। ক্ষমতা যদি তাদের হাতে থাকত সঙ্গে সঙ্গে শান্তি এসে যেত। আমি কেরেন্স্কির পক্ষে নই। জাহান্নামে যাক কেরেন্স্কি! ওরা সব এক গোয়ালের গোরু!' বুনচুক একটু হাসল, জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলে চলল, 'তবে আমার কথা হল, মজুরদের রক্তপাত করো না। কর্নিলভ যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে মজুরের

রক্তে রাশিয়া ভেসে যাবে, তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে মেহনতীদের হাতে দেওয়া আরও কঠিন হবে।'

'একটু দাঁড়াও ইলিয়া!' পেছনের সারি থেকে এগিয়ে এলো এক বেঁটেখাটো কসাক, বুনচুকের মতোই গাঁট্টাগোট্টা। লোকটা গলা খাঁকারি দিল, সুপ্রাচীন ওক গাছের বৃষ্টি ধোওয়া শেকড়ের মতো লম্বা লম্বা হাতদুটো ঘসল। কচিপাতার মতো হাল্কা সবুজ চকচকে হাসি-হাসি চোখে বুনচুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই যে জোয়ালের কথা বললে না তুমি . . . তা বলশেভিকরা যখন ক্ষমতা দখল করবে তখন কোন্ জোয়াল আমাদের ঘাড়ে চাপাবে বল ত?'

'তুমি কি নিজের ঘাড়ে নিজে জোয়াল চাপাবে?'

'নিজে মানে – কী বলতে চাও?'

'কী বলতে চাই? আচ্ছা বলশেভিকরা ক্ষমতায় এলে কে সরকার চালাবে? তুমি চালাবে, যদি তোমাকে বাছাই করা হয়, নয়ত দুগিন, নয়ত এই এ। এটা হল যাদের বাছাই করা হবে তাদের নিয়ে তৈরি সরকার। সোভিয়েত। বুঝলে?'

'কিন্তু সবার ওপরে কে থাকবে?'

'এখানেও সেই, যাকে বাছাই করা হবে। তোমাকে সকলে বেছে নিলে তুমিই হবে সবার ওপরে।'

'বাপ্‌স রে, বল কি! বাজে কথা বলছ না ত মিত্রিচ?'

কসাকরা হেসে ওঠে। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। এমনকি দরজার কাছে যে পাহারায় ছিল সেও অল্পক্ষণের জন্য সরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

'কিন্তু জমির ব্যাপারে ওরা কী বলে?'

'আমাদের জমিজমা কেড়ে নেবে না ত?'

'লড়াই থামাবে ওরা? নাকি ওই মুখেই বলা – যাতে আমরা ওদের পক্ষে হাত তুলি?'

'তুমি বাপু কিছু না লুকিয়ে সব বল আমাদের!'

'আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি।'

'বাইরের লোককে বিশ্বাস করার বিপদ আছে। উল্‌টো পাল্‌টা নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। . . .'

'গতকাল কোথাকার এক জাহাজী কেরেন্‌স্কির জন্যে মায়াকান্না জুড়ে দিল। আমরা ব্যাটাকে চুলের মুঠি ধরে কামরা থেকে বার করে দিয়েছি।'

''তোমরা হলে গিয়ে প্রিতি-বিপ্লবী!' এই বলে চিৎকার-চেঁচামেচি। . . . আজব লোক বটে!'

'ওসব বড় বড় কথার অর্থ কী, আমাদের মাথায় ঢোকে না।'

বুনচুক চারপাশে মাথা ঘুরিয়ে চোখের দৃষ্টিতে কসাকদের মেজাজ বোঝার চেষ্টা করল, তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। নিজের উদ্যমের সাফল্য সম্পর্কে গোড়ায় তার মনে যে অনিশ্চয়তা ছিল তা এখন দূর হয়ে গেল। কসাকদের মন-মেজাজ নিজের বশে আনার পর এখন সে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারল, যা-ই ঘটুক না কেন নার্ভাতে সামরিক ট্রেন আটকে রাখতে পারবে। আগের দিন সে যখন পার্টির পেত্রোগ্রাদ জেলা-কমিটির কাছে গিয়ে পেত্রোগ্রাদ-অভিমুখী এক নম্বর দন-কসাক ডিভিশনের ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রচারক হিশেবে কাজ করার জন্য নিজের নাম প্রস্তাব করেছিল তখন সাফল্য সম্পর্কে তার মনে স্থির বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু নার্ভায় পৌঁছে তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। সে জানে, কসাকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অন্য এক ভাষার দরকার। হয়ত তাদের সঙ্গে তার ভাষার মিল হবে না এই ভেবে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ এই যে গত নয় মাস ধরে মজুরদের মধ্যে ফিরে আসার পর তাদের জীবনধারার সঙ্গেই আবার সে একান্ত ভাবে মিশে গেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওর মুখের অর্ধেক কথাতেই যে ওরা তাকে উপলব্ধি করতে পারে, বুঝতে পারে – এই ঘটনায় এখন সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে, নিজের দেশের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে দরকার অন্য আরেক ভাষা, কালো মাটির অঞ্চলের ভাষা, যে-ভাষা সে প্রায় ভুলে গেছে। এখানে দরকার গিরগিটির মতো ক্ষিপ্রতা, লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের এক বিশেষ ক্ষমতা – বিরাট শক্তি। আদেশ অমান্য করার যে আতঙ্ক এই সব মানুষের মনে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে তাকে শুধুই ছেঁকা দেওয়া নয় – জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে, ধ্বংস করে দিতে হবে; ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে কসাকদের মনের আড়ষ্টতা। তারা যে ন্যায়ের পথে চলেছে তাদের মনের মধ্যে সেই চেতনা জাগিয়ে তুলে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাদের।

গোড়ায় যখন সে কথা বলতে শুরু করেছিল তখন নিজের কণ্ঠস্বরের বাধ-বাধ অনিশ্চয়তার ভাব, একটা কৃত্রিমতা তার নিজের কানেই ধরা পড়ে। তার মনে হয়েছিল সে যেন আর কারও মুখ থেকে কতকগুলো শুষ্ক নীরস কথা শুনছে। নিজের যুক্তির অসারতার কথা ভেবে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। অস্থির হয়ে সে তখন বিরুদ্ধযুক্তি ভেঙে চুরমার করার জন্য মাথা কুটতে থাকে, ভারী ভারী কথার মোক্ষম বড় বড় চাঁইয়ের খোঁজ করতে থাকে। . . . কিন্তু তার মনটা একটা অবর্ণনীয় তিক্ততায় ভরে ওঠে যখন সে উপলব্ধি করে তার বদলে মুখ থেকে সাবানের বুদ্বুদের মতো বেরিয়ে আসছে কতকগুলো ফাঁকা বুলি, আর মাথার ভেতরে অসার কতকগুলো চিন্তা গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে, পিছলে সরে

যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হতে থাকে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে থাকে। কথা বলার সময়ও তার মাথার ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছিল একটিমাত্র চিন্তা: 'আমার ওপরে এত বড় একটা কাজের ভার দেওয়া হল, আর আমি কিনা এতই অপদার্থ যে নিজের হাতে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছি! ... গুছিয়ে কথা বলতে পারছি না। ... এ কী হল আমার? আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হাজার গুণ ভালো যুক্তি দিতে পারত। ... দুর ছাই, আমি দেখছি নেহাৎই একটা অপদার্থ!'

ধারাল সবুজ-চোখ যে কসাকটা জোয়ালের কথা জিজ্ঞেস করল সে যেন ধাক্কা মেরে এই অস্বস্তিকর আত্মবিস্মৃত অবস্থা থেকে বুন্‌চুককে বার করে আনল। এর পর যে আলোচনার সূত্রপাত হল তাতে সে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেবার সুযোগ পেল। পরে ভেতরে ভেতরে এক অস্বাভাবিক শক্তির জোয়ার উপলব্ধি করে, দামী দামী বাছা বাছা ধারাল, কাটা-কাটা কথার ফুলঝুরি বেরিয়ে আসছে দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। তখন সে উৎসাহিত হয়ে উঠল, আপাত প্রশান্ত ভাবের আড়ালে ভেতরের প্রবল উত্তেজনা গোপন রেখে বেশ গুরুত্ব দিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শ্লেষাত্মক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে লাগল, কথাবার্তা সে এমন ভাবে চালাতে লাগল যেন ঘোড়সওয়ার কোন এক অবাধ্য ঘোড়াকে ছুটিয়ে হয়রান করিয়ে বাগে এনেছে।

'আচ্ছা, সংবিধান সভা* খারাপটা কিসের বল ত?'

'তোমাদের যে লেনিন, তাকে ত জার্মানরা নিয়ে এসেছে, ... তাই না? কোত্থেকে এসে উদয় হল লোকটা ... ভুঁই ফুঁড়ে নাকি?'

'বল ত মিত্রিচ, তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ, নাকি তোমাকে কেউ পাঠিয়েছে?'

'কসাক ফৌজীদের জমি কারা পাচ্ছে?'

'জারের আমলে আমরা খারাপটা কী ছিলাম?'

'মেনশেভিকরাও** ত জনসাধারণের পক্ষে, তাই না?'

---

* রাশিয়ায় পার্লামেন্ট সংস্থা। ১৯১৮ সালের ৫ জানুয়ারী পেত্রোগ্রাদে এর অধিবেশন বসে। সভার অধিকাংশ সদস্যই ছিল প্রতিবিপ্লবী। সোভিয়েত সরকারের ডিক্রীগুলি তারা অস্বীকার করে। সকালে এর অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়। পর দিন মাঝরাতের পর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বিশেষ আদেশ বলে সংবিধান সভা বাতিল হয়ে যায়। – অনুঃ

** রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির উপদল। ১৯০৩ সালের পার্টি কংগ্রেসে রণকৌশলের প্রশ্নে পার্টি দুটি উপদলে ভেঙে যায়: সংখ্যাগুরু (বল্‌শিনস্তভো) ও সংখ্যালঘু (মেন্‌শিন্‌স্তভো) – তাই থেকে যারা সংখ্যাগুরুদের দলভুক্ত তাদের 'বলশেভিক' ও যারা সংখ্যালঘুদের অন্তর্বর্তী তাদের 'মেনশেভিক' নাম হয়। পরে দুই উপদল দুটি পার্টিতে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর বলশেভিকরা আসলে সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়ায় এবং পুনরায় সংখ্যাধিক্য অর্জন করে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে। – অনুঃ

'আমাদের কসাক ফৌজীদের যে কাউন্সিল তা জনসাধারণের সরকার – তাহলে সোভিয়েত-টোভিয়েতের কী দরকার আমাদের?'

মাঝরাতের পর সকলে যে যার জায়গায় চলে গেল। ঠিক হল পরদিন সকালে দুটো স্কোয়াড্রনকে নিয়েই একটা মিটিং করা হবে। ট্রেনের কামরার ভেতরেই রাত কাটানোর জন্য রয়ে গেল বুন্‌চুক। চিকামাসভ তার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে বলল বুন্‌চুককে। শোবার আগে সুনিদ্রার প্রার্থনায় ভগবানের নাম করল চিকামাসভ, তারপর বুন্‌চুককে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পার ইলিয়া মিত্রিচ, কিন্তু একটা ব্যাপারে আমাদের ক্ষমা করতে হবে . . . আমাদের এখানে উকুন আছে ভাই। কিছু উকুন যদি জুটে যায় তোমার, তাহলে রাগ করো না কিন্তু। এত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি আমরা . . . সেই সুযোগে উকুনগুলোও হয়ে উঠেছে বিরাট বিরাট – বিপদ আর কাকে বলে! একেকটা ভালো জাতের বাছুরের সমান!' একটু চুপ করে রইল সে, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'ইলিয়া মিত্রিচ, কোন্ জাতের লোক লেনিন? মানে, কোথায় তাঁর জন্ম, কোথায় বড় হয়েছেন তিনি?'

'লেনিন? রুশী।'

'যাঃ!'

'সত্যি বলছি, রুশী।'

'না ভাই! তুমি দেখছি তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জান না,' চিকামাসভের কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে বিজ্ঞতার ভাব। মোটা গলায় সে বলল, 'জান কোন্ জাতের লোক? আমাদের। দন-কসাকদের ভেতর থেকে এসেছেন, সাল্‌স্ক জেলার ভেলিকোক্লিয়াজেস্কায়া সদরে তাঁর জন্ম। ভেলিকোক্লিয়াজেস্কায়া – বুঝেছ? শোনা যায় গোলন্দাজ ছিলেন। তা চেহারাটা সেই রকমই বটে – দনের ভাটি এলাকার কসাকদের মতো – গালের হাড়গুলো উঁচু, বড় বড়। তাছাড়া চোখ?'

'কোথায় শুনলে?'

'কসাকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, তাইতে শুনলাম।'

'না চিকামাসভ! লেনিন রুশী, সিম্বির্‌স্ক প্রদেশে তাঁর জন্ম।'

'না, বিশ্বাস করি না। কেন করি না? খুবই সহজ! এই ধর পুগাচিওভ – পুগাচিওভ কসাক, তা স্বীকার কর ত? আর স্তেপান রাজিন? আর ইয়েরমাক তিমফেয়েভিচ? তাহলেই বোঝ! জারের বিরুদ্ধে গরিব লোকদের যারা জাগিয়ে তুলেছে তারা সব্বাই কসাক। আর তুমি কিনা বলছ সিম্বির্‌স্ক প্রদেশের লোক। অমন কথা শুনলেও রাগে গা জ্বালা করে মিত্রিচ . . .'

বুন্‌চুক মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে সবাই বলছে – কসাক ?'

'হ্যাঁ, কসাকই, তবে এক্ষুনি প্রকাশ করছেন না, এই যা। তাঁর মুখটা যখন দেখতে পাব তখন এক নজরে ঠিক বুঝতে পারব।' চিকামাসভ একটা সিগারেট ধরাল, কড়া তামাকের উগ্র গন্ধ বুন্‌চুকের মুখের ওপর ছাড়ল, চিন্তিত ভাবে কাশল, তারপর বলল, 'আমি অবাক হয়ে যাই, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রায় মারামারি বেধে যায় আর কি! এই লেনিন – ভ্লাদিমির ইল্‌গিচ – যদি আমাদের কসাক, গোলন্দাজই হবেন, তাহলে অত বিদ্যেবুদ্ধি উনি পেলেন কোত্থেকে ? সবাই বলে, লড়াইয়ের প্রথম দিকে জার্মানরা তাঁকে যুদ্ধবন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তিনি পড়াশুনো করেন, সব রকম বিদ্যে শেখেন। কিন্তু তারপর যেই ওদের মজুরদের দিয়ে বিদ্রোহ করাতে লাগলেন, ওদেরই পণ্ডিতদের চোখ খুলে দিতে লাগলেন তখন ওরা ভয়েই মরে। বলল, 'তবে রে ভিটেকপালি, ভাগো এখেন থেকে! ভালোয় ভালোয় চলে যাও। নইলে দেখছি তুমি এখানে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে যে আমরা আর সামলাতেই পারব না!' ব্যস্ পাঠিয়ে দিল রাশিয়ায় – ওদের ভয় ছিল ওদের দেশের মজুরগুলোকে ক্ষেপিয়ে না তোলেন। হুঁ হুঁ, একেই বলে দাঁতাল!' শেষ কথাগুলো বেশ গর্বভরেই উচ্চারণ করল চিকামাসভ। অন্ধকারের মধ্যে খুশিতে হেসে ওঠে। 'তুমি তাঁকে দেখ নি মিত্রিচ ? না ? আফশোসের কথা। লোকে বলে ওঁর মাথাটা নাকি বিরাট।' একটু কাশল, নাক দিয়ে বাদামী ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ল। সিগারেটে সুখটান দিয়ে বলে চলল, 'বেশি করে অমন লোকের জন্ম দেওয়াই না মেয়েমানুষদের কাজ! মুরদ আছে বটে। যে কোন জারকে ঘোল খাইয়ে দিতে পারে! . . .' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না মিত্রিচ, আমার সঙ্গে তক্ক করো না। এই ইল্‌গিচ একজন কসাক। . . . ওসব রহস্যি করা কেন ? সিম্বির্স্কে অমন লোক জন্মায় না – কোন কালেই জন্মাতে পারে না!'

বুন্‌চুক চুপ করে রইল, চোখ বন্ধ না করে হাসি হাসি মুখে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল।

ঘুম আসতে তার একটু দেরিই হল। সত্যি সত্যিই পিলপিল করে উকুন এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে, জামার ভেতরে ঢুকে কুটকুট করছে, সারা গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে আগুনের জ্বালা। তার পাশে শুয়ে শুয়ে চিকামাসভ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে, গা চুলকোচ্ছে। কার একটা ঘোড়া যেন অস্থির হয়ে নাকের ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বুন্‌চুক প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় কামরার ঘোড়াগুলো নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় পা ঠুকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ ছেড়ে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

'ধুত্তোর শয়তানের ঝাড়! খেলা পেয়েছ! . . . এই, এই, হারামজাদা!' ঘুমজড়ানো চড়া গলায় চিৎকার করে উঠল দুগিন, লাফিয়ে উঠে হাতের কাছে

যে ঘোড়াটাকে পেল ভারীমতো কী একটা দিয়ে যেন তাকে বাড়ি মারল।

উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বুন্‌চুক ছটফট করতে লাগল, অন্য পাশে কাত হয়ে শুল। কিন্তু যখন তিতবিরক্ত হয়ে বুঝতে পারল অনেকক্ষণের জন্য ঘুমের দফা রফা হয়ে গেল তখন আগামীকালের জনসভার কথা ভাবতে শুরু করে দিল। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল অফিসারদের দিক থেকে কী দারুণ বাধা আসতে পারে। ভেবে সে বাঁকা হাসি হাসল, মনে মনে বলল, 'কসাকরা যদি একযোগে প্রতিবাদ করে তবে হয়ত লেজ গুটিয়ে পালাবে। অবশ্য কে বলতে পারে ছাই, ওদের কখন কী মতিগতি হয়! অন্তত সাবধানতার খাতিরে গ্যারিসন-কমিটির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেব।' আপনাআপনিই কেন যেন তার মনে পড়ে গেল ১৯১৫ সালের আক্রমণের সময়কার একটা ঘটনা। তারপর স্মৃতি যেন পায়ে-মাড়ানো পরিচিত পথে চলার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠল, হিংস্র উল্লাসে, একগুঁয়ের মতো ধরিয়ে দিতে লাগল অতীতের টুকরো টুকরো ছবি: নিহত রুশ আর জার্মান সৈন্যদের মুখ, তাদের বীভৎস ভঙ্গি, নানা কণ্ঠের ভাষণ, কোন এক সময়ে যে প্রকৃতিকে সে দেখেছিল কালক্রমে মুছে-আসা তার বর্ণহীন টুকরো টুকরো দৃশ্য, মনের মধ্যে কেন যেন গেঁথে থাকা কতকগুলো অব্যক্ত চিন্তা, কামানগর্জনের অস্পষ্টপ্রায় গুমগুম প্রতিধ্বনি, মেশিনগানের পরিচিত কটকট আর গুলির ফিতে ঘোরার খসখস আওয়াজ, বীররসাত্মক সুরের উল্লাস, একদা যে নারীকে সে ভালোবেসেছিল তার মুখের আবছাপ্রায় ছবি – এত সুন্দর যে বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে; তারপর আবার নিহত সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন দেহ, গণসমাধির মাটির স্তূপ, ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে মাটি। . . .

বুন্‌চুক উসখুস করতে থাকে; কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসে। তারপর জোরে বলে উঠল কিংবা শুধু মনে মনেই ভাবল, 'আমরণ এই স্মৃতি বয়ে বেড়াব। শুধু আমি একা নই, যারা টিকে থাকবে তারা সবাই। আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে দিল, ছিনিমিনি খেলল আমাদের জীবন নিয়ে! মরণ হয় না তোমাদের! . . . যে অপরাধ তোমরা করেছ মরণেও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না! . . .'

আরও মনে পড়ল পেত্রোগ্রাদের এক ধাতু-শ্রমিকের বারো বছরের মেয়ে লুশার কথা। যুদ্ধে নিহত শ্রমিকটি তার বন্ধু ছিল। কোন এক সময় তারা একসঙ্গে তুলা শহরে কাজ করেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বুল্‌ভার ধরে হেঁটে যাচ্ছিল বুন্‌চুক। সেখানে কিনারার একটা বেঞ্চের ওপর বসে ছিল মেয়েটি – বেঁটে গড়নের লিকলিকে কিশোরী – বেপরোয়া ভঙ্গিতে সরু সরু ঠ্যাঙদুটো ছড়িয়ে দিয়ে সিগারেট

টানছিল। বিবর্ণ তার মুখ, চোখে ক্লান্তির ছাপ, অকাল পরিণতির ফলে ঠোঁটদুটো তার টানা লম্বা দেখাচ্ছে, রঙচঙ করা ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছে তিক্ততার আভাস। 'আমাকে চিনতে পারছেন না ইলিয়া কাকু?' পেশাদারী রপ্ত-করা ভঙ্গিতে হেসে ভাঙা ভাঙা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, উঠে দাঁড়াল, তারপর ঘাড় গুঁজে বুনচুকের কনুইয়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা অসহায় শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এখন যেন বিষাক্ত গ্যাসের মতো ঘৃণার একটা প্রবল বন্যা ছুটে এসে তার শ্বাস রোধ করার উপক্রম করল। তার মুখের রক্ত শুকিয়ে গেল, সে দাঁতে দাঁত ঘসল, আর্তনাদ করে উঠল। এর পর অনেকক্ষণ ধরে লোমশ বুকটা ডলতে লাগল, তার ঠোঁটজোড়া থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার মনে হল একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো বুকের ভেতর যেন ঘৃণার আগুন জ্বলছে – ধিকিধিকি করে জ্বলছে – তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বুকের বাঁ ধারে, হৃৎপিণ্ডের কাছে ব্যথা করছে।

ভোরের আগে চোখে ঘুম এলো না। সকালবেলায় ফেকাসে হয়ে, অন্য দিনের চেয়ে আরও গম্ভীর থমথমে মুখ করে সে গেল রেল কর্মচারীদের কমিটির কাছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে এই ঠিক হল যে কসাকদের সামরিক ট্রেনটা নার্ভা থেকে যেতে দেওয়া হবে না। এক ঘণ্টা পরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল গ্যারিসন-কমিটির সদস্যদের খোঁজে।

ট্রেনের কাছে যখন সে ফিরে এলো তখন সাতটা বেজে গেছে। চলতে চলতে সকালের মৃদু ঠাণ্ডা আমেজ সারা শরীর দিয়ে উপভোগ করতে লাগল। রেলগুদামের মরচে ধরা চালের মাথা বয়ে উঠেছে সূর্য, কোন দূর থেকে যেন ভেসে আসছে গানের মতো সুরেলা নারীকণ্ঠ – এই সবের সঙ্গে এ যাত্রায় নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনার কথা ভেবে অস্পষ্ট আনন্দ উপলব্ধি করল সে। শেষ রাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়েছিল, অল্পক্ষণের জন্য হলেও প্রচণ্ড জোরে, প্রবল বর্ষণ হয়। রেলরাস্তার বেলে-মাটি ধুয়ে গেছে, জলের সরু সরু দাগ পড়েছে মাটির ওপর। মাটির গায়ে এখনও লেগে আছে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ। ছোট ছোট গর্তগুলোতে জমা জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। যেখানে যেখানে বৃষ্টির ফোঁটা গেঁথে বসেছিল সেই সব জায়গা বসন্তের দাগের মতো দেখাচ্ছে।

কামরাগুলো ঘুরে যেতেই কাদামাখা হাইবুট পায়ে গ্রেটকোট পরা এক অফিসারকে সামনাসামনি আসতে দেখল বুনচুক। মেজর কাল্‌মিকোভকে চিনতে ভুল হল না তার। চলার গতি খানিকটা কমিয়ে দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। কাছে আসতে মুখোমুখি হতেই কাল্‌মিকোভ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার তেরছা কালো দুই চোখে ঠাণ্ডা ঝলক খেলে গেল।

'কর্ণেট বুন্চুক? এখনও ছাড়া আছ? মাফ করবে, হাত আমি তোমার সঙ্গে মেলাতে পারছি নে।'

শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গ্রেটকোটের পকেটে হাত গুঁজল সে।

'আমিও হাত বাড়াতে যাচ্ছি নে। . . . সে রকম কোন অভিপ্রায় আমার নেই। . . . তুমি একটু তাড়াতাড়ি কথাটা বলে ফেলেছ,' উত্তরে ব্যঙ্গ করে বুন্চুক বলল।

'তুমি এখানে কী করছ? গা বাঁচাচ্ছ? নাকি . . . পেত্রোগ্রাদ থেকে এলে? আমাদের দোস্ত্ কেরেন্স্কির কাছ থেকে নাকি?'

'এ কি জেরা নাকি?'

'এককালে যার সঙ্গে কাজ করেছি পল্টন থেকে ফেরার হওয়ার পর তার ভাগ্যে কী হল সেই সম্পর্কে আইনসঙ্গত কৌতূহল।'

বুন্চুক তাচ্ছিল্যের হাসি চেপে রেখে কাঁধ ঝাঁকাল।

'নিশ্চিন্ত থাকতে পার – কেরেন্স্কির কাছ থেকে আসি নি আমি।'

'কিন্তু তোমরা যে এখন আসন্ন বিপদের মুখে ভাবে গদগদ হয়ে গাঁটছড়া বেঁধেছ! সে যাই হোক, কে তুমি, কী তোমার পরিচয়? অফিসারের কাঁধপটি নেই, গায়ে ফৌজী গ্রেটকোট . . .' নাকের দু'পাশ ফুলিয়ে অবজ্ঞাভরে করুণার দৃষ্টিতে কাল্মিকোভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বুন্চুকের কোলকুঁজো মূর্তিটা। 'রাজনীতির ভ্রাম্যমান দালাল? ঠিক ধরেছি?' উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখ ঘুরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলে গেল।

বুন্চুক তার কামরার সামনে দুগিনের দেখা পেল।

'কোথায় ছিলে তুমি? মিটিং ত এদিকে শুরু হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেল কেমন?'

'কেমন আবার? আমাদের স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার মেজর কাল্মিকোভ বাইরে ছিল, সবে পেত্রোগ্রাদ থেকে ট্রেনে করে এসেছে, এসেই কসাকদের একটা মিটিং ডেকেছে। এইমাত্র গেল ওদের বোঝাতে।'

কবে থেকে কাল্মিকোভ কাজের ভার নিয়ে পেত্রোগ্রাদে গিয়েছিল জিজ্ঞেস করে সেইটুকু জেনে নিতে যতটা সময় লাগল তার চেয়ে বেশি সময় বুন্চুক সেখানে নষ্ট করল না। জানা গেল কাল্মিকোভ প্রায় একমাস অনুপস্থিত ছিল।

'বিপ্লবকে টুঁটি টিপে মারার জন্য যারা আছে, বোমা ছোঁড়ার কায়দা শেখানোর অছিলায় কর্নিলভ যাদের পেত্রোগ্রাদে পাঠিয়েছিল, তাদেরই একজন। তার মানে, কট্টর কর্নিলভপন্থী। আচ্ছা, ঠিক আছে!' দুগিনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সভায় যাবার পথে অসংলগ্ন ভাবে সে ভাবল।

রেলের গুদামঘরের পেছনে কসাকদের ফৌজী শার্ট আর গ্রেটকোটের গাঢ় সবুজ সমারোহ। মাঝখানে অফিসারদের বেষ্টনীর মধ্যে একটা উপুড় করা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কাল্‌মিকোভ, তীক্ষ্ণ গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে চিৎকার করে বলছে:

'. . . চূড়ান্ত জয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে! ওঁরা আমাদের বিশ্বাস করেন – সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমরা রক্ষা করব! এবারে কসাকদের উদ্দেশ্য করে জেনারেল কর্নিলভের পাঠানো টেলিগ্রামটা আমি পড়ে শোনাব।'

অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ফৌজী শার্টের পাশের পকেট থেকে একটা দলা পাকানো কাগজের টুকরো টেনে বার করল সে, সামরিক ট্রেনের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল।

বুন্‌চুক আর দুগিন এগিয়ে এসে কসাকদের দলের সঙ্গে মিশে গেল।

গলার স্বর খানিকটা উঁচিয়ে বেশ দরদ দিয়েই পড়ে যেতে লাগল কাল্‌মিকোভ।

'আমার প্রিয় দেশবাসী কসাক বন্ধুবর্গ! তোমাদেরই পিতৃপিতামহের অস্থিপঞ্জরের উপর কি রুশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তুত হয় নাই, তাহার সীমানা বিস্তৃত হয় নাই? তোমাদেরই বিপুল শৌর্যে, তোমাদেরই কীর্তি, আত্মোৎসর্গ ও বীরত্বের ফলেই কি মহীয়সী রুশভূমি বলবতী হইয়া উঠে নাই? তোমরা, প্রশান্ত দন, সুন্দরী কুবান আর দুরন্ত তেরেকের স্বাধীন, মুক্ত সন্তানেরা, উরাল, ওরেনবুর্গ, আস্ত্রাখান, সেমিরেচিয়ে, সাইবেরিয়ার স্তেপ ও পাহাড়, বৈকালের সুদূর পূর্বাঞ্চল, আমুর ও উস্‌সুরির পক্ষবিস্তারী শক্তিমান ঈগলেরা, তোমাদের ধ্বজার সম্মান ও গৌরব রক্ষায় সর্বদাই দণ্ডায়মান হইয়াছ; তোমাদের পিতৃপিতামহের কীর্তিকাহিনীতে রুশভূমির সর্বত্র পরিকীর্ণ। বর্তমানে এমন এক মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে যখন তোমাদের সাহায্য মাতৃভূমির প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব, শাসনকার্যে অক্ষমতা ও অযোগ্যতা, দেশের অভ্যন্তরে জার্মানদের অবাধ কর্তৃত্বের সুযোগপ্রদান – যাহার প্রমাণ কাজানের ঘটনা, যেখানে আনুমানিক দশলক্ষ গোলার বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে এবং ১২,০০০ মেশিনগান ধ্বংস হইয়াছে – এই সকল অপরাধে আমি সাময়িক সরকারকে অভিযুক্ত করিতেছি। পরন্তু সরকারের কতিপয় সদস্যকে দেশের প্রতি সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে আমি অভিযুক্ত করিতেছি। নিম্নলিখিত তথ্যই তাহার প্রমাণ: আগস্টের ৩ তারিখে শীত প্রাসাদে সাময়িক সরকারের একটি মন্ত্রণাসভায় যখন আমি উপস্থিত ছিলাম সেই সময় মন্ত্রী কেরেন্‌স্কি এবং সাভিন্‌কভ আমাকে স্পষ্টই বলেন যে সকল কথা খোলাখুলি বলিবার উপায় নাই, যেহেতু মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে আস্থাস্থাপনের অযোগ্য লোকজন রহিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে এবংবিধ সরকার জাতিকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিতেছে, এবংবিধ সরকারকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহার সহিত সহযোগিতা করিলে হতভাগ্য

রাশিয়ার উদ্ধারের কোন আশা নাই। এই কারণে গতকল্য যখন শত্রুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সাময়িক সরকার সর্বাধিনায়কের পদ ত্যাগ করিবার জন্য আমার নিকট দাবি করে তখন একজন কসাকরূপে, স্বীয় সম্মান ও বিবেকের খাতিরে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও কলঙ্ক হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ শ্রেয় বিবেচনা করিয়া উক্ত দাবি অস্বীকার করিতে আমি বাধ্য হই। রুশভূমির বীরব্রতী কসাকগণ! আমি যখন প্রয়োজন মনে করিব তখনই মাতৃভূমির উদ্ধারকার্যে তোমরা আমার সহিত সহযোগিতা করিবে – এই প্রতিশ্রুতি তোমরা আমাকে দিয়াছিলে। সেই মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে – মাতৃভূমির উপর মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে! সাময়িক সরকারের নির্দেশ আমি অমান্য করিতেছি, স্বাধীন রাশিয়াকে উদ্ধারের স্বার্থে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি এবং তাহার যে সকল দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্ত্রণাদাতা স্বদেশকে বিকাইয়া দিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। কসাকগণ, অতুলনীয় শৌর্যের অধিকারী কসাকসম্প্রদায়ের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ, তাহা হইলেই তোমরা মাতৃভূমিকে এবং বিপ্লবের দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। আমার আদেশ মান্য কর, পালন কর! আমাকে অনুসরণ কর! ২৮ আগস্ট, ১৯১৭। সর্বাধিনায়ক জেনারেল কর্নিলভ।'

একটু চুপ থেকে কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে কাল্‌মিকোভ চেঁচিয়ে বলল, 'কেরেন্‌স্কি আর বলশেভিকদের দালালরা আমাদের ইউনিটগুলোকে রেললাইন ধরে এগুতে দিচ্ছে না। সুপ্রিম কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে আমরা যে নির্দেশ পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে রেলপথে সৈন্য পাঠানো যদি অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ঘোড়ায় চেপে মার্চ করেই আমাদের পেত্রোগ্রাদ যেতে হবে। আজই আমরা রওনা দেব। ট্রেন থেকে নামার জন্যে তৈরি হও!'

বুন্‌চুক কোন ভদ্রতার বালাই না রেখে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে ভিড়ের মধ্যে পথ করে মাঝখানে চলে গেল। অফিসাররা যেখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছাকাছি না গিয়ে জনসভায় বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে গলা চড়িয়ে চিৎকার করে বলল। 'কসাক কমরেডরা! পেত্রোগ্রাদের মজুর আর সৈন্যরা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে, বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে এরা তোমাদের ওস্‌কাচ্ছে। তোমরা যদি জনগণের বিরুদ্ধে যেতে চাও, যদি রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাও, যদি পঙ্গু অথর্ব না হওয়া পর্যন্ত, মরে হেজে না যাওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে চাও তাহলে যাও, তাই করো গে! . . . কিন্তু পেত্রোগ্রাদের মজুর আর সৈন্যরা আশা করে তোমরা ভ্রাতৃঘাতী হবে না। তারা তাদের ভ্রাতৃত্বের জ্বলন্ত অভিনন্দন পাঠাচ্ছে তোমাদের; শত্রু হিশেবে নয়, বন্ধু হিশেবে তারা দেখতে চায় তোমাদের . . .'

কথাগুলো শেষ করার সুযোগ সে পেল না। প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচির একটা ঝড় বয়ে গেল। তার ঝাপ্টায় কাল্‌মিকোভ যেন পিপের ওপর থেকে পড়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বুনচুকের দিকে এগিয়ে গেল সে, কয়েক পা দূরে থাকতে জুতোর হিলের ওপর ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'কসাকরা! কর্ণেট বুনচুক গত বছর ফ্রন্ট ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল – সে খবর তোমরা জান। এই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতকের কথা আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে?'

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কাল্‌মিকোভের গলা ডুবিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠল ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল সুকিন।

'অ্যারেস্ট করতে হয় ইতরটাকে! আমরা রক্ত ঢালছি, আর উনি দিব্যি পেছনে লুকিয়ে গা বাঁচাচ্ছেন! . . . ধর ওকে!'

'দাঁড়াও না, অত তাড়ার কী আছে?'

'বলতে দাও!'

'আহা অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া কেন? ওর পথ ওকে নিজেকেই ব্যাখ্যা করতে দাও না!'

'অ্যারেস্ট কর!'

'ওসব ফেরারীদের দিয়ে কোন কাজ নেই আমাদের!

'বল বুনচুক, বল!'

'ওদের একেবারে কচুকাটা করে দাও হে মিত্রিচ!'

'নিপাত যাক! . . .'

'চোপ্‌, হারামজাদারা!'

'দাও বুনচুক, ওদের কাত করে দাও! কষে দাও ওদের! দাও একচোট!'

পিপের ওপর লাফিয়ে উঠল ঢ্যাঙামতন এক কসাক, রেজিমেণ্টের বিপ্লবী কমিটির সদস্য। মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা, কোন টুপি নেই তার মাথায়। জ্বালাময়ী ভাষায় কসাকদের আহ্বান করে সে বলল জেনারেল কর্নিলভ বিপ্লবকে টুঁটি টিপে হত্যা করতে চলেছে – তার হুকুম যেন তারা না মানে; জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফল যে কী সর্বনাশা সেই কথা সে বলল। বক্তৃতার শেষে বুনচুকের দিকে ফিরে বলল। 'আর আপনি কমরেড, মনে করবেন না, অফিসাররা যেমন আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখে, আমরাও সেই চোখে দেখি। আপনাকে দেখে আমরা খুশি হয়েছি, জনসাধারণের প্রতিনিধি হিশেবে আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমরা। আরও যে কারণে আপনাকে শ্রদ্ধা করি তা হল এই যে আপনি যখন অফিসার

ছিলেন তখন কসাকদের হেয়ে করেন নি, ভাইয়ের মতো দেখেছেন আমাদের। আপনার কাছ থেকে কোন কটু কথা আমরা কখনও শুনি নি। আপনি কিন্তু একথা কখনও ভাববেন না যে আমরা অশিক্ষিত লোক বলে ভালো ব্যবহারের মর্যাদা দিতে জানি নে। মানুষ ত দূরের কথা, গোরুভেড়াও মিষ্টিকথা বুঝতে পারে। আপনার সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াই। আমাদের অনুরোধ, পেত্রোগ্রাদের মজুর আর সৈন্যদের জানাবেন যে আমরা তাদের গায়ে হাত তুলব না!'

রাজ্যের যত কাড়া-নাকাড়া যেন ফেটে পড়ল: সমর্থনসূচক ধ্বনির গর্জন প্রবল হয়ে উঠে সর্বোচ্চ গ্রামে পৌঁছুল, তারপর ধীরে ধীরে নামতে নামতে থিতিয়ে পড়ল।

আবার কাল্‌মিকোভ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল পিপের ওপর, তার সুঠাম দেহটা দুলে উঠল, যেন ভেঙে পড়তে চাইল। হাঁপাতে হাঁপাতে মড়ার মতো ফেকাসে মুখে সে বলে চলল প্রাচীন দনের গৌরব আর সম্মানের কথা, কসাকসম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা আর অফিসার ও কসাকসৈন্যরা মিলে যে রক্ত ঢেলেছে সে সব কথা।

কাল্‌মিকোভের পরে এলো মোটাসোটা গড়নের সাদা-চুল সাদা-ভুরু এক কসাক। বুনচুকের উদ্দেশ্যে বিষোদ্‌গার করে বক্তৃতা দিতে শুরু করল সে, কিন্তু জনতার চিৎকারে তার কথা ডুবে গেল, বক্তাকে হাত ধরে টেনে নামাল সকলে। পিপের ওপর লাফিয়ে উঠল চিকামাসভ। যেন কাঠের গুঁড়ি ফাড়ছে – এই ভাবে দু'হাত নাড়া দিয়ে গাঁক গাঁক করে সে বলে উঠল। 'আমরা যাব না! ট্রেন থেকে নামব না আমরা! টেলিগ্রামে বলা হয়েছে কসাকরা যেন কর্নিলভকে সাহায্য করার কথা দিয়েছে। কে আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল শুনি? কোন কথা আমরা তাকে দিই নি! কথা দিয়েছিল কসাক-ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরিষদের অফিসাররা! গ্রেকভ লেজ নেড়েছিল – সে-ই সাহায্য করুক গে! . . .'

একের পর এক বক্তৃতা দেওয়ার ধুম পড়ে গেল। টিবি-কপাল মাথাটা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল বুনচুক। একটা কালো মেটে-মেটে রঙের ছোপে ছেয়ে গেল তার মুখটা, গলার আর কপালের দু'পাশের শিরাগুলো ফুলে উঠল, ভীষণ ভাবে দপদপ করতে লাগল। চারপাশে পুঞ্জীভূত তড়িতের প্রবাহ। অবস্থাটা এমন যে আর একটু মাত্রা ছাড়ালেই, একটু অসতর্ক হয়ে কেউ কোন হঠকারিতা করে বসলেই রক্তপাতে পরিসমাপ্তি ঘটবে এই উত্তেজনার।

স্টেশন থেকে ভিড় করে এলো গ্যারিসনের সৈন্যরা, অফিসাররাও সভা ছেড়ে চলে গেল।

আধঘণ্টা পরে দুগিন ছুটতে ছুটতে এলো বুনচুকের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে

বলল। 'কী করা যায় বল ত মিত্রিচ? . . . কাল্‌মিকোভ কী যেন একটা ফন্দি এঁটেছে। এক্ষুনি দেখলাম গাড়ি থেকে মেশিনগানগুলো নামিয়ে নিচ্ছে, একজন ঘোড়সওয়ারকে কোথায় যেন পাঠাল খবর দিয়ে।'

'চল দেখি, ওখানে গিয়ে দেখা যাক। জনা বিশেক কসাক জুটিয়ে নাও! চটপট!'

সামরিক ট্রেনের কামরার কাছে কাল্‌মিকোভ আর তিনজন অফিসার মিলে ঘোড়ার পিঠে মেশিনগান বোঝাই করছিল। বুন্‌চুকই প্রথম এগিয়ে গেল। কসাকদের দিকে একবার ফিরে তাকাল, তারপর গ্রেটকোটের পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে অফিসার হিসাবে পাওয়া সযত্নে ঘসা-মাজা নতুন একটা নাগান রিভল্‌ভার বার করে নিল।

'কাল্‌মিকোভ, তোমাকে অ্যারেস্ট করা হল! হাত তোল! . . .'

ঘোড়ার কাছ থেকে লাফিয়ে সরে এলো কাল্‌মিকোভ। কাত হয়ে রিভল্‌ভারের খাপের ওপর হাত রাখল, কিন্তু রিভল্‌ভার বার করার আর অবকাশ পেল না: তার মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে ছুটে গেল একটা বুলেট। গুলির শব্দকে ছাড়িয়ে অশুভ ইঙ্গিতপূর্ণ চাপা গলায় বুন্‌চুক আবার হাঁক দিল।

'হাত তোল! . . .'

তার রিভল্‌ভারের ঘোড়াটা আস্তে আস্তে উঠে আধ-খাড়া হয়ে রইল। কাল্‌মিকোভ চোখ কুঁচকে সেই দিকে তাকাল, তারপর অনেক চেষ্টায় হাত তুলল, মটমট করে উঠল তার হাতের আঙুলগুলো।

অফিসাররা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের হাতিয়ার তুলে দিল।

'আমাদের তলোয়ারগুলোও কি খুলে দিতে বলেন?' মেশিনগান বাহিনীর অল্পবয়সী একজন কর্ণেট বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে মেশিনগানগুলো নামিয়ে কামরায় নিয়ে তুলল কসাকরা।

'এগুলোর ওপর পাহারা বসাতে হবে,' দুগিনের দিকে ফিরে বুন্‌চুক বলল। 'বাদবাকিদের চিকামাসভ এখানে নিয়ে আসবে অ্যারেস্ট করে। শুনছ চিকামাসভ? আর কাল্‌মিকোভকে তুমি আর আমি মিলে গ্যারিসনের বিপ্লবী কমিটিতে নিয়ে যাব। মেজর কাল্‌মিকোভ দয়া করে সামনে চল।'

'বাহবা! বাহবা!' বুন্‌চুক, দুগিন আর কাল্‌মিকোভকে দূরে চলে যেতে দেখে একজন অফিসার তারিফ করে কথাগুলো বলে লাফিয়ে কামরায় উঠে পড়ল।

'আমাদের সকলের লজ্জা করা উচিত, মশাই! লজ্জা করা উচিত! একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো করলাম আমরা! এই ইতরটাকে সময়মতো খতম করে দেবার কথা কারও মনে পড়ল না! ও যখন কাল্‌মিকোভের দিকে রিভল্‌ভার উঁচিয়েছিল

তখুনি ঝেড়ে দেওয়া উচিত ছিল – তাহলে আর দেখতে হত না!' লেফটেনান্ট-কর্ণেল সুখিন রেগে অফিসারদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে তার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল।

'কিন্তু এ যে গোটা একটা বাহিনী ... আমাদের গুলি করে খতম করে দিত,' মেশিনগান-চালক কর্ণেটটি কাচুমাচু হয়ে মন্তব্য করল।

অফিসাররা চুপচাপ সিগারেট টানতে টানতে মাঝে মাঝে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে থাকে। পুরো ব্যাপারটা যে রকম বিদ্যুৎগতিতে ঘটে গেল তাতে সকলে হতচকিত।

কাল্‌মিকোভ তার কালো গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে খানিকক্ষণ নীরবে হেঁটে চলে। তার হাড়-উঁচু বাঁ গালটা জ্বলতে থাকে, যেন চড় খেয়েছে। স্থানীয় লোকজন যেতে যেতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে থাকে, ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে। নার্ভার মাথার ওপর মেঘলা আকাশের রঙ গোধূলির স্পর্শে ধুয়ে ফিকে হয়ে আসছে। রাস্তায় রাস্তায় নিখাদ সোনার পিণ্ডের মতো পড়ে আছে বার্চগাছের ঝরাপাতা – আগস্ট মাস যাবার বেলায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। গির্জায় সবুজ গম্বুজের চারপাশে দাঁড়কাকগুলো পাক খাচ্ছে। স্টেশনের ওপারে, আবছা মাঠ ছাড়িয়ে কোথায় যেন হিমেল নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রাত নামছে; কিন্তু নার্ভা থেকে প্স্কোভ এবং লুগার দুর্গম নিঃসীম আকাশে তখনও সন্ধ্যার সাদা ঝকঝকে সীসেরঙের জমিনের ওপর লাগানো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের দল ভেসে যাচ্ছে, অদৃশ্য সীমান্ত পার হয়ে এসে গোধূলিকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে রাতের অন্ধকার।

স্টেশনের কাছাকাছি আসার পর কাল্‌মিকোভ ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বুনচুকের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল।

'বদমাশ!'

বুনচুক মাথা সরিয়ে থুতুর আক্রমণ বাঁচাল, তার ভুরুদুটো এক লাফে ওপরে উঠে গেল। ডান হাতটা পকেটের ভেতরে ঢোকার জন্য নিসপিস করতে থাকায় বাঁ হাতে অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখল ডান হাতের কব্‌জিটা।

'সামনে চল! ...' অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করল।

ফ্রন্টের জীবনের তীব্র যন্ত্রণা, আতঙ্ক আর বেপরোয়া মনোভাবের ফলে ভেতরে ভেতরে জমে থাকা যত নোংরা কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়ে, বীভৎস গালাগাল দিতে দিতে এগিয়ে চলল কাল্‌মিকোভ।

'তুই বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! এর মাশুল তোকে দিতে হবে!' মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে বুনচুকের দিকে ফিরে চিৎকার করে সে বলতে লাগল।

'চল! দয়া করে চল বলছি . . .' প্রত্যেক বারই উত্তরে বুন্‌চুকের অনুরোধ।

কাল্‌মিকোভ রাগে হাতদুটো মুঠো করে, আবার জায়গা ছেড়ে নড়ে, উত্তেজিত ঘোড়ার মতো ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলতে থাকে। তারা পাম্পঘরের কাছাকাছি এসে পড়ল। দাঁতে দাঁত ঘসে কাল্‌মিকোভ চিৎকার করে বলল, 'তোদের আবার পার্টি কিসের? তোরা হলি সমাজের যতসব তলানি, ওঁচা গুণ্ডা-বদমাসের দল! কে তোদের চালাচ্ছে? জার্মান ফৌজী নেতারা! বল-শেভিক! . . . আরে ছোঃ! দো আঁশলা বেজন্মার দল! তোদের পার্টি হল আঁস্তাকুড়ের এঁটো . . . যখন তখন কেনা যায় . . . এই যেমন . . . যেমন . . . পাজি ইতর কোথাকার! দেশকে বিকিয়ে দিয়েছিস তোরা! . . . আমি হলে তোদের সব কটাকে এক দড়িতে লটকাতাম। . . . দাঁড়া না, সময় আসবে! . . . তোদের ওই লেনিন তিরিশটা জার্মান মার্কের লোভে রাশিয়াকে বেচে দেয় নি? দাগী আসামী একটা! লাখ টাকা হাতিয়ে কেটে পড়েছে! . . .'

'দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়া!' আমতা-আমতা করে টেনে টেনে বুন্‌চুক চিৎকার করে বলল।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল দুগিন।

'ইলিয়া মিত্রিচ, দাঁড়াও! কী করতে যাচ্ছ? দাঁড়াও! . . .'

রাগে বুন্‌চুকের মুখটা কেমন যেন কালো আর বিকৃত হয়ে উঠেছে। এক লাফে তেড়ে এলো কাল্‌মিকোভের দিকে, তার রগ ঘেঁসে বসিয়ে দিল একটা ঘুষি! তাইতে কাল্‌মিকোভের মাথা থেকে টুপি উড়ে গেল। টুপিটা পায়ের তলায় থেঁতলাতে থেঁতলাতে কাল্‌মিকোভকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল পাম্প-ঘরের অন্ধকার দেয়ালের কাছে: 'দাঁড়া এখানে!'

'কী করছিস? কী করতে যাচ্ছিস তুই? তোর এতবড় আস্পর্ধা! . . . সাহস হবে তোর, আমার গায়ে হাত তুলতে? . . .' কাল্‌মিকোভ বাধা দিতে দিতে গর্জাতে থাকে।

পাম্প-ঘরের দেয়ালের গায়ে ধপ্ করে পিঠে ধাক্কা খেতে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাল্‌মিকোভ।

'আমাকে গুলি করে মারতে চাস?'

বুন্‌চুক ঝুঁকে পড়ল, তাড়াহুড়ো করে রিভল্‌ভার বার করতে গিয়ে পকেটের ভেতরের কাপড়ের সঙ্গে টেপার ঘোড়াটা আটকে গেল।

দ্রুত হাতে গ্রেটকোটের বুকের সবগুলো বোতাম আটকে এগিয়ে এলো কাল্‌মিকোভ।

'গুলি কর্, শুয়োরের বাচ্চা! তাই কর্! দ্যাখ, কী করে মরতে পারে রুশ

অফিসার।. . আমি মরার আগে. . .'

গুলি তার মুখের ভেতরে গিয়ে বিঁধল। একটা ভাঙা-ভাঙা প্রতিধ্বনি উঁচু পাম্প-ঘরের ওপর দিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে পেছনে মিলিয়ে গেল। দ্বিতীয়বার সামনে পা ফেলতে গিয়ে কাল্‌মিকোভ হোঁচট খেল, বাঁ হাতে মাথা চেপে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। শক্ত বাঁকা ধনুকের মতো বেঁকে গেল তার শরীরটা, থুতুর সঙ্গে কালো কালো রক্তমাখা ভাঙা দাঁতগুলো উপড়ে দিল বুকের ওপর, জিভ দিয়ে টাকরায় টুসকি মেরে মিষ্টি আওয়াজ বার করল। তার শরীরটা আবার সোজা হয়ে ভেজা মাটির সঙ্গে লাগতে না লাগতেই আরও একবার গুলি করল বুনচুক। কাল্‌মিকোভ কেঁপে উঠল, একপাশে কাত হয়ে গেল, নিদ্রাতুর পাখির মতো তার মাথাটা বুকের ওপর ঢলে পড়ল, একটু ফুঁপিয়েই থেমে গেল সে।

বুনচুক হাঁটা দিল। প্রথম যে মোড়টা পড়ল সেইখানে দুগিন তাকে ধরে ফেলল।

'মিত্রিচ. . . এ কী করলে তুমি? . . . কী দরকার ছিল?'

দুগিনের দু'কাঁধ চেপে ধরল বুনচুক। ইস্পাতের মতো কঠিন মর্মভেদী দৃষ্টি দুগিনের চোখের ওপর রেখে অদ্ভুতরকম শান্ত, মিয়ানো গলায় সে বলল, 'হয় আমরা ওদের মারব, নয়ত ওরা আমাদের মারবে! . . . এর মাঝামাঝি কিছু নেই। রক্তের বদলে রক্ত। কে কার নিতে পারে. . . খতম করার লড়াই। . . . বুঝলে? কাল্‌মিকোভের মতো লোকজনকে খতম করতে হবে, সাপের মতো থেঁতলে মেরে ফেলতে হবে। আর তাদের জন্যে যাদের মায়াকান্না ঝরে তাদেরও গুলি করে মারা উচিত. . . বুঝলে? অমন মায়াকান্নার কী আছে? শক্ত হতে হবে! শরীরে রাগ পুষতে জানতে হবে! কাল্‌মিকোভের হাতে ক্ষমতা থাকলে সে কী করত? – মুখ থেকে সিগারেটটা পর্যন্ত না সরিয়ে আমাদের গুলি করত. . . আর তুমি. . . তুমি কিনা . . . ইস, কী ছিঁচকাঁদুনে!'

দুগিনের মাথাটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকে। দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে থাকে সে, চলতে গিয়ে বাদামী ছোপ ধরা বুটজুতোর ভেতরে কেমন যেন আনাড়ির মতো জড়িয়ে যেতে থাকে তার বড় বড় পাগুলো।

কোন কথা না বলে নির্জন গলি ধরে তারা দু'জনে হাঁটতে লাগল। বার কয়েক পিছন ফিরে তাকাল বুনচুক। তাদের মাথার ওপর নীচু হয়ে পুবের দিকে ধেয়ে চলেছে ফেনায়িত কালো মেঘ। আগস্টের মেঘলা আকাশের একটুখানি ছেঁড়া ফাঁক থেকে মড়ার মতো সবুজ বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে গতকালের বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে যাওয়া ক্ষয়িত চাঁদ। রাস্তার সামনের মোড়ে এক সৈনিক আর কাঁধের ওপর সাদা শাল জড়ানো এক স্ত্রীলোক জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

সৈনিকটি স্ত্রীলোকটিকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে কী যেন বলছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি দু'হাতে সৈনিকের বুকে ধাক্কা মারল, মাথাটা ঝটকা মেরে পেছনে সরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বিড় করে বলল, 'বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না!' একটা চাপা খিলখিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

আঠারো

জেনারেল ক্রিমভকে কেরেন্স্কি পেত্রোগ্রাদে ডেকে পাঠিয়েছিল। ৩১ আগস্ট তারিখে সেখানেই গুলিতে আত্মহত্যা করল জেনারেল ক্রিমভ।

ক্রিমভের বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কম্যাণ্ডার আর প্রতিনিধিরা বশ্যতা স্বীকার করার জন্য হুড়হুড় করে শীত প্রাসাদে আসতে শুরু করল। যারা এই সেদিনও সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগুচ্ছিল, তারাই এখন বিনয়াবনত হয়ে কেরেন্স্কির সামনে সেলাম ঠুকতে লাগল, তার প্রতি নিজেদের চরম আনুগত্যের উপলব্ধি ব্যক্ত করে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মনোবল ভেঙে পড়লেও তখনও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে ক্রিমভের বাহিনী – নেহাৎ চলতে হয় বলে তার কোন কোন ইউনিট তখনও গড়িয়ে চলেছে পেত্রোগ্রাদের দিকে; কিন্তু সে চলার আর কোন অর্থই রইল না, কারণ কর্নিলভের অভ্যুত্থানের দিন শেষ হয়ে এসেছে, প্রতিক্রিয়ার যে-বিস্ফোরণ আতসবাজির মতো ঝলকে উঠেছিল তা নিভে এসেছে; এদিকে দেশের সাময়িক শাসনকর্তাও – ইতিমধ্যে তার ফোলা গাল অনেকটা চুপসে গেলেও – নেপোলিয়নের মতো বুটের ওপর থেকে গুল্‌ফ পর্যন্ত চামড়ার পটিতে জড়িয়ে মন্ত্রিসভার পরের বৈঠকেই 'রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার' কথা ঘোষণা করল।

ক্রিমভের আত্মহত্যার আগের দিন জেনারেল আলেক্সেয়েভকে সর্বাধিনায়ক করা হয়েছিল। নিজের অবস্থাটা যে কতটা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা বুঝতে পেরে খুঁতখুঁতে স্বভাবের কৌশলী আলেক্সেয়েভ প্রথমে সে পদ গ্রহণে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল; কিন্তু পরে কর্নিলভ এবং যারা যারা সরকার-বিরোধী বিদ্রোহের সংস্থার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিল একমাত্র তাদের শাস্তি লঘু করার উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত হয়ে তা গ্রহণ করতে রাজি হল।

পথে থাকতেই মগিলিওভে হেড কোয়ার্টারে সরাসরি টেলিফোন করে তার নিয়োগ আর আগমন সম্পর্কে কর্নিলভের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। গভীর রাত পর্যন্ত চলল এই ক্লান্তিকর আলোচনা, মাঝে মাঝে ছেদও পড়ছিল।

সেই দিনই আবার সদর দপ্তরের নেতৃমণ্ডলী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে কর্নিলভের বৈঠক চলছিল। সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে এর পরও প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত হবে, বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে কর্নিলভ সেই প্রশ্ন উত্থাপন করলে তাদের অধিকাংশই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পক্ষে মত প্রকাশ করল।

বৈঠক চলাকালে সমস্তক্ষণ ধরে লুকোম্‌স্কি নীরব ছিল। তার দিকে ফিরে কর্নিলভ বলল, 'এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে পারি কি আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ?'

অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ চালানোর বিরুদ্ধে সংযত অথচ দৃঢ় ভাষায় তার অভিমত প্রকাশ করল লুকোম্‌স্কি।

'তার মানে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছেন?' কর্কশস্বরে তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কর্নিলভ জিজ্ঞেস করল।

লুকোম্‌স্কি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এ থেকে স্বাভাবিক ভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।'

আরও আধঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা চলল। কর্নিলভ কোন কথা বলল না, দেখে মনে হচ্ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আত্মসংযম বজায় রাখছিল। এর কিছুক্ষণ পরে বৈঠক শেষ হয়ে গেল। তারও এক ঘণ্টা পরে লুকোম্‌স্কিকে ডেকে পাঠাল কর্নিলভ।

'আপনি ঠিকই বলেছেন আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ!' কর্নিলভ আঙুল মটকাল, নিভন্ত চোখের দৃষ্টিতে একপাশে কোথায় যেন এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যে দেখে মনে হল তার চোখের ওপর বুঝি কেউ সাদা ছাই ঢেলে দিয়েছে। ক্লান্তস্বরে সে বলল, 'এরপর প্রতিরোধ চালাতে গেলে সেটা হবে মূর্খামি, অপরাধজনকও বটে।'

অনেকক্ষণ ধরে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে তাল ঠুকল – মনে হল কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে – নিজের মধ্যে যে-সব চিন্তাভাবনা ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করছে হয়ত বা সেগুলোকেই ধরার চেষ্টা করছিল; শেষকালে নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করল, 'মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ কবে আসছেন?'

'আগামীকাল।'

পয়লা সেপ্টেম্বর আলেক্সেয়েভ এলো। সেই দিনই সন্ধ্যায় সাময়িক সরকারের নির্দেশে কর্নিলভ, লুকোম্‌স্কি ও রমানোভ্‌স্কিকে সে গ্রেপ্তার করল। 'মেত্রোপোল' হোটেলে প্রহরাধীনে বন্দীদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে তাদের পাঠানোর আগে কর্নিলভের সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে যেন বিশ মিনিট ধরে আলেক্সেয়েভের একান্তে কথাবার্তা হল। কথাবার্তার পর আলেক্সেয়েভ যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তখন সে গভীর ভাবে বিচলিত, নিজের ওপর সংযম প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।

রমানোভ্স্কি কর্নিলভের কাছে যেতে গেলে কর্নিলভের স্ত্রী তাকে বাধা দিল।

'মাফ করবেন, লাভ্র গেওর্গিয়েভিচ বলেছেন, কাউকে যেন তাঁর কাছে আসতে দেওয়া না হয়।'

রমানোভ্স্কি তার বিমূঢ় মুখের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সরে গেল, উত্তেজনায় তার চোখ পিটপিট করতে লাগল, দু'গালের উঁচু হাড়ের ওপর কালো রঙ ধরল।

পরদিনই বের্দিচেভে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সর্বাধিনায়ক জেনারেল দেনিকিন, আর তার সদর দপ্তরের নেতৃবৃন্দ – জেনারেল মার্কভ, জেনারেল ভান্নোভ্স্কি এবং স্পেশাল আর্মির কম্যাণ্ডার জেনারেল এর্দেলি গ্রেপ্তার হল।

বীখোভ শহরের মেয়েদের হাইস্কুলে তাদের বন্দী করে রাখা হল। এই ভাবেই ইতিহাসের চাকার তলে পিষ্ট হয়ে কর্নিলভ-আন্দোলনের গৌরবহীন পরিসমাপ্তি ঘটল। পরিসমাপ্তি ঘটল বটে, কিন্তু এখানেই জন্ম নিল আরেক নতুন জিনিস; কারণ এখানে না হলে ভাবী গৃহযুদ্ধ আর বিস্তৃত ফ্রন্ট জুড়ে বিপ্লবের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা আর কোথায়ই বা অঙ্কুরিত হতে পারে?

উনিশ

অক্টোবরের শেষ দিকে একদিন খুব ভোরে রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে মেজর লিস্তনিৎস্কি নির্দেশ পেল তার স্কোয়াড্রনকে পায়ে হেঁটে প্রাসাদ-চকে যেতে হবে।

সার্জেন্ট-মেজরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে লিস্তনিৎস্কি তড়িঘড়ি জামাকাপড় পরে নিল।

হাই তুলতে তুলতে, গালাগালি দিতে দিতে অফিসাররা সকলে ঘুম থেকে উঠল।

'এসব কী ব্যাপার?'

'বলশেভিকদের কাণ্ডকারখানা!'

'আমার টোটাগুলো গেল কোথায় আবার? কেউ দেখেছেন মশায়?'

'কোথায় যেতে হবে আমাদের?'

'গুলিগোলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না?'

'কিসের ছাই গুলিগোলার আওয়াজ! আপনার শোনার ভুল!'

অফিসাররা আঙিনায় বেরিয়ে এলো। স্কোয়াড্রনটা ট্রুপে ভাগ ভাগ হয়ে সার বেঁধে দাঁড়াতে লাগল। লিস্তনিৎস্কি দ্রুত মার্চ করিয়ে আঙিনা থেকে বার করে আনল কসাকদের। নেভ্স্কি এভিনিউ জনমানবহীন। কোথা থেকে যেন বাস্তবিকই

মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। শীত প্রাসাদের চত্বরের ওপর একটা সাঁজোয়া গাড়ি ঘোরাঘুরি করছে, শিক্ষানবিশ অফিসাররা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় মরুভূমির নিস্তব্ধতা। শীত প্রাসাদের ফটকের কাছে শিক্ষানবিশ অফিসার আর চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাক অফিসারদের একটা দলের সঙ্গে কসাকদের দেখা হয়ে গেল। তাদের একজন – স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার – লিস্তনিৎস্কিকে একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পুরো স্কোয়াড্রন আপনার সঙ্গে আছে ত?'

'তা আছে। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'দু'নম্বর, পাঁচ নম্বর আর ছয় নম্বর আসে নি – আসতে রাজি হয় নি; কিন্তু মেশিনগান-প্লেটুন আমাদের সঙ্গে আছে। কসাকদের মতিগতি কেমন?'

লিস্তনিৎস্কি হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে সংক্ষেপে হাত নাড়ল।

'গতিক খারাপ। কিন্তু এক আর চার নম্বর রেজিমেন্টের অবস্থা কী রকম?'

'ওরা এখানে নেই। ওরা আসবে না। আপনি কি জানেন যে বলশেভিকদের কাছ থেকে আজ একটা আক্রমণের আশঙ্কা আছে? কে জানে ছাই কী হচ্ছে!' বিষণ্ণ ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই জগাখিচুড়ি অবস্থা থেকে বেরিয়ে দনে চলে যেতে পারলে কী খুশিই না হতাম! . . .'

লিস্তনিৎস্কি তার স্কোয়াড্রনকে আঙিনায় নিয়ে এলো। কসাকরা তাদের রাইফেলগুলোকে এক জায়গায় জড় করে রেখে কুচকাওয়াজের মাঠের মতো প্রশস্ত আঙিনা জুড়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। অফিসাররা দূরের এক কোনায় বার-বাড়িতে জমায়েত হয়ে সিগারেট টানতে টানতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এক ঘণ্টা পরে শিক্ষানবিশ অফিসারদের একটি রেজিমেণ্ট ও একটি নারী ব্যাটেলিয়ন এসে হাজির হল। শিক্ষানবিশ অফিসাররা প্রাসাদে ঢোকার মুখের হল্-ঘরে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, মেশিনগানগুলো টেনে এনে সেখানে বসাল। মেয়েদের হানাদার ব্যাটেলিয়নটি* আঙিনায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। কসাকরা ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে তাদের সামনে এসে অশ্লীল ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দিল। আঁটসাট গ্রেটকোট গায়ে আঁটসাট গড়নের একটা মেয়ের পিঠে চাপড় মেরে সার্জেণ্ট আর্জানভ বলল, 'বাচ্চা বিয়োনোই তোমার ভালো ছিল মাসি, ব্যাটাছেলেদের কাজে তুমি এলে কী করতে?'

'তুমি নিজে বিয়ো গে!' এতটুকু অমায়িক ভাব না দেখিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে মোটা গলায় মাসিটি বলল।

---

* 'মৃত্যু ব্যাটেলিয়ন' নামেও পরিচিত। – অনুঃ

'আহা আমার নাগরীরা, তোমরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছ?' তিউকোভ্নভ নামে রক্ষণশীল ধর্মমতাবলম্বী এক মেয়েবাজ তাদের পেছনে লেগে রইল।

'দাও ওগুলোকে ধরে এক চোট!'

'আহা, দুটো পা ওই ত দু'দিকে বেঁকে আছে! কী আমার লড়ুয়ে!'

'ঘরে বসে থাকলেই ত হত! ইস্, কী ঠেকাই না পড়েছে!'

'মরি, মরি, যেন দু'খণ্ড গুঁড়ি দিয়ে তৈরি! দুনিয়ার কী ছিষ্টি!'

'সামনের দিক থেকে দেখলে সেপাই, পেছন দিক থেকে – না পুরুতঠাকুর, না . . . কে জানে ছাই কী। . . . এমনকি থুতু ফেলতে ইচ্ছে হয়!'

'এই যে হানাদার-মেয়ে, পাছা সামলে, নইলে কিন্তু দেবো এক কুঁদোর গুঁতো!'

কসাকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। মেয়েদের দেখে তাদের ফুর্তি আর ধরে না। কিন্তু দুপুর গড়াতে না গড়াতে তাদের ফুর্তির ভাব মিলিয়ে গেল। নারী-সৈন্যরা প্লেটুনে ভাগ ভাগ হয়ে চত্বরের ওপর দিয়ে বিশাল বিশাল পাইন-কাঠ বয়ে এনে ফটকের সামনে ব্যারিকেড গড়ে তুলতে লাগল। তাদের কাজের তদারকি করছিল পুরুষালি ধাঁচের এক বিশালবপু স্ত্রীলোক। গায়ে তার মানানসই সুন্দর একটা গ্রেটকোট, বুকে ঝুলছে সেণ্ট জর্জ ক্রস। চত্বরের ওপর সাঁজোয়া গাড়িটা আরও ঘন ঘন চক্কর দিতে লাগল। কিছু শিক্ষানবিশ অফিসার কোথা থেকে যেন কার্তুজ আর মেশিনগানের গুলির ফিতে ভরতি বাক্স প্রাসাদের ভেতরে টেনে নিয়ে চলল।

'এইবার ভাই, সামলাও ঠেলা!'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, লড়াই করতে হবে?'

'তাছাড়া কী? তুমি কি ভেবেছ মেয়ে-সৈন্যগুলোর গায়ে হাত বুলানোর জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?'

লাগুতিনের দেশের কিছু লোক – বুকানোভ্স্কায়া আর স্লাশ্চেভ্স্কায়ার কসাকরা তাকে ঘিরে আছে, কী নিয়ে যেন তারা আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অফিসাররা সব কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কসাকরা আর নারী-সৈন্যরা ছাড়া কেউ রইল না আঙিনায়। বলতে গেলে ফটকের ঠিক কাছটাতে মেশিনগান-চালকদের পরিত্যক্ত কিছু মেশিনগান পড়ে আছে, মেশিনগানের ঢালগুলো ভিজে সামান্য চকচক করছে।

সন্ধ্যার দিকে হিম পড়তে শুরু করল। কসাকরা অস্থির হয়ে পড়ল।

'এ কী ব্যবস্থা? – টেনে নিয়ে এসে কোনরকম খাবারদাবার না দিয়ে উঠোনে ধরে রাখা হয়েছে?'

'লিস্ত্‌নিৎস্কিকে খুঁজে বার করতে হয়।'

'হুঃ, তা হলেই হয়েছে! সে আছে রাজবাড়ির ভেতরে, আমাদের মতো লোকদের সেখানে ঢুকতেই দেবে না ক্যাডেটরা।'

'খাবারের গাড়ির জন্যে কাউকে পাঠানো দরকার তাহলে – খাবার নিয়ে আসুক।'

খাবার আনতে পাঠিয়ে দেওয়া হল দু'জন কসাককে।

'রাইফেল ছাড়াই যাও। বলা যায় না, ছিনিয়ে নিতে পারে,' লাগুতিন পরামর্শ দিল।

আরও দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করল কসাকরা। না খাবারের গাড়ি, না খবর দেবার লোক – কেউ এলো না। পরে জানা গেল ব্যারাক থেকে খাবারের গাড়ি বের হলে সেমিওনভ রেজিমেন্টের লোকেরা সেটাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। নারী-সৈন্যদের যে দলটা ফটকের কাছে ভিড় করে ছিল, সন্ধ্যার অন্ধকার নামার মুখে তারা ঘন সার বেঁধে ছড়িয়ে পড়ল, কাঠগুলোর আড়ালে পজিশন নিয়ে শুয়ে পড়ে চত্বরের ওপর দিয়ে কোথায় যেন গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল। কসাকরা গুলি ছোঁড়ায় কোন অংশ নিল না, তামাক টানতে টানতে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। লাগুতিন প্রাসাদের দেয়ালের কাছে স্কোয়াড্রন জড় করল, ভয়ে ভয়ে প্রাসাদের জানলাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে বলতে শুরু করল, 'এখন যা বলি শোনো, কসাকরা! এখানে আমাদের করার কিছু নেই। কেটে পড়া দরকার, নইলে বিনা দোষে আমাদের ভুগতে হবে। রাজবাড়ির ওপর গুলিগোলা পড়তে শুরু হবে, সেক্ষেত্রে আমাদের কী করার আছে? অফিসারদের টিকির দেখা নেই। . . . আমরা কী অপরাধ করেছি যে এখানে থেকে আমাদের মরতে হবে? চল, সবাই বাড়ি ফিরে যাই। কাজ কী এখানে দেয়ালে গা ঘষে? আর সাময়িক সরকারের কথা যদি বল . . . তাকে দিয়ে আমাদের কী ছাইটা হবে বল ত? কী বল সব কসাকরা?'

'উঠোন থেকে বেরোলেই লাল ফৌজীরা মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে আমাদের কচুকাটা করে দেবে।'

'আমাদের মাথা কাটা যাবে! . . .'

'তা কেন হবে . . .'

'তাহলে যা ভালো বোঝো, কর!'

'না না শেষ পর্যন্ত এখানেই বসে থাকব।'

'আমরা হলাম গোরু বাছুরের মতো – খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল, তারপর খোঁয়াড়ে।'

'যার যেমন খুশি, আমাদের ট্রুপ কিন্তু চলে যাচ্ছে!'

'আমরাও যাব!'

'বাইরে বলশেভিকদের কাছে লোক পাঠানো হোক – তারা আমাদের যেন না ছোঁয়, আমরাও তাদের ছোঁব না।'

এক নম্বর ও চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাকরাও এসে জুটল। অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রত্যেক স্কোয়াড্রন থেকে একেকজন করে, মোট তিন জন কসাক ফটকের বাইরে চলে গেল, এক ঘণ্টা পরে তারা ফিরে এলো – সঙ্গে তিনজন জাহাজী। ফটকের কাছে যে কাঠের গুঁড়ি স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছিল লাফিয়ে লাফিয়ে সেগুলো ডিঙোতে ডিঙোতে ইচ্ছে করে বেপরোয়া ভঙ্গিতে পা ফেলে তারা চলল উঠোনের ওপর দিয়ে। কসাকদের কাছে এসে তারা কুশল বিনিময় করল। তাদের মধ্যে একজন, অল্পবয়সী, কালো গোঁফ, গায়ের জাহাজী কোর্তার বুকের সামনের বোতামগুলো খোলা, টুপিটা মাথার পেছন দিকে সরানো। সে এসে ঠেলেঠুলে কসাকদের ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে গেল। তারপর বলতে শুরু করল, 'কসাক কমরেডরা! আমরা বিপ্লবী বাল্‌তিক নৌবাহিনীর প্রতিনিধি; আপনারা শীত প্রাসাদ ছেড়ে চলে যান, এই প্রস্তাব জানাতে আমরা এসেছি। যে সরকার আপনাদের নয়, সেই বুর্জোয়া সরকারকে বাঁচানোর জন্যে আপনারা দাঁড়াবেন কেন? বুর্জোয়াদের যারা আদরের দুলাল সেই শিক্ষানবিশ অফিসাররা বাঁচাক তাকে। সাময়িক সরকারকে বাঁচানোর জন্যে একটি সৈন্যও এগিয়ে আসে নি, আপনাদের ভাইবন্ধুরা – এক নম্বর আর চার নম্বর রেজিমেণ্টের কসাকরা আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে। যারা যারা আমাদের সঙ্গে সামিল হতে চাও – বাঁ দিকে সরে দাঁড়াও!'

'একটু দাঁড়াও ভাই!' এই বলে সামনে এগিয়ে এলো এক নম্বর স্কোয়াড্রনের ডাকাবুকো চেহারার এক সার্জেণ্ট। 'যাব আমরা তোমাদের সঙ্গে খুশি মনেই... কিন্তু ধর লাল ফৌজীরা যদি আমাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে?'

'কমরেডরা! পেত্রোগ্রাদ সামরিক বিপ্লবী কমিটির তরফ থেকে আমরা তোমাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

কালো গোঁফওয়ালা জাহাজীর পাশে এসে দাঁড়াল গাঁট্টাগোট্টা চেহারার আরেকজন জাহাজী। মুখে বসন্তের দাগ, বৃষস্কন্ধ। মাংসল ঘাড়টা ঘুরিয়ে কসাকদের নিরীক্ষণ করে দেখল, আঁটসাঁট জাহাজী জামায় ঢাকা বিশাল স্ফীত বক্ষদেশে ঘুসি মেরে বলল, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কারণ নেই, ভাই। আমরা তোমাদের শত্রু নই, পেত্রোগ্রাদের প্রলেতারীয়রাও তোমাদের শত্রু নয়; শত্রু যদি কেউ হয় তা হল এই এরা...' বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে তাই দিয়ে প্রাসাদের দিকে ইঙ্গিত করে ঘন দাঁতের সারি বার করে সে হাসল।

কসাকরা কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে ইতস্তত করতে লাগল।

নারী-ব্যাটেলিয়নের সৈন্যরা এগিয়ে এসে শুনল, কসাকদের দিকে তাকাল, তারপর আবার চলে গেল ফটকের কাছে।

'এই মেয়েরা, আমাদের সঙ্গে আসবে?' একজন দাড়িওয়ালা কসাক চেঁচিয়ে বলল।

কোন উত্তর এলো না।

'রাইফেল তুলে নিয়ে চলতে শুরু কর!' দৃঢ়স্বরে বলল লাগুতিন।

কসাকরা চটপট একসঙ্গে তাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে সার বাঁধল।

'মেশিনগানগুলো নিতে হবে না?' কালো গোঁফওয়ালা জাহাজীকে জিজ্ঞেস করল একজন কসাক মেশিনগান-সৈনিক।

'নিয়ে নাও। ক্যাডেটদের জন্যে রেখে কাজ নেই।'

কসাকরা আঙিনা ছেড়ে যাবে, এমন সময় স্কোয়াড্রনগুলোর অফিসারদের পুরো দলটা এসে হাজির হল। গাদাগাদি হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল তারা, জাহাজীদের ওপর থেকে দৃষ্টি আর সরে না তাদের। স্কোয়াড্রনগুলো সার বেঁধে দাঁড়ানোর পর চলতে শুরু করে দিল। সামনে মেশিনগান প্লেটুন নিয়ে চলেছে মেশিনগান। ভিজে পাথরে ঘসা লেগে চাকার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ ঘর্ঘর আওয়াজ উঠছে। জাহাজী কোর্তা গায়ে নাবিকটি এক নম্বর স্কোয়াড্রনের সামনের ট্রুপের পাশে পাশে মার্চ করে চলেছে। ফেদসেয়েভ্স্কায়া জেলা সদরের সাদা-চুল সাদা-ভুরু এক লম্বা মতন কসাক জাহাজীটির জামার হাতা ধরে মুখ কাচুমাচু ক'রে আবেগের সুরে বলল, 'ওরে ভাই, তুমি কি ভাবছ সাধারণ লোকের বিপক্ষে যেতে চেয়েছিলাম আমরা? নিজেদের বোকামির জন্য আমরা এই গাড্ডায় পড়ে গিয়েছিলাম। আগে জানলে কি আর আমরা আসতাম?' ঝুঁটিওয়ালা মাথাটা ভীষণ ভাবে ঝাঁকাল সে। 'বিশ্বাস কর, আসতাম না, কিছুতেই আসতাম না! মাইরি বলছি!'

চার নম্বর স্কোয়াড্রন সকলের শেষে চলছিল। ফটকের কাছে আসার পর বাধা পড়ল - পুরো নারী-ব্যাটেলিয়ন সেখানে জমাট ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এক জোয়ান গোছের কসাক কাঠের গুঁড়ির ব্যারিকেডের ওপর লাফিয়ে উঠল, নখসুদ্ধ কালো তর্জনীটা অর্থপূর্ণ ভাবে, বোঝানোর ভঙ্গিতে নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'রাইফেল-হাতে মেয়েরা, তোমরা শোন! আমরা এখন চলে যাচ্ছি, তোমরা তোমাদের মেয়েলি বুদ্ধির দোষে এখানে থেকে যাচ্ছ। তা থাক, কিন্তু কোন নষ্টামি চলবে না বলে দিচ্ছি! পেছন থেকে যদি আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে শুরু কর তাহলে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কটাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলব। বুঝেছ ত কী বললাম? মনে থাকে যেন। আচ্ছা এখনকার মতো চললাম তাহলে আমরা।'

কাঠের স্তূপ থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল সে, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে ছুটল তার সঙ্গীদের নাগাল ধরতে।

কসাকরা প্রায় চত্বরের মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে, এমন সময় তাদের একজন পেছন ফিরে তাকাল, তারপর উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আরে দেখ, দেখ! একজন অফিসার ছুটে আসছে আমাদের পেছন পেছন!'

অনেকেই চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল। একজন লম্বামতো অফিসার কোমরে বাঁধা তলোয়ারের হাতলটা হাতে চেপে ধরে চত্বরের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাত নাড়াচ্ছে।

'এ হল তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের আতারশ্চিকভ।'

'কোন্ আতারশ্চিকভ?'

'আরে সেই যে লম্বামতন, যার চোখের পাতার ওপর একটা আঁচিল আছে।'

'আমাদের সঙ্গে আসতে চায়।'

'বেড়ে ছোকরা!'

আতারশ্চিকভ জোরে স্কোয়াড্রনের দিকে ছুটে আসতে লাগল। দূর থেকে চোখে পড়ে তার মুখে হাসির ঝলক। কসাকরা হাত নাড়তে লাগল, হাসতে হাসতে বলল, 'জোরে লেফ্‌টেনান্ট, জোরে!'

'চট্‌পট্!'

প্রাসাদের ফটকের কাছ থেকে খুট্ করে একটি মাত্র নীরস শব্দ তুলে ছিটকে এলো একটা গুলি। দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে মাথা পেছনে হেলিয়ে চিতপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আতারশ্চিকভ। দুটো পা অল্প অল্প ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছটফট করতে লাগল সদর রাস্তার ওপর, ওঠার চেষ্টা করল। যেন কারও নির্দেশ পেয়ে গোটা স্কোয়াড্রনটা ঘুরে দাঁড়াল প্রাসাদের দিকে মুখ করে। মেশিনগানাররা ফটকের দিকে মেশিনগান ঘুরিয়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে পাশে বসল। মেশিনগানের গুলির ফিতে ঘোরার ঘর্ঘর আওয়াজ উঠল। কিন্তু প্রাসাদের ফটকের কাছে, কাটা পাইন গাছের ব্যারিকেডের ওপরে – কোথাও কোন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এই এক মুহূর্ত আগেও নারী-ব্যাটেলিয়নের সৈন্যরা আর যে সব অফিসার ফটকের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, গুলিটা যেন তাদের চেটেপুটে সাফ করে দিয়ে গেছে। স্কোয়াড্রনগুলো আবার দ্রুত সার বেঁধে দাঁড়াল, এবারে তারা চলতে লাগল আরও জোর কদমে। আতারশ্চিকভ যেখানে পড়ে গিয়েছিল শেষের ট্রুপের দু'জন কসাক সেখান থেকে ফিরে এলো। স্কোয়াড্রনের সকলে যাতে শুনতে পায় তেমনি জোরে তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'বাঁ কাঁধের ঠিক নীচে এসে বিঁধেছে। খতম হয়ে গেছে!'

জোরে জোরে পা ফেলার স্পষ্ট ও খটখট আওয়াজ উঠল। কোর্তা-গায়ে

জাহাজী হাঁক দিল, 'বাঁ দিকে ঘোর . . . এগিয়ে চল!'

স্কোয়াড্রনগুলো সাপের মতো বেঁকে মোড় নিল। জবুথবু স্তব্ধ প্রাসাদটা নীরবে তাদের বিদায় দিল।

বিশ

শরৎকাল। কিন্তু তখনও গরমের রেশ আছে। যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে। ছোট্ট শহর বীখোভ। তার মাথার ওপর কদাচিৎ প্রকাশ পাচ্ছে রক্তলেশহীন পাণ্ডুর সূর্য। অক্টোবরে বাসাবদলের জন্য বুনোপাখিদের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। এমনকি রাতের বেলায়ও ঠাণ্ডা, কালো মাটির বুকের ওপর সারসের অস্বস্তিকর করুণ বিলাপ বেজে ওঠে। আসন্ন হিম আর আকাশের অনেক ওপরে হাড় কাঁপানো উত্তুরে বাতাসের কথা ভেবে বাসাবদলকারী পাখিরা শঙ্কিত হয়ে দলে দলে পালাচ্ছে।

কর্নিলভ-মামলায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল, এই বীখোভেই দেড় মাস হল বন্দী হয়ে আদালতের বিচারের প্রতীক্ষায় আছে তারা। এই সময়ের মধ্যে তাদের কারাজীবনে যেন একটা স্থিতির ভাব এসে গেছে, সে জীবন একেবারে সাধারণ না হলেও তার নিজস্ব ধরনের কঠিন ধরাবাঁধা রূপ পরিগ্রহ করেছে। সকালে জলখাবারের পর জেনারেলরা বেড়াতে বের হয়; ফিরে এসে ডাকের চিঠিপত্র পড়ে, যে-সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দেখা করতে আসে তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সামান্য দিবানিদ্রা, তারপর আলাদা আলাদা ভাবে যার যার ঘরে খুশিমতো কাজকর্ম; সন্ধ্যায় সকলে সচরাচর কর্নিলভের ঘরে জড় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা সলা-পরামর্শ করে।

এক কালে মেয়েদের হাইস্কুল ছিল এটা, এখন জেলখানা হয়েছে। তাহলেও মোটামুটি আরামেই জীবন কাটছিল এখানে।

দালানের বাইরে পাহারায় ছিল সেন্ট জর্জ ব্যাটেলিয়নের সৈন্যরা, ভেতরের পাহারায় – তেকিনরা। এই প্রহরা বন্দীদের স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করত বটে, কিন্তু তার বদলে একটা রীতিমতো ভালো সুযোগও দিয়েছিল – ব্যবস্থাটা এমন ভাবে সাজানো যে ইচ্ছে করলে বন্দীরা যে-কোন মুহূর্তে সহজে ও নিরাপদে পালাতে পারত। বীখোভের কারাগারে থাকাকালে তারা সারা সময় বাইরের জগতের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ সুযোগ পেয়েছে, অবিলম্বে যাতে তদন্ত ও বিচার হয় এই দাবি তুলে বুর্জোয়ামহলের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে তারা বিদ্রোহের সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে, তারা অফিসারমহলের মেজাজ বোঝার

চেষ্টা করেছে, আর বেগতিক দেখলে যাতে পালানো যায় তার জন্যও প্রস্তুতিও নিচ্ছে।

বিশ্বস্ত তেকিনদের নিজের পাশে পাশে রাখার জন্য কর্নিলভের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই; তাই কালেদিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তুর্কীস্তানে দুর্ভিক্ষপীড়িত তেকিন পরিবারগুলোকে খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। কালেদিন সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে কয়েক ওয়াগন খাদ্যশস্য সেখানে পাঠিয়ে দেয়। যে-সমস্ত অফিসার কর্নিলভ-বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের পরিবারবর্গের জন্য সাহায্য চেয়ে মস্কো ও পেত্রোগ্রাদের বড় বড় কয়েকজন ব্যাঙ্কারের কাছে বেশ সারগর্ভ ও জোরাল ভাষায় চিঠি লিখেছিল কর্নিলভ; নিজেদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়লে ফেসাদে পড়তে হয় এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে তারাও এতটুকু বিলম্ব না করে বেশ কয়েক হাজার রুব্‌ল পাঠিয়ে দেয়। নভেম্বর পর্যন্ত কালেদিনের সঙ্গে কর্নিলভের কার্যসম্পর্কিত পত্রবিনিময় অব্যাহত ছিল। পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং সেখানে তার আগমন ঘটলে কসাকরা সেটাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে সেই সম্পর্কে জানতে চেয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি কালেদিনকে সে এক বিশদ চিঠি লেখে। উত্তরে কালেদিন আশাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করে।

অক্টোবরের বৈপ্লবিক পটপরিবর্তনের ফলে বীখোভের বন্দীদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। ঘটনার পরদিন চতুর্দিকে বার্তাবহরা ছুটল। ইতিমধ্যে জেনারেল দুখোনিন নিজেই নিজেকে সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করেছে। আরও এক সপ্তাহ পরে তার কাছে কালেদিনের লেখা একটা চিঠি গেল, যাতে বন্দীদের অদৃষ্ট সম্পর্কে কোন এক মহলের উদ্বেগের প্রতিধ্বনি ছিল। চিঠিতে কর্নিলভ এবং অন্যান্য বন্দীদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হয়েছিল। কসাক সৈন্যসংঘের পরিষদ এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসার-সংঘের মুখ্য সমিতিও ওই একই মর্মে প্রধান সামরিক দপ্তরে অনুরোধ জানিয়েছিল। দুখোনিন ইতস্তত করতে লাগল।

পয়লা নভেম্বর কর্নিলভ তাকে একটা চিঠি পাঠাল। সামরিক প্রধান দপ্তর যে কতদূর অসহায় কর্নিলভের সেই চিঠির মার্জিনে দুখোনিনের লেখা নোট তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। বস্তুতপক্ষে সামরিক প্রধান দপ্তর ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে চরম দুর্দশার মধ্যে শেষ দিন গুনছিল।

নিকলাই নিকলায়েভিচ, মহামান্যবরেষু,

মুখ্যত ঊর্ধ্বতন সেনাপতিমণ্ডলীর দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও নীরব সমর্থনের ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলী দেশকে যে রকম সর্বনাশের মুখে উপনীত করিয়াছে, সৌভাগ্যবশত আপনি যে আসনে অধিষ্ঠিত আছেন তাহার বলে উক্ত ঘটনার গতিপরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন।

আপনার সম্মুখে এমন এক মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে যখন মানুষের কর্তব্য হয় দুঃসাহস প্রদর্শন করা, নতুবা পদত্যাগ করা, অন্যথায় দেশের সর্বনাশের জন্য দায়িত্ব এবং সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত ভাঙনের কলঙ্ক তাহার উপর বর্তায়।

যে সকল অসম্পূর্ণ, আংশিক সংবাদ আমার গোচরীভূত হইয়াছে, তদনুযায়ী পরিস্থিতি গুরুতর, কিন্তু হতাশাজনক নহে। তবে হতাশাজনক হইবে তখনই যদি আপনি সামরিক প্রধান দপ্তরকে বলশেভিকদের অধিকারে ছাড়িয়া দেন অথবা স্বেচ্ছায় তাহাদের কর্তৃত্ব মানিয়া লন।

আপনার অধীনে যে সেণ্ট জর্জ ব্যাটেলিয়ন আছে, যাহার অর্ধাংশ ইতিমধ্যে প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত, তাহারা এবং আপনার দুর্বল তেকিন রেজিমেণ্ট কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে।

ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি অনুমানপূর্বক আমার অভিমত এই যে আপনার উচিত অবিলম্বে এমন সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাহাতে সামরিক প্রধান দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হইতে পারে এবং পরিণামে আসন্ন নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সংগঠনের অনুকূল পরিস্থিতি গড়িয়া উঠে।

আমার বিবেচনায় ব্যবস্থাগুলি হওয়া উচিত নিম্নরূপ:

১। চেক রেজিমেণ্টগুলির একটির এবং পোল উলান রেজিমেণ্টের অবিলম্বে মগিলিওভে স্থানান্তরণ।

মার্জিনে দুখোনিনের নোট: প্রধান সামরিক দপ্তর ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করে না। বলশেভিকদের সহিত যাহারা প্রথম সন্ধিস্থাপন করে উক্ত ইউনিটগুলি তাহাদিগের অন্যতম।

২। কসাক ফ্রন্ট-লাইনের ব্যাটারীর সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধিপূর্বক পোল্-কোর্-এর ইউনিটগুলির দ্বারা ওর্শা, স্মলেন্স্ক, জ্লোবিন ও গোমেল অধিকার।

মার্জিনের নোট: ওর্শা ও স্মলেন্স্ক অধিকারের নিমিত্ত ২ নম্বর কুবান-ডিভিশন এবং আস্ট্রাখান-কসাকদিগের একটি ব্রিগেডের সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে। বন্দীদিগের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনাপূর্বক বীখোভ হইতে ১ নম্বর পোল্-ডিভিশনের রেজিমেণ্ট আনয়ন অবাঞ্ছনীয়। ১ নম্বর ডিভিশনের ইউনিটগুলির সামরিক কর্মিবৃন্দ নিতান্তই দুর্বল, সুতরাং প্রকৃত শক্তি রূপে তাহারা গ্রাহ্য নহে। কোর্ সুনির্দিষ্ট ভাবে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার পক্ষপাতী।

৩। পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোয় স্থানান্তরণের অছিলায় ওর্শা-মগিলি-ওভ-জ্লোবিন লাইনে চেকোস্লোভাক কোর্ ও কর্নিলভ-রেজিমেণ্টের সকল ইউনিট এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত ধরনের একটি কিংবা দুইটি কসাক-ডিভিশনের সমাবেশ ঘটানো।

মার্জিনের নোট: কসাকরা বলশেভিকদিগের সহিত যুদ্ধের বিরোধী – এই ক্ষেত্রে তাহাদিগের মনোভাব আপসহীন।

৪। ঐ একই এলাকায় সমস্ত ব্রিটিশ ও বেলজিয়ম সাঁজোয়াগাড়ির সমাবেশ ঘটানো এবং একান্ত ভাবে অফিসারবৃন্দকে তাহাদিগের পরিচারকবর্গের স্থলাভিষিক্ত করা।

৫। মগিলিওভ এবং তৎসন্নিহিত কোন এক স্থানে অবশ্যই সমবেত হইবে এমন সকল ভলাণ্টিয়ার ও অফিসারদিগের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত নির্ভরযোগ্য প্রহরাধীনে উক্ত এলাকায় রাইফেল, গুলিগোলা, মেশিনগান, অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র ও হাতবোমা সরবরাহ-ব্যবস্থার সমাবেশ ঘটানো।

মার্জিনের নোট: ইহার ফলে মাত্রাধিক্য ঘটিতে পারে।

৬। দন, তেরেক ও কুবান সেনাবাহিনীর আতামান সকল এবং পোল্ ও চেকোস্লোভাক কমিটিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ও সঠিক বুঝাপড়া। কসাকগণ দেশে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছে; পোল্ ও চেকদিগের পক্ষে রাশিয়ার আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন তাহাদিগের স্বীয় অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্ন।

* * *

নিত্যই বেশি বেশি করে আশঙ্কাজনক খবর আসছে। বীখোভে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। মগিলিওভ ও বীখোভের মধ্যে কর্নিলভের শুভার্থীদের নিয়ে ঘন ঘন মোটরগাড়ি যাতায়াত করছে, বন্দীদের ছেড়ে দেবার দাবি তুলছে তারা দুখোনিনের কাছে। কসাক পরিষদ প্রচ্ছন্ন হুমকির পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে।

যে-সমস্ত ঘটনা আসন্ন হয়ে উঠছে তার ভারে দুখোনিন অবদমিত। একমাত্র এখনই সে বুঝতে পারল সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে কী বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে। কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে সে ইতস্তত করতে লাগল। ১৮ নভেম্বর বন্দীদের দন অঞ্চলে সরানোর নির্দেশ পাঠাল সে,

কিন্তু পরক্ষণেই বাতিল করে দিল সেই নির্দেশ।

পর দিন সকালে বীখোভ হাইস্কুল-কারাগারের প্রধান প্রবেশপথের সামনে ঘন জল-কাদা ছিটানো একটা মোটরগাড়ি এসে থামল। ড্রাইভার সৌজন্যসহকারে গাড়ির দরজা খুলে দিল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছিমছাম চেহারার এক মাঝবয়সী অফিসার। প্রহরীদের অফিসারের কাছে জেনারেল স্টাফের কর্ণেল কুসোন্স্কির নামে কাগজপত্র দেখাল সে।

'আমি আর্মির হেডকোয়ার্টার থেকে আসছি। বন্দী জেনারেল কর্নিলভের কাছে একটা ব্যক্তিগত বার্তা নিয়ে এসেছি আমি। কম্যাণ্ডাণ্টকে আমি কোথায় পেতে পারি?'

কম্যাণ্ডাণ্ট, তেকিন রেজিমেন্টের লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল এর্গার্দ্‌ত সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুককে কর্নিলভের কাছে নিয়ে গেল। কুসোন্স্কি নিজের পরিচয় দিল, তারপর বেশ জোর দিয়ে, লক্ষ করার মতো খানিকটা ভাবাবেগের সঙ্গে জানাল, 'চার ঘণ্টার মধ্যে ক্রিলেন্‌কো মগিলিওভে আসছেন, আর্মির হেডকোয়ার্টার বিনা যুদ্ধে মগিলিওভ ছেড়ে দিচ্ছে। জেনারেল দুখোনিনের নির্দেশে আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে বন্দীদের সকলকে এই মুহূর্তে অবশ্যই বীখোভ ছেড়ে যেতে হবে।'

কুসোন্স্কিকে জিজ্ঞেসবাদ করে মগিলিওভের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল এর্গার্দ্‌তকে ডেকে পাঠাল কর্নিলভ। বাঁহাতের আঙুলে টেবিলের কিনারায় জোরে চাপ দিয়ে সে বলল, 'এক্ষুনি জেনারেলদের ছেড়ে দিন। রাত বারোটা নাগাদ মার্চ করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে তেকিনদের তৈরি থাকতে হবে। আমি রেজিমেন্টের সঙ্গে যাব।'

সারাটা দিন ধরে ফৌজী কামারশালার হাপরগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ তুলে চলল, লাল টকটকে হয়ে জ্বলতে লাগল গনগনে কয়লার আঁচ, হাতুড়ির ঠনঠন আওয়াজ চলল, ঘোড়াগুলো খুঁটি বাঁধা অবস্থায় ভয়ঙ্কর হাঁকডাক ছাড়তে লাগল। তেকিনরা তাদের ঘোড়াগুলোর সব পায়ে ভালো করে নাল বাঁধাল, ঘোড়ার সাজ মেরামত করল, রাইফেলগুলো সাফ করল, যাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগল তারা।

দিনের বেলায় জেনারেলরা এক এক করে তাদের কারাবাস ছেড়ে চলে গেল। আর নেকড়ে-জাগা মাঝরাতে, গভীর নিশীথে ছোট্ট মফস্বল শহরটির লোকজন যখন ঘরের বাতি নিভিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সেই সময় বীখোভের হাইস্কুলের আঙিনা থেকে পাশাপাশি তিনজন করে সার বেঁধে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘোড়সওয়ারের দল। ইস্পাতরঙের আকাশের পটভূমিকায় ঝাপসা ঝাপসা দেখাতে লাগল তাদের একাকার মিশমিশে কালো অথচ উঁচু নীচু মূর্তিগুলো। ভেড়ার লোমের উঁচু উঁচু টুপিগুলোকে চোখের ওপর অবধি নামিয়ে দিয়ে,

তেলচকচকে তামাটে মুখগুলো কাপড়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে ঘাড় গুঁজে রোঁয়াফোলানো কালো কালো পাখির মতো জিনের ওপর বসে আছে ঘোড়সওয়াররা। রেজিমেন্টের কলামের মাঝখানে রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার কর্ণেল কুগেল্‌গেনের পাশে পাশে একটা উঁচু রোগা ঘোড়ার পিঠে কোলকুঁজো হয়ে বসে দুলতে দুলতে চলেছে কর্নিলভ। বীখোভের রাস্তায় রাস্তায় ঠাণ্ডা বাতাস হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে; তাইতে ভুরু কোঁচকাল কর্নিলভ, সরু সরু চোখের ফাঁক কুঁচকে তাকাল নক্ষত্রখচিত হিমেল আকাশের দিকে।

ঘোড়াগুলোর সদ্য-নাল-পরানো খুরের মৃদু মধুর খট্‌খট্‌ আওয়াজ উঠল রাস্তায় রাস্তায়, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল উপকণ্ঠের বুকে।

একুশ

প্রায় দু'দিন ধরে পেছনে হটছিল রেজিমেন্ট। ধীরে ধীরে, লড়াই করতে করতে, কিন্তু হটতে তাদের হচ্ছিল। উঁচু কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে আসছিল রুশ আর রুমানীয় বাহিনীর মালপত্তর বোঝাই দলবাঁধা গাড়িগুলো। অস্ট্রো-জার্মান যুক্ত ইউনিটগুলো পিছু-হটা দলের পাশের দিকে গভীর আক্রমণ চালিয়ে চক্রব্যূহের মুখ বুজিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ধ্যার দিকে আর বুঝতে বাকি রইল না যে ১২ নম্বর রেজিমেন্ট এবং তার পাশের রুমানীয় ব্রিগেড ঘেরাও হয়ে পড়ার বিপদ দেখা দিয়েছে। সূর্যাস্তের মুখে শত্রুপক্ষ খোভিনেস্কি গ্রাম থেকে রুমানীয়দের হটিয়ে দিয়ে গোল্‌শ্‌স্কি গিরিপথের সীমান্তে '৪৮০' শীর্ষভূমি পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

রাত্রে পার্বত্য ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কামানগুলোর সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পর ১২ নম্বর রেজিমেন্ট গোল্‌শ্‌স্কি উপত্যকার নীচের দিকের অঞ্চলে পজিশন নিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ পেল। সান্ত্রীদের ঘাঁটি বসিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল রেজিমেন্ট।

সেই রাত্রে আগুয়ান ঘাঁটির গোপন পাহারা দেওয়ার ভার পড়ল মিশ্‌কা কশেভয় আর তাদেরই গাঁয়ের আলেক্সেই বেশ্‌নিয়াক নামে এক শক্তসমর্থ জোয়ান কসাকের ওপর। ওরা দু'জনে একটা ছোট্ট খাতের ভেতরে এক পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা কুয়োর ধারে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল, ভারী হিমেল বাতাসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল। মেঘে ঢাকা ঝুপসি আকাশের বুকে থেকে থেকে দেরিতে উড়ে যেতে লাগল একঝাঁক বুনো হাঁস, হুঁশিয়ার হয়ে ডাক ছেড়ে নিশানা দিয়ে

যেতে লাগল তাদের যাত্রাপথের। ধূমপান নিষেধ – একথা মনে পড়ে যেতে বিরক্ত হয়ে ফিসফিস করে কশেভয় বলতে শুরু করল:

'এ এক অদ্ভুত জীবন রে আলেক্সেই! . . . মানুষ অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে হেঁটে চলেছে। চলতে চলতে এ ওর সঙ্গে মেলে, আবার তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কখন কখন এ ওকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। . . . এখন এই যেমন আছি সেই ভাবে মরণের কাছাকাছি বসে কিছুকাল কাটাও, তখন এই ভেবে অবাক লাগে এত সব উট্‌কো ঝামেলার অর্থ কী? আমার মনে হয় মানুষের ভেতরে যা আছে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর দুনিয়ায় আর কিছু নেই। যতই চেষ্টা কর না মানুষের মনের তল খুঁজে পাবে না। . . . এই যে আমি এখন তোর পাশে শুয়ে আছি, জানি নে তুই কী ভাবছিস, কোন দিনই জানতে পাব না; কোন্ ধরনের জীবন তুই পেছনে ফেলে এসেছিস তাও জানি নে, তুইও জানিস নে আমার সম্পর্কে। . . . এমনও ত হতে পারে আমি তোকে এখন খুন করতে চাই, অথচ তুই আমাকে এতটুকু সন্দেহ করছিস না – আদর করে আমাকে বিস্কুট খেতে দিচ্ছিস। . . . মানুষ নিজের সম্পর্কে অল্পই জানে। গরমকালে আমি ছিলাম হাসপাতালে। আমার পাশের বেডে ছিল এক সেপাই – মস্কোর লোক। লোকটা অবাক হয়ে কেবলই আমায় জিজ্ঞেস করত কসাকরা কেমন করে থাকে – কেন, কোথায়, কী ভাবে – এই রকম নানা প্রশ্ন তার। ওরা ভাবে কসাকরা চাবুক ছাড়া আর কিছু জানে না, ভাবে কসাকরা অসভ্য বর্বর, ওদের মন বলে কোন পদার্থ নেই, তার জায়গায় আছে একটা বোতল। কিন্তু আমরাও ত তাদের মতোই মানুষ, ওদের মতোই মেয়েমানুষ ভালোবাসি, যুবতীদের সোহাগ করি, নিজেদের দুঃখে কাঁদি, পরের সুখে সুখ পাই নে। . . . তোর কী মনে হয় আলেক্সেই? জীবনের জন্যে আমার কিন্তু দারুণ লোভ হয় ভাই – যখন ভাবি দুনিয়ায় কত সুন্দর সুন্দর মেয়েমানুষ আছে, তখন ওঃ বুকের ভেতরটা যা টনটন করে ওঠে না! মনে মনে ভাবি ওদের সকলকে পাওয়া জীবনেও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, তখন দুঃখে বেদনায় ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে আমার! মেয়েদের সম্পর্কে আমি এত কোমল হয়ে পড়েছি আজকাল যে আমি ওদের যে-কাউকে ভালোবেসে ব্যথা সইতেও রাজি। . . . উড়ুক না কেন, যেখানে খুশি ঢলাঢলি গড়াগড়ি করুক না কেন, সুন্দরী হলেই হল – আমি তাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম। . . . অথচ দ্যাখ বিরাট বুদ্ধি খাটিয়ে জীবন কাটানোর কী উপায়ই না লোকে বার করেছে! - একটাকে ধরিয়ে দেবে, আর সেটাকে নিয়েই চটকাচটকি কর যতদিন তোমার মরণ না হচ্ছে। . . . বিরক্তি ধরে যায় না? তার ওপর কিনা আবার যুদ্ধ করার কথা ভাবল. অমনিতেই . . .'

'তোর পিঠে তেমন ঘা পড়ে নি এখনও, ধর্মের ষাঁড় কোথাকার!' বেশ্‌নিয়াক গালাগাল দিলেও তার মধ্যে কোন বিদ্বেষের ভাব ছিল না।

কশেভয় গড়িয়ে চিত হয়ে শুল, চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ ধরে আকাশের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্বপ্নাতুরের মতো মৃদু হাসল, উত্তেজনাভরে পরম স্নেহভরে হিমকঠিন, দুরধিগম্য, উদাসীন ধরণীর গায়ে হাত বুলাতে লাগল।

পাহারা বদল হয়ে ছাড়া পেতে তখনও এক ঘণ্টা বাকি, এমন সময় জার্মানদের হাতে তারা ধরা পড়ে গেল। বেশ্‌নিয়াক একবারই মাত্র গুলি করার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত কড়মড় করতে করতে মরণযন্ত্রণায় মোচড়াতে মোচড়াতে ঝুঁকে মাটিতে বসে পড়ল। জার্মানদের ধারাল বেয়নেটের ফলা তার পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বার করে ফেলল, মূত্রাশয় ফুঁড়ে শিরদাঁড়ায় শক্ত হয়ে গেঁথে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কশেভয় রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে মাটিতে পড়ে গেল। এক বিশালদেহ জার্মান সিকি ক্রোশখানেক তাকে বয়ে নিয়ে এসেছিল। মিশ্‌কার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে উপলব্ধি করল যে রক্তের বন্যায় তার দম আটকে আসছে; একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে অবলীলাক্রমে জার্মানটার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। এক ঝাঁক গুলি ছুটল তাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু রাতের অন্ধকার আর ঝোপঝাড়ের জন্য তার সুবিধা হয়ে গেল - সে পালাল।

পিছু হটা বন্ধ হওয়া আর ফাঁদ থেকে রুশ-রুমানীয় বাহিনীর ইউনিটগুলো বেরিয়ে আসার পর ১২ নম্বর রেজিমেন্টকে পজিশন থেকে সরিয়ে তার সেক্টরের কয়েক ক্রোশ বাঁয়ে, ফ্রন্ট-লাইনের পেছনে নিয়ে যাওয়া হল। বাহিনী ছেড়ে কোন সৈন্য যাতে ফেরার হয়ে ফ্রন্ট-লাইনের পেছনে চলে না যায় তার জন্য রাস্তা বন্ধ করে চৌকি বসানোর নির্দেশ চলে গেল রেজিমেন্টে। বলা হল দরকার হলে অস্ত্রের আশ্রয় নিয়েও তাদের আটকাতে হবে এবং প্রহরাধীনে ডিভিশনের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

এই বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রথম যাদের পাঠানো হল মিশ্‌কা কশেভয় ছিল তাদের মধ্যে একজন। সে এবং আরও তিনজন কসাক সকাল থাকতে গাঁ ছেড়ে বের হল, সার্জেন্ট-মেজরের নির্দেশানুযায়ী রাস্তার কাছাকাছি একটা ভুট্টাক্ষেতের শেষে ঘাঁটি গেড়ে রইল। রাস্তাটা একটা ছোট বনের ধার দিয়ে ঘুরে গিয়ে চষাক্ষেতের ছোট ছোট খুপরি কাটা একটা গড়ানে উপত্যকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওরা তিনজন পালা করে নজর রাখতে লাগল। দুপুরের কিছু পরে তারা দেখতে পেল জনাদশেক সৈন্যের একটা দল তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ওদের গতিবিধি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে টিলার গায়ের নীচের ছোট্ট গ্রামটাকে এড়িয়ে যাবার মতলব। ছোট বনটার কাছাকাছি চলে আসার পর ওরা থামল, সিগারেট ধরাল, বেশ বোঝা গেল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে। তারপর এগিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ গতি পরিবর্তন করে সমকোণ আকারে বাঁ দিকে মোড় নিল।

'হাঁক ছাড়ব নাকি একটা?' ভুট্টার ঘন ঝাড়ের ভেতর থেকে উঠে এসে বাকি কসাকদের জিজ্ঞেস করল কশেভয়।

'মাথার ওপরে গুলি ছোঁড়।'

'এই, কে যায়? থাম!'

সৈন্যরা ততক্ষণে কসাকদের প্রায় শ'খানেক গজের মধ্যে এসে গেছে। ডাক শুনে মুহূর্তের জন্য তারা থামল, তারপর অনেকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার সামনে চলতে শুরু করল – যেন কিছুই শুনতে পায় নি।

'থাম!' কসাকদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল, তারপর একের পর এক শূন্যে গুলি ছুঁড়ে কার্তুজের ক্লিপ উজার করে দিল।

সৈন্যরা আস্তে আস্তে পা ফেলে যাচ্ছিল। কসাকরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে ছুটতে ছুটতে তাদের পাল্লা ধরে ফেলল।

'থামছ না যে বড়? কোন্ ইউনিটের? কোথায় যাচ্ছ? তোমাদের ছাড়পত্র দেখাও!' ঘাঁটির প্রধান, সার্জেন্ট কোলিচেভ ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল।

সৈন্যরা থামল। তিনজন আস্তেসুস্থে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল।

পেছনের লোকটা ঝুঁকে পড়ে টেলিফোনের এক টুকরো তার দিয়ে ছেঁড়া তলিটা বুটের ওপরের অংশের সঙ্গে নতুন করে বাঁধার চেষ্টা করতে লাগল। ওদের সকলেরই জামাকাপড় অবিশ্বাস্য রকমের ছেঁড়াখোঁড়া আর নোংরা। গ্রেটকোটের কিনারায় লেগে আছে খোঁচা খোঁচা বাদামী রঙের চোরকাঁটা – বোঝাই যাচ্ছে বনের ভেতরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথাও রাত কাটিয়েছে। দু'জনের মাথায় গরমকালের টুপি, অন্যদের মাথায় ভেড়ার লোমের টুপি – নোংরা ছাইরঙা, কানঢাকার অংশগুলো নামানো, ঝুলঝুল করছে বাঁধার ফিতে। শেষের লোকটি – লম্বা, বুড়োদের মতো কোলকুঁজো – হাবভাবে মনে হল ওদের নেতা; তার ঝুলে পড়া গালের মাংসপেশীগুলো কাঁপছে, ক্ষিপ্ত হয়ে নাকি গলায় চিৎকার করে সে বলল, 'তোমাদের কী হে? আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি? তোমরা তাহলে আমাদের পেছনে লেগেছ কেন?'

'ছাড়পত্র দেখাও!' কঠিন ভাব করে তাকে বাধা দিয়ে সার্জেন্ট বলল।

নীল-চোখ, নতুন পোড়া ইটের মতো লাল টকটকে চেহারার একজন সৈনিক তার বেল্টের নীচ থেকে একটা বোতল-আকারের হাতবোমা বার করল, সার্জেন্টের মুখের ওপর নাকের ডগায় সেটা নাচাতে নাচাতে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর ইয়ারোস্লাভ্‌লীয় টানে তড়বড় করে বলতে শুরু করল:

'এই যে আমাদের ছাড়পত্তর! দেখে লাও গো! সারা বচ্ছরের মতো এই ছাড়পত্তর! বলি প্রাণের মায়া আছে?–এমন একটা ঝাড়ব না–কুড়িয়ে লেবার মতো হাড়গোড় থাকবে নি। বুঝলে? বুঝলে কিনা? বলি বুঝলে? . . .'

'ওসব ইয়ার্কি ছাড়!' লোকটার বুকে ধাক্কা মেরে ভুরু কুঁচকে সার্জেন্ট বলল। 'ইয়ার্কি ছাড়, তাছাড়া ভয়ও দেখাতে এসো না আমাদের–ভয় পেতে পেতে অমনিতেই বিরক্তি ধরে গেছে আমাদের। তোমরা যদি ফেরারী হও তাহলে ঘুরে দাঁড়াও, সদর ঘাঁটিতে যেতে হবে। তোমাদের মতো চরিত্রের লোকজনকে সেখানেই জড় করা হচ্ছে।'

সৈন্যরা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে রাখল। ওদের মধ্যে একজন–কালো গোঁফ, লম্বা চেহারার, দেখে মনে হয় খনিমজুর–মরিয়া দু'চোখের দৃষ্টি কশেভয়ের ওপর থেকে বাকিদের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এবারে আমরা যদি বেয়নেট বিঁধিয়ে তোমাদের গেঁথে ফেলি তাহলে কেমন হয়! . . . ভাগো! সরে যাও বলছি! ভগবানের দিব্যি, যে প্রথম এগিয়ে আসবে তারই ওপর গুলি ঝেড়ে দেব! . . .'

নীল-চোখ সৈন্যটা মাথার ওপর হাতবোমা ঘোরাতে লাগল; ঢ্যাঙা কোলকুঁজো যে সৈন্যটা আগে আগে যাচ্ছিল, তার বেয়নেটের মরচে-ধরা ফলার খোঁচায় সার্জেন্টের গ্রেটকোটের খানিকটা বনাত ফাঁসিয়ে দিল; খনিমজুরের মতো দেখতে লোকটা শাপশাপান্ত করতে করতে মিশ্‌কা কশেভয়ের দিকে তাক করে বন্দুকের বাঁট দোলাল। এদিকে ট্রিগার চেপে ধরা অবস্থায় মিশ্‌কার আঙুল কাঁপতে লাগল, কনুইয়ের ধাক্কায় একপাশে সরে গিয়ে দুলতে লাগল রাইফেলের বাঁটটা। একজন কসাক ছোটখাটো চেহারার বেঁটেমতো এক সেপাইকে গ্রেটকোটের কলার ধরে হিড়হিড় করে কাছে টেনে আনল, ভয়ে ভয়ে সে পেছনে তাকাতে লাগল, পাছে অন্যেরা পেছন থেকে তাকে মেরে বসে।

ভুট্টার ঝাড়ের শুকনো পাতায় মর্মরধ্বনি উঠল। গড়ানে উপত্যকাটা পেরিয়ে নীল রঙের তরঙ্গ তুলছে পাহাড়ের রেখাগুলো। গ্রামের কাছে গোচারণভূমিতে বাদামী রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে। বাতাসে বন পেরিয়ে উড়ে গেল ধুলোর মতো গুঁড়ো বরফের ঘূর্ণিঝড়। নিদ্রাতুর, শান্তিময় অক্টোবরের অনুজ্জ্বল দিনটি; কুণ্ঠিত সূর্যালোকস্নাত প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে ছড়িয়ে পড়ছে নিস্তব্ধতা আর

স্বর্গীয় প্রশান্তি। কিন্তু এখানে রাস্তার অনতিদূরেই অর্থহীন ক্রোধে অন্ধ হয়ে লোকেরা দাপাদাপি করছে, বৃষ্টির জলে পরিতৃপ্ত, বীজবোনা এই উর্বর মাটিকে নিজেদের রক্ত ঢেলে বিষাক্ত করে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

উত্তেজনার ভাব খানিকটা কমে এলো। খানিকটা হৈচৈ করার পর সৈন্যরা আর কসাকরা অনেকটা শান্ত ভাবে কথাবার্তা শুরু করল।

'তিনদিন আগে পজিশন থেকে আমাদের সরিয়ে আনা হয়েছে! কিন্তু আমরা ত ফ্রন্ট-লাইনের পেছনে পালিয়ে যাই নি! তোমরা পালাচ্ছ, লজ্জা করে না তোমাদের! সঙ্গীসাথীদের ফেলে চলে যাচ্ছ! ফ্রন্ট তাহলে আগলাবে কে? কী লোক তোমরা! . . . এই দেখ না, আমার বন্ধুই আমার চোখের সামনে বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে মরল – লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম আমরা। তুমি কিনা বলছ যুদ্ধের স্বাদ আমরা পাই নি!' ক্রুদ্ধ হয়ে বলল কশেভয়।

'এত তক্কাতক্কির কী দরকার?' একজন কসাক বাধা দিল। 'সদর ঘাঁটিতে চল, কোন কথা নয়!'

'পথ ছেড়ে দাও, কসাকরা! নইলে, ভগবানের দিব্যি, গুলি করব!' খনিমজুরের মতো দেখতে সেপাইটা জোর দিয়ে বলল।

সার্জেন্ট হতাশার ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে বলল, 'এইটে আমরা করতি পারব নি ভাই! আমাদের যদি গুলি করে মেইরেও ফেল পালাতি তোমরা পারবা না; হুই গেরামে আমাদের স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি আছে।'

লম্বা, কোলকুঁজো সৈন্যটা কখনও ভয় দেখাতে লাগল, কখনও অনুনয়বিনয় করতে লাগল, কখনও বা মান সম্মান খুইয়ে হাতে পায়ে ধরতে লাগল। অবশেষে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নোংরা ঝুলি হাতড়ে খড়ের বুননি দিয়ে জড়ানো একটা বোতল বার করল, তোয়াজের ভঙ্গিতে কশেভয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে চাপা গলায় বলল, 'ওহে কসাকছেলেরা, আমরা তোমাদের কিছু দেব . . . আর এই দেখ ভাই এই ভোদ্‌কা . . . জার্মান ভোদ্‌কা। . . . আরও কিছু জিনিস হয়ত দেওয়া যাবে যোগাড়-যন্তর করে। . . . আমাদের যেতে দাও, খ্রীষ্টের দোহাই! ঘরে বাচ্চাকাচ্চা আছে, তুমি নিজেও ত বোঝ। . . . সব জোর-বল শুষে নিয়েছে, আর পারা যাচ্ছে না। . . . আর কতকাল চলতে পারে? . . . হা ভগবান! . . . সত্যিই ছাড়বে না বলছ?' বুটের ওপরকার জড়ানো চামড়ার পটির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি সে তামাকের বটুয়া বার করল, বটুয়ার ভেতর থেকে ঝেড়ে বার করল কেরেন্‌স্কি সরকারের ছাপ দেওয়া দলামোচড়া পাকানো দুটো নোট। নোটদুটো কশেভয়ের হাতে জোর করে গুঁজে দিতে দিতে সে বলল, 'নাও, নাও! আহা, ও কিছু নয়। ভগবানের দিব্যি! কিচ্ছু ভেবো না। . . . ও ছাড়াও আমরা ঠিক চালিয়ে নেব!

টাকাটা কিছু নয়. . . টাকা ছাড়াও চলে যাবে। . . . নাও! আরও কিছু যোগাড় করে দেব 'খন। . . .'

লজ্জায় লাল হয়ে হাতদুটো পেছনে করে মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে এলো কশেভয়। তার মুখে রক্ত ঝলক দিয়ে উঠল, চোখে জল ঠেলে এলো। মনে মনে ভাবল, 'বেশ্‌নিয়াকের ভাগ্যে যা ঘটল তার জন্যেই না আমার এত রাগ? কিন্তু আমি. . . আমি নিজেই ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে, অথচ এই লোকগুলোকে আটকানোর চেষ্টা করছি! কী অধিকার আছে আমার? . . . মা গো, এ কী করছি আমি! কী জঘন্য ইতর আমি!'

সার্জেন্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে একপাশে ডেকে নিল তাকে, তার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'ছেড়েই দিই ওদের, কী বল? তোমার কী মনে হয় কোলিচেভ? ভগবানের নাম করে না হয় ছেড়েই দিই! . . .'

সার্জেন্টও এমন ভাবে তাকাতে লাগল যেন সেই মুহূর্তে কোন লজ্জার কাজ করে ফেলেছে। উত্তরে বলল, 'যাক গে। . . . ওদের দিয়ে কী ছাইটা হবে আমাদের? শিগ্‌গিরই আমাদের নিজেদেরও এই পথ নিতে হবে। . . . পাপ আর লুকোতে যাই কেন!'

সৈন্যদের দিকে ফিরে ভয়ঙ্কর হম্বিতম্বি করে বলল, 'হারামজাদারা! আমরা ভালোমানুষ জেনে তোদের সঙ্গে অত ভদ্র ব্যবহার করতে গেলাম, আর তোরা কিনা আমাদের টাকার গরম দেখাচ্ছিস! তোরা কি ভাবিস, আমাদের নিজেদের টাকার অভাব আছে?' মুখচোখ লাল করে বলল, 'তোদের টাকার থলে সরিয়ে নে বলছি, নইলে টানতে টানতে নিয়ে যাব ওপরওয়ালাদের কাছে! . . .'

কসাকরা এক পাশে সরে দাঁড়াল। সৈন্যেরা যখন চলে যাচ্ছে, তখন দূর গ্রামের জনশূন্য রাস্তাঘাটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কশেভয় তাদের বলল, 'এই গাধার দল! খোলা জায়গার ওপর দিয়ে কোথায় চললে? ওই যে ছোট বনটা দেখতে পাচ্ছ ওর ভেতরে ঢুকে পড়। দিনের বেলাটা ওখানে কাটিয়ে রাতে পথ চল! নইলে আরেক ঘাঁটির খপ্পরে পড়বে – তারা কিন্তু ছাড়বে না!'

সৈন্যরা চারধারে তাকাল, কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর একপাল নেকড়ের মতো পরপর দাঁড়িয়ে একটা নোংরা ছাইরঙা সার বেঁধে নাবাল বয়ে ঝাঁকড়া অ্যাস্পেনগাছের বনের ভেতরে ঢুকে গেল।

* * *

নভেম্বরের প্রথম দিকে পেত্রোগ্রাদে বৈপ্লবিক ওলটপালট সম্পর্কে বিচিত্র ধরনের সমস্ত গুজব কসাকদের কানে আসতে লাগল। ওপরওয়ালাদের যারা আর্দালি তারাই সচরাচর অন্যদের চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। তারা জোর দিয়ে বলতে লাগল যে সাময়িক সরকার আমেরিকায় পালিয়ে গেছে; তবে কেরেন্স্কি ধরা পড়েছিল জাহাজীদের হাতে, তার মাথা মুড়িয়ে, বেশ্যার মতো আলকাতরা মাখিয়ে পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় দু'দিন ধরে ঘোরানো হয়েছিল তাকে।

পরে যখন সাময়িক সরকারের উৎখাত এবং চাষী মজুরদের হাতে ক্ষমতা আসার খবর সরকারী সূত্রে পাওয়া গেল তখন কসাকরা সতর্ক ভাবে শান্ত হয়ে রইল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে এই আশায় অনেকে উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেরেন্স্কি আর জেনারেল ক্রাস্নোভের সঙ্গে ৩ নম্বর ক্যাভালরী কোর্ পেত্রোগ্রাদের দিকে এগিয়ে আসছে, আর ইতিমধ্যে সময় থাকতে দন অঞ্চলে কতকগুলো কসাক রেজিমেন্টের সমাবেশ ঘটাতে পারায় কালেদিন দক্ষিণ থেকে চাপ সৃষ্টি করছে – এই মর্মে গুজবের চাপা প্রতিধ্বনি মনে শঙ্কা জাগিয়ে তুলল।

ফ্রন্টে ভাঙন ধরল। অক্টোবরে সৈন্যরা এলোমেলো ভাবে ছাড়া ছাড়া দলে পালাচ্ছিল, কিন্তু নভেম্বরের শেষে দেখা গেল পুরোপুরি একেকটা কোম্পানি, ব্যাটেলিয়ন, রেজিমেন্ট তাদের পজিশন ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে মালপত্র ছাড়া খালি হাতে আসতে লাগল, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সঙ্গে নিয়ে আসতে লাগল রেজিমেন্টের সম্পত্তি, গুদাম ভেঙে, অফিসারদের গুলি করে, পথে লুটপাট করতে করতে বাঁধভাঙা উদ্দাম বন্যাস্রোতের মতো তারা ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাদের দেশের দিকে।

এই পরিস্থিতিতে ১২ নম্বর রেজিমেন্টের ফেরারী সৈন্যদের আটকানোর কাজ অর্থহীন হয়ে পড়ল – পদাতিক সৈন্যরা তাদের সেক্টর ছেড়ে যাবার পর যে-সব ফাঁক-ফোকর সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টায় রেজিমেন্টকে ফের পজিশনে পাঠানো হল, কিন্তু নভেম্বরেই আবার সরিয়ে নিয়ে আসতে হল সেখান থেকে। অতঃপর সকলে মার্চ করে কাছের রেলস্টেশনে পৌঁছুল, রেজিমেন্টের যাবতীয় সম্পত্তি, মেশিনগান, গোলাবারুদের রসদ আর ঘোড়া – সব গাড়িতে চাপিয়ে যাত্রা করল যুদ্ধবিক্ষুব্ধ রাশিয়ার গভীর অভ্যন্তরে।

ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে দনের দিকে এগিয়ে চলল বারো নম্বর রেজিমেন্টের সামরিক ট্রেন। অনতিদূরে লালফৌজীরা তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করল। আধঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। কশেভয় আর স্কোয়াড্রনের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি এবং

আরও পাঁচজন কসাক অস্ত্রশস্ত্রসমেত তাদের ছেড়ে দেবার জন্য আবেদন জানাল।

'অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কী করবে তোমরা ?' স্টেশন-সোভিয়েতের সদস্যরা জানতে চাইল।

'আমাদের যে সমস্ত বুর্জোয়া আর জেনারেল আছে তাদের মারতে হবে। কালেদিনের জারিজুরি ভাঙব আমরা!' সবার হয়ে উত্তর দিল কশেভয়।

'অস্ত্রশস্ত্র আমাদের, আমাদের ফৌজের। ওগুলো দেওয়া যাবে না!' কসাকরা উত্তেজিত হয়ে বলল।

ট্রেন এগুতে দেওয়া হল। ক্রেমেনচুগে আবার তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা হল। কসাক মেশিনগানচালকরা যখন কামরার খোলা দরজায় মেশিনগান বসিয়ে স্টেশনের দিকে তাক করল আর একটা কসাক স্কোয়াড্রন রেলরাস্তা বরাবর সার বেঁধে শুয়ে পড়ে আক্রমণের জন্য তৈরি হল একমাত্র তখনই তাদের শর্তে রাজি হয়ে যেতে দেওয়া হল। ইয়েকাতেরিনস্লাভের কাছে আসার পর কিন্তু একদল রেড গার্ডের সঙ্গে গুলি চালাচালি করেও কোন লাভ হল না – শেষ পর্যন্ত রেজিমেন্টকে আংশিক ভাবে নিরস্ত্র করা হল। মেশিনগান, একশ' বাক্সেরও বেশি গোলাবারুদ, ফিল্ডের টেলিফোনের যন্ত্রপাতি আর কয়েক বাণ্ডিল তার ওরা নিয়ে নিল। অফিসারদের গ্রেপ্তার করার প্রস্তাবে কসাকরা রাজি হল না। সারা রাস্তায় তারা হারাল একজন মাত্র অফিসারকে – সে হল রেজিমেন্টের এজুটান্ট চির্কোভ্স্কি। কসাকরা নিজেরাই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন আর একজন জাহাজী রেড গার্ড সেই দণ্ড কার্যকরী করে।

১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগে আগে এজুটান্টকে কামরা থেকে টেনে বার করল কসাকরা।

'এই সেই লোক যে কসাকদের ধরিয়ে দিয়েছিল?' মাউজার পিস্তল আর জাপানী রাইফেল-সজ্জিত, কৃষ্ণসাগরের এক ফোকলাদাঁত জাহাজী উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ভেবেছ আমরা চিনতে ভুল করেছি? উঁহু, আমাদের এতটুকু ভুল হয় নি – ঠিক ধরেছি ওকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন।

এজুটান্ট লোকটি অল্পবয়সী এক সাব-অল্টার্ণ। তাড়া-খাওয়া দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল সে, ঘর্মাক্ত হাতের তালু দিয়ে মাথার চুল পাট করল। ঠাণ্ডায় মুখে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল; কিন্তু না ঠাণ্ডা, না রাইফেলের কুঁদোর ঘা – কোনটাতেই কোন ব্যথা-যন্ত্রণাই সে উপলব্ধি করতে পারছিল না। ঝুঁটিওয়ালা ও জাহাজী তাকে কামরা থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'এই ধরনের শয়তানগুলোর জন্যেই লোকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এদের মতো লোকের জন্যেই বিপ্লব দেখা দেয়। . . . আহা-হা, বাছা আমার, অমন কেঁপো

না, খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে যাবে,' মাথার টুপি খুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে ফিসফিস করে ঝুঁটিওয়ালা বলল। 'আচ্ছা এই বার সামলে, সাব-অল্‌টার্ণ সাহেব!'

'তৈরি?' মাউজার পিস্তলটা হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে হাসতে হাসতে ঝুঁটিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল জাহাজী।

'আমি তৈরি!'

ঝুঁটিওয়ালা আরও একবার ক্রুশ-প্রণাম করল, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল জাহাজী একটা পা পেছনে রেখে খাড়া হয়ে পিস্তল তুলছে, লক্ষ্য স্থির রাখার জন্য একটা চোখ বুজছে, তারপর একটা কঠিন হাসি হেসে গুলি ছুঁড়ল – সে-ই প্রথম গুলি ছুঁড়ল।

চাপ্‌লিনের কাছে এসে ঘটনাক্রমে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হল রেজিমেণ্টকে। লড়াই বেধেছিল নৈরাজ্যবাদী আর ইউক্রেনীয়দের মধ্যে। তিনজন কসাককে হারাতে হল। কোন এক রাইফেল ডিভিশনের ট্রেনে লাইন আটকে পড়েছিল, অনেক কষ্টে সে লাইন পরিষ্কার করে গায়ের জোরে বাধা ভেঙে তারা বেরিয়ে এলো।

তিন দিন পরে মিল্লেরোভো স্টেশনে রেজিমেণ্টের প্রথম ট্রেন থেকে লোকজন নামল।

বাকি ট্রেনগুলো লুগান্‌স্কে আটকে পড়ে রইল।

অর্ধেক লোকবল নিয়ে (বাকিরা স্টেশন থেকেই সোজা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে) রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছুল কার্গিন গ্রামে। পর দিন তারা যুদ্ধে-জেতা মালপত্র, ফ্রন্টে অস্ট্রীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ঘোড়া – সব বেচে দিল, রেজিমেণ্টের টাকাকড়ি আর সাজসজ্জা ভাগাভাগি করে নিল নিজেদের মধ্যে।

সন্ধ্যার সময় কশেভয় আর তাতার্‌স্কি গ্রামের অন্যান্য কসাকরা বাড়ির দিকে যাত্রা করল। একটা পাহাড়ের ওপর উঠল তারা। নীচে চির্‌ নদীর বরফ ঢাকা আঁকাবাঁকা সাদা পাড়ের বুকে ছড়িয়ে আছে কার্গিন গ্রাম – দনের উজানে সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। বাষ্পীয় মিলের চোঙা থেকে ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বারোয়ারিতলায় কালো কালো ভিড় জমিয়ে আছে লোকজন, সন্ধ্যা-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। কার্গিন গ্রামের চুড়ো ছাড়িয়ে ক্লিমভ্‌স্কি গ্রামের উইলোগাছের মাথাগুলো একটু আধটু চোখে পড়ছে; তাদেরও পেছনে, বরফঢাকা দিগন্তের বুকে নীলচে-সবুজ রঙের খেলা, তার ওপাড়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি ঝলমল করছে, অর্ধেক আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধূমাচ্ছন্ন গাঢ় লাল দীপ্তি।

একটা ঢিবির ওপর তিনটে ন্যাড়া বুনো আপেলগাছ দাঁড়িয়ে আছে। আঠারোজন ঘোড়সওয়ার ঢিবিটা পেরিয়ে গেল, তারপর নতুন করে দুলকি চালে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে জিনের মচমচ আওয়াজ তুলে উত্তর পুবের দিকে চলতে লাগল। পরের

টিলাটার মাথার ওপাশে চোরের মতো ঘাপটি মেরে আছে হিমেল রাত। টুপির ওপরে গরম কাপড়ের ঘোমটা টেনে কসাকরা থেকে থেকে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে হুড়হুড় করে ঘোড়া ছুটাতে থাকে। নাল বাঁধানো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ স্পষ্ট খট্‌খট্‌ করে প্রায় যন্ত্রণার মতো এসে বাজতে থাকে। ঘোড়ার খুরের নীচে বাঁধানো রাস্তা স্রোতের মতো বয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। কিছুদিন আগে গলতে শুরু করায় পাতলা বরফের সর রাস্তার দু'পাশের লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় লেগে আছে, চাঁদের আলোয় সেগুলো ঝলমল করছে, খড়িরঙের সাদা ঝলক তুলে বয়ে চলেছে আলোর বন্যা।

কসাকরা নিঃশব্দে ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিতে লাগল। স্রোতের মতো রাস্তা চলেছে দক্ষিণমুখে। পুবে ঘুরতে ঘুরতে সরে গেল দুবোভেন্‌কি গিরিখাতের বনরেখা। যেখানে যেখানে ঘোড়ার খুর পড়ছে তার পাশে পাশে চোখে পড়ে খরগোসের আঁকাবাঁকা পায়ের দাগে বোনা নক্সা। স্তেপভূমির মাথার ওপর কসাকের সূক্ষ্ম কারুকাজকরা কোমরবন্ধনীর মতো সুন্দর করে জড়িয়ে ধরে আছে ছায়াপথ।

পঞ্চম পর্ব

এক

১৯১৭ সালের শরতের শেষাশেষি ফ্রন্ট থেকে গ্রামে ফিরতে লাগল কসাকরা। খ্রিস্তোনিয়া যখন ফিরে এলো তখন তাকে দেখে মনে হল বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে এলো আরও তিনজন কসাক, যারা তারই সঙ্গে ৫২ নম্বর রেজিমেণ্টে কাজ করত। পলটন থেকে পুরোপুরি খারিজ হয়ে ফিরে এলো আনিকেই, গোলন্দাজ ইভান তোমিলিন আর 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ। আনিকেই সেই আগের মতোই মাকুন্দো রয়ে গেছে। তাদের পরে এলো মার্তিন শামিল, ইভান আলেক্সেয়েভিচ, জাখার করলিওভ আর বিশ্রী ঢ্যাঙা বোর্‌শ্চিওভ। ডিসেম্বরে অপ্রত্যাশিত ভাবে হাজির হল মিত্‌কা কোর্‌শুনভ, তার এক সপ্তাহ পরে এলো আগেকার বারো নম্বর রেজিমেণ্টের গোটা একটা দল – মিশ্‌কা কশেভয়, প্রোখর জিকভ, বুড়ো কাশুলিনের ছেলে আন্দ্রেই কাশুলিন, ইয়েপিফান মাক্সায়েভ আর ইয়েগর সিনিলিন।

কাল্‌মিক ধাঁচের চেহারার ফেদোত বদভ্‌স্কোভ তার রেজিমেণ্ট থেকে কেটে পড়েছিল। কোন এক অস্ট্রিয়াণ অফিসারের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া চমৎকার এক তামাটে রঙের ঘোড়ায় চেপে সে সোজা এলো ভরোনেজ থেকে। কেমন করে ভরোনেজ প্রদেশের বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে গলে এসেছে, নিজের ঘোড়ার শক্তির ওপর ভরসা করে কী ভাবে রেড গার্ড দলগুলোর নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে এই নিয়ে পরে অনেক দিন ধরে সে গল্প করে বেড়াতে লাগল।

এর পর কামেন্‌স্কায়া থেকে এসে হাজির হল মের্কুলভ, পেত্রো মেলেখভ আর নিকলাই কশেভয়। এরা সবাই পালিয়ে এসেছে বলশেভিক হয়ে যাওয়া সাতাশ নম্বর রেজিমেণ্ট থেকে। তারাই গাঁয়ে খবর নিয়ে এলো যে গ্রিগোরি মেলেখভ হালে ২ নম্বর সংরক্ষিত রেজিমেণ্টে ছিল, এখন সে বলশেভিকদের দলে ভিড়ে গিয়ে কামেন্‌স্কায়াতেই রয়ে গেছে। এই ডামাডোলের বাজারে যে অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে তার জন্য এবং সহজ-স্বচ্ছন্দ দিন কাটানোর সম্ভাবনায়

বলশেভিকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক কালের দাগী ঘোড়া-চোর, ২৭ নম্বর রেজিমেন্টের মাক্সিম গ্রিয়াজ্‌নোভও সেখানে রয়ে গেছে। তারা বলল, মাক্সিম একটা অবিশ্বাস্যরকমের কুৎসিত ঘোড়া জুটিয়েছে – যেমন কুৎসিত তেমনি অবিশ্বাস্য-রকমের ভয়ঙ্কর সেটার তেজ। ঘোড়াটার শিরদাঁড়া বরাবর নাকি চলে গেছে স্বাভাবিক রুপোলি লোমের একটা লম্বা গোছা। অমনিতে ঘোড়াটা তেমন উঁচু নয়, তবে বেশ লম্বা, আর গায়ের রঙ অনেকটা যেন ষাঁড়ের মতো লাল। গ্রিগোরি সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা শোনা গেল না – তার সম্পর্কে কিছু বলার কোন ইচ্ছে তাদের ছিল না, কারণ তারা জানত যে গ্রামের আর সব লোকের পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছে তার পথ এবং দুটো পথ আবার কখনও মিলবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই।

কসাকরা যে-সব বাড়িঘরে গৃহস্বামী অথবা বহু প্রতীক্ষিত অতিথি হয়ে ফিরে এলো সেখানে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠল। কিন্তু যে-সব লোক চিরকালের জন্য তাদের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনকে হারিয়েছে, এই আনন্দ তাদের গভীর মর্মবেদনাকে আরও নির্মম ভাবে প্রকট করে তুলল। কত কসাক হারিয়ে গেল, ছড়িয়ে রইল গালিসিয়া, বুকোভিনা, পূর্ব প্রাশিয়া, কার্পাথিয়াসংলগ্ন এলাকা আর রুমানিয়ার মাঠে ঘাটে – পড়ে রইল তাদের মৃতদেহ, কামানের শোকসঙ্গীতের মধ্যে পচতে লাগল সেগুলো। এখন একসঙ্গে যেখানে তাদের মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে সেই সব কবরের ঢিবির ওপর লম্বা লম্বা আগাছা গজিয়েছে, বৃষ্টির ধারায় সেগুলো বসে গেছে, বাতাসের ঝাপটায় ঝুরঝুরে বরফ ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর দিয়ে। কসাক মেয়েরা এলোচুলে বাড়ি থেকে ছুটে যতই রাস্তায় বেরিয়ে আসুক না কেন, হাতের তালু দিয়ে সূর্যের আলো আড়াল করে যত দূরেই তাকিয়ে দেখুক না কেন – প্রিয়জনকে আর কখনও দেখার সুযোগ ঘটবে না তাদের! কান্নায় ফোলা নিষ্প্রভ চোখ থেকে যত অশ্রুধারাই গড়িয়ে পড়ুক না কেন তাদের আর্তি তাতে ধুয়ে যাবে না! শ্রাদ্ধবাসরে আর স্মরণতিথিগুলোতে যত উচ্চরোলই উঠুক না কেন পুবের হাওয়া কখনই সেই হাহাকার বয়ে নিয়ে যাবে না গালিসিয়া আর পূর্ব প্রাশিয়ায়, বারোয়ারি সমাধির সেই বসে যাওয়া ঢিবিগুলোতে! . . .

ঘাসে ঢেকে যায় কবর, সময়ে ঢাকা পড়ে বেদনা। যারা চলে গেছে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের চিহ্ন; সময়ও তেমনি মুছে দিয়ে যাবে তাদের রক্তাক্ত বেদনা, তাদের স্মৃতি, যারা তাদের প্রিয়জনদের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না এবং পারবেও না, কারণ মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত আর এই ধরণীর বুকে সুদীর্ঘকাল বিচরণ করা আমাদের কারোরই ভাগ্যে নেই।

প্রোখর শামিলের বিধবা বৌ যখন দেখে ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসে তার দেওর

মার্তিন শামিল পোয়াতি বৌকে আদর করছে, ছেলেমেয়েদের কোলে পিঠে তুলে আহ্লাদ করছে, তাদের সবাইকে উপহার দিচ্ছে তখন মেঝের শক্ত মাটিতে সে মাথা খোঁড়ে। মাথা খুঁড়ে মরে সে, মেঝের ওপর পড়ে ছটফট করতে থাকে, আর তাকে ঘিরে একপাল ভেড়ার মতো ঘুরঘুর করতে থাকে তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাদের মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে দেখে কান্না জুড়ে দেয় তারস্বরে।

ওগো নারী, ছেঁড়ো তোমার অঙ্গের শেষ বস্ত্রখণ্ড! এই নিরানন্দ দুর্বিষহ জীবনের ফলে তোমার মাথায় যে সামান্য ক'টি চুল অবশিষ্ট আছে তাও ছিঁড়ে ফেল, কামড়ে কামড়ে তোমার যে ঠোঁট তুমি ক্ষতবিক্ষত করেছ তা কামড়াও, কাজ করে করে তোমার যে দু'হাতে কড়া পড়েছে সেদুটো মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেল, শূন্য ঘরের চৌকাটের কাছে মাটিতে মাথা খুঁড়ে মর! নেই তোমার বাড়ির কর্তা, তোমার স্বামী নেই, নেই তোমার ছেলেমেয়েদের বাপ! আর মনে রেখো, কেউ তোমাকে আদর করবে না, তোমার অনাথ শিশুদেরও না, হাড়ভাঙা খাটুনির হাত থেকে, দারিদ্র্য থেকে কেউ আসবে না তোমাকে উদ্ধার করতে, যখন তুমি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়বে তখন রাতের বেলায় কেউ তোমার মাথাটা বুকে চেপে ধরবে না, একদিন সে যেমন বলত কেউ আর তেমন করে বলবে না, 'কিচ্ছু ভেবো না গো, সব ঠিক হয়ে যাবে!' আর তোমার স্বামী জুটবে না, কারণ খেটে খেটে, অভাবে-অনটনে আর ছেলেমেয়েদের তদ্বির তদারক করে করে তুমি শুকিয়ে গেছ, ফুরিয়ে গেছ। তোমার অর্ধ-উলঙ্গ, শিকনি-পড়া ছেলেমেয়েদের কোন বাপ জুটবে না। হাড়ভাঙা খাটুনিতে হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি নিজে জমি চাষ করবে, জমিতে মই দেবে, ফসল কাটবে, বিদেকাঠি দিয়ে ভারী ভারী গমের আঁটি তুলে গাড়িতে বোঝাই করবে, তখন উপলব্ধি করবে তলপেটে কী যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর ছেঁড়া তেনাকানিতে মুড়ি দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে, তোমার শরীরের সব রক্ত ফুরিয়ে যাবে।

আলেক্সেই বেশ্‌নিয়াকের পুরনো জামাকাপড় হাতড়াতে হাতড়াতে তার মা কাঁদল। চোখের জল তার প্রায় শুকিয়ে গেছে, তবু তিক্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আলেক্সেইয়ের গায়ের শেষ জামাটা মিশ্‌কা কশেভয় নিয়ে এসেছিল। একমাত্র সেটারই ভাঁজে ভাঁজে ছেলের ঘামের গন্ধ লেগে আছে। সেই জামায় মাথা গুঁজে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বুড়ি মা আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগল, ট্রেড মার্ক লেগে থাকা নোংরা জামাটার ওপর চোখের জলের নক্সা এঁকে দিল।

মানিৎস্‌কোভ, আফোন্‌কা ওজেরভ, ইয়েভ্‌লাম্পি কালিনিন, লিখভিদভ, ইয়েরমাকোভ এবং আরও অনেকের পরিবার অনাথ হয়ে গেল।

একমাত্র স্তেপান আস্তাখভের জন্যই কেউ কাঁদল না – কাঁদার কেউ ছিল না। যাবার আগে বাড়িঘরের দরজা যেমন বাইরে তক্তা লাগিয়ে পেরেক দিয়ে এঁটে গিয়েছিল সেই ভাবেই পড়ে রইল আধা ধসে পড়া তার খালি বাড়িটা। গ্রীষ্মকালেও কেমন যেন থমথমে। আক্সিনিয়া ইয়াগদ্‌নোয়েতে থাকে, গ্রামে তার কথা খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়, তাছাড়া গ্রামে সে একবারও পা মাড়ায় নি, সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে জানারও কোন আগ্রহ নেই তার।

দনের উজান এলাকার বিভিন্ন জেলার কসাকরা যে যে গ্রাম থেকে গিয়েছিল সেই অনুযায়ী একের পর এক দল বেঁধে ফিরে আসতে লাগল। ডিসেম্বরের মধ্যে ভিওশেনস্কায়া জেলার প্রায় সব ফ্রন্ট-সৈনিক ফিরে এলো তাদের গ্রামগুলোতে।

দিন নেই রাত নেই তাতারস্কি গ্রামের ভেতর দিয়ে দশ থেকে চল্লিশজন ঘোড়সওয়ারের একেকটি দল এগোতে থাকে দনের বাম তীর লক্ষ্য করে।

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে সেপাইরা?' বুড়োরা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে।

'চোর্নায়া রেচ্‌কা থেকে।'

'জিমোভ্‌নি থেকে।'

'দুব্রোভ্‌কা থেকে।'

'রেশেতোভ্‌স্কি থেকে।'

'দুদারেভ্‌কা থেকে।'

'গরোখোভ্‌কা থেকে।'

'আলিমোভ্‌কা থেকে।'

এই রকম সব উত্তর আসে।

'লড়াই করার সাধ মিটে গেল বুঝি?' বুড়োরা খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে।

কোন কোন ফ্রন্ট-সৈনিক, যারা একটু বিবেকবান ও শান্ত প্রকৃতির, হেসে উত্তর দেয়:

'যথেষ্ট হয়েছে বুড়ো কত্তা! লড়াই করার সাধ আর নেই আমাদের।'

'দরকার পড়েছে গো, বাড়ি চলেছি।'

কিন্তু যারা একটু বেপরোয়া আর রাগী গোছের তারা মুখ খারাপ করে, বুড়োদের উপদেশ দিয়ে বলে:

'একবার গিয়ে দেখ দিকি বুড়ো! তোমার লেজ কেউ মাড়ায় নি কিনা!'

'অত জিজ্ঞেসবাদ কেন? কী চাই তোমার?'

'তোমাদের মতো গুজগুজ ফুসফুস করার লোক এখানে অনেক!'

শীতের শেষেই নোভোচের্‌কাস্‌স্কের কাছাকাছি গৃহযুদ্ধের সূচনা দেখা দিল। কিন্তু দনের উজানের গ্রাম আর জেলা সদরগুলোতে তখনও বিরাজ করছে কবরের

নিস্তব্ধতা। শুধু ঘরে ঘরে চলতে লাগল গোপন পারিবারিক কোন্দল, কখন-সখন তা প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল বাইরে। ফ্রন্ট থেকে যারা ফিরে এসেছে তাদের সঙ্গে বুড়োদের আর বনে না।

দন সেনাবাহিনী বিভাগের সদরে যে তুমুল লড়াই চলছে সে সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় শুধু কানাঘুষায়। নানা ধরনের যে সমস্ত রাজনৈতিক ধারা দেখা দিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আবছা আবছা ধারণা নিয়ে লোকে মন দিয়ে সব শোনে, ঘটনার গতিবিধি লক্ষ করতে থাকে।

জানুয়ারী পর্যন্ত তাতার্স্কি গ্রামেরও জীবনযাত্রা চলল শান্ত গতিতে। যে সমস্ত কসাক ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসেছে তারা বৌদের পাশে বসে সময় কাটায়, পেট পুরে খাওয়াদাওয়া করে। গত যুদ্ধের সময় যে প্রচণ্ড দুঃখবেদনার গুরুভার তাদের বইতে হয়েছিল তার চেয়েও বড় বিপদ যে তাদের দোর গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে সেটা তারা টেরই পেল না।

দুই

যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রিগোরি মেলেখভ কর্ণেট পদে উঠল, দু'নম্বর সংরক্ষিত রেজিমেন্টের ট্রুপ-অফিসার হল সে।

সেপ্টেম্বর মাসে, নিউমোনিয়া থেকে সেরে ওঠার পর সে ছুটি পেয়েছিল। দেড় মাস বাড়িতে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর জেলার চিকিৎসা কমিশন তাকে কাজের উপযোগী বলে ঘোষণা করল। তাকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হল রেজিমেন্টে। অক্টোবরের বৈপ্লবিক ঘটনার পর সে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের পদ পেল। চারপাশের ঘটনাবলী থেকে এবং অংশত রেজিমেন্টের একজন অফিসার - ইয়েফিম ইজ্‌ভারিন নামে এক লেফ্‌টেনান্টের প্রভাবে তার মনোভাবের যে গভীর পরিবর্তন দেখা যায়, এই সময় থেকেই সেটা হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

ছুটি থেকে ফিরে আসার প্রথম দিনেই ইজ্‌ভারিনের সঙ্গে গ্রিগোরির পরিচয়। তার পর থেকে কাজের সময় এবং কাজের পরেও অনবরত তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। দেখতে দেখতে নিজের অলক্ষ্যে গ্রিগোরি তার প্রভাবে পড়ে গেল।

ইয়েফিম ইজ্‌ভারিন ছিল গুন্দোরোভ্‌স্কায়া জেলা সদরের এক অবস্থাপন্ন কসাক পরিবারের ছেলে। নোভোচের্‌কাস্‌স্কের ক্যাডেট কলেজে তার শিক্ষা। কলেজের শিক্ষাপর্ব শেষ হলে ফ্রন্টে ১০ নম্বর দন কসাক রেজিমেন্টে সে যোগ দেয়। সেখানে বছরখানেক কাজ করে। সেখানে থাকার সময়ই, তার নিজের কথায়,

'বুকে অফিসারের সেন্ট জর্জ ক্রস আর শরীরের নানা স্থানে অস্থানে হাত বোমার চৌদ্দটা ভাঙা টুকরো' সে পেয়েছিল। অতঃপর পল্টনে নাতিদীর্ঘ কর্মজীবন সমাপ্ত করার জন্য তাকে বদলি করা হয় দু'নম্বর সংরক্ষিত রেজিমেণ্টে।

বহু গুণের অধিকারী আর নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ছিল ইজ্‌ভারিন। তার শিক্ষার মান এত উঁচুতে ছিল যে তখনকার দিনের কসাক অফিসারসম্প্রদায় সচরাচর সে পর্যায়ে পৌঁছুতেই পারত না। কসাকদের স্বায়ত্বশাসনের উগ্র সমর্থক সে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব তাকে নাড়া দিয়েছিল, তাকে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ মতবাদের সমর্থক কসাক মহলগুলোর সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখত। কসাকরা জারের স্বৈরতন্ত্রের পদানত হওয়ার আগে দন অঞ্চলে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দন সেনাবাহিনী বিভাগভুক্ত এলাকার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য কৌশলে প্রচার-আন্দোলন চালাত সে। ইতিহাসে তার অগাধ জ্ঞান ছিল, অতিরিক্ত উৎসাহী হলেও স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিল সে। যখন কসাক শাসনপরিষদ দেশ শাসন করবে, যখন তাদের বিভাগের ত্রিসীমানায় একটিও রুশ থাকবে না এবং কসাকরা তাদের রাজ্যের সীমান্তে সীমান্ত ঘাঁটি বসানোর অধিকারী হয়ে আভূমি নত না হয়ে যখন ইউক্রেন ও মহারাশিয়ার সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলবে, তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যবিনিময় করবে – জন্মভূমি দন অঞ্চলের সেই স্বাধীন মুক্ত ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র অপূর্ব প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে বর্ণনা করতে পারত। সরলমতি কসাক আর স্বল্পশিক্ষিত অফিসারদের মাথা ঘুরিয়ে দিল ইজ্‌ভারিন।

গ্রিগোরিও তার প্রভাবে পড়ল। প্রথম দিকে ওদের মধ্যে তুমুল তর্ক চলত, কিন্তু প্রতিপক্ষের তুলনায় অর্ধশিক্ষিত গ্রিগোরিকে নেহাৎই অস্ত্রহীন বলা যায়, তাই বাগ্‌যুদ্ধে ইজ্‌ভারিন সহজেই জিতে যেত। তর্কবিতর্ক সচরাচর চলত ব্যারাকের কোন এক কোণে, শ্রোতাদের সহানুভূতি কিন্তু সব সময়ই যেত ইজ্‌ভারিনের পক্ষে। যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে ভবিষ্যৎ স্বাধীন জীবনের যে ছবি সে আঁকত তা কসাকদের মনে রেখাপাত করত – দনের ভাটি অঞ্চলের অবস্থাপন্ন কসাকদের অধিকাংশের সযত্নলালিত গভীর অনুভূতিকে নাড়া দিত।

'কিন্তু রাশিয়াকে ছাড়া আমরা বাঁচব কী করে? গম ছাড়া যে আমাদের কিছুই নেই!' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করত।

ইজ্‌ভারিন ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করত।

'একমাত্র দন এলাকারই স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা আমি ভাবছি না। ফেডারেশনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সম্মিলনের ভিত্তিতে আমরা কুবান আর তেরেক

এবং ককেশাসের পাহাড়ীদের সঙ্গে মিলে বাঁচব। ককেশাসে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে, সেখানে আমরা সব পাব।'

'কিন্তু কয়লা?'

'আমাদের হাতের কাছেই আছে দনেৎস্ক খনি-অঞ্চল।'

'কিন্তু তা ত রাশিয়ার!'

'কে তার মালিক এবং কার সীমানায় জায়গাটা আছে সেটা এখনও তর্কের বিষয়। কিন্তু দনেৎস্কের খনি-অঞ্চল যদি রাশিয়ার ভাগে চলেও যায় তবু আমরা খুব কমই হারাব। আমাদের ফেডারেটিভ ইউনিয়ন কলকারখানার ভিত্তিতে হবে না। আমাদের দেশ চরিত্রগত ভাবে কৃষিভিত্তিক। তাই আমাদের ছোট ছোট কলকারখানার চাহিদা মেটাতে আমরা রাশিয়ার কাছ থেকে কয়লা কিনব। শুধু কয়লাই বা বলি কেন, আরও অনেক কিছু আমাদের কিনতে হবে রাশিয়ার কাছ থেকে – কাঠ, ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র আরও কত কি। তার বদলে আমরা রাশিয়াকে দেব খুব ভালো জাতের গম আর তেল।'

'কিন্তু আলাদা হয়ে আমাদের লাভ কী?'

'লাভ হবে সরাসরি। সবচেয়ে বড় কথা আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বাবধান থেকে রেহাই পাব, রাশিয়ার জারেরা আমাদের যে সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে সেগুলোকে আবার চালু করব, যে-সব বিদেশী এখানে এসে বসবাস করছে তাদের হটাব। দশ বছরের মধ্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করে আমাদের অর্থনীতিকে এতটা উন্নত করে তুলব যে আমরা দশগুণ ধনী হয়ে উঠব। এই দেশ আমাদের – আমাদের পিতৃপুরুষদের রক্তে সুজলা এর মাটি, তাদের হাড়ে এর সার হয়েছে; কিন্তু আমরা রাশিয়ার অধীনে এসে চারশ' বছর হল তারই স্বার্থ রক্ষা করা আসছি। আমাদের সমুদ্রে বেরুবার পথ আছে। আমাদের সেনাবাহিনী হবে অতি শক্তিমান, তার লড়াইয়ের ক্ষমতা হবে অসাধারণ। শুধু ইউক্রেন কেন রাশিয়াও সাহস পাবে না আমাদের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলতে!'

মাঝারি আকারের, সুন্দর গড়ন, চওড়া কাঁধ ইজ্‌ভারিন ছিল একজন খাঁটি কসাক: সবে পাক ধরা যইয়ের মতো হলদে ছাঁটের ঢেউ খেলানো চুল, তামাটে মুখ, সাদা রঙের গড়ানে কপাল, শুধু গালে আর সাদাটে ভুরুর খানিকটা উঁচুতে পাশ বরাবর চলে গেছে রোদে পোড়া দাগ। কণ্ঠস্বরটা তার উঁচু, মাজাঘষা, সংযত। কথা বলতে বলতে বাঁ ভুরুটা ভীষণ ভাবে ওপরে ওঠানোর এবং ছোট্ট বাঁকা নাকটা এমন অদ্ভুত ভাবে কোঁচকানোর অভ্যাস তার ছিল যে দেখলে মনে হত বুঝি সব সময় কিছু একটা শুঁকছে। তার পা ফেলার দৃপ্ত ভঙ্গি, আচার-আচরণে গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং খয়েরি রঙের চোখের অকপট দৃষ্টি – সব মিলে সে ছিল

রেজিমেন্টের অন্যান্য অফিসারদের থেকে স্বতন্ত্র। কসাকরা তাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করত - এমনকি সম্ভবত রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারের চেয়েও বেশি।

ইজ্‌ভারিন অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগোরির সঙ্গে আলোচনা করত। এই সেদিন যে শক্ত মাটি তার পায়ের তলায় ছিল তা আবার সরে যাচ্ছে উপলব্ধি করে গ্রিগোরির মনে কষ্ট হত - মস্কোয় স্নেগিরিওভের চোখের হাসপাতালে গারান্‌জার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল এ যেন অনেকটা সেই রকম। এই দু'জন লোকের কথাবার্তার তুলনামূলক বিচার করে সত্যটা বার করার চেষ্টা করত সে, কিন্তু পারত না। তবু অসচেতন ভাবে সে নতুন বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে শুরু করল, যে-সব ধ্যানধারণা এতকাল তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে ছিল সেগুলো নতুন ভাবে বিচার করে দেখতে লাগল।

অক্টোবরের বৈপ্লবিক ঘটনার কিছু পর পর একবার ইজ্‌ভারিনের সঙ্গে গ্রিগোরির কথাবার্তা হল। পরস্পরবিরোধী চিন্তার ভারে জর্জরিত গ্রিগোরি বেশ হুঁশিয়ার হয়ে প্রশ্ন করল বলশেভিকদের সম্পর্কে।

'আচ্ছা ইয়েফিম ইভানিচ, বলশেভিকদের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তাদের ভাবনাচিন্তাগুলো কি ঠিক, নাকি ঠিক নয়?'

বাঁ ভুরু নাচিয়ে কোনায় তুলে রসিকতার ছলে নাক কুঁচকে চাপা হাসি হাসল ইজ্‌ভারিন।

'ওদের ভাবনাচিন্তার কথা বলছ? হা-হাঃ! . . . আরে তুমি দেখছি নেহাৎই একটা দুধের বাচ্চা! . . . বলশেভিকদের কর্মসূচী তাদের নিজস্ব, তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা। বলশেভিকরা তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিকই আছে, আমরাও আমাদের দিক থেকে ঠিক। বলশেভিকদের পার্টির আসল নাম কী জান ত? জান না? বল কি! রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি! বুঝলে? শ্র-মিক! এখন ত্যরা কসাক আর চাষীদের সঙ্গে দহরম মহরম করছে, কিন্তু ওদের কাছে আসল হল শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিকদের মুক্তি আনছে তারা, কিন্তু চাষীদের জন্যে নিয়ে আসছে নতুন ধরনের, হয়ত বা আরও খারাপ ধরনের এক দাসত্ব। সবাই সমান ভাগ পাবে জীবনে এ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। বলশেভিকরা যদি কর্তৃত্ব পায় তাহলে শ্রমিকদের ভালো হবে, বাকি সকলের খারাপ হবে। যদি রাজতন্ত্র ফিরে আসে তাহলে জমিদার বা তাদের মতো লোকজনের ভালো হবে, বাকিদের খারাপ হবে। এর কোনটাই আমরা চাই নে। আমাদের যা দরকার তা হল আমাদের নিজস্ব জিনিস, আর সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত রকম অভিভাবকের হাত থেকে রেহাই পাওয়া - তা সে কর্নিলভ হোক, কেরেন্‌স্কি হোক, আর লেনিনই হোক। নিজেদের দেশের মাটিতে এই সব

হোমরা-চোমরা লোকজন ছাড়াও আমাদের চলে যাবে। ভগবান আমাদের বন্ধুদের হাত থেকে রেহাই দিন, শত্রুর মোকাবিলা আমরা নিজেরাই করতে পারব।'

'কিন্তু বেশির ভাগ কসাকই বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকছে... তা জান?'

'গ্রিশা, ওগো বন্ধু, আসল জিনিসটা বোঝার চেষ্টা কর: এখন, এই মুহূর্তে কসাক আর চাষীদের পথ ওই বলশেভিকদেরই পথ। কেন, জান?'

'কেন?'

'কারণ এই যে...' ইজ্‌ভারিন নাকটা এমন ভাবে কোঁচকাল যে সেটা পাকিয়ে গোল হয়ে গেল, তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'কারণ এই যে বলশেভিকরা শান্তি চায়, এক্ষুনি শান্তি চায় তারা, আর লড়াই বসে আছে কসাকদের এই এখানে!' এই বলে সে নিজের রোদে পোড়া শক্ত ঘাড়ে দড়াম করে একটা চাপড় মারল। অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে তার ভুরুটা সেই যে উঠে গিয়েছিল সেটাকে সোজা করে এখন সে চেঁচিয়ে বলল, 'এই কারণেই কসাকদের গায়ে বলশেভিকবাদের গন্ধ, তারা বলশেভিকদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে।... কিন্তু... কিন্তু যে মুহূর্তে লড়াই শেষ হবে আর বলশেভিকরা কসাকদের ভূসম্পত্তির দিকে হাত বাড়াবে তখনই কসাক আর বলশেভিকদের পথ আলাদা হয়ে যাবে। এটা অমূলক নয় – এ হল এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা! কসাকদের জীবনযাত্রার বর্তমান বিধিব্যবস্থা আর সমাজতন্ত্র – বলশেভিক বিপ্লবের শেষ পরিণতি – এ দুয়ের মাঝখানে এক দুস্তর খাদের ব্যবধান।...'

'আমি বলছিলাম কি...' অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে গ্রিগোরি বলল, 'কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার... এর মাথামুণ্ডু আমার পক্ষে বোঝা মুশ্‌কিল।... ফাঁকা স্তেপের বুকে বরফ-ঝড়ের মধ্যে পড়ে আমি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।...'

'তা বলে ত আর পার পাওয়া যাবে না! জীবন নিজেই তোমাকে বুঝে নিতে বাধ্য করবে। এমনকি জোর করে তোমাকে ঠেলে দেবে, বাধ্য করবে কোন একটা পক্ষ নিতে।'

এই সব কথাবার্তা হয়েছিল অক্টোবরের শেষ দিকে। নভেম্বরেই ঘটনাচক্রে গ্রিগোরির দেখা হয়ে গেল আরও এক কসাকের সঙ্গে, দনের বিপ্লবের ইতিহাসে যার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। যার সঙ্গে গ্রিগোরির দেখা সে হল ফিওদর পদ্‌তিওল্‌কভ। অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর গ্রিগোরির মনের ভেতরে আবার সেই আগের সত্যের পাল্লা ভারী হয়ে দেখা দিল।

সেই দিন দুপুর থেকে ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধ্যার আগে আগে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ২৮ নম্বর রেজিমেন্টের জুনিয়র কর্ণেট দ্রজ্‌দোভের আস্তানায় যাবে বলে ঠিক করল গ্রিগোরি। দ্রজ্‌দোভ তাদেরই জেলার

লোক। মিনিট পনেরো পরেই দ্রজ্‌দোভের বাসার দরজার সামনে গ্রিগোরি এসে দাঁড়াল। পাপোষে জুতো মুছে দরজায় টোকা মারল। ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা কিছু রোগা রোগা পাতাবাহার গাছ আর রঙ চটা আসবাবপত্র। গৃহস্বামী ছাড়াও সেখানে জানলার দিকে পিঠ করে অফিসারের ক্যাম্পখাটের ওপর বসে আছে আরেকজন লোক। বেশ স্বাস্থ্যবান, শক্তসমর্থ চেহারার এক কসাক, কাঁধপটি থেকে বোঝা গেল গোলন্দাজ রক্ষিদলের সার্জেণ্ট-মেজর। লোকটা বসে আছে কুঁজো হয়ে, কালো বনাত কাপড়ের সালোয়ার পরা, পাদুটো অনেকখানি ফাঁক করা। গোলাকার চওড়া দুই হাঁটুর ওপর বাদামী লোমে ভর্তি সেই রকমই চওড়া দুটো হাত রাখা। গায়ের ফৌজী শার্টটা আঁটসাঁট হয়ে তার পাঁজরার দু'পাশে লেপ্‌টে আছে, বগলের কাছটায় কুঁচকে আছে, চওড়া উঁচু বুকের ওপর প্রায় ফেটে যাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দ হতেই সে হৃষ্টপুষ্ট খাটো ঘাড়টা ফেরাল, হিমকঠিন দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকাল, তারপর ফোলা ফোলা চোখের পাতার নীচে, সরু কোটরের ভেতরে চোখের তারার সেই হিমেল আলো চাপা দিয়ে ফেলল।

'এই যে আলাপ করিয়ে দিই। গ্রিশা, একে আমাদের প্রায় পড়শীই বলতে পার – উস্ত্-খোপিওর্‌স্কায়ার লোক – পদ্‌তিওল্‌কভ।'

গ্রিগোরি আর পদ্‌তিওল্‌কভ নিঃশব্দে করমর্দন করল। গ্রিগোরি বসে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসল: 'জুতোর কাদায় ঘরের মেঝেটা বোধহয় নোংরা করে দিলাম – গালাগাল দিও না ভাই।'

'না, না, ও কিছু নয়। বাড়িউলি মুছে দেবে 'খন। . . . চা খাবে ত?'

বেঁটেখাটো গড়নের, চটপটে দ্রজ্‌দোভ সঙ্গে সঙ্গে তামাকের ধোঁয়ায় তামাটে আঙুল দিয়ে খুট করে সামোভারের ঢাকনা খুলল, আক্ষেপের সুরে বলল, 'ঠাণ্ডা চা খেতে হবে কিন্তু।'

'চায়ের দরকার নেই। ব্যস্ত হতে হবে না।'

পদ্‌তিওল্‌কভকে সিগারেট দিতে গেল গ্রিগোরি। সিগারেট-কেসের ভেতরে ঘন ঠাসাঠাসি সাদা সিগারেটের সারি। সেখান থেকে পুরুষ্টু লাল আঙুল দিয়ে সিগারেট টেনে বার করতে বেগ পেতে হল পদ্‌তিওল্‌কভ্‌কে। বিব্রত বোধ করল সে। তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কিছুতেই ধরতে পারছি নে। . . . ধুত্তোর ছাই!'

শেষকালে একটা সিগারেট বার করতে পেরে আধখানা চোখ বুজে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে হাসল, তাতে তার চোখদুটো আরও সরু দেখাল। লোকটার সহজ-সরল ভাবটা গ্রিগোরির ভালো লাগল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ গাঁয়ে বাড়ি?'

'আমার জন্ম আসলে ক্রুতোভ্‌স্কিতে,' সোৎসাহে বলল পদ্‌তিওল্‌কভ। 'সেখানেই

বড় হয়ে উঠেছি। তবে পরের দিকে থাকতাম উস্ত্-কালিনোভ্স্কিতে। ক্রুতোভ্স্কি জানেন ত – নাম শুনেছ নিশ্চয় ? ইয়েলান্স্কায়ার সীমান্তের প্রায় পাশে। প্লেশাকোভ্স্কি গ্রাম জান ? বেশ, তার পরে মাত্ভেইয়েভ্স্কি, আর আমাদের জেলার ঠিক পাশে হল তিউকোভ্নভ্স্কি গ্রাম, আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পড়বে আমাদের ক্রুতোভ্স্কি গ্রাম – তার উজানের আর ভাটির এলাকা – যেখানে আমার জন্ম।'

সর্বক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে গ্রিগোরিকে সে কখনও 'তুমি' কখনও বা 'আপনি' সম্বোধন করে যাচ্ছিল। কথা সে বলছিল স্বচ্ছন্দ গতিতে। এমনকি একবার বেশ সহজ হয়ে গিয়ে তার ভারী হাতখানা দিয়ে বন্ধু ভাবে গ্রিগোরির কাঁধ স্পর্শ করল। সামান্য বসন্তের দাগধরা, নিখুঁত কামানো তার বিরাট মুখের ওপর জ্বলজ্বল করছে সযত্নে পাকানো একজোড়া গোঁফ। জল ভিজিয়ে পাট করে আঁচড়ানো তার চুলগুলো ছোট ছোট দুই কানের কাছে ফাঁপিয়ে তোলা, বাঁ পাশে খানিকটা কোঁকড়া হয়ে ঝুলে আছে। একটু ওপরের দিকে তোলা প্রকাণ্ড নাকটা আর চোখদুটো বাদ দিলে তার চেহারা লোকের মনে মধুর ছাপ ফেলতে পারত। প্রথম দৃষ্টিতে, তার চোখের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখা যায় না, কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখার পর গ্রিগোরির মনে হল সেগুলো যেন সীসের মতো ভারী। সরু সরু কোটরের ভেতরে ভাঁটার মতো চকচক করছে ছোট দুটো চোখ, দেখে মনে হয় যেন কামান ছোঁড়ার ফোকর থেকে বেরিয়ে আছে, সামনাসামনি কোন চোখের দৃষ্টি পড়লে তাকে ধরাশায়ী করছে, ভীষণ গোঁয়ার্তুমি করে এক জায়গায় বিঁধে আছে।

গ্রিগোরি কৌতূহল ভরে তাকে লক্ষ করতে লাগল। একটা বৈশিষ্ট্য তার নজরে পড়ল। পদ্তিওল্কভের চোখের পলক প্রায় পড়ে না। কথা বলার সময় তার নিরানন্দ দৃষ্টি শ্রোতার মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ হয়ে থাকছিল, নয়ত একটা কিছু থেকে আরেকটার ওপর সরে সরে যাচ্ছিল; কিন্তু তার চোখের পাতার রোদে-পোড়া ছোট ছোট পালকগুলো সব সময় নত, স্থির হয়ে রইল। কেবল কদাচিৎ চোখের ফোলাফোলা পাতাদুটো নামিয়ে পরক্ষণেই ঝাঁকানি দিয়ে ওপরে তুলছিল, লক্ষ্য স্থির করে ভাঁটার মতো চোখজোড়া চারপাশের সমস্ত কিছুর ওপর বুলিয়ে নিচ্ছিল।

'বেশ মজার ব্যাপার কিন্তু ভাই!' গ্রিগোরি তার বন্ধু ও পদ্তিওল্কভকে বলল। 'লড়াই শেষ হলে আমাদের এক নতুন ধরনের জীবন শুরু হবে। ইউক্রেনে সরকার চালাবে 'রাদা'* আর আমাদের এখানে সরকার চালাবে 'কসাক ফৌজী কাউন্সিল'**।'

---

* ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি জায়গার বিধানসভার ঐতিহাসিক নাম। – অনুঃ

** ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে দন, ভোল্গা প্রভৃতি অঞ্চলের কসাকদের সাধারণ ফৌজী পরিষদ। সর্বোচ্চ শাসনসংস্থা। এই সংস্থা কর্তাব্যক্তিদের নির্বাচন করত। – অনুঃ

'তার চেয়ে বল না কেন, আতামান কালেদিন,' অর্ধস্ফুটস্বরে তাকে সংশোধন করে দিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল।

'ওই একই হল। তফাতটা কিসের?'

'তফাত ত নেই-ই,' পদ্‌তিওল্‌কভ স্বীকার করল।

'জননী রাশিয়ার চরণে শতকোটি প্রণাম – তাকে আমরা এখন বিদায় জানাচ্ছি,' ইজ্‌ভারিনের বক্তৃতার পুনরুক্তি করে বলে চলল গ্রিগোরি। এই ধরনের কথা দ্রজ্‌দোভ আর গোলন্দাজ রক্ষিবাহিনীর এই জোয়ান লোকটার ওপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে জানার কৌতূহল হল তার। 'নিজেদের সরকার, নিজেদের বিধিব্যবস্থা, কসাকদের দেশ থেকে ইউক্রেনীয় ঝোঁটন সব হটাও! আমরা সীমান্ত জুড়ে ঘাঁটি বসাব – আর ঘেঁসতে হবে না! আগেকার দিনে আমাদের পিতৃপুরুষরা যেমন জীবন কাটাত আমরাও তেমনি কাটাব। আমার মনে হয় বিপ্লব আমাদের ভালোই করবে। তোমার কী মনে হয় দ্রজ্‌দোভ?'

বন্ধু দ্রুত শরীরটা ঝাঁকিয়ে একটা পাক খেয়ে হাসল।

'ভালো ত করবেই, অবশ্যই করবে! চাষাগুলো আমাদের শক্তি নিংড়ে নিত, ওদের জ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ। তাছাড়া এসব কসাক সর্দার-টর্দার – এরা ছাই সবই ত দেখছি কোথাকার জার্মান লোকজন – ফন্‌ টাউবে, ফন্‌ গ্রাব্‌বে এই রকম আরও কত যে নাম! সব জমি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এই স্টাফ-অফিসারদের মধ্যে। . . . এখন অন্তত কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার সময় মিলবে।'

'কিন্তু রাশিয়া? রাশিয়া কি সেটা মেনে নেবে?' বিশেষ ভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না করে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল পদ্‌তিওল্‌কভ।

'মেনে নিতেই হবে,' আশ্বাসের ভঙ্গিতে গ্রিগোরি বলল।

'হবে সেই একই ব্যাপার। . . . সেই পুরনো কাসুন্দী – কেবল একটু বেশি জলো এই যা।'

'তার মানে?'

'মানে ত পরিষ্কার।' পদ্‌তিওল্‌কভ তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো দ্রুত ঘুরিয়ে নিল, ভীষণ কটাক্ষ হেনে ভারী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল গ্রিগোরির দিকে। 'আতামানরা আগের মতোই সাধারণ লোকজনের ওপর, খেটেখাওয়া মানুষদের ওপর অত্যাচার করবে। 'জি হুজুর' বলে ওদের কাছে গিয়ে ধরনা দাও, আর ওরা তোমাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় করুক। বলিহারি . . . কী চমৎকার জীবন! . . . তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মর!'

গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াল। ঘুপচি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে গিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভের ছড়ানো দুই পায়ের হাঁটুতে কয়েকবার তার গা লেগে গেল। শেষকালে

পদ্‌তিওল্‌কভের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কী করা উচিত?'

'শেষ পর্যন্ত যেতে হবে।'

'কতদূর পর্যন্ত?'

'শুরু যখন একবার করে দিয়েছ তখন শেষ পর্যন্ত লাঙল টানতে হয়। একবার যখন জার আর প্রতিবিপ্লবকে হটানো গেছে তখন সরকার যাতে জনগণের হাতে আসে তার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। এছাড়া অন্য যা কথা সে হল ছেলেভুলানো গল্প। পুরনো আমলে আমাদের দাবিয়ে রাখত জারেরা, এখন জারেরা নয়, আমাদের পিষে মারার মতো আরও অনেকে আছে। আমাদের নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়বে! . . .'

'তাহলে তুমি কী বল পদ্‌তিওল্‌কভ?'

যেন খানিকটা ফাঁকা জায়গার সন্ধানে ভাঁটার মতো চোখের ভারী দৃষ্টি ওপরে উঠে আবার ছুটে বেড়াতে লাগল ঘুপচি ঘরটার মধ্যে।

'সাধারণ মানুষের সরকার . . . বেছে নেওয়া সরকার। জেনারেলদের খপ্পরে পড়লে আবার লড়াই হবে, সেটা হবে আমাদের বাড়তি ঝক্কি। চারদিকে, সারা দুনিয়া জুড়ে যদি এমন সরকার গড়ে তোলা যেত যাতে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার না হয়, তাদের ঠেলে লড়াইয়ে নামানো না হয়! নইলে আর কী হল? ছেঁড়া সালোয়ার যত উলটেই পর না কেন, ফুটো যেমনকার তেমন থেকে যায়?' দুই হাঁটুর ওপর ধপাধপ হাতের চাপড় মেরে ঘন সাজানো অসংখ্য খুদে খুদে দাঁতের সারি বার করে ক্রুদ্ধ হাসি হাসল পদ্‌তিওল্‌কভ। 'পুরনো আমল-টামল থেকে একটু দূরে দূরে থাকাই আমাদের ভালো, নইলে ওরা এমন জোয়াল চাপাবে আমাদের ঘাড়ে যে জারের আমলের চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে।'

যেন কোন হাত-ছাড়া জিনিস ধরার চেষ্টায় শূন্যে মুঠি পাকাল গ্রিগোরি, তার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এলো।

'আমাদের কি জমি ছেড়ে দিতে হবে? সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে?'

'না . . . তা কেন হবে?' পদ্‌তিওল্‌কভ বিব্রত হয়ে পড়ল, তাকে যেন বিভ্রান্তই দেখা গেল। 'জমি আমরা ছেড়ে দেব না। আমরা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করব, কসাকদের মধ্যে ভাগ করব; জমিদারদের কাছ থেকে জমি আমরা নিয়ে নেব। কিন্তু চাষীদের আমরা কোন জমি দিতে পারব না। একবার যদি ওদের মধ্যে ভাগ করতে শুরু করি তাহলে আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে দেবে।'

'কিন্তু আমাদের সরকার চালাবে কে?'

'আমরা নিজেরাই চালাব!' উৎসাহিত হয়ে উঠল পদ্‌তিওল্‌কভ। 'আমরা

ক্ষমতা দখল করে নেব – সেটাই হবে আমাদের সরকার। ওদের জিনের বাঁধনগুলো একটু আলগা হোক না – কালেদিনদের ফেলে দিতে কতক্ষণ।'

জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রিগোরি। হিমে শার্সিতে বরফ জমেছে। গ্রিগোরি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে লাগল। দেখল কতকগুলো ছোট ছোট বাচ্চা কী এক মজার খেলায় মেতে উঠেছে; উল্‌টো দিকের বাড়িগুলোর ভিজে ছাদ আর বাগানের পপ্‌লার গাছের বিবর্ণ ধূসর ডালপালার ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। দ্রজ্‌দোভ আর পদ্‌তিওল্‌কভের যে তর্ক চলতে লাগল তার খেই সে হারিয়ে ফেলল, সেদিকে সে কান দিল না। মাথার ভেতরে চিন্তার যে জট পাকিয়ে গেছে সেটা ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, চেষ্টা করল কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার।

মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইল সে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানলার কাচে চুপচাপ আঁকিবুকি কেটে চলল। বাইরে একটা নীচু বাড়ির ছাদের মাথায় আসন্ন শীতের সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ধিকি ধিকি জ্বলছে তার ম্লান আলো। মরচে-ধরা টিনের ছাদের চুড়োয় খাঁজের মধ্যে যেন আটকে আছে একটা রক্তিম ভিজে গোলা, যেন যে-কোন মুহূর্তে ওটা খসে পড়তে পারে, গড়িয়ে পড়তে পারে ছাদের যে-কোন দিকে। শহরের বাগান থেকে বৃষ্টির ছাটে ঝরে-পড়া পাতাগুলো সরসর শব্দে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটছে, ইউক্রেনের লুগান্‌স্ক থেকে বাতাস জোরাল হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর দস্যুদলের মতো বারবার হানা দিচ্ছে কসাক বসতিগুলোর ওপর।

তিন

বলশেভিক বিপ্লবের ভয়ে যারা পালিয়েছিল তাদের সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল নোভোচের্‌কাস্‌স্ক। আজকের বিধ্বস্ত রুশ সেনাবাহিনীর এককালে যারা ছিল ভাগ্যবিধাতা সেই সমস্ত হোমরা-চোমরা জেনারেলরা প্রতিক্রিয়াশীল দন-কসাকদের সমর্থন লাভের আশায় এবং এই পাদভূমি থেকে রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ গড়ে তোলা ও বিস্তারের মতলব নিয়ে দনের ভাটি অঞ্চলে স্রোতের মতো গড়িয়ে চলল।

২ নভেম্বর কোম্পানি-ক্যাপ্টেন শাপ্রনের সঙ্গে নোভোচের্‌কাস্‌স্কে এসে হাজির হল জেনারেল আলেক্সেয়েভ। কালেদিনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী সংগঠনের কাজে লেগে গেল। অফিসার, শিক্ষানবিশ অফিসার, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময়কার আক্রমণাত্মক জঙ্গী বাহিনীর লোকজন, বিভিন্ন শিক্ষায়তনের

ছাত্র, আর্মির বিভিন্ন ইউনিটের শ্রেণীচ্যুত সাধারণ সৈনিক – যারা যারা উত্তর থেকে পালিয়ে এসেছিল তারা, সেই সঙ্গে কসাকদের মধ্যকার সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিক্রিয়াশীলরা এবং স্রেফ যারা রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার আর মোটা মাইনের খোঁজে থাকে – এমনকি কেরেনস্কির নোটে হলেও – এরাই হল ভবিষ্যৎ স্বেচ্ছাবাহিনীর মেরুদণ্ড।

নভেম্বরের শেষ দিকে এলো দেনিকিন, লুকোম্‌স্কি, মার্কভ ও এর্দেলি – এই ক'জন জেনারেল। ইতিমধ্যে আলেক্সেয়েভের বাহিনীগুলো এক হাজারের বেশি বেয়নেট নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে।

৬ ডিসেম্বর নোভোচের্‌কাস্‌স্কে আগমন ঘটল কর্নিলভের। পথে তেকিন-রক্ষীদের ছেড়ে আসতে হয়েছে তাকে, ছদ্মবেশে এসে ঢুকেছে দন-অঞ্চলের সীমান্তে।

রুমানীয় ও অস্ট্রো-জার্মান ফ্রন্টে যে-সব কসাক রেজিমেন্ট ছিল, কালেদিন ইতিমধ্যে সেখান থেকে তাদের প্রায় সবগুলোকে দন-অঞ্চলে সরিয়ে এনে নোভোচের্‌কাস্‌স্ক – চের্তকোভো – রস্তোভ – তিখোরেত্‌স্কায়া রেললাইন বরাবর ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তিন বছরের যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত কসাকরা বিপ্লবী মেজাজ নিয়ে ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসার পর বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিশেষ কোন চাড় দেখাল না। রেজিমেন্টগুলোতে যত সংখ্যক ঘোড়সওয়ার থাকা স্বাভাবিক তার তিন ভাগের এক ভাগও অবশিষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। তাদেরই মধ্যে মোটামুটি যেগুলো অটুট – ২৭ নম্বর, ৪৪ নম্বর ও ২ নম্বর সংরক্ষিত রেজিমেন্ট – অবস্থান করছিল কামেন্‌স্কায়া জেলা সদরে। এক সময় পেত্রোগ্রাদ থেকে আতামান রক্ষিদল আর কসাক রক্ষিদলের রেজিমেন্টগুলোও সেখানেই পাঠানো হয়েছিল। ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসার পর ৫৮, ৫২, ৪৩, ২৮, ১২, ২৯, ৩৫, ১০, ৩৯, ২৩, ৮ ও ১৪ নম্বর রেজিমেন্ট এবং ৬, ৩২, ২৮, ১২ ও ১৩ নম্বর ব্যাটারি চের্তকোভো, মিল্লেরোভো, লিখাইয়া, গ্লুবোকায়া, জ্‌ভেরেভো আর খনি অঞ্চলে আস্তানা নিল। খোপিওর ও উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসা জেলার কসাকদের রেজিমেন্টগুলো ফিলোনোভো, উরিউপিন্‌স্কায়া ও সেব্‌রিয়াকোভোয় এসে হাজির হয়েছিল, কিছু সময় সেখানেই আস্তানা নেওয়ার পর আস্তে আস্তে বসে গেল।

ভিটেমাটি সকলকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। দুর্বার তার আকর্ষণ। এমন কোন শক্তি ছিল না যা ঘরের জন্য কসাকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করতে পারে। দন কসাকদের রেজিমেন্টগুলোর মধ্যে একমাত্র ১, ৪ ও ১৪ নম্বর রেজিমেন্ট ছিল পেত্রোগ্রাদে, তারাও বেশি দিন সেখানে থাকল না।

বিশেষ ভাবে বিশ্বাসের অযোগ্য কোন কোন ইউনিটকে ভেঙে নতুন করে সাজানোর কিংবা অটল বিশ্বস্ত ইউনিটগুলো দিয়ে ঘেরাও করে তাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করল কালেদিন।

নভেম্বরের শেষে কালেদিন যখন ফ্রন্ট-লাইন ইউনিটগুলোকে বিপ্লবী রস্তোভে পাঠানোর প্রথম চেষ্টা করল তখন কসাকরা আক্সাইস্কায়া পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলো, আক্রমণ করতে অস্বীকার করল তারা।

টুকরোটাকরা দলগুলোকে একত্র করে সংগঠনের ব্যাপক প্রয়াসের সুফল দেখা দিল: ইতিমধ্যে আলেক্সেয়েভও কিছু ব্যাটেলিয়ন জুটিয়ে ফেলেছে। নভেম্বরের ২৭ তারিখেই বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাবাহিনীর সাহায্যে এবং আলেক্সেয়েভের কাছ থেকেও কিছু বল ধার নিয়ে অপারেশনে নামার মতো অবস্থায় এসে গেল কালেদিন।

ডিসেম্বরের ২ তারিখে স্বেচ্ছাসেবী ইউনিটগুলো লড়াই করে রস্তোভ দখল করে ফেলল। কর্নিলভের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠনের কেন্দ্র সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কালেদিন একা পড়ে গেল। কসাকদের ইউনিটগুলোকে জেলার সীমান্ত বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে ত্সারিৎসিনোর দিকে এবং সারাতভ প্রদেশের সীমান্ত লক্ষ করে সে এগিয়ে চলল, কিন্তু যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজে শুধু গেরিলা-অফিসার দলগুলোকেই লাগানো হল। সামরিক কর্তৃপক্ষ দিনকে দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে দুর্বল হয়ে আসছিল, একমাত্র ওই ইউনিটগুলোই ছিল তাদের আশা-ভরসাস্থল।

দনেৎস্কের খনিমজুরদের অবদমন করার জন্য সদ্য-রিক্রুট-করা স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের কতকগুলো দল পাঠানো হল। মেজর চের্নেৎসোভ গেল মাকেয়েভ্কা অঞ্চলে, যেখানে ৫৮ নম্বর স্থায়ী কসাক রেজিমেন্টের ইউনিটগুলো অবস্থান করছিল। নোভোচের্কাস্স্কে তাড়াহুড়ো করে গড়ে উঠতে লাগল সেমিলেতভ আর গ্রেকভের বাহিনী এবং বিভিন্ন ভলাণ্টিয়ার দল। উত্তরে খোপিওর জেলায় অফিসার আর গেরিলাদের জুটিয়ে গড়ে তোলা হল তথাকথিত 'স্তেন্কা রাজিন* বাহিনী'। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনদিক থেকে এলাকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল রেড গার্ডরা। আঘাত হানার জন্য খার্কভ আর ভরোনেজে বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটতে লাগল। দনের আকাশে ঝড়ের মেঘ জমল, ঘন কালো হয়ে উঠল সে মেঘ। ইউক্রেনের দিক থেকে ইতিমধ্যেই ভেসে আসতে শুরু করেছে প্রথম সঙ্ঘর্ষের কামানগর্জন। ঘনিয়ে আসছে দুঃসময়।

---

* স্তেন্কা রাজিন – স্তেপান রাজিনের সর্বজন পরিচিত নাম। স্তেপান রাজিন টীকা দ্রঃ। – অনুঃ

চার

হলদে-সাদা মেঘের পুঞ্জ পালতোলা নৌকোর মতো ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে নোভোচের্‌কাস্‌স্কের আকাশে। ক্যাথিড্রালের ঝলমলে গম্বুজের ঠিক ওপরে, ঊর্ধ্ব আকাশের নিঃসীম নীলিমার মধ্যে স্থির হয়ে ঝুলে আছে পালকের মতো নরম, ভেড়ার ছাইরঙা কোঁকড়ানো পশমের মতো মেঘের টুকরো, তার দীর্ঘপুচ্ছটা ঢেউ খেলিয়ে নীচে নেমে এসেছে, ক্রিভিয়ানস্কায়া জেলা সদরের মাথার ওপর কোথায় যেন গোলাপী রুপোলি আভায় ঝলমল করছে।

সূর্য উঠছে। তবে উজ্জ্বল নয়। কিন্তু আতামান ভবনের জানলাগুলো তার ঠিকরে পড়া কিরণে ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলছে। বাড়িঘরের টিনের চাল চকচক করছে। সাইবেরিয়ার রাজমুকুট হাতে উত্তরদিকে বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে ইয়ের্মাকের* ব্রোঞ্জমূর্তি – গতকালের বৃষ্টি জলে এখনও ভিজে ভিজে।

কসাক ঘোড়সওয়ারদের একটা ট্রুপ ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চড়াই বয়ে ওপরে উঠছে। তাদের রাইফেলের বেয়নেটের গায়ে সূর্যের আলো খেলা করছে। ভোরের মোহময় নিস্তব্ধতা – কদাচিৎ দু’-একজন পথচারীর পদশব্দে বা ঘোড়ার গাড়ির চাকার ঘর্ঘর মন্দ্রে ভেঙে যাচ্ছে, কসাকদের হাল্‌কা পায়ের নিখুঁত চলার অস্পষ্টপ্রায় ধ্বনিতে তার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটছে না।

সেইদিন সকালে মস্কোর ট্রেনে নোভোচের্‌কাস্‌স্কে পৌঁছুল ইলিয়া বুন্‌চুক। গায়ের হাল্‌কা পুরনো ওভারকোটটা টেনে ঠিকঠাক করে নিয়ে সবার শেষে সে বেরিয়ে এলো কামরা থেকে। বে-সামরিক পোশাকে অনভ্যাসের দরুন সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল।

প্ল্যাটফর্মে একজন মিলিটারী-পুলিশের লোক আর দুটো কমবয়সী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মেয়েদুটো কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছিল। বুন্‌চুক তার রঙচটা শস্তার স্যুটকেসটা বগলদাবা করে নিয়ে শহরের মুখে হাঁটা দিল। রাস্তার একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এতটা পথ চলার মধ্যে প্রায় একটা লোকও চোখে পড়ল না। আধঘণ্টা হাঁটার পর কোনাকুনি পথে শহর পেরিয়ে বুন্‌চুক এসে দাঁড়াল একটা পড়পড় ছোট বাড়ির সামনে। বাড়িটার অবস্থা শোচনীয়, বহুকাল মেরামত হয় নি। কালের হস্তস্পর্শ পড়েছে তার ওপর, তার ভারে ছাদ বসে গেছে, দেয়াল হেলে পড়েছে, খড়খড়িগুলো ঝুলঝুল করছে, জানলাগুলো পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো বেঁকেচুরে আছে। বুন্‌চুক গেট খুলল, বাড়িটা আর তার সংলগ্ন ছোট্ট সঙ্কীর্ণ উঠানের ওপর সন্ত্রস্ত নজর বুলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি দেউড়ির ধাপের দিকে পা বাড়াল।

---

* কসাক-আতামান ইয়ের্মাক তিমফেইয়েভিচ। ১৫৮১ সাল নাগাদ সাইবেরিয়ায় রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযান চালায়। তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত। বহু লোকগাথা ও সঙ্গীতের চরিত্র। – অনুঃ

বাড়ির ভেতরের সরু গলির অর্ধেকটা জুড়ে আছে রাজ্যের যত টুকিটাকি জিনিসে বোঝাই একটা সিন্দুক। অন্ধকারে তার একটা কোনা দিয়ে হাঁটুতে ধাক্কা খেল বুনচুক, কিন্তু ব্যথাটা তেমন গ্রাহ্য না করে দরজা খুলে ফেলল। সামনের নীচু ঘরটায় কেউ ছিল না। সেটা পার হয়ে পরের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল, সেখানেও কাউকে না দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চৌকাটের ওপর। একটা ভয়ঙ্কর পরিচিত গন্ধ – কেবল এই বাড়িটারই বৈশিষ্ট্য – নাকে যেতে তার মাথা ঘুরতে লাগল। এক নজরে দেখে নিল ঘরের গোটা পরিবেশটা – ভেতরের বড় ঘরের সামনের দিকে এক কোনায় কুলুঙ্গিতে ভারী ভারী বিগ্রহ, খাট, ছোট্ট টেবিল, তার ওপরে ঝুলছে ছোপ ছোপ পুরনো একটা আয়না, কয়েকখানা ফটো, বাঁকানো কাঠের তৈরি কয়েকটা জীর্ণ চেয়ার, সেলাইকল, চুল্লীর ওপরের তাকে একটা সামোভার – বহুকাল ব্যবহারের ফলে গায়ের সেই জৌলুস নেই। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা ভীষণ ধড়াস ধড়াস করতে লাগল – সে মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল, মনে হল যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুনচুক ঘুরে দাঁড়াল, স্যুটকেসটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল। সদ্য রঙ-করা উনুনটার সামনের অংশ ভিটেকপালের মতো উঁচিয়ে আছে, সেটার সবুজ রঙ আগের মতোই তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। নীলরঙের ছিটের পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মারল কটা রঙের বুড়ো বেড়ালটা – তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ প্রায় মানুষের মতো কৌতূহলে ঝকঝক করে উঠল – দেখেই বোঝা যায় এ বাড়িতে আগন্তুক কদাচিৎ আসে। টেবিলের ওপর ডাঁই হয়ে আছে এঁটো থালাবাসন, কাছে একটা ছোট টুলের ওপর পড়ে আছে পশমী সুতোর একটা গুলি, একটা অসমাপ্ত মোজার চার কোনা ভেদ করে চকচক করছে চারটে পশমের কাঁটা।

আট বছরে এখানে কিছুই বদলায় নেই। মনে হয় যেন এই গতকাল বুনচুক বাড়ি ছেড়েছে। সে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরের সিঁড়িতে। উঠোনের শেষ প্রান্তে একটা চালাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধা – বয়সে আর জীবনের দুঃখকষ্টের ভারে কুঁজো, নুয়ে পড়েছে। 'মা। . . . তাই কি? . . . সত্যিই কি মা? . . .' বুনচুকের ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, মাথার টুপি ঝট করে খুলে ফেলে হাতের মুঠোর ভেতরে দলা পাকাতে লাগল সে। ছুটে গেল তার দিকে।

'কাকে চাই? কাকে চান আপনি?' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিবর্ণ ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধা।

'মা!' অস্ফুটস্বরে বুনচুক বলে উঠল। 'এ কী . . . চিনতে পারছ না? . . .'

প্রায় হোঁচট খেতে খেতে বুনচুক এগিয়ে গেল তার দিকে, দেখতে পেল তার ডাক শুনে মা টলে পড়ল, যেন চোট খেয়েছে – মনে হল সে যেন

ছুটে আসতে চাইছিল, কিন্তু শক্তিতে কুলোল না; তাই টলতে টলতে এগিয়ে গেল, যেন বাতাসের বাধা ঠেলে এগোতে হচ্ছে তাকে। কাছে এসে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, বুনচুক তাকে ধরে ফেলল, তার বলিরেখাঙ্কিত ছোট্ট মুখে, ভয়ে ও আনন্দে বিহ্বল ম্লান দুই চোখে চুমু খেতে লাগল। সে নিজে অসহায় ভাবে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'ইলিয়া! . . . ইলিউশা! . . . খোকা আমার! . . . চিনতে পারি নি। . . . হা ভগবান, কোত্থেকে এলি তুই?' ফিসফিস করে বলতে বলতে দুর্বল দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল বৃদ্ধা।

দু'জনে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। আর তখনই, আবেগের প্রথম মুহূর্তগুলো কেটে যাবার পর বুনচুক আবার পরের ওভারকোট-গায়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওভারকোটটা বড় আঁটো লাগছিল তার, বগলে চাপ লাগছিল, নড়তে চড়তেই ভয় হচ্ছিল তার। ওটা গা থেকে খুলতে পেরে এখন সে স্বস্তি বোধ করল, টেবিলের ধারে বসল।

'ভাবতেও পারি নি তোকে জ্যান্ত দেখতে পাব! . . . কতকাল দেখি নি! খোকা রে! কী করে তোকে চিনব বল? তুই যে কত বড় হয়ে গেছিস! বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে তোকে!'

'তা তুমি কেমন আছ মা?' হেসে জিজ্ঞেস করল বুনচুক।

অসংলগ্ন ভাবে গল্প করতে করতে বৃদ্ধা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরময় ছোটাছুটি করতে লাগল – টেবিল গোছাতে লাগল, সামোভারে কয়লা দিতে লাগল। চোখের জল আর কয়লার কালিতে একাকার হয়ে গেল মুখটা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একেকবার ছেলের কাছে ছুটে আসে, তার হাতের ওপর হাত বুলায়, তার কাঁধের ওপর মাথা রেখে কাঁপতে থাকে। বৃদ্ধা জল গরম করল, নিজের হাতে ছেলের মাথা ধুয়ে দিল। সিন্দুকের তলা থেকে একপ্রস্ত কাচা জামাকাপড় টেনে বার করল। অনেক কাল হয়ে পড়ে থাকায় সেগুলোতে হলুদ রঙ ধরেছে। আদরের অতিথিটিকে বেশ করে খাওয়াল দাওয়াল। চোখ আর ফেরাতে পারে না তার মুখের ওপর থেকে। এই ভাবেই বসে রইল মাঝরাত পর্যন্ত, নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল, থেকে থেকে দুঃখের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

বুনচুক যখন শুতে গেল তখন কাছের ঘণ্টামিনারে দুটোর ঘণ্টা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে বিস্মৃত হল বর্তমানকে – স্বপ্ন দেখল সে যেন এক খুদে দুরন্ত ছেলে, কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়ে; সারাদিন ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়েছে, ঘুমে তার চোখদুটো জড়িয়ে আসছে, এই বুঝি রান্নাঘরের দরজা ঠেলে মা বেরিয়ে আসবে, ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করবে,

'ইলিউশা, কালকের পড়া তৈরি হয়েছে?' আনন্দ আর উত্তেজনায় জড়িত একটুকরো হাসি লেগে রইল তার মুখে। এই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ভোরের আগে বেশ কয়েক বার মা তার কাছে এসেছিল। লেপ বালিশ ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছে, তার বিশাল কপালে এবং কপালের ওপর দিয়ে তেরছা ভাবে ঝুলে পড়া লাল চুলের গোছায় চুমু খেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে।

পরের দিনই চলে গেল বুনচুক। সকালে ফৌজী গ্রেটকোট গায়ে আর আনকোরা নতুন খাকী টুপি মাথায় এক বন্ধু এলো তার সঙ্গে দেখা করতে, ফিসফিস করে কী যেন বলল তাকে। বুনচুক সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি অন্যান্য জিনিসের ওপরে মায়ের হাতে কাচা একপ্রস্ত জামাকাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্যুটকেস গুছিয়ে নিল। অস্বস্তির সঙ্গে চোখমুখ কুঁচকে ওভারকোটটা টেনেটুনে গায়ে চাপাল। বাধো বাধো গলায় তাড়াহুড়ো করে মা'র কাছ থেকে বিদায় নিল, কথা দিল এক মাস পরে আবার আসবে।

'আবার কোথায় যাচ্ছিস খোকা?'

'রস্তোভে মা, রস্তোভে। শিগ্‌গিরই ফিরব।... তুমি... তুমি মন খারাপ করো না মা!' বৃদ্ধাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করল সে।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি ঝোলানো ছোট্ট ক্রসটা নিজের গলা থেকে খুলে নিল, ছেলেকে চুমু খেয়ে মাথার ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে আশীর্বাদ করে ক্রসটা তার গলায় পরিয়ে দিল। ডুরিটা তার কলারের তলায় ভালো করে গুঁজে দিতে গেল, কিন্তু আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল, ঠাণ্ডায় যেন ছুঁচ বিঁধতে লাগল আঙুলে।

'গলায় ঝুলিয়ে রাখিস খোকা। সন্ত নিকলাইয়ের ক্রস এটা। হে পুণ্যাত্মা, হে পরম কারুণিক প্রভু রক্ষা কর, আড়াল দিয়ে রাখ ওকে।... আর যে কেউ নেই আমার।...' ক্রসটা চেপে ধরে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে ফিসফিস করে সে বলল।

আবেগভরে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ঠোঁটের কোনাদুটো থরথর করে কেঁপে উঠল, গভীর তিক্ততায় ঝুলে পড়ল নীচে। বুনচুকের লোমশ হাতের ওপর বসন্তের বারিধারার মতো ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল তপ্ত চোখের জল। বুনচুক তার মা'র বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিষণ্ণমুখে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে এলো দেউড়ির ধাপে।

* * *

রস্তোভ স্টেশন লোকে লোকারণ্য - তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মেঝেতে গোড়ালি-সমান সিগারেটের পোড়া টুকরো আর সূর্যমুখী ফুলের বীচির খোসা।

স্টেশনের চাতালে গ্যারিসনের সৈন্যরা মিলিটারীর সাজসজ্জা, তামাক আর নানা রকম চোরাই মাল বেচছে। দক্ষিণের সমুদ্রতীরের বেশির ভাগ শহরে সচরাচর যেমন দেখা যায়। সেই রকম বহু জাতের লোকের ভীড়, গুঞ্জন।

'আস্-স্-স্মলোভ্স্কি সিগারেট! খুচরো কিনুন, খুচরো কিনুন!' বাচ্চা সিগারেট-ফেরিয়ালা হাঁকছে।

'শস্তায় পাবেন স্যার...' কেমন যেন সন্দেহজনক চেহারার একটা পুবদেশী লোক ষড়যন্ত্রকারীর ভঙ্গিতে বুনচুকের কানের কাছে ফিসফিস করে কথাগুলো বলে তার গ্রেটকোটের ফুলে থাকা কিনারার দিকে চেয়ে চোখ টিপল।

'সূর্যমুখীর বীচি! গরম ভাজা! গরম গরম! আহা, কী বীচি!' ঢোকার মুখে নানা কণ্ঠে হাঁকডাক করে ছুঁড়িরা আর বুড়িরা তাদের মাল বেচছে।

জোরে জোরে কথা বলতে বলতে, হাসাহাসি করতে করতে ভিড় ঠেলে পথ করে বেরিয়ে গেল কৃষ্ণসাগরের ছয় জন জাহাজী। তাদের গায়ে বেড়ানোর পোশাক, ফিতে, গিল্‌টি করা বোতাম, চওড়া প্যাণ্ট পরেছে তারা, প্যাণ্টের গায়ে কাদা ছেটা। জনতা তাদের দেখে শ্রদ্ধাভরে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে।

বুনচুক ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে পথ করে নিয়ে চলতে লাগল।

'এটা সোনার বলতে চাও? ঘোড়ার ডিম! পেতল, স্রেফ পেতল তোমার ওই সোনা।... ভাবছ আমার চোখ নেই?' আর্মির এক রোগাপটকা টেলিগ্রাফকর্মী ঠাট্টা করে বলল।

যে লোকটা মাল বেচছিল উত্তরে সে বেশ ভারী গোছের একটা সোনার হার দোলাল – যেটা দেখলে অবশ্য সোনার না বলেই সন্দেহ হয়। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল সে।

'কী, দেখছ কী?... সোনা! নিখাদ সোনা! যদি জানতে চাও, তাহলে বলি, হাকিমের বাড়ি থেকে হাতিয়েছি।... হল? যাও, চুলোয় যাও, তোমার মতো মাল অনেক দেখা আছে! ওনাকে মার্কা দেখাও... আহা।... আর এই যে এটা, এটা চাই না?'

'না না জাহাজীরা যাবে না।... স্রেফ বাজে কথা।' কানের কাছে শোনা গেল।

'কেন, যাবে না কেন?'

'এই খবরের কাগজগুলোয় বলা হয়েছে...'

'এই যে দেখি ছোকরা, এদিকে দাও!'

'আমরা পাঁচ নম্বর* লিস্টের পক্ষে ভোট দিয়েছি।... এছাড়া আর কিছুতে কিছু হবার নয়।...'

* সংবিধান সভায় বলশেভিক নির্বাচন-প্রার্থীদের তালিকা। – অনুঃ

'ভুট্টার জাউ! ভুট্টার জাউ! খেতে মজা। চাই ত বলুন!'

'মিলিটারী-ট্রেনের ওপরওয়ালা ত কথা দিয়েছে ট্রেন নাকি পাওয়া যাচ্ছে – আগামীকাল আমরা রওনা দেব।'

বুন্‌চুক খুঁজে খুঁজে বার করল পার্টি কমিটির দালানটা। সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠে গেল। এক শ্রমিক রেড গার্ড বুন্‌চুকের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

'কাকে চাই, কমরেড?'

'কমরেড আব্রাম্‌সনকে চাই। আছেন ত?'

'বাঁ দিকে তিন নম্বর ঘর।'

ছোটখাটো চেহারার লোক। নাকটা বিরাট, মাথার চুল কালো কুচকুচে। একজন বয়স্ক রেলকর্মীর সঙ্গে কথা বলছে সে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো ফ্রককোটের বুকের প্রান্ত দিয়ে ভেতরে গুঁজে দিয়েছে, ডান হাতটা কথা বলতে বলতে অনবরত শূন্যে উঠছে পড়ছে।

'এতে চলবে না! একে সংগঠন বলে না! এ ভাবে প্রচার চালিয়ে গেলে তার ফল হবে উলটো!'

রেলকর্মীটির মুখে একটা বিভ্রান্ত কাচুমাচু ভাব দেখে মনে হল নিজের সমর্থনে সে যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু কালো-চুল লোকটা তাকে মুখ খোলার কোন অবকাশ দিল না। স্পষ্টই বোঝা গেল বেজায় চটে গেছে সে – রেলকর্মীটির কোন কথা শুনতে চাইল না – তার চোখের দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে তর্জনগর্জন করে চলল।

'এক্ষুনি কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিন মিত্‌চেঙ্কোকে! আপনাদের মধ্যে যা ঘটছে তা আমরা বসে বসে দেখতে পারি না! ভেরখোত্‌স্কিকে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে বিপ্লবী আদালতের কাছে! তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ত? করা হয়েছে অ্যারেস্ট? . . . ওকে যাতে গুলি করে মারা হয় সে ব্যাপারে আমি বিশেষ চাপ দেব!' কড়া সুরে সে তার বক্তব্য শেষ করল। নিজেকে পুরোপুরি সামলে তোলার আগেই ক্রুদ্ধ মুখখানা বুন্‌চুকের দিকে ফিরিয়ে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই আপনার?'

'আপনিই আব্রাম্‌সন?'

'হ্যাঁ।'

পেত্রোগ্রাদের উচ্চ ভারপ্রাপ্ত জনৈক কমরেডের লেখা একটা চিঠি আর কাগজপত্র তার হাতে দিয়ে কাছে, জানলার ধারিতে এসে বসল বুন্‌চুক।

আব্রাম্‌সন মন দিয়ে চিঠিটা পড়ল। বিষণ্ণ হাসি হেসে (গলা চড়িয়েছিল বলে তার অস্বস্তি হচ্ছিল) বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। এখুনি আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

রেলকর্মীটি তখন ঘামছিল। তাকে বিদায় করে দিয়ে সে নিজেও বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে এক লম্বা চেহারার মিলিটারীর লোককে নিয়ে ফিরে এলো। লোকটার মাথা কামানো, নীচের চোয়াল বরাবর তলোয়ারের কোপের নীলচে কাটা দাগ। হাবভাব দেখে মনে হল নিয়মিত পর্যায়ের আর্মি-অফিসার।

'ইনি আমাদের ফৌজী বিপ্লবী কমিটির একজন সদস্য। আলাপ করিয়ে দিই। আপনি, কমরেড . . . মাফ করবেন, ভুলে গেছি আপনার নামটা . . .'

'বুন্চুক।'

'. . . কমরেড বুন্চুক . . . আপনি ত একজন মেশিনগানার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক এরকম লোকই আমাদের দরকার!' ফৌজী লোকটি হেসে বলল।

কানের ডগা থেকে শুরু করে চিবুক পর্যন্ত তার কাটা দাগটার পুরো জায়গা জুড়ে গোলাপী আভা ছড়িয়ে দিল সেই হাসি।

'মজুরদের রেড গার্ড নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা মেশিনগান প্লেটুন গড়ে তুলতে পারবেন আপনি?' আব্রাম্সন জিজ্ঞেস করল।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি। একটু সময় সাপেক্ষ।'

'বেশ ত কত সময় লাগতে পারে, বলুন? এক সপ্তাহ . . . দুই . . . তিন সপ্তাহ?' উৎসুক দৃষ্টিতে বুন্চুকের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল ফৌজী লোকটি।

'কয়েক দিন।'

'চমৎকার!'

কপালটা ঘসল আব্রাম্সন, স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'গ্যারিসনের ইউনিটগুলোর মনোবল একদম ভেঙে গেছে, এখন আর তাদের সত্যিকারের কোন দাম নেই। সর্বত্রই যেমন, কমরেড বুন্চুক, আমাদের এখানেও তেমনি, মজুররাই আশাভরসা বলে আমার মনে হয়। জাহাজীদের কথা যদি বলেন – ঠিক আছে, কিন্তু সৈন্যরা . . . সেইজন্যেই বুঝলেন কিনা, নিজেদের মেশিনগানার পেতে চাই।' নীলচে দাড়ির গোল গোল পাকগুলো ধরে সে টান দিল, তারপর উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বৈষয়িক অবস্থা কী রকম? আচ্ছা সে আমরা ব্যবস্থা করব 'খন। আজ কিছু খাওয়া হয়েছে? না, নিশ্চয়ই হয় নি!'

'আচ্ছা এই যে এক নজর দেখে একটা ভরপেট লোক আর একজন উপোসী লোকের মধ্যে তফাত করতে পারার ক্ষমতা – এর জন্যে তোমাকে কত উপোস করতে হয়েছে বল ত ভাই? আর কত শোক দুঃখ বা বিভীষিকার মধ্য দিয়ে তোমাকে যেতে হয়েছে বলেই না তোমার মাথায় ওই সাদা চুলের গোছা?'

আব্রাম্‌সনের মাথার কালো কুচকুচে চুলের রাশির মধ্যে মাথার ডান ধারে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা চুলের একটা ছোপ দেখতে দেখতে গভীর দরদ ভরে মনে মনে ভাবল বুন্‌চুক। তারপর একজন লোকের সঙ্গে বুন্‌চুক যখন আব্রাম্‌সনের বাড়ির দিকে পা বাড়াল তখনও মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল তার সম্পর্কে চিন্তা: 'এই হল একজন মানুষ। একেই বলে বলশেভিক! ভয়ঙ্কর কাঠিন্য যেমন আছে, তেমনি যা ভালো, যা কিছু মানবিক তাও বজায় আছে। কোন এক ভের্‌খোত্‌স্কি অন্তর্ঘাতী কাজ করেছে বলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে এতটুকু বাধে না তার, আবার সেই সঙ্গে একজন কমরেডকে রক্ষা করতে, তার যত্ন নিতেও পারে।'

আব্রাম্‌সনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার সম্পর্কে একটা উষ্ণ অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বুন্‌চুক এসে পৌঁছুল আব্রাম্‌সনের বাড়িতে। তাগান্‌রোগ স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে বাড়িটা। আব্রাম্‌সনের দেওয়া চিরকুটটা বাড়িউলির হাতে দিল। বইপত্রে বোঝাই ছোট্ট ঘরটাতে বিশ্রাম নিল, কিছু খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করতে না করতে ঘুমে ঢলে পড়ল।

পাঁচ

পার্টি কমিটি যে ক'জন মজুর ঠিক করে বুন্‌চুকের কাছে পাঠাল, তাদের নিয়ে চারদিন ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রইল সে। সংখ্যায় তারা ছিল ষোলজন। নানা ধরনের পেশার লোক, এমনকি বয়সে এবং জাতিতেও তাদের অনেক ভেদ। দু'জন মুটে – খ্‌ভিলিচ্‌কো নামে এক পল্‌তাভার ইউক্রেনীয় আর মিখালিদি নামে বুশীতে পরিণত এক গ্রীক; ছাপাখানার কম্পোজিটার স্তেপানভ, আটজন ধাতু কারখানার মজুর, পারামোনভ খনির মজুর জেলেন্‌কভ, রুটিকারখানার এক রুগ্‌ণ চেহারার আর্মানী কর্মী – নাম তার গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস, ইয়োহান রেবিণ্ডার নামে বুশীতে পরিণত এক জার্মান ফিটার-মিস্ত্রী আর দু'জন রেলডিপোর কর্মী। সতেরো নম্বর সুপারিশ নিয়ে যে এলো সে একজন স্ত্রীলোক। তার গায়ে তুলোর ফৌজী জ্যাকেট, বুটজোড়া নিজের পায়ের মাপের চেয়ে অনেক বড় – ঢলঢল করছে।

বুন্‌চুক প্রথমে তার আগমনের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারে নি, তাই তার হাত থেকে বন্ধ-খামটা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'ফিরতি পথে একবার সদর ঘাঁটিতে দেখা করতে পারেন?'

মেয়েটি মৃদু হাসল। তার মাথার ওড়নার নীচে মোটা এক গোছা চুল খসে

পড়েছিল, অস্বস্তির সঙ্গে হাত দিয়ে সেটা ভেতরে গুঁজতে গুঁজতে ইতস্তত করে সে বলল, 'আমাকে আপনার কাছেই পাঠানো হয়েছে...' তারপর মুহূর্তের বিমূঢ়তা কাটিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, 'মেশিনগানার হিশেবে।'

বুন্‌চুকের চোখেমুখে গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল।

'ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল নাকি? আমি কি মেয়েদের ব্যাটেলিয়ন তৈরি করছি?... আপনি মাফ করবেন, এ ঠিক আপনার উপযোগী কাজ নয়। খুব ভারী কাজ, পুরুষের মতো শক্তি দরকার।... কিন্তু এ কী ব্যাপার?... না না, আমি আপনাকে নিতে পারব না।'

ভুরু কোঁচকাতে কোঁচকাতে খামটা সে খুলল, লেখা চিঠিটার ওপর চটপট চোখ বুলিয়ে নিল। তাতে নেহাৎ মামুলী ভাষায় লেখা আছে যে পার্টির জনৈক সদস্য কমরেড আন্না পগুদ্‌কোকে তার কাছে পাঠানো হল। ওই চিঠির সঙ্গে ছিল আব্রাম্‌সনের লেখা একটা চিরকুট। বুন্‌চুক এর পর বার কয়েক সেটা পড়ল। আব্রম্‌সন লিখেছে:

'প্রিয় কমরেড বুন্‌চুক,

আন্না পগুদ্‌কো নামে একজন ভালো কমরেডকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। তার সনির্বন্ধ অনুরোধের কাছে আমাদের নতিস্বীকার না করে উপায় ছিল না, তাই আপনার কাছে পাঠাতে হল। আমরা আশা করি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে একজন দস্তুরমতো জঙ্গী মেশিনগানার করে তুলতে পারবেন আপনি। এই মেয়েটিকে আমি জানি। আমি তাকে আন্তরিক ভাবে সুপারিশ করছি, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। কর্মী হিশেবে ও মূল্যবান, তবে মাথা গরম, খানিকটা উত্তেজিত স্বভাবের (যৌবনের উচ্ছ্বাস এখনও পুরোমাত্রায় চলছে আর কি)। তাই বলি কি, অবিমৃষ্যকারিতার হাত থেকে ওকে বাঁচাবেন, সামলে রাখবেন। আপনাদের আসল শক্তি, প্রাণকেন্দ্র বলতে যা বোঝায় তা নিঃসন্দেহে ধাতু কারখানার ওই আটজন মজুর। তাদের মধ্য থেকে কমরেড বগভোয়'র প্রতি আমি আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অত্যন্ত কাজের লোক, একনিষ্ঠ বিপ্লবী কমরেড। আপনার মেশিনগান বাহিনী গঠনগত ভাবে আন্তর্জাতিক – এটা ভালো। দস্তুরমতো একটা লড়ুয়ে ইউনিট হবে এই বাহিনী।

শেখানোর কাজ চটপট সারুন। শোনা যাচ্ছে কালেদিন নাকি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর উদ্যোগ করছে।

কমরেডসুলভ প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

আব্রাম্‌সন।'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল বুন্‌চুক (মস্কো স্ট্রীটের একটা বাড়ির তল-কুঠুরির ঘটনা এটা। সেখানেই ট্রেনিং হত)। স্বল্প আলোকে ছায়াঘন হয়ে উঠেছে মেয়েটার মুখ, আবছা আবছা দেখাচ্ছে তার চেহারা।

'আচ্ছা বেশ,' একটু অপ্রসন্ন ভাবেই সে বলল। 'আপনার নিজের যখন এতই ইচ্ছে... তাছাড়া আব্রাম্‌সনও যখন এত করে বলছেন... থেকেই যান।'

* * *

বিশাল হাঁ-করা মুখ 'ম্যাক্সিম' মেশিনগানের চারদিক থেকে লেপ্টে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে শিক্ষার্থীরা, দলে দলে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, এ ওর কাঁধে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে বুন্‌চুকের দক্ষ হাতের কাজ। বুন্‌চুকের হাতের ছোঁয়ায় মেশিনগানটা দ্রুত টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগল। আবার সে বেশ হিসাব করে খুব ধীরে ধীরে, নিখুঁত ভাবে জোড়া দিতে দিতে আলাদা আলাদা প্রতিটি অংশের গঠন প্রকৃতি আর কোন্‌টার কী কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগল। যন্ত্রটা কী ভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়, কী ভাবে তার পাল্লা ঠিক করতে হয়, লক্ষ্য স্থির করতে হয় – সব শেখাল সে। কী করে, কত ডিগ্রী বাঁকা পথে গুলি ছোঁড়া যায় এবং কতদূর পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব, তাও বোঝাল। তারপর সে তাদের দেখাল শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে পর্যুদস্ত না হয়ে গা ঢাকা দেওয়ার কায়দা – নিজে সে মেশিনগানের খাকি রঙ লাগানো ঢালটার আড়ালে শুয়ে পড়ল; সুবিধাজনক জায়গা বেছে নেওয়ার এবং গুলির ফিতের বাক্সগুলো ঠিক মতো রাখার গুরুত্বও বুঝিয়ে দিল।

বুটি কারখানার কর্মী গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস বাদে আর সবাই বেশ চটপট শিখে নিল। লোকটার কিছুতেই কিছু ঠিক হয় না। বুন্‌চুক তাকে কতই না মেশিনগান চালানোর নিয়ম শেখাল – কিছুতেই সে মনে রাখতে পারে না, বারবার গুলিয়ে ফেলে, ভেবাচেকা খেয়ে যায়, হতভম্ব হয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'ঠিক হয় না কেন? আরে ধুৎ,... আমারই ত দোষ দেখছি।... হ্যাঁ এই যে, এটা হবে এখানে। নাঃ, তাও ত হচ্ছে না?' হতাশ হয়ে সে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। 'কেন হচ্ছে না?'

রোদে-পোড়া তামাটে মুখ বগভোয়'র। বারুদের নীলচে গুঁড়ো গেঁথে ছিটছিট হয়ে আছে তার কপাল আর দুই গাল। গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎসকে ভেঙচি কেটে সে বলে, 'কেন হচ্ছে না? – এই দ্যাখ্! হচ্ছে না এই জন্যে যে তুই একটা হাঁদারাম। করতে হবে এই এরকম!' বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মেশিনগানের যে অংশটা যেখানে বসানোর কথা, বসিয়ে দেয় সে। 'একেবারে ছোটবেলা থেকেই মিলিটারীর কাজে আমার ঝোঁক ছিল,' মুখের ছিটছিট নীলচে দাগগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সকলে হো হো করে হেসে উঠলে সে বলে চলে, 'একটা কামান বানিয়েছিলাম, সেটা ফেটে গেল – তাইতে ভুগতেও হল। কিন্তু এখন দেখ, আমি কেমন আমার কেরামতি দেখিয়ে যাচ্ছি।'

বাস্তবিকই অন্য সকলের চেয়ে সহজে এবং তাড়াতাড়ি মেশিনগানের কাজ সে শিখে ফেলেছে। এখন বাকি রয়ে গেছে কেবল গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস। প্রায়ই শোনা যায় তার দুঃখে-ক্ষোভে কাঁদো-কাঁদো গলা।

'আবার গোলমাল হয়ে গেল! কেন? – কে জানে বাপু!'

'কী গাধা, কী গাধা! সারা নাখিচেভান তল্লাটে এমন আর দুটি হয় না!' বদমেজাজী গ্রীক মিখালিদি বিরক্ত হয়ে বলে।

'একেবারেই হাঁদা!' সংযতস্বভাব রেবিগুারও সায় না দিয়ে পারে না।

'তর ওই রুটির ময়দা মাখার কাম না, বুঝলি?' গাঁক গাঁক করে কথাগুলো বললেও মনের মধ্যে কোন বিদ্বেষ না রেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে খ্‌ভিলিচ্‌কো।

একমাত্র স্তেপানভই ভয়ঙ্কর চটেমটে চোখমুখ লাল করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

'অমন দাঁত না খিচিয়ে কমরেডকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত!'

স্তেপানভকে সমর্থন করে ডিপোর প্রৌঢ় মজুর ক্রুতগোরভ। বিশাল চেহারা, লম্বা লম্বা হাত, চোখদুটো যেন তার ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। অনেকটা আলখিল্লাছাড়া পাদ্রির মতো চেহারা।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ সব! কাজ ত আর তাই বলে বসে থাকছে না! কমরেড বুন্‌চুক, তোমার এই হাটুরে লোকগুলোকে সামলাও, নয়ত চুলোয় পাঠিয়ে দাও ওদের! বিপ্লব বিপদের মুখে পড়েছে – এদিকে ওনারা হাসাহাসি করছেন!' বজ্রমুষ্টি নাচাতে নাচাতে গম্ভীর গলায় সে বলে।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করতে থাকে আন্না পগুদ্‌কো। নাছোড়বান্দার মতো সে লেগে থাকে বুন্‌চুকের পেছন পেছন, তার গায়ের সেই বিদ্‌ঘুটে হাল্‌কা ওভারকোটের হাতা ধরে টানাটানি করতে থাকে, মেশিনগানের কাছ থেকে কোন মতে আর সরে না।

'আচ্ছা ঢাকনার ভেতরে জল যদি জমে যায় তাহলে কী হবে? জোর বাতাস

বইলে কী ভাবে ঘোরাতে হবে? আর এটা কী রকম হবে কমরেড বুনচুক?' - এই রকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বুনচুককে বিপর্যস্ত করে তোলে সে, আর বড় বড় কালো চোখের স্নিগ্ধ দীপ্তি ছড়িয়ে সাগ্রহে, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে বুনচুকের দিকে।

তার উপস্থিতিতে বুনচুকের কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকতে লাগল, নিজের এই অস্বস্তির শোধ নেওয়ার জন্যই যেন সে তার ওপর আরও বেশি কড়া হয়ে উঠল, ইচ্ছে করেই অনেকটা নিস্পৃহ ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু রোজ সকালে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটার সময় তুলোয় ঠাসা সবুজ জ্যাকেটের হাতার ভেতরে দু'হাত ঢুকিয়ে শীতে জবুথবু হয়ে বড় বড় ঢলঢলে ফৌজী বুটের তলা ঘসটে ঘসটে আন্না পগুদ্‌কো যখন তল-কুঠুরিতে এসে ঢোকে, তখন কেমন যেন একটা অসাধারণ, একটা উত্তেজনাকর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বুনচুক। বুনচুকের চেয়ে মাথায় সে একটু খাটো, শরীরটা ভরাট - যে সব স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দৈহিক পরিশ্রম করে, স্বাভাবিক ভাবেই তাদের শরীর যেমন আঁটসাঁট আর ভরাট গোছের হয়ে থাকে, সেই রকম। কাঁধদুটো খানিকটা ঝুলে-পড়া, এমনকি সুন্দরীও হয়ত তাকে বলা চলে না - শুধু তার বড় বড় আকর্ষণীয় চোখদুটো ছাড়া। চোখজোড়া যেন তার সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত শ্রী এনে দিয়েছে।

প্রথম চারদিন বুনচুক তাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখার সুযোগই পেল না। একে তল-কুঠুরিতে আলোর অভাব, তাছাড়া মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করা যেমন অস্বস্তিকর তেমনি তার ফুরসতও ছিল না। পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা ওরা দু'জনে একসঙ্গে ঘর থেকে বের হল। মেয়েটি আগে আগে যাচ্ছিল। শেষ সিঁড়ির ধাপে ওঠার পর কী যেন একটা প্রশ্ন করার জন্য তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। সন্ধ্যার আলোয় তার মুখের ওপর দৃষ্টি পড়তে বুনচুকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠল। মেয়েটি তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য পেছনে হেলিয়ে চুলগুলো গোছাতে গোছাতে বুনচুকের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু প্রশ্নটা বুনচুক শুনতে পায় নি। একটা বেদনা-মধুর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আস্তে আস্তে সে উঠতে লাগল সিঁড়ি ভেঙে।

এই অনুভূতিকে বুনচুক ভালোমতো চেনে। তার জীবনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে তখনই এর অস্তিত্ব সে টের পেয়েছে। কোন আক্রমণের প্রথম মুহূর্তে যখন আবেগ ভোঁতা হয়ে এসেছে, তার আগে আগে এই উপলব্ধি বুনচুকের হয়েছে, এই উপলব্ধি তার হয়েছে যখন লেনিনের ঈষৎ কণ্ঠ্যবর্ণে উচ্চারিত বক্তৃতা সে শুনেছে, একজন নেতার যুক্তির ক্ষমতা আর প্রতিভার কথা ভেবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে, যখন সূর্যাস্তের কোন অসাধারণ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ

হয়েছে অথবা কোন মারাত্মক কাজে সে নেমেছে। মেয়েটির ছায়া-ছায়া ম্লান গোলাপী গালদুটো, চোখের সাদা অংশে শরতের নীলিমা আর কালো চোখের তারার অতলান্ত গভীরতার দিকে তাকাতে আবার সেই উপলব্ধি তার জেগে উঠল। মেয়েটির গোলাপী নাকের পাটা ভেদ করে ফুটে উঠেছে অস্তগামী সূর্যের কিরণ। মাথার ওড়না না খুলে চুল ঠিক করতে অসুবিধা হতে থাকায় মেয়েটি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, তাইতে সামান্য কেঁপে উঠল তার নাকের পাটা। মুখের চারপাশের রেখাগুলো পুরুষ-কঠিন, সেই সঙ্গে শিশুর মতো কোমল। ওপরের ঠোঁটটা সামান্য ওলটানো। ঠোঁটের ওপরে হাল্কা লোমের মৃদু কালো রেখা তার মুখের অনুজ্জ্বল সাদা ত্বকের গায়ে আরও স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে।

বুন্চুক যেন আঘাত খেয়ে মাথা নীচু করল। তারপর উচ্ছ্বাসভরে রসিকতা করে বলল:

'আন্না পগুদ্‌কো . . . দু'নম্বর মেশিনগানার, তুমি যেন কারও একজনের সুখের মতোই সুন্দর।'

'যত-সব বাজে কথা!' দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল সে, তারপর হাসল। 'বাজে কথা, কমরেড বুন্চুক! . . . জিজ্ঞেস করছিলাম কি, কাল ক'টার সময় চাঁদমারিতে যেতে হবে আমাদের?'

ওই হাসিটুকু তাকে যেন আরও সহজ, আরও অধিগম্য, আরও পার্থিব করে তুলল। বুন্চুক তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার শেষ প্রান্তে সূর্য যেন আটকে পড়ে গেছে, রক্তিম আলোর বন্যায় সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে, শান্ত গলায় উত্তর দিল, 'চাঁদমারিতে? কাল। কোথায় যেতে হবে তোমাকে? কোথায় থাক তুমি?'

মেয়েটি শহরের উপকণ্ঠের কোন একটা গলির নাম করল। ওরা দু'জনে একসঙ্গে চলল। চৌরাস্তার মোড়ে ছুটতে ছুটতে তাদের এসে ধবল বগভোয়।

'বুন্চুক শোন! কাল কোথায় আমাদের জমায়েত হবে বললে না ত?'

রাস্তায় চলতে চলতেই বুন্চুক বলল যে সকলকে হাজির হতে হবে শান্তকুঞ্জের ওপাশে। ক্রুতগোরভ আর খ্‌ভিলিচ্‌কো একটা ঘোড়ার গাড়ি করে সেখানে মেশিনগান নিয়ে যাবে। জমায়েতের সময় সকাল আটটা। বগভোয় কথা বলতে বলতে তাদের সঙ্গে দুটো মহল্লা পার হল, পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বুন্চুক আর আন্না পগুদ্‌কো কয়েক মিনিট নীরবে চলল। শেষকালে নীরবতা ভঙ করে তীর্যক দৃষ্টি হেনে আন্না তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কসাক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি অফিসার ছিলেন?'

'আমি? কিসের আবার অফিসার?'

'আপনি কোথাকার লোক?'

'নোভোচের্‌কাস্‌স্ক।'

'রস্তোভে কি অনেক দিন আছেন?'

'মাত্র কয়েকদিন হল।'

'তার আগে?'

'পেত্রোগ্রাদে ছিলাম।'

'পার্টিতে কোন্ সাল থেকে আছেন?'

'উনিশ শ' তেরো সাল থেকে।'

'আপনার পরিবার কোথায়?'

'নোভোচের্‌কাস্‌স্কে,' চটপট কথাগুলো বলেই অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাতখানা বাড়াল বুন্‌চুক। 'একটু থাম। এবারে আমাকে প্রশ্ন করতে দাও: তোমার জন্ম কি রস্তোভে?'

'না, আমার জন্ম ইয়েকাতেরিনোস্লাভে। কিন্তু আজকাল এখানেই আছি।'

'এবারে আমি জিজ্ঞেস করি... ইউক্রেনীয়?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, 'না।'

'ইহুদী?'

'হ্যাঁ। কেন? কথার টানে ধরা পড়ে নাকি?'

'না, তা নয়।'

'তা হলে কী করে বুঝলেন যে আমি ইহুদী?'

আন্নার চলার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে পায়ের গতি কমিয়ে দিয়ে সে বলল, 'কান। কান আর চোখের গড়ন দেখে। এছাড়া তোমার জাতের খুব কমই ছাপ আছে তোমার মধ্যে।...' একটু ভেবে যোগ করল, 'তুমি যে আমাদের সঙ্গে আছ এটা ভালোই বলতে হবে।'

'কেন?' কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করল আন্না।

'কথাটা কি জান, ইহুদীদের একটা বিশেষ দুর্নাম আছে। আমি জানি, অনেক মজুরও সেটা বিশ্বাস করে—ইহুদীরা নাকি কেবল হুকুম দিতেই জানে, নিজেরা কখনও গুলির মুখে এগিয়ে যায় না—আমি নিজেও একজন মজুর কিনা...' প্রসঙ্গত সে মন্তব্য করল। 'কিন্তু এ ধারণা ভুল। আর এটা যে ভুল তুমি তার চমৎকার প্রমাণ দেবে। তুমি শিক্ষিত মেয়ে ত?'

'হ্যাঁ, গত বছর আমি হাই স্কুল শেষ করেছি। আপনি কত দূর পড়াশুনো করেছেন? কথাটা এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি যে আপনার কথাবার্তার ধরন থেকে

বুঝতে বাকি থাকে না যে আপনি ঠিক মজুর পরিবার থেকে আসেন নি।'

'আমি অনেক পড়াশুনো করেছি।'

আস্তে আস্তে পথ চলতে লাগল ওরা। আন্না ইচ্ছে করেই অলিগলি ধরে ঘুরতে ঘুরতে চলল, নিজের সম্পর্কে সংক্ষেপে আরও কিছু বলার পর কর্নিলভের বিদ্রোহ, পেত্রোগ্রাদের মজুরদের মতিগতি আর অক্টোবরের বৈপ্লবিক ঘটনা সম্পর্কে তাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল।

ঘাটের রাস্তার কাছাকাছি কোথায় যেন রাইফেলের গুলির ভিজেমতন আওয়াজ হল, তারপর হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গর্জে উঠল মেশিনগান। আন্না জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'কোন্ ধরনের মেশিনগান এটা?'

'লুইস্।'

'গুলির ফিতের কতটা গেল?'

একটা নোঙর ফেলা ট্রলারের সার্চ-লাইটের কমলা রঙের আলো মরকত-সবুজ হিমকণা ছিটানো দাঁড়ার মতো বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্যের আলোয় জ্বলন্ত ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে। বুন্চুক মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। কোন উত্তর দিল না।

নির্জন শহরের বুকে ঘণ্টা তিনেক ঘোরাঘুরি করার পর আন্নার বাড়ির গেটের সামনে এসে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হল।

চৈতন্যের গভীরে এক বোধাতীত তৃপ্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ঘরে ফিরল বুন্চুক। 'চমৎকার কমরেড, বেশ বুদ্ধিমতী কিন্তু মেয়েটি। বড় ভালো লাগল ওর সঙ্গে কথা বলে – এই ত ভেতরে ভেতরে কেমন একটা আমেজ লাগছে। এই কয়েক বছরের মধ্যে বড্ড রুক্ষ হয়ে গেছি। লোকের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করা একান্তই দরকার, নইলে বাসী রুটির মতো একদম চিমসে যাব। . . .' নিজের মনকে যে চোখ ঠারছে একথা জেনেও সে মনে মনে ভাবল।

ফৌজী-বিপ্লবী কমিটির এক বৈঠক থেকে সদ্য ফিরে আসার পর মেশিনগানারদের ট্রেনিং সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ শুরু করল আব্রাম্সন। প্রসঙ্গত সে জিজ্ঞেস করল আন্না পগুদ্কো সম্পর্কে।

'কী রকম চালাচ্ছে? যদি চলার মতো মনে না করেন তা হলে বলবেন, ওকে আমরা অন্য কাজে লাগাতে পারি, বদলে আমরা অন্য কাউকে পাঠাতে পারি।'

'না না ঠিক আছে!' বুন্চুক শঙ্কিত হয়ে ওঠে। 'খুবই কাজের মেয়ে।'

মেয়েটি সম্পর্কে কিছু বলার প্রায় অদম্য একটা বাসনা তাকে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু একমাত্র প্রচণ্ড মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার ফলেই সে তা থেকে ক্ষান্ত হতে পারল।

ছয়

নভেম্বরের ২৫ তারিখের দুপুরে নোভোচের্‌কাস্‌স্ক থেকে রস্তোভের দিকে কালেদিনের বাহিনীর সমাবেশ ঘটতে লাগল। আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। আলেক্সেয়েভের অফিসারদের দলটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে ছোট ছোট সার বেঁধে রেললাইনের দু'পাশের ঢাল ধরে এগিয়ে চলল। ডানধারের রক্ষণভাগে শিক্ষানবিশ অফিসারদের ধূসর মূর্তিগুলো একটু ঘন হয়ে এগোচ্ছে। বাঁ দিকের রক্ষণভাগে আছে জেনারেল পপোভের স্বেচ্ছাবাহিনী। লালমাটির একটা ছোট খাতের পাশ দিয়ে ঘুরে চলেছে তারা। দূর থেকে ছোট ছোট ছাইরঙা ডেলার মতো দেখাচ্ছে তাদের। কেউ কেউ টুপটাপ খাতটার মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে, এ ধারে উঠে এসে ঠিক মতো সার বাঁধার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, তারপর আবার বয়ে চলেছে আগের মতো ধারায়।

নাখিচেভান শহরতলির উপকণ্ঠে ছড়িয়ে থাকা রেড গার্ডদের সারির মধ্যে দারুণ অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখা দিল। মজুরদের মধ্যে অনেকেই জীবনে এই প্রথম রাইফেল হাতে নিয়েছে। তারা ভয় পেয়ে গেল, বুকে হেঁটে চলতে লাগল, শরতের কাদামাটিতে নোংরা হয়ে গেল তাদের গায়ের কালো ওভারকোটগুলো। কেউ কেউ আবার মাথা তুলতে লাগল, ভালোমতো নিরীক্ষণ করার পর দেখতে পেল শ্বেতরক্ষীদের মূর্তিগুলো এগিয়ে আসছে। বহু দূর প্রান্তরের ওপর তাদের ছোট ছোট দেখাচ্ছে।

সারিতে মেশিনগানের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বুন্‌চুক, দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখছে। আগের দিন সে তার বিদ্‌ঘুটে হাল্‌কা ওভারকোটটা পালটে গায়ে দিয়েছে ফৌজী গ্রেটকোট। সেটা গায়ে দিয়ে সে তার স্বভাবে ফিরে এসেছে, স্বস্তি বোধ করছে।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সহ্য করতে না পেরে নির্দেশের অপেক্ষা না করেই গুলি চালাতে শুরু করল রেড গার্ডরা। প্রথম গুলির আওয়াজ হতে না হতেই বুন্‌চুক গালাগাল দিয়ে উঠল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'গুলি থামাও!'

গুলির কট্‌কট্‌ আওয়াজের তাড়নায় ডুবে গেল তার চিৎকার। হাত নাড়ল সে, গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করল, বগভোয়কে হুকুম দিল মেশিনগান চালানোর। বগভোয়'র মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু সে হাসি-হাসি মুখে মেশিনগানের গুলি ভরার ফাটলটার ওপর ঝুঁকে পড়ল, আঙুল দিয়ে চেপে ধরল গুলি ছোঁড়ার হাতলটা। মেশিনগানের পরিচিত কট্‌কট্‌ শব্দ

বুন্‌চুকের কানে এসে বিঁধল। শত্রুপক্ষের সৈন্যদের সারিটা মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে শুয়ে পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্য সেদিকে তাকিয়ে নিশানা কতটা ঠিক হল বোঝার চেষ্টা করল সে, তারপর লাফিয়ে উঠে সারি বরাবর অন্য মেশিনগানগুলোর দিকে ছুটল।

'ফায়ার!'

'এই চালালাম! . . . হো-হো-হো-হো!' ভয়ার্ত অথচ খুশি-খুশি মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে গর্জন করে উঠল খ্‌ভিলিচ্‌কো।

মাঝের সারিতে তৃতীয় মেশিনগান যারা চালাচ্ছিল তারা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। বুন্‌চুক সেদিকে ছুটে গেল। মাঝপথে সামান্য ঝুঁকে পড়ে দূরবীন দিয়ে দেখে নিল। কুয়াসায় ঝাপসা হয়ে আসা গোল কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে পেল ছাইরঙা ডেলাগুলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ভালোমতো তাক-করা এক ঝাঁক গুলি সেদিক থেকে ছুটে এলো। বুন্‌চুক মাটিতে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়েই বেশ বুঝতে পারল যে তৃতীয় মেশিনগানের নিশানা একদম ঠিক হচ্ছে না।

'পাল্লা নীচু কর! ধুত্তোর ছাই!' সারি বরাবর আঁকাবাঁকা গতিতে বুকে হেঁটে এগুতে এগুতে সে চিৎকার করতে থাকে।

তার মাথার ঠিক ওপর দিয়ে মারাত্মক শিস দিয়ে গুলি ছুটে যেতে থাকে। আলেক্সেয়েভের সৈন্যরা নিখুঁত ভাবে গুলি চালাচ্ছে, যেন ময়দানে মহড়া নিচ্ছে।

মেশিনগানের নাকটা বিদ্‌ঘুটে ভাবে অনেকখানি উঁচু হয়ে আছে, পাশে এ ওর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মেশিনগান চালকেরা। মেশিনগানের নিশানাদার গ্রীক মিখালিদি। বিশ্রীরকম ভাবে উঁচুতে পাল্লা ঠিক করে না থেমে অবিরাম গুলি ছুঁড়ে চলেছে সে, মজুত গুলির ফিতে অযথা খরচ করে ফেলছে। তার পাশে স্তেপানভ। নিদারুণ আতঙ্কে তার মুখ সবুজ হয়ে গেছে। সে কাতরাচ্ছে। তাদের পেছনে ক্রুতগোরভের বন্ধু, রেলকর্মীটি। কচ্ছপের মতো পিঠ উঁচু করে, পাদুটো টানটান করে শরীরটা সামান্য উঠিয়ে মাটিতে মাথা গুঁজে ছটফট করছে।

মিখালিদিকে ঠেলে সরিয়ে দিল বুন্‌চুক। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চোখ কুঁচকে নিশানা ঠিক করল। শেষকালে যখন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, তার হাতে পড়ে মেশিনগান যখন কেঁপে উঠে সমান তালে কট্‌কট্‌ আওয়াজ তুলতে লাগল তখন ফল ফলতে দেরি হল না। শিক্ষানবিশ অফিসারদের যে দলটা ছুটতে ছুটতে টিলা পেরিয়ে আসছিল তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঢাল বেয়ে পালাতে শুরু করল। টিলার ন্যাড়া কাদামাটির ওপর ফেলে গেল তাদের একজন সঙ্গীকে।

বুন্‌চুক এবারে ফিরে গেল তার নিজের মেশিনগানের কাছে। বগভোয়'র পায়ের মাংস বেরিয়ে গেছে, কাত হয়ে শুয়ে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে সমানে শাপ-শাপান্ত করে চলেছে সে। তার মুখটা ফেকাসে হয়ে উঠেছে, তাইতে

গালের ওপরকার বাবুদের ছিটগুলো আরও বেশি নীলচে দেখা যাচ্ছে।

'গুলি কর, ওরে হারামজাদা গুলি কর!' পাশেই আগুনের মতো লাল চুলো যে রেড গার্ডটি শুয়ে ছিল চার-হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে সে গর্জন করে উঠল। 'গুলি কর! দেখতে পাচ্ছ না, এগিয়ে আসছে?'

কুচকাওয়াজের মাঠে ডবল মার্চ করার ভঙ্গিতে উঁচু জায়গাটা বরাবর ছুটতে ছুটতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে অফিসারদের বাহিনীটা।

বগভোয়'র জায়গায় এলো রেবিণ্ডার। এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে বুদ্ধিমানের মতো হিসাব করে গুলি খরচ করতে লাগল সে।

এদিকে বাঁ দিকের রক্ষণভাগ থেকে খরগোসের মতো লাফাতে লাফাতে ছুটে যাচ্ছিল গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস। মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুটতে দেখলেই মাটিতে আছড়ে পড়ছে সে, আর্তনাদ করে উঠছে। বুন্‌চুকের কাছে এসে বলল, 'হচ্ছে না!... গুলি বেরোচ্ছে না!...'

নিজেকে প্রায় আড়াল না দিয়েই মাটিতে শুয়ে থাকা সারি বরাবর ছুটল।

দূর থেকেই সে দেখতে পেল মেশিনগানের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আন্না, চোখের কাছে ঝুলে থাকা চুলের গোছা সরাতে সরাতে হাতের আড়াল দিয়ে শত্রুসৈন্যদের সারিটা দেখছে।

মেয়েটার বিপদের কথা ভেবে ভয়ে কালো হয়ে গেল বুন্‌চুকের মুখ। এক ঝলক রক্তোচ্ছ্বাস গেল তার মুখে। চিৎকার করে সে বলল, 'শুয়ে পড়! বলছি শুয়ে পড়!...'

বুন্‌চুকের দিকে সে চোখ ফেরাল। কিন্তু আগের মতোই হাঁটু গেড়ে বসে রইল। একটা ভারী গোছের মোক্ষম গালাগাল বুন্‌চুকের ঠোঁটের ডগায় এসেও আটকে গেল। তার কাছে ছুটে গিয়ে জোর করে মাটিতে ঠেলে দিল সে।

মেশিনগানের ঢালের পেছনে ফোঁসফোঁস করে হাঁপাচ্ছিল ক্রুতগোরভ।

'আটকে গেছে। চলছে না!' কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে বুন্‌চুককে বলল সে, তারপর চোখ তুলে গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎসকে খুঁজতে গিয়ে তার গলা বুজে এলো, চিৎকার করে বলল, 'পালিয়েছে, ব্যাটা পালিয়েছে! তোমার ওই মান্ধাতার আমলের ঘাটের মড়াটা পালিয়েছে!... হাউমাউ করে ব্যাটা আমার জান বার করে দিল!... কাজ করার জো আছে নাকি!...'

সাপের মতো এঁকেবেঁকে বুকে হেঁটে এগিয়ে এলো গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস। তার কালো খোঁচা খোঁচা বাসী দাড়ির ওপর শুকনো হয়ে কাদা জমে আছে। ক্রুতগোরভ ষাঁড়ের মতো ভারী ঘর্মাক্ত কাঁধ ঘুরিয়ে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকাল, গুলিগোলার আওয়াজ ছাপিয়ে গর্জন করে উঠল।

'গুলির ফিতে কোথায় রেখেছ? . . . মান্ধাতার লক্কর মাল! . . . বুন্‌চুক! বুন্‌চুক! ওটাকে সরাও বলছি। নইলে ওটাকে খতম করব আমি! . . .'

বুন্‌চুক মেশিনগানটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকে। একটা গুলি সজোরে আঘাত করল ঢালের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল সে, যেন ছ্যাঁকা লেগেছে।

মেশিনগান ঠিকঠাক করে বুন্‌চুক নিজের হাতে গুলি ছুঁড়ল, আলেক্সেয়েভের যে দুর্ধর্ষ সৈন্যদল দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছিল তাদের শুয়ে পড়তে বাধ্য করল, তারপর দু'চোখে আড়াল খুঁজতে খুঁজতে বুকে হেঁটে পেছনে ফিরে গেল।

শত্রুসৈন্যদের সারিগুলো আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এখন দূরবীন দিয়ে দেখলে চোখে পড়ে ভলান্টিয়াররা চলেছে – তাদের কাঁধে বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে রাইফেল, এখন আর তারা আড়াল দেবার জন্য তত ঘন ঘন শুয়ে পড়ছে না। গুলি আরও মারাত্মক হয়ে উঠছে। রেড গার্ডদের সারিতে ইতিমধ্যেই তিনজন মারা গেছে। তাদের কমরেডরা বুকে হেঁটে কাছে গিয়ে তাদের রাইফেল আর গুলি নিয়ে নিল – মৃতের আর হাতিয়ারে কী দরকার! . . . ক্রুতগোরভের মেশিনগানের পাশে আড়াল দিয়ে শুয়ে ছিল আন্না আর বুন্‌চুক। তাদের চোখের সামনে গুলি লেগে পড়ে গেল একজন ছোকরা রেড গার্ড। ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করতে লাগল, মুখ দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলল, গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পটি জড়ানো পাদুটো মাটিতে আছড়াল, শেষকালে দু'দিকে ছড়ানো হাতের ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়াল, পরক্ষণেই কাতর আর্তনাদ তুলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে শেষবারের মতো নিঃশ্বাস ছাড়ল। বুন্‌চুক তেরছা চোখে তাকাল আন্নার দিকে। মেয়েটির বড় বড় দুটো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, দু'চোখে ঝরে পড়ছে একটা অস্থির আতঙ্ক। মৃত তরুণটির পায়ের দিকে, ফৌজীদের মতো তার পায়ে গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো, বহু ব্যবহারে জীর্ণ কাপড়ের পটিটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। এদিকে ক্রুতগোরভ তার কানের কাছে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

'গুলির ফিতে! . . . ফিতে! . . . ফিতে! . . . এই ছুঁড়ি, ফিতে দে!'

কথাগুলো আন্নার কানেই গেল না।

পাশের দিক থেকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জোর আক্রমণ চালিয়ে কালেদিনের সৈন্যরা রেড গার্ডদের সারিটাকে পেছনে হটিয়ে দিল। নাখিচেভান শহরতলির রাস্তায় ঝলক দিতে লাগল পিছু-হটা রেড গার্ডদের কালো ওভারকোট আর গ্রেটকোট। ডান দিকের রক্ষণভাগের শেষ প্রান্তের মেশিনগানটা শ্বেতরক্ষীদের হাতে চলে গেল। এক সিনিয়র শিক্ষানবিশ-অফিসার সামনা-সামনি গুলি করে মেরে ফেলল গ্রীক মিখালিদিকে। দ্বিতীয় চালকটিকে তালিমের সময়কার নকল

মানুষের মতো বেয়নেটে গেঁথে ফেলল। একমাত্র কম্পোজিটর স্তেপানভ পালিয়ে বাঁচল।

ট্রলারগুলো থেকে যখন প্রথম গোলা ছুটতে শুরু করল তখন বন্ধ হল পিছু হটা।

'লাইন বেঁধে চল! আমার পেছন পেছন চল!' চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে বুন্‌চুকের পরিচিত একজন লোক – বিপ্লবী কমিটির সদস্য।

রেড গার্ডদের লাইন নড়েচড়ে উঠল, বেঁকেচুরে গেল তাদের সারি, তারা এগিয়ে গেল আক্রমণ করতে। বুন্‌চুকের গা ঘেঁসে জড়সড় হয়ে পড়ে ছিল ক্রুতগোরভ, আন্না আর গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস। প্রায় পাশাপাশি তিনজন লোক চলে গেল তাদের পাশ দিয়ে। একজন সিগারেট টানছিল, আরেকজন চলতে চলতে রাইফেলের টিপকলটা হাঁটুতে ঠুকে দেখছিল, তৃতীয়জন খুব নিবিষ্ট হয়ে তার ওভারকোটের কাদা-লাগা কিনারা দেখছিল। লোকটার মুখে, তার গোঁফের প্রান্তে লেগে ছিল কুণ্ঠাজড়িত মৃদু হাসি – দেখে মনে হচ্ছিল না যে মৃত্যুর মুখে চলেছে; মনে হচ্ছিল যেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পানভোজনের পর বাড়ি ফেরার পথে কাদামাখা ওভারকোটটা দেখে বোঝার চেষ্টা করছে বাড়িতে কুঁদুলে বেউয়ের কাছ থেকে কী ধরনের শাস্তি প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

দূরের একটা বেড়ার পেছনে গিজগিজ করছিল কতকগুলো মানুষের ছোট ছোট ধূসর মূর্তি। সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ক্রুতগোরভ চেঁচিয়ে বলল, 'ওই যে ওরা!'

'ঘোরাও ও দিকে!' বুন্‌চুক প্রচণ্ড শক্তিতে মেশিনগান টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল।

মেশিনগানের গুলির তুমুল কলকণ্ঠে কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম, আন্না তাই কান বন্ধ করতে বাধ্য হল। আলগোছে বসে পড়ে সে দেখতে পেল বেড়ার ওপাশে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এক মিনিট পরেই সেখান থেকে সমান তালে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে লাগল, মাথার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আবছা আকাশের পটে অদৃশ্য ছিদ্র করে চলল। ঢাকের গুরুগুরু আওয়াজের মতো বাজতে লাগল মেশিনগানের ছর্‌রা, শুকনো চটচট আওয়াজ করে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে মেশিনগানের ভেতরে ঘুরে ঘুরে জ্বলতে লাগল গুলির ফিতেগুলো। থেকে থেকে বিচ্ছিন্ন একেকটা গুলি পূর্ণশক্তিতে গমগম করে ফেটে পড়ছিল। কৃষ্ণসাগরের নাবিকরা ট্রলার থেকে যে সমস্ত গোলা ছুঁড়ছিল সেগুলো মাথার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে প্রচণ্ড আর্তনাদ আর কড়কড় শব্দে ফেটে পড়তে লাগল। আন্না দেখতে পেল একেকটা গোলা যেই উড়ে যাচ্ছে অমনি বিলিতি কেতায় ছিমছাম গোঁফ-ছাঁটা, ভেড়ার চামড়ার টুপি মাথায় লম্বা মতন এক রেড

গার্ড আপনা থেকেই মাথাটা নামিয়ে ফেলছে আর উচ্ছ্বাসভরে চেঁচিয়ে বলছে, 'চালাও, চালাও! এই ত চাই সেমিওন! আরও বেশি করে ঢাল ওগুলোর ওপর!'

গোলা অবশ্য সত্যি সত্যি বেশি করেই পড়ছিল। নাবিকরা ওদের পাল্লার মধ্যে পেয়ে এক জায়গায় তাক করে গোলা ছুঁড়তে লাগল। কালেদিনের লোকেরা বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটছে, ঘন ঘন গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়তে লাগল তাদের ওপরে। কামানের একটা গোলা পলায়নপর শত্রুপক্ষের ভাঙা সারির মাঝখানে গিয়ে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধূসর স্তম্ভ লোকজনকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ফেলে দিল গোলার আঘাতে তৈরি গর্তটার ভেতরে। তারপর ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসতে থাকে গর্তটার মাথার ওপরকার ধোঁয়া। হাতের দূরবীনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নোংরা হাতে আতঙ্কবিস্ফারিত দু'চোখ ঢেকে আর্তনাদ করে ওঠে আন্না। দূরবীনের গোল কাঁচের ভেতর দিয়ে সেই বিস্ফোরণের আবছায়া ঘূর্ণি আর ওদের লোকজনের মারা যাওয়ার দৃশ্য সে কাছে দেখতে পেরেছিল। তার গলা বুজে এলো।

'কী হল?' তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বুনচুক চেঁচিয়ে ওঠে।

দাঁতে দাঁত চেপে থাকে আন্না। তার চোখের মণিদুটো বিস্ফারিত, ঘোলাটে হয়ে উঠছে চোখজোড়া।

'আমি পারব না।...'

'সাহস ধর!... শুনছ... আন্না, শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?... অমন করে না!... অমন করতে নেই!' আন্নার কানের কাছে গলা ফাটিয়ে ধমক দিয়ে বলল সে।

ডান দিকের রক্ষণভাগে, একটা ছোট টিবির পায়ের কাছে, উপত্যকার ওপরে শত্রুপক্ষের কিছু পদাতিক সৈন্য জড় হতে শুরু করেছে। বুনচুক সেটা লক্ষ করে মেশিনগান নিয়ে ছুটল আরও একটা সুবিধাজনক জায়গায়। গুলি ছুঁড়ে টিলা আর নাবাল জায়গাটার দখল নিল।

কট্ কট্ কট্ কট্ শব্দে থেকে থেকে অসমান তালে বেজে চলল রেবিণ্ডারের মেশিনগান।

হাত দশেকের মধ্যে কে যেন ভাঙা গলায় ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল।

'স্ট্রেচার!... স্ট্রেচার নেই?... স্ট্রেচার গেল কোথায়?...'

'তা-ক ক-র!' সুর করে টেনে টেনে বলল ফ্রন্ট সৈন্যদের প্লেটুন-কম্যাণ্ডার। 'ফায়ার, ফায়ার!'

সন্ধ্যার দিকে রুক্ষ মাটির বুকে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল প্রথম মিহি বরফ। আক্রমণ করতে গিয়ে এবং পিছু হটার সময় লড়াই করতে করতে সৈন্যরা যে সমস্ত জায়গা মাড়িয়ে গেছে, যেখানে যেখানে তারা ঢলে পড়েছে, এক ঘণ্টার

মধ্যেই সর্বত্র মাটির ডেলার মতো কালো কালো মৃতদেহের স্তূপ আর মাঠঘাট – সব ছেয়ে গেল ভিজে চটচটে বরফের গুঁড়োয়।

সন্ধ্যানাগাদ পিছু হটে গেল কালেদিনের বাহিনী।

সদ্য তুষারপাতের ফলে রাত অস্পষ্ট সাদা ঝলক দিচ্ছে। সেই রাতে বুনচুককে কাটাতে হল মেশিনগানের ঘাঁটিতে। ক্রুতগোরভ কোথা থেকে যেন ঘোড়ার গা ঢাকার একটা দামী চাদর হাতিয়েছিল। তাই দিয়ে মাথা ঢেকে ভিজে ছিবড়ে মাংস খেতে লাগল সে, থেকে থেকে থুতু ফেলতে লাগল আর অস্ফুটস্বরে শাপ-শাপান্ত করে চলল। সেখানেই উপকণ্ঠের বাড়ির আঙিনার ফটকের কাছে গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎসও ছিল। ঠাণ্ডায় ঝিঝি-ধরা কালশিটে-পড়া আঙুলগুলো সিগারেটের আগুনের ওপর রেখে গরম করতে লাগল সে। আন্না ঠকঠক করে কাঁপছিল। গ্রেটকোটের কিনারা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কার্তুজের একটা দস্তার বাক্সের ওপর বসে রইল বুনচুক। আন্না ভিজে দুই হাতে শক্ত করে চোখ চেপে রেখেছিল। থেকে থেকে তার চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বুনচুক চুমু খেতে থাকে তার হাতের তালুতে। অনেক কষ্টে বুনচুকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে অনভ্যস্ত কোমল কথাগুলো।

'এ কী ব্যাপার বল ত? . . . তোমার যে মনের জোর ছিল . . . আনিয়া,* কথা শোনো, শক্ত হও! . . . আনিয়া, লক্ষ্মী আমার! . . . শুনছ? . . . অভ্যেস হয়ে যাবে। . . . তোমার অহঙ্কার যদি ছেড়ে চলে যাবার পথে বাধা হয়, তাহলে অন্য রকম হতে হবে তোমাকে। যারা মারা গেছে তাদের দিকে তাকাতে নেই। . . . পাশ কাটিয়ে চলে যাও, ব্যস! ওসব ভাবনাচিন্তাকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিও না, ওগুলোর রাস টানতে হবে। দেখলে ত, তুমি বললে কী হবে, তোমার মেয়েলি স্বভাব যাবে কোথায়!'

আন্না চুপ করে রইল। শরতের মাটি আর মেয়েলি উষ্ণতাভরা একটা গন্ধ ভেসে আসছিল তার হাত থেকে।

ঝিরঝিরে তুষারের আবছা কোমল আস্তরণে আকাশ ছেয়ে গেল। আশেপাশের মাঠঘাট, আঙিনা আর ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা শহরের বুকে নেমে এলো ঝিমঝিম তন্দ্রার ঘোর।

---

* আন্নার ডাকনাম। – অনুঃ

সাত

রস্তোভ শহরের একেবারে ভেতরে আর তার আশপাশ জুড়ে লড়াই চলল ছয় দিন ধরে।

রাস্তায় রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লড়াই চলেছে। রেড গার্ডরা দু'-দু'বার রস্তোভ রেলস্টেশন ছেড়ে দিল, আবার দু'বারই শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে দিল সেখান থেকে। ছয় দিনের লড়াইয়ে কোন পক্ষই কোন পক্ষের কাউকে বন্দী করতে পারল না।

নভেম্বরের ২৬ তারিখে সন্ধ্যার আগে আগে মালস্টেশনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল আন্না আর বুন্‌চুক। বুন্‌চুক দেখতে পেল দু'জন রেড গার্ড এক বন্দী অফিসারকে গুলি করে মারছে। আন্না মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। বুন্‌চুক খানিকটা উদ্ধত ভঙ্গিতেই তার দিকে ফিরে বলল, 'এই তো চাই! ওদের মেরে ফেলা উচিত, কোন রকম দয়ামায়া না দেখিয়ে খতম করা উচিত। ওরা আমাদের কোন দয়া দেখায় না, তাছাড়া ওদের দয়া আমরা চাইও না। ওদের ওপর দরদ দেখানোর কোন অর্থ হয় না। চুলোয় যাক ওরা! দুনিয়া থেকে এই আবর্জনাস্তূপ সাফ করতে হবে! তাছাড়া মোদ্দা কথা হল, যখন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন ভাবাবেগের কোন স্থান হতে পারে না। ঠিকই করছে এই মজুররা!'

তিন দিনের দিন অসুস্থ হয়ে পড়ল বুন্‌চুক। ভেতরে ভেতরে একটা বমিবমি ভাব অনবরত বৃদ্ধি পেতে লাগল, সারা দেহে দুর্বলতা বোধ করতে লাগল সে, মাথাটা লোহার মতো অসহ্য ভারী হয়ে উঠল, ভেতরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হতে লাগল। এই অবস্থায় আরও একটা দিন খাড়া হয়ে রইল বুন্‌চুক।

২ ডিসেম্বর ভোরবেলায় রেড গার্ডদের বিশৃঙ্খল বাহিনীগুলো শহর ছেড়ে চলে গেল। মেশিনগান আর আহতদের নিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। আন্না আর ক্রুতগোরভের গায়ে ভর দিয়ে গাড়ির পেছন পেছন হেঁটে চলল বুন্‌চুক। অতি কষ্টে সে তার অবসন্ন শক্তিহীন দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল। লোহার মতো ভারী অবাধ্য পাদুটো বাড়িয়ে দিতে লাগল যেন ঘুমের ঘোরে। দূরে চোখে পড়ল আন্নার মিনতি ও উদ্বেগভরা দৃষ্টি, বহু দূর থেকে যেন কানে এসে বাজতে লাগল তার কথাগুলো।

'গাড়িতে উঠে বোসো ইলিয়া, শুনছ? তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না ইলিউশা?* তোমার পায়ে পড়ি, উঠে বোসো, তোমার যে অসুখ করেছে!'

* ইলিয়ার ডাকনাম - আদরার্থে। - অনুঃ

কিন্তু আন্নার কথাগুলো বুঝতে পারল না বুন্চুক, এও বুঝতে পারল না যে ভেঙে পড়েও সে যুঝে চলেছে, ইতিমধ্যে টাইফাসের কবলে সে পড়ে গেছে। বাইরে কোথায় যেন অচেনা এবং অদ্ভুত পরিচিত নানা কণ্ঠস্বর মাথা কুটে মরছে, কিন্তু তার চৈতন্যের ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না, অনেক অনেক দূরে কোথায় যেন নিদারুণ উদ্বেগের আগুনে ধিকিধিকি জ্বলছে আন্নার কালো দুটো চোখ। একটা বিকট কুণ্ডলী পাকিয়ে দুলছে ক্রুতগোরভের দাড়িটা।

বুন্চুক মাথাটা আঁকড়ে ধরল, টসটসে লাল মুখে চেপে ধরল জ্বরতপ্ত প্রশস্ত দুই করতল। তার মনে হল চোখ ফেটে বুঝি রক্ত বেরোচ্ছে, আর অদৃশ্য কোন এক পর্দার আড়াল দেওয়া কূলকিনারাহীন, সমস্ত জগৎটা যেন চঞ্চল হয়ে দুরন্ত ঘোড়ার মতো সামনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে, বুন্চুকের পায়ের নীচ থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে। বিকারের ঘোরে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সব দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ক্রুতগোরভ তাকে গাড়িতে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সে বার বার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল।

'না, দরকার নেই! দাঁড়াও! কে তুমি? আন্না গেল কোথায়? . . . মাটির একটা ডেলা তুলে দাও আমাকে। . . . এই ব্যাটাদের খতম করে দাও - মেশিনগানের গুলিতে, আমি হুকুম দিচ্ছি! সোজাসুজি মেশিনগান তাক কর! . . . দাঁড়াও, দাঁড়াও! . . . ওঃ কী গরম! . . .' আন্নার হাতের মুঠো থেকে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলল।

জোর করে তাকে গাড়িতে শুইয়ে দেওয়া হল। আরও মিনিটখানেক সে অনুভব করল একটা কড়া পাঁচমিশালী গন্ধ, চোখের সামনে ঝলকে উঠল নানা ধরনের সমস্ত রঙ; নিজের চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিদারুণ আতঙ্কে সে প্রাণপণ যুঝতে লাগল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। একটা কালো শব্দহীন শূন্যতা ফুলে ফেঁপে উঠে গ্রাস করে ফেলল তার চৈতন্যকে। শুধু কোথায় যেন অনেক উঁচুতে কয়লার নীল আঁচের মতো ঝলমল করে জ্বলতে লাগল উপলমণির একটা টুকরো, তারই সঙ্গে জড়ানো আঁকাবাঁকা সোনালি বিদ্যুতের চমক।

আট

চালার খড়ের সঙ্গে মিশে হলুদ রঙ ধরে ঝুলছিল বরফের কাঠি। এখন কাচের মতো টুংটাং আওয়াজ করে সেগুলো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে। গ্রামের মাঠেঘাটে বরফ গলতে শুরু করেছে। জায়গায় জায়গায় জেগে উঠেছে খালি

মাটির চাপড়া আর জলের ডোবা। গোরুবাছুরগুলোর গায়ের লোম এখনও পড়ে নি। রাস্তায় রাস্তায় এখানে ওখানে তারা নাকে শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ির উঠোনে জড়ো করে রাখা লকড়ির গাদার মধ্যে চড়ুই পাখিরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, কিচিরমিচির করছে, যেন বসন্ত এসে গেছে। পেটপুরে দানাপানি খেয়ে লালচে বাদামী রঙের ঘোড়াটা বাড়ির উঠোন থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধরার জন্য বারোয়ারিতলায় ছুটেছে মার্তিন শামিল। ঘোড়াটা জট-পড়া বিশাল লেজটা খাড়া করে শূন্যে উঁচিয়ে এলোমেলো কেশর হাওয়ায় উড়িয়ে পা ছুঁড়ে চাঁট মারতে লাগল, পায়ের খুর থেকে আধগলা বরফের ডেলা অনেক দূরে ছিটাতে লাগল, বারোয়ারিতলার ওপর কয়েকটা চক্কর মারল, তারপর গির্জার পাঁচিলের ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইট শুঁকতে লাগল। মনিবকে কাছে আসতে দিল, বেগনী রঙের একটা চোখ টেরিয়ে তার হাতে ধরা মুখের সাজটার দিকে তাকাল, তারপর আবার পিঠ টানটান করে ক্ষিপ্ত হয়ে চার পা তুলে ছুট দিল।

জানুয়ারী মাস। তার উষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন কয়েকটা দিন যেন মাটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। অকালে বান ডাকতে পারে এই আশঙ্কায় কসাকরা দনের ওপর নজর রাখতে লাগল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কোর্‌শুনভ সেই দিন বাড়ির পেছনের উঠোনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরু বরফে ঢাকা ঘাসজমি আর বরফ-জমাট সবুজাভ ময়ূরকণ্ঠী রঙের দনের শোভা দেখছিল। দেখতে দেখতে সে মনে মনে ভাবল, ‘গত বছরের মতো এবারেও গলা-বরফের জলে আমাদের খুব এক চোট নাইয়ে ছাড়বে! ওঃ যা বরফ জমেছে! এত বরফের চাপে মাটি শক্ত হয়ে না যায়– নিঃশ্বাসই নিতে পারছে না যে মাটি!’

তার ছেলে মিত্‌কা শুধু একটা খাকী রঙের ফৌজী শার্ট গায়ে গোয়াল সাফ করছিল। মিত্‌কার মাথার সাদা লোমের লম্বা ককেশীয় টুপিটা যেন কোন মন্ত্রবলে তার মাথার পেছনে আটকে আছে। মাথার সোজা চুলগুলো ঘামে ভিজে গেছে, কপালের ওপর এসে পড়ছে। গোবরের গন্ধ ভরা নোংরা হাতের পিঠ দিয়ে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিতে লাগল সে। উঠোনের ফটকের কাছে হিমে জমাট হয়ে পড়ে আছে একগাদা গোবর। একটা ফুরফুরে লোমওয়ালা ছাগল সেই গাদাটা মাড়াচ্ছে। বেড়ার গায়ে গাদাগাদি করে আছে ভেড়ার পাল। মায়ের চেয়েও বড়সড় হয়ে ওঠা একটা বাছুর তার মায়ের দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মা তাকে ঢুঁ মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এক পাশে একটা কালো রঙের শিঙ পাকানো খাসী-করা ভেড়া লাঙলের গায়ে পিঠ চুলকোচ্ছে।

গোলাবাড়ির দরজায় গেরিমাটির প্রলেপ লাগানো হয়েছে। পাশেই শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে ঝুলে-পড়া গাল, প্রকাণ্ড মুখ, হলুদ ভুরুওয়ালা এক বিশাল কুকুর।

বাইরে চালার নীচে, গোলাঘরের দেয়ালের গায়ে কিছু ঝাঁকি-জাল ঝুলছে। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে গ্রিশাকা দাদু দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সেগুলো – স্পষ্টতই আসন্ন বসন্তের কথা, মাছধরার সরঞ্জামগুলো মেরামত করার কথা ভাবছে।

মাড়াই-উঠোনে চলে এলো মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। খড়ের গাদায় কতটা খড় আছে তীক্ষ্ণ হিসাবী দৃষ্টিতে মনে মনে তার একটা হিসাব করে নিল। ছাগলে খেতে গিয়ে কিছু জনারের খড় গাদা থেকে টেনে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ফেলেছিল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ একটা বিদেকাঠি দিয়ে সেগুলো আঁচড়ে এক জায়গায় জড়ো করতে যাবে, এমন সময় তার কানে এলো কতকগুলো অপরিচিত কণ্ঠস্বর। বিদেকাঠিটা খড়ের গাদার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনের উঠোনে ফিরে গেল সে।

মিত্‌কা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট পাকাচ্ছে। তার দু'-আঙুলের ফাঁকে জমকাল কারুকাজ করা একটা বটুয়া – প্রেয়সীর উপহার। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে খ্রিস্তোনিয়া আর ইভান আলেক্সেয়েভিচ। নীলরঙের আতামান গার্ড-টুপির তলা থেকে খ্রিস্তোনিয়া সিগারেট পাকানো একটা তেলচিটে কাগজ বার করল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ উঠোনের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ের গ্রেটকোটের সামনেটা খোলা, তুলোঠাসা ফৌজী প্যান্টের দু'পকেট হাতড়াচ্ছে সে। নিখুঁত কামানো চকচকে মুখে চিবুকের ওপর কালো হয়ে জেগে আছে একটা ছোট্ট টোল। বোঝাই যাচ্ছে কিছু একটা ভুলে ফেলে এসেছে সে, তাইতে তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে বিরক্তির চিহ্ন।

'ভালো আছ ত মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ?' খ্রিস্তোনিয়া সম্ভাষণ করল।

'ভগবানের আশীর্বাদে ভালোই গো সেপাইরা।'

'এসো, আমাদের সঙ্গে তামাক খাও।'

'খ্রীষ্ট তোমাদের মঙ্গল করুন। এখুনি খেয়ে এলাম।'

লাল টোপর দেওয়া, তিনপাশ ঝোলানো গরম টুপিটা মাথা থেকে খুলে কসাকদের সঙ্গে করমর্দন করল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। মাথার সাদা চুলগুলো খাড়া হয়ে ছিল। হাত দিয়ে সেগুলোকে পাট করে নিয়ে মৃদু হাসল।

'তা কী মনে করে আতামান গার্ড-ভায়াদের আগমন?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা না দিয়ে খ্রিস্তোনিয়া একবার আপাদমস্তক তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। থুতু দিয়ে কাগজটা ভিজিয়ে নিয়ে ষাঁড়ের মতো বিশাল খসখসে জিভ অনেকক্ষণ ধরে সেটার ওপর বুলাল, তারপর সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'মিত্রির সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

বেড়া ধরে জাল হাতে ঝুলিয়ে পা ঘসটে ঘসটে ওদের পাশ দিয়ে চলে

যাচ্ছিল গ্রিশাকা দাদু। ইভান আলেক্সেয়েভিচ ও খ্রিস্তোনিয়া তাকে দেখে মাথার টুপি খুলে নমস্কার জানাল। বুড়ো গ্রিশাকা জালগুলো সিঁড়ির ওপর নামিয়ে রেখে ফিরে এলো।

'কী গো সেপাইরা, ঘরে বসে আছ যে? বৌ-মাগদের নিয়ে খুব ফুর্তি করা হচ্ছে, না?' বুড়ো মন্তব্য করল।

'নয়ত কী?' খ্রিস্তোনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'তুই চুপ ক'রে থাক ত খ্রিস্তোনিয়া! বলতে চাস কিছুই জানিস নে?'

'মাইরি বলছি জানি নে!' দিব্যি গেলে বলল খ্রিস্তোনিয়া। 'যিশুর দিব্যি, দাদু, জানি নে!'

'এই সেদিন ভরোনেজ থেকে একজন লোক এসেছিল, এক ব্যবসাদার, সের্গেই প্লাতোনিচ মোখভের জানাশোনা, নাকি তার কোন আত্মীয়ই হবে – ঠিক বলতে পারছি নে। তা সে যাই হোক, সে এসে বলল চের্তকোভে বাইরের ফৌজ এসে ঘাঁটি গেড়েছে – ওই যে বল্‌শাক না কী বলে, তারা। রাশিয়া আমাদের সঙ্গে লড়তে আসছে, আর তোমরা কিনা দিব্যি ঘরে বসে আছ! আর তুই . . . ওরে হারামজাদা মিত্‌কা, শুনছিস? তুই কেন চুপ করে আছিস রে? ভাবছ কী তোমরা?'

'আমরা কিছুই ভাবছি না,' ইভান আলেক্সেয়েভিচ হাসল।

'বিপদ ত এখানেই যে তোমরা কিছু ভাবছ না!' উত্তেজিত হয়ে বলল বুড়ো দাদু। 'তোরা সবকটা তিতির পাখির মতো জালে ধরা পড়বি! ওরে দুধের পোকারা, বুশী চাষাগুলো যখন তোদের ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে থেঁতলে দেবে তখন ঠ্যালা বুঝবি! . . .'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ মুখ টিপে হাসল। খ্রিস্তোনিয়া তার অনেক দিনের না-কামানো গালে হাত বুলাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ঘসঘস আওয়াজ হল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ মিত্‌কার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। মিত্‌কার তেরছা চোখের বিড়ালের মতো সবুজ মণিদুটোতে আগুনের কণা জমে উঠেছে – তার চোখজোড়া হাসছে না অতৃপ্ত ক্রোধে ধূমায়িত হয়ে উঠছে বোঝা কঠিন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ইভান আলেক্সেয়েভিচ ও খ্রিস্তোনিয়া বিদায় নিল। বিদায় নেওয়ার সময় মিত্‌কাকে গেটের কাছে ডেকে নিয়ে এসে ইভান আলেক্সেয়েভিচ ধমক দিয়ে বলল, 'কালকের মিটিং-এ যাও নি কেন?'

'সময় করতে পারি নি।'

'কিন্তু মেলেখভদের বাড়ি যাবার বেলায় ত সময় ছিল?'

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভেড়ার লোমের টুপিটা কপালের ওপর টেনে এনে চাপা ক্রোধে মিত্‌কা বলল, 'যাই নি – ব্যস, চুকে গেল। অত কথায় কাজ কী?'

'আমাদের গাঁয়ের যারা যারা লড়াইতে গিয়েছিল তারা সবাই ছিল – একমাত্র পেত্রো মেলেখভ ছাড়া। তুমি জান . . . গাঁ থেকে কামেন্‌স্কায়াতে প্রতিনিধি পাঠাব বলে ঠিক করেছি আমরা। দশই জানুয়ারী লড়াই-ফেরত ফৌজীদের কংগ্রেস হবে সেখানে। দান ফেলে ঠিক করা হল কারা কারা প্রতিনিধি হবে – আমাদের তিনজনের নাম উঠেছে – আমার, খ্রিস্তোনিয়ার আর তোমার।'

'আমি যাচ্ছি না,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল মিত্‌কা।

'বল কী!' মিত্‌কার ফৌজী শার্টের একটা বোতাম চেপে ধরে ভুরু কুঁচকে বলল খ্রিস্তোনিয়া। 'নিজের সঙ্গীসাথীদের ছেড়ে যাচ্ছ ? কেন, পোষাচ্ছে না বুঝি ?'

'মেলেখভদের পেত্‌কাটার* সঙ্গে ওর দহরম মহরম . . .' খ্রিস্তোনিয়ার গ্রেট-কোটের হাতা ধরে নাড়া দিয়ে ইভান আলেক্সেয়েভিচ বলে উঠল। তার মুখটা নজরে পড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেল। বলল, 'চল চল, দেখাই যাচ্ছে এখানে আমাদের কিছু করার নেই। . . . তাহলে, তুমি যাবে না ত মিত্রি ?'

'না। . . . 'যাব না' বলেছি যখন তার মানে – যাব না।'

'আচ্ছা চলি,' খ্রিস্তোনিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে বলল।

'এসো।'

খ্রিস্তোনিয়ার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মিত্‌কা তপ্ত হাতখানা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। তারপর ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

'শালা বদমাইশ!' অস্ফুটস্বরে বলল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। তার নাকের পাটা সামান্য কেঁপে উঠল। 'শালা বদমাইশ!' মিত্‌কা চলে যাচ্ছে দেখে তার চওড়া পিঠটার দিকে তাকিয়ে আরও উঁচু গলায় সে বলল।

বাড়ি ফেরার পথে তারা লড়াই থেকে ফেরা ফৌজীদের কাউকে কাউকে জানিয়ে দিল যে কোর্‌শুনভ যেতে অস্বীকার করেছে, তাই কাল ওরা দু'জনেই কংগ্রেসে যাচ্ছে।

জানুয়ারীর ৮ তারিখে ভোরবেলায় খ্রিস্তোনিয়া ও ইভান আলেক্সেয়েভিচ গ্রাম থেকে রওনা দিল। 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ স্বেচ্ছায় স্লেজগাড়ি করে নিয়ে চলল তাদের। ভালো জাতের দুটো ঘোড়া গাড়ির সামনের ডাণ্ডায় জোতা হল। ঘোড়াদুটো খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে টিলার পথ ধরল। বরফ গলে গিয়ে রাস্তার মাটি বেরিয়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় যেখানে বরফ সরে গেছে, স্লেজের রানার সেখানে মাটিতে আটকে যেতে লাগল, স্লেজ ঝাঁকুনি খেয়ে চলতে লাগল, ফিতের বাঁধনে টান পড়ায় ঘোড়াদুটোর কষ্ট হতে লাগল।

---

* পেত্রো – পেত্‌কা – অবজ্ঞার্থে। – অনুঃ

কসাকরা স্লেজ থেকে নেমে পেছন পেছন হেঁটে চলল। ভোরের হিমে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ। হাইবুটের নীচে মচমচে বরফ ভাঙতে ভাঙতে সে হেঁটে চলেছে। তার সারা মুখে জ্বলছে লাল আভা, শুধু অর্ধবৃত্তাকার সেই কাটা দাগটা মড়ার মতো নীল।

রাস্তার এক পাশে দানা দানা গুঁড়ো বরফ জমেছে। তার ওপর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ফুসফুসে বেশি বাতাস ঢুকে যাওয়ায় খ্রিস্তোনিয়ার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। ১৯১৬ সালে দুব্‌নোর উপকণ্ঠে জার্মানদের বিষাক্ত গ্যাস তার ফুসফুসে ঢুকে গিয়েছিল, তারই ফল।

টিলার ওপরে জোর হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডাও বেশি সেখানে। কসাকরা চুপচাপ পথ চলতে লাগল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ ভেড়ার চামড়ার কলারে মুখ জড়িয়ে নিল। দূরের ছোট বনটা আরও কাছে চলে আসতে লাগল। রাস্তাটা তার ভেতর দিয়ে ফুঁড়ে বেড়িয়ে একটা ঢিবির মাথায় গিয়ে উঠেছে। বনের ভেতরে জলের ধারার মতো ঝিরঝির শব্দে বাতাস বয়ে চলেছে। ডালপালা মেলা ওক গাছগুলোর কাণ্ডে কাণ্ডে আঁশ-আঁশ ছাতার চাকলা সোনালি-সবুজ নক্সা কেটে রেখেছে। দূরে কোথায় যেন কিচিরমিচির করে উঠল একটা ছাতার-পাখি। লেজটা একপাশে কাত করে রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে চলল। বাতাস তাকে ওড়ার পথ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিল, তাই কাত হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ডানা ঝাপটে উড়তে লাগল সে, ঝলমল করতে লাগল তার বিচিত্রবর্ণের পালকগুলো।

গ্রাম ছেড়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলে নি 'ঘোড়ার নাল'। এতক্ষণ পরে ইভান আলেক্সোয়েভিচের দিকে ফিরে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে বলল (সম্ভবত অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে চিন্তা করার পর কথাগুলো তৈরি করেছে), 'কংগ্রেসে গিয়ে চেষ্টা করো যাতে লড়াই না হয়। এমন একজনকেও পাবে না যে লড়াই চায়।'

'সে ত একশ' বার,' খ্রিস্তোনিয়া সায় দিল। মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে মনে মনে পাখির চিন্তাভাবনাহীন সুখী জীবনের তুলনা করতে করতে ঈর্ষাভরে তাকিয়ে দেখতে লাগল ছাতার-পাখিটার স্বচ্ছন্দ ওড়া।

১০ জানুয়ারী সন্ধ্যার দিকে তারা কামেন্‌স্কায়ায় এসে পৌঁছুল। বড় জেলা-সদরটার রাস্তাঘাটের ওপর দিয়ে ভিড় করে কসাকরা চলেছে কেন্দ্রস্থলের দিকে। চারদিকে চোখে পড়ার মতো চাঞ্চল্য। খোঁজখবর নিয়ে গ্রিগোরি মেলেখভের বাসা যখন তারা খুঁজে বার করল তখন জানতে পারল যে সে বাড়ি নেই। বাড়িউলী. এক মোটাসোটা মহিলা, ভুরুর লোমগুলো তার সাদা; তাদের বলল যে গ্রিগোরি সভায় চলে গেছে।

'কোথায় হচ্ছে সেই সভাটা?' খ্রিস্তোনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'জেলা কাছারিতে হবে হয়ত, নয়ত পোস্টাপিসে,' উত্তরে এই কথা বলে বাড়িউলী নির্বিকার ভাবে খ্রিস্তোনিয়ার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

কংগ্রেস তখন পুরোদমে চলছে। অনেকগুলো জানলাওয়ালা বিরাট ঘরখানায় প্রতিনিধিদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। কসাকরা অনেকে সিঁড়ির ওপর, দরদালানে আর আশেপাশের ঘরগুলোতে ভিড় করে আছে।

'আমার পেছন পেছন থেকো,' কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ঘোঁত ঘোঁত করে খ্রিস্তোনিয়া বলল।

চলতে চলতে তার পেছন পেছন যে সরু ফাঁক তৈরি হচ্ছিল তারই ভেতর দিয়ে সামনে এগোতে লাগল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। কংগ্রেস যেখানে চলছে সেই ঘরে ঢোকার প্রায় মুখে তারা চলে এসেছে, এমন সময় একজন কসাক খ্রিস্তোনিয়াকে আটকাল। কথার টানে মনে হল দনের ভাটি অঞ্চলের লোক।

'ওহে কাতলা, একটু আস্তেসুস্থে ঘাই মারলেও ত পার!' টিপ্পনী কেটে সে বলল।

'আরে ছাড় বলছি!'

'এখানেই বরং দাঁড়িয়ে থাক! দেখতে পাচ্ছ না ভেতরে কোন জায়গা নেই।'

'ছাড় বলছি পিনপিনে মশা। নইলে তোকে পিষেই মেরে ফেলব!' খ্রিস্তোনিয়া দাবড়ানি দিয়ে বলল। তারপর অবলীলাক্রমে ছোটখাটো চেহারার কসাকটিকে জায়গা থেকে তুলে একপাশে সরিয়ে 'সামনে এগিয়ে চলল।

'ওঃ একেবারে যেন একটা ভল্লুক!'

'হ্যাঁ আতামান-গার্ড সেপাই বটে!'

'যেন একটা সাফ করার যন্তর! ঘোড়ার বদলে ওকে দিয়েই ত চার ইঞ্চি মুখের কামান বওয়ানো যায়!'

'চমৎকার ভাবে সরিয়ে দিল কিন্তু, তাই না!'

গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কসাকরা হাসতে থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সসম্ভ্রমে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে খ্রিস্তোনিয়াকে। মাথায় সকলের চেয়ে উঁচু সে।

পেছনের দেয়ালের কাছে গ্রিগোরিকে পাওয়া গেল। উবু হয়ে বসে তামাক খেতে খেতে ৩৫ নম্বর রেজিমেন্টের প্রতিনিধি এক কসাকের সঙ্গে কথা বলছে। গ্রামের লোককে দেখতে পেয়ে তার কালো কুচকুচে ঝোলা গোঁফজোড়া হাসিতে কেঁপে উঠল।

'আরে! কোন্ হাওয়ায় এখানে উড়িয়ে নিয়ে এলো তোমাদের? ইভান আলেক্সেয়েভিচ, কী খবর? কেমন আছ খ্রিস্তোনিয়া খুড়ো?'

'ভালো, ভালো, তবে যত বড় শরীরটা দেখছ তত ভালো নয়,' নিজের বিশাল হাতের মুঠোর মধ্যে গ্রিগোরির হাতটা চেপে ধরে খ্রিস্তোনিয়া হেসে বলল।

'আমাদের গাঁয়ের সবাই কে কেমন আছে?'

'ভগবানের আশীর্বাদে সব ভালো। সবাই প্রণাম জানিয়েছে। বাপ বলেছে তাড়াতাড়ি এসে দেখা করে যেতে।'

'পেত্রোর খবর কী?'

'পেত্রো . . .' ইভান আলেক্সেয়েভিচ আনাড়ির মতো হাসল। 'আমাদের মতো লোকজনের সঙ্গে সে মেলামেশা করে না।'

'তা জানি। আর নাতালিয়া? বাচ্চারা? দেখা হয়েছিল?'

'সবাই ভালো আছে। তোমাকে ভালোবাসা আর প্রণাম জানিয়েছে। তোমার বাপের কিন্তু রাগ পড়ে নি। . . .'

মঞ্চের ওপর সভাপতিমণ্ডলীর আসনে কসাকদের যে দলটি বসে ছিল খ্রিস্তোনিয়া মাথা ঘুরিয়ে ভালো করে তাদের দেখতে লাগল। পেছনে দাঁড়িয়েও যে-কোন লোকের চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছিল সে। বৈঠকের মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য একটা বিরতি ছিল, সেই সুযোগে গ্রিগোরি একের পর এক প্রশ্ন করে চলল তাদের। গ্রামের কথা, গ্রামের এটা ওটা নানা খবর দিতে দিতে যুদ্ধ-ফেরতা কসাকদের যে সভা থেকে তাকে আর খ্রিস্তোনিয়াকে এখানে পাঠানো হয়েছে ইভান আলেক্সেয়েভিচ তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। কামেন্স্কায়ায় কী ঘটছে, কী বৃত্তান্ত জানার জন্য সে গ্রিগোরিকে প্রশ্ন করতে যাবে, এমন সময় মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে থেকে কে যেন ঘোষণা করল, 'ভাইসব, এখন বলবেন খনিমজুরদের এক প্রতিনিধি। সকলের কাছে অনুরোধ, মন দিয়ে শুনুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।'

মাঝারি আকারের একজন লোক সুন্দর করে আঁচড়ানো মাথায় লালচে বাদামী চুলগুলো হাত দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করল। এতক্ষণ ধরে মৌমাছির মতো যে গুঞ্জন চলছিল হঠাৎ এক আঘাতে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটার জ্বালাময়ী আবেগদীপ্ত বক্তৃতায় একেবারে গোড়া থেকেই গ্রিগোরি এবং উপস্থিত আর সকলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল তার মতবাদের প্রচণ্ড শক্তি। সে বলল যে কসাক সম্প্রদায়কে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে কালেদিন বিশ্বাসঘাতক রাজনীতির পরিচয় দিয়েছে। কসাক আর মজুরদের স্বার্থ যে সমান এবং কসাক প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে বলশেভিকরা যে-উদ্দেশ্য সাধন করতে চলেছে সেই সব কথাও সে বলল।

'আমরা খেটে-খাওয়া কসাকদের দিকে ভাই-বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা আশা করি, যে-সমস্ত কসাক লড়াই থেকে ফিরে এসেছে শ্বেতরক্ষী দস্যুদলের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াইয়ে তাদের মধ্যে আমরা বিশ্বাসী মিত্র খুঁজে পাব। জারের সময়কার রুশ-জার্মান যুদ্ধে মজুর আর কসাকরা একই সঙ্গে খুন ঢেলেছে; আর আজ কালেদিনের প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ভুঁইফোঁড় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইতেও আমরা একসঙ্গে থাকব – আমাদের একসঙ্গে থাকতেই হবে! যুগযুগান্তর ধরে খেটে-খাওয়া মানুষদের যারা পদানত করে রেখে দিয়েছে, আমরা আজ হাত ধরাধরি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব!' বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে বলল সে।

'শালা শুয়োরের বাচ্চা! দাও ঝেড়ে আচ্ছা করে! . . .' উল্লসিত হয়ে ফিসফিস করে কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগোরির কনুইটা খ্রিস্তোনিয়া এত জোরে চেপে ধরল যে যন্ত্রণায় গ্রিগোরির চোখমুখ কুঁচকে গেল।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ মুখটা অর্ধেক হাঁ করে শুনতে লাগল, উত্তেজনায় ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ঠিক! ঠিক কথা বলেছে!'

এই প্রতিনিধিটির পর বাতাসে দোদুল্যমান অ্যাশ গাছের মতো দুলতে দুলতে বক্তৃতা দিতে উঠল একজন ঢ্যাঙা খনিমজুর। উঠে যেন ভাঁজ খুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল, উপস্থিত জনতার অসংখ্য চোখের ওপর নজর বুলিয়ে নিল, হৈ-হট্টগোল থিতিয়ে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। গুণটানার কাছির মতো দড়ি-পাকানো চেহারা মজুরটির, দেখলে বেশ আশাভরসা রাখার মতো পোক্ত বলেই মনে হয়। শুকনো শরীর থেকে একটা সবজে আভা ফুটে বেরোচ্ছে – যেন গন্ধকের প্রলেপ লাগানো। সারা মুখ জুড়ে লোমকূপের সঙ্গে গেঁথে আছে মিহি কয়লার কালো কালো গুঁড়ো – বুঝিবা ধুলেও ওঠার নয়। খনির গর্তের অন্তহীন তিমির আর কালিমায় নিষ্প্রভ, ম্লান তার চোখজোড়া। সেই একই রকম কয়লার দীপ্তি ঝরে পড়ছে তার ক্লান্ত দু'চোখে। মাথার ছোট ছোট চুলগুলোকে সে ঝাঁকিয়ে ঠিক করে নিল, খনিতে গাঁইতি চালানোর ভঙ্গিতে শক্ত মুঠো করে দু'হাত নাড়াল।

'ফ্রন্টে ফৌজীদের ওপর মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছে কে? কর্নিলভ! কালেদিনের সঙ্গে মিলে কে আমাদের টুটি টিপে ধরার মতলব করছে? কে আবার? ওই কর্নিলভ!' ঘন ঘন চিৎকার করতে লাগল সে, তার মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল কথাগুলো: 'কসাকরা! কসাক ভাইরা! ভাই! ভাইসব! কার পক্ষ নেবে তোমরা? ভাই ভাইয়ের বুক চিরে রক্ত খাক – এই হল কালেদিনের ইচ্ছে! না, না, তা হবে না! ওরা বললেই হল! আমরা ব্যাটাদের পিষে মেরে ফেলব,

সবগুলোকে পিষে মেরে ফেলব! ঝাড়েবংশে মেরে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব!'

'শ্-শা-লা শুয়োরের বাচ্চা!' আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে খ্রিস্তোনিয়া বলল, উল্লসিত হয়ে দু'হাত দু'দিকে ছড়াল, আর সামলাতে না পেরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ঠি-ই-ক কথা! . . . দাও ব্যাটাচ্ছেলেদের আচ্ছা করে!'

'চুপ করে থাক ত! অ্যাই খ্রিস্তান, কী হচ্ছে? তোমাকে এখান থেকে বার করে দেবে কিন্তু!' ইভান আলেক্সেয়েভিচ শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

বুকানোভ্স্কায়ার সেই কসাক লাগুতিন এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে আহূত সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কসাক বিভাগের প্রধান সভাপতি হয়েছে। কথা সে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারল না, কিন্তু তার জ্বালাময়ী কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে কসাকদের উৎসাহিত করে তুলল। মঞ্চে সভাপতিত্ব করছিল পদ্তিওল্কভ। সেও বক্তৃতা দিল। তার পরে বক্তৃতা দিতে উঠল বিলিতিছাঁদে ছাঁটা-গোঁফ সুপুরুষ শ্চাদেন্কো।

'এ কে?' বিদাকাঠির মতো লম্বা হাতটা উঠিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গ্রিগোরিকে জিজ্ঞেস করল খ্রিস্তোনিয়া।

'শ্চাদেন্কো। বলশেভিকদের কম্যাণ্ডার।'

'আর ওই যে ওখানে?'

'মান্দেলস্তাম।'

'কোত্থেকে?'

'মস্কো থেকে।'

'আর ওখানে – ওরা কারা?' ভরোনেজ-কংগ্রেসের একদল প্রতিনিধিকে দেখিয়ে খ্রিস্তোনিয়া জানতে চাইল।

'আহা, একটু চুপ কর না খ্রিস্তোনিয়া!'

'মাইরি বলছি, বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে! . . . বল না আমাকে, ওই যে পদ্তিওল্কভের পাশে বসে আছে, লম্বা মতন লোকটা – কে ও?'

'ক্রিভশ্লিকভ। ইয়েলানস্কায়া জেলার গর্বাতভ গ্রামের লোক। ওর পেছনে যে দু'জন, ওরা আমাদের – কুদিনভ আর দনেৎস্কভ।'

'আচ্ছা, আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করি . . . ওই যে ওখানে . . . না, না, ও নয়! ওই যে একেবারে ধারে, মাথায় ঝুঁটি!'

'ইয়েলিসেয়েভ। . . . কোন্ জেলার, আমি জানি নে।'

খ্রিস্তোনিয়া সন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে গেল। আগের মতোই অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল নতুন বক্তার বক্তৃতা। শেষে শত শত কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিয়ে গমগম করে গর্জন করে উঠল, 'ঠিক কথা!'

কসাক বলশেভিক স্তেখিনের বক্তব্য শেষ হলে বক্তৃতা দিতে উঠল চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেন্টের এক প্রতিনিধি। অনেক কষ্টে পীড়াদায়ক রুক্ষ কথাগুলো সে ধরে ঠেলে ঠেলে বার করতে লাগল। একটা করে শব্দ উচ্চারণ করে – যেন বাতাসের গায়ে ছাপ মারে – চুপ করে থাকে, ফোঁস ফোঁস করে নাক টানে। কিন্তু কসাকরা রীতিমতো সহানুভূতির সঙ্গে তার কথাগুলো শুনতে লাগল, শুধু কদাচিৎ সমর্থনসূচক চিৎকার করে ব্যাঘাত করতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল লোকটার কথাগুলো কসাকদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলছে।

'ভাইসব! আমাদের কংগ্রেসের উচিত হবে এই গুরুতর ব্যাপারটাকে নিয়ে আলোচনা করা, যাতে কোন লোকের মনে কোন দুঃখ না থাকে, যাতে ভালোয় ভালোয়, শান্তিতে সব কিছু চুকে যায়।' তোতলাতে তোতলাতে টেনে টেনে সে বলল। 'আমি যা বলতে চাই তা এই যে এই খুন ঝরানো লড়াইয়ের পথ বাদ দিতে হবে আমাদের। অমনিতেই সাড়ে তিন বছর আমরা ট্রেঞ্চে পচেছি, তার ওপর যদি এখন আমাদের আবার লড়াইতে নামতে হয় তাহলে কসাকরা একেবারেই মারা পড়বে।...'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা!...'

'খাঁটি কথা!'

'আমরা লড়াই চাই না!...'

'বলশেভিক আর ফৌজী পরিষদের সঙ্গে কথা বলা দরকার!'

'শান্তির উপায় বার করতে হবে।... ওসব উল্‌টো-পাল্‌টা চাল নয়!'

পদ্‌তিওল্‌কভ টেবিলের ওপর দুম্ করে কিল মারতে চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেল। আবার ঝাঁটার মতো দাড়িতে বিলি কাটতে কাটতে চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেন্টের প্রতিনিধিটি টেনে টেনে বলতে লাগল, 'আমাদের উচিত, কংগ্রেস থেকে নোভো-চের্‌কাস্‌স্কে আমাদের নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানো, আমরা অনুরোধ করব যত স্বেচ্ছাসেবক আর গেরিলা আছে তারা যেন দয়া করে এখেন থেকে চলে যায়।... ভালোয় ভালোয় চলে যায় যেন।... আর বলশেভিকদেরও সেই একই কথা বলব।.. তাদেরও এখানে কিছু করার নেই।... মেহনতী মানুষের শত্রুদের সঙ্গে আমরা নিজেরাই মোকাবিলা করতে পারব। কারও কাছ থেকে কোন সাহায্যের আমাদের এখনও দরকার পড়ে নি, যখন দরকার হবে তখন ডেকে পাঠাব।'

'এসব কোন কাজের কথা নয়!'

'ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে!'

'রোসো, রোসো! কী 'ঠিক বলেছে'? বলতে চাও ওরা আমাদের যখন ঠেলে

গাড্ডায় ফেলে দেবে তখন সাহায্য চেয়ে পাঠাব? অবস্থা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছুবে যে কারও বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে।'

'আমাদের নিজেদের সরকার গড়তে হবে।'

'আহা কী কথাই বললে! গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল! এত গবেটও লোকজন হয়!'

৪৪ নম্বর রেজিমেন্টের প্রতিনিধির পর বক্তৃতা দিতে উঠল লাগুতিন। তীব্র জ্বালাময়ী কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে দিল সে, কিন্তু অনবরত চিৎকার-চেঁচামেচিতে বাধা পেতে লাগল। দশ মিনিটের বিরতির প্রস্তাব করা হল; কিন্তু যেই নিস্তব্ধতা নেমে এলো অমনি পদ্‌তিওল্‌কভ উত্তেজিত জনতার মাঝখানে ছুঁড়ে মারল তার কথাগুলো।

'কসাক ভাইসব! আমরা যতক্ষণ এখানে তর্কবিতর্ক করে মরছি ততক্ষণ মেহনতী মানুষের শত্রুরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। আমরা চাইছি সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। কিন্তু কালেদিন ঠিক তা ভাবছে না। এই সভায় যারা যারা যোগ দেবে তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করার একটা হুকুমনামা সে জারী করেছে – সেটা আমাদের হাতে এসে পড়েছে। সেই হুকুমনামাটা আমরা এখন পড়ে শোনাচ্ছি।'

সভার প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করার বিষয়ে কালেদিনের হুকুমনামা পড়ে শোনানোর পর উপস্থিত জনতার মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। এমন হৈ-হট্টগোল শুরু হল যে জেলা-ময়দানের কোন জমায়েতের কোলাহলই তার ধারেকাছে লাগে না।

'কথা নয়, কাজ চাই, কাজ!'

'চুপ! . . . চুপ! . . .'

'চুপ করার কী আছে! দাও ওদের গুঁড়িয়ে! . . .'

'লোবভ! লোবভ! . . . কিছু বল ওদের! . . .'

'রোসো! একটু রোসো!'

'কালেদিন লোকটা বোকা নয়!'

গ্রিগোরি এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, চোখের সামনে প্রতিনিধিদের মাথা আর হাতগুলো দুলছিল – তা-ই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু শেষকালে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'চুলোয় যাও সব! চুপ করলে! . . . বাজার পেয়েছ নাকি অ্যাঁ? পদ্‌তিওল্‌কভকে কথা বলতে দাও!'

৮ নম্বর রেজিমেন্টের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে ইভান আলেক্সেয়েভিচের তর্ক বেধে গেছে।

খ্রিস্তোনিয়ার নিজের রেজিমেণ্টেরই একজন লোক তার ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছে, খ্রিস্তোনিয়া গাঁক গাঁক করে তর্ক করে চলেছে – আক্রমণ ঠেকাচ্ছে।

'এখানেই ত হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল! . . . তুই কী সব আজেবাজে বোঝাতে এসেছিস আমাকে? . . . খেপেছিস নাকি? তোদের কথা ভেবে আমার বড় দুঃখু হয় রে ভাই! হুঁঃ, আবার বলে কিনা নিজেরাই চালাতে পারবে! – কত মুরদ জানা আছে!'

বহুকণ্ঠের বজ্রধ্বনি থিতিয়ে এলো (শক্তি ফুরিয়ে গেলে বাতাস যেমন ঢেউখেলানো গমক্ষেতের ওপর ভারী নিঃশ্বাস ফেলে)। কিন্তু পরিপূর্ণ স্তব্ধতা নেমে আসার আগেই তাকে ভেদ করে বেরিয়ে এলো ক্রিভশ্‌লিকভের মেয়েলি গলার তীক্ষ্ণ স্বর:

'কালেদিন নিপাত যাক! কসাক ফৌজী বিপ্লবী কমিটি জিন্দাবাদ!'

জনতা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। সমবেত কণ্ঠের সমর্থনসূচক বজ্রহুঙ্কার একটা রজ্জুর মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে কানের ভেতরে যেন আছড়ে পড়ল। ক্রিভশ্‌লিকভ হাতটা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতের আঙুলগুলো বাঁশপাতার মতো একটু একটু কাঁপতে লাগল। কান ফাটানো চিৎকারের রেশটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে আসতে না আসতে ক্রিভশ্‌লিকভ আগের মতোই কিনকিনে সরু গলা ছেড়ে আকুল হয়ে এমন ভাবে চিৎকার করে উঠল যেন কোন শিকারের পিছু ধাওয়া করছে সে।

'আমি প্রস্তাব করছি, এখানে যে প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছে তাদের ভেতর থেকে কসাক ফৌজী বিপ্লবী কমিটি নির্বাচন করা হোক! সেই কমিটির ওপর কালেদিনের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর ভার এবং . . .'

'হো-ও-ও!' গোলা বিস্ফারণের মতো ফেটে পড়ল প্রচণ্ড চিৎকার। গোলার ভাঙা টুকরোর মতো ছাদ থেকে ঝুরঝুর করে খসে পড়ল খানিকটা পলেস্তারা।

বিপ্লবী কমিটির সদস্য নির্বাচনের কাজ শুরু হয়ে গেল। ৪৪ নম্বর রেজিমেণ্টের সেই যে লোকটি বক্তৃতা দিতে উঠেছিল তার এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধির পরিচালনায় কসাকদের একটা মুষ্টিমেয় অংশ তখনও কসাক ফৌজী পরিষদের সঙ্গে বিরোধের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে মত প্রকাশ করে যেতে লাগল। কিন্তু সভায় উপস্থিত বেশির ভাগ প্রতিনিধিই তাদের আর সমর্থন করল না। কালেদিন তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য যে পরোয়ানা জারী করেছে সেটা শোনার পর কসাকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে – তারা নোভোচের্‌কাস্‌স্কে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার দাবি জানাল।

রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরে জরুরী তলব পড়ায় নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত দেখে

যাওয়া গ্রিগোরির পক্ষে সম্ভব হল না। যাবার সময় খ্রিস্তোনিয়া ও ইভান আলেক্সেয়েভিচকে সে বলল, 'শেষ হওয়ামাত্র আমার বাসায় চলে এসো। কে কে মেম্বার হল জানতে বড় ইচ্ছে করছে।'

রাত্রে ইভান আলেক্সেয়েভিচ ফিরল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চৌকাটের ওপাশ থেকেই সে জানাল, 'পদ্‌তিওল্‌কভ – চেয়ারম্যান, আর ক্রিভশ্‌লিকভ – সেক্রেটারী।'

'মেম্বার কারা কারা হল?'

'ইভান লাগুতিন আছে, গোলোভাচিওভ আছে, এছাড়া মিনায়েভ, কুদিনভ, আরও কারা কারা যেন আছে।'

'কিন্তু খ্রিস্তোনিয়া? খ্রিস্তোনিয়া গেল কোথায়?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'কসাকদের সঙ্গে গেছে, কামেনস্কায়ার কর্তাদের অ্যারেস্ট করতে। রেগে আগুন হয়ে গেছে, একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলছে। সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!'

খিস্তোনিয়া ফিরে এলো ভোরের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পায়ের জুতো খুলতে লাগল, অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে কী যেন বলতে লাগল। গ্রিগোরি বাতি জ্বালাল, দেখতে পেল তার ছাইরঙাধরা মুখখানা রক্তে মাখানো, কপালের খানিকটা ওপরে গুলিতে ছড়ে যাওয়ার দাগ।

'কে করল তোমার এই দশা? . . . ব্যাণ্ডেজ করে দিই? . . . দাঁড়াও এক্ষুনি করে দিচ্ছি, ব্যাণ্ডেজ বার করি,' বলতে বলতে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর অন্যান্য সরঞ্জামের খোঁজে।

'অমনিতেই সেরে যাবে, কুকুরের ঘা যেমন সেরে যায়,' গাঁক গাঁক করে বলল খ্রিস্তোনিয়া। 'আর্মির কম্যাণ্ডান্ট তার নাগান রিভল্‌ভার দিয়ে ঝেড়েছে। আমরা দিব্যি ভদ্রলোকের মতো সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ওর কাছে এলাম, ব্যাটা গুলি ছুঁড়তে লাগল। আরও একজন কসাককেও ঘায়েল করেছে। ইচ্ছে ছিল ওর কলজেটা টেনে বার করে আনি – দেখি অফিসারের কলজে কেমন হয়। কিন্তু আর সবাই করতে দিল না। নইলে ওটাকে দেখে নিতাম – ঠিক দেখে নিতাম।'

নয়

কামেনস্কায়ায় লড়াই-ফেরতা কসাকদের যে-সভা হয়েছিল তাতে ঘোষণা করা হল যে ফৌজী বিপ্লবী কমিটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। একথা জানার পর লেনিন বেতারে ঘোষণা করলেন যে দনের ছেচল্লিশটি কসাক রেজিমেণ্ট এক সরকার গঠন করেছে এবং সেই সরকার কালেদিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে।

লড়াই-ফেরতা কসাকরা পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েতগুলির সারা রাশিয়া কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধি পাঠাল। স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউটে* লেনিন তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'জনগণের শত্রুকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার এবং নোভোচের্‌কাস্‌স্ক থেকে কালেদিনকে হটানোর' আবেদন জানিয়ে সারা রাশিয়া কংগ্রেস কসাকদের কাছে একটা বার্তা পাঠাল।

কামেন্‌স্কায়ার কংগ্রেসের পরের দিন কালেদিনের নির্দেশে সভায় যোগদানকারী সকলকে গ্রেপ্তারের এবং অপেক্ষাকৃত বেশি বিপ্লবী কসাক ইউনিটগুলোকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে ১০ নম্বর দন-কসাক রেজিমেণ্ট এসে উপস্থিত হল।

ঠিক সেই সময় স্টেশনে একটা সভা হচ্ছিল। বক্তার ভাষণে কসাকদের বিপুল জনতার মধ্যে নানা রকম সাড়া জাগছে, সকলে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে।

মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছে পদ্‌তিওল্‌কভ। সে বলছিল, 'বাপের সমান গণ্যিমান্যি আর ভাই-বন্ধুরা! আমি কোন পার্টির মেম্বার নই, আমি বলশেভিকও নই। আমার উদ্দেশ্য মাত্র একটাই: ন্যায়বিচার, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর খেটে-খাওয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক; আমি চাই অত্যাচার বলে যেন কিছু না থাকে, কোন জোতদার, বুর্জোয়া আর ধনী যেন না থাকে, যেন সব মানুষ স্বাধীন হয়ে, মুক্ত হয়ে বাঁচতে পারে। . . . এই চেষ্টাই বলশেভিকরা করছে, এরই জন্যে তারা লড়াই করছে। বলশেভিকরা হল মজুর, আমাদের মতো, কসাকদের মতো তারাও খেটে-খাওয়া মানুষ। একমাত্র তফাত এই যে বলশেভিক মজুরদের জ্ঞানগম্যি আমাদের চেয়ে বেশি। আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওরা শহরের লোক বলে জীবনকে আমাদের চেয়ে ভালো ভাবে বুঝতে শিখেছে। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে বলশেভিক পার্টির মেম্বার না হয়েও আমি একজন বলশেভিক।'

রেজিমেণ্টটা ট্রেন থেকে নেমে মিটিং-এ সামিল হল। অর্ধেক রেজিমেণ্টই গড়ে উঠেছে রস্তোভ জেলার গুন্দোরোভ্‌কা শহর থেকে বাছাই করা জমকাল চেহারার লম্বা চওড়া জোয়ানদের নিয়ে। অন্যান্য রেজিমেণ্টের কসাকদের দলে ভিড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মতিগতিও একেবারে বদলে গেল। রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার যখন কালেদিনের হুকুম তামিল করতে বলল, তখন তারা সে আদেশ

---

* তৎকালীন পেত্রোগ্রাদের এক অভিজাত নারীশিক্ষায়তন। ১৯১৭ সালে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত ও পেত্রোগ্রাদের ফৌজী বিপ্লবী কমিটির দপ্তর। ১৯১৭ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত লেনিন এখানে বাস করতেন। – অনুঃ

অমান্য করল। বলশেভিকদের সমর্থকরা যে তীব্র প্রচার-অভিযান চালাল তার ফলে তাদের মধ্যে উত্তেজনা ফেনিয়ে উঠতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে কামেনস্কায়াতে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। দখল-করা স্টেশনগুলো ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সেখানকার সেনাবল বাড়ানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে কসাকদের দলে দলে জড় করে ট্রেনে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঘন ঘন সৈন্যবোঝাই ট্রেন চলেছে জ্‌ভেরেভো – লিখায়া লাইনে। প্রতিটি ইউনিটের নতুন নতুন কম্যাণ্ডার নির্বাচন করা হচ্ছে। যে-সব কসাক লড়াই চায় না তারা নিঃশব্দে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিভিন্ন গ্রাম আর জেলা-সদর থেকে দেরি করে পাঠানো প্রতিনিধিরা তখনও সভায় যোগ দিতে আসছে। কামেনস্কায়ার রাস্তায় রাস্তায় এমন প্রাণচাঞ্চল্য এর আগে আর দেখা যায় নি।

তেরোই জানুয়ারী দনের প্রতিবিপ্লবী সরকারের এক প্রতিনিধিদল আলাপ-আলোচনার জন্য কামেনস্কায়ায় এসে পৌঁছুল। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিল কসাক ফৌজী পরিষদের সভাপতি আগেয়েভ, পরিষদের সদস্য স্‌ভেতোজারভ, উলানভ, কারেভ, বাজেলভ আর কসাক সেনাপতি কুশ্‌নারিওভ।

স্টেশনে এক বিরাট জনতা তাদের দেখতে এলো। আতামান রক্ষিদলের কসাকরা তাদের আগলে আগলে নিয়ে চলল পোস্টাপিসের বাড়িতে। সেখানে সরকারী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ফৌজী বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের সারা রাত ধরে বৈঠক চলল।

ফৌজী বিপ্লবী কমিটির সতেরো জন সদস্য উপস্থিত ছিল। আগেয়েভ যখন ফৌজী বিপ্লবী কমিটির বিরুদ্ধে দনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বলশেভিকদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ আনল তখন পদ্‌তিওল্‌কভ প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে কড়া ভাষায় তার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিল। এর পর বক্তৃতা দিল ক্রিভশ্‌লিকভ ও লাগুতিন। দরদালানের ভেতরে যে সমস্ত কসাক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অনবরত চিৎকারে কুশ্‌নারিওভের বক্তৃতার ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। একজন মেশিনগানার বিপ্লবী কসাকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলের গ্রেপ্তারের দাবি জানাল।

সম্মেলনে কোন ফল হল না। রাত প্রায় দুটোর সময় যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন ফৌজী পরিষদের একজন সদস্য কারেভ প্রস্তাব করল যে সরকার গঠনের ব্যাপারে যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তার জন্য ফৌজী বিপ্লবী কমিটির তরফ থেকে একটা প্রতিনিধিদল নোভোচের্‌কাস্‌স্কে পাঠানো দরকার। প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

দন-সরকারের প্রতিনিধিদল চলে গেলে তাদের ঠিক পর পর পদ্‌তিওল্‌কভের নেতৃত্বে ফৌজী বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধিরাও নোভোচের্‌কাস্‌স্কে রওনা দিল।

পদ্‌তিওল্‌কভ, কুদিনভ, ক্রিভশ্‌লিকভ, লাগুতিন, স্কাচ্‌কোভ, গোলোভাচিওভ ও মিনায়েভ সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হল। আতামান রেজিমেণ্টের যে অফিসারদের কামেন্‌স্কায়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের জামিন হিশেবে রেখে দেওয়া হল।

দশ

গাড়ির জানলার বাইরে তুষার-ঝঞ্ঝা ঢেউ খেলিয়ে চলে যাচ্ছে। বিধ্বস্তপ্রায় বেড়ার ওপরে হাওয়ায়-চাটা বরফের স্তূপ চোখে পড়ে। সেগুলো শক্ত জমাট বেধে গেছে। তাদের ভাঙা ভাঙা চুড়োগুলোর ওপর বিচিত্র নক্সা কেটে চলে গেছে পাখির পায়ের দাগ।

ছোট ছোট স্টেশন, টেলিগ্রাফের খুঁটি, আর বরফে ঢাকা সীমাহীন, একঘেয়ে, ভয়াল স্তেপভূমি উত্তরে সরে সরে যাচ্ছে।

একটা নতুন চামড়ার আটপৌরে কোর্তা গায়ে পদ্‌তিওল্‌কভ বসে আছে জানলার ধারে। তার উল্‌টো দিকে ছোট টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে বসে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ক্রিভশ্‌লিকভ। রোগা শুকনো চেহারা, কাঁধদুটো সরু সরু – অল্পবয়সী ছেলের মতো দেখতে সে। তার শিশুসুলভ স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর প্রতীক্ষার চিহ্ন। লাগুতিন চিরুণী দিয়ে তার লালচে বাদামী রঙের বিরল দাড়ির গোছা আঁচড়াচ্ছে। বিশালবপু কসাক মিনায়েভ গরম জলের পাইপের ওপরে হাত গরম করছে, ঠাণ্ডায় গুটিসুটি মেরে বেঞ্চিতে বসে আছে।

গোলোভাচিওভ আর স্কাচ্‌কোভ ওপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে।

কামরাটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, তামাকের ধোঁয়ায় খানিকটা ভরে উঠেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা নোভোচের্‌কাস্‌স্ক যাত্রার পথে মনে মনে এতটুকু ভরসা পাচ্ছে না। কথাবার্তাও তাই তেমন জমল না। একটা বিশ্রী রকমের ক্লান্তিকর নিস্তব্ধতা। ওরা যখন লিখায়া পার হয়ে গেল তখন পদ্‌তিওল্‌কভ ওদের সকলের মনের কথা প্রকাশ করে বলল, 'কিছুই হবে না। আমরা কোন চুক্তিতে আসতে পারব না।'

'আমরা মিছিমিছিই যাচ্ছি,' তাকে সমর্থন করে লাগুতিন বলল।

আবার দীর্ঘ নীরবতা। পদ্‌তিওল্‌কভ তার হাতের কব্জি এমন ভাবে সমান তালে নাড়িয়ে চলেছে যেন জালের ফুটোর ভেতর দিয়ে মাকু চালাচ্ছে। মাঝে

মাঝে সে গায়ের চামড়ার কোর্তাটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটার স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে।

দেখতে দেখতে নোভোচের্‌কাস্‌স্কের কাছে এসে পড়ল তারা। শহর থেকে দন কী ভাবে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে তা দেখে মিনায়েভ শান্তকণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'আগেকার দিনে আতামান রেজিমেন্টে চাকরীর মেয়াদ শেষ হলে সমস্ত লটবহরসুদ্ধ ট্রেনে করে কসাকদের বাড়ি পাঠানো হত। যত রাজ্যের বাক্সপেঁটরা, নানা রকমের সম্পত্তি, ঘোড়া সব তোলা হত গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিত। কিন্তু ভরোনেজের কাছে এসে, যেখানে রেললাইন প্রথম দনের ওপর দিয়ে গিয়েছে, ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিত, যত আস্তে আস্তে পারা যায় চালাতে শুরু করত। . . . সে জানে কী ঘটবে। গাড়ি যেই পুলের ওপর উঠত . . . আরে ব্বাস! . . . যা কাণ্ড শুরু হয়ে যেত! কসাকরা একেবারে পাগল হয়ে যেত: 'দন! দন! আমাদের দন! আমাদের শান্ত দন! আমাদের বাপ! আমাদের অন্নদাতা! জয় হোক আমাদের দনের!' এই বলে জানলা দিয়ে, পুল থেকে সোজা জলের ভেতরে, লোহার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিত মাথার টুপি, পুরনো গ্রেটকোট, সালোয়ার, বালিশের ওয়াড়, গায়ের জামা আরও কত কী যে খুচরো জিনিস! পলটনের মেয়াদ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে তারা দনকে উপহার দিত। জলের দিকে তাকালে দেখা যেত আতামান রক্ষীদের নীল টুপিগুলো যেন রাজহাঁসের মতো কিংবা ফুলের মতো ভেসে চলেছে। . . . এ ছিল বহুকালের পুরনো প্রথা।'

ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল, শেষকালে একেবারে থেমে গেল ট্রেনটা। কসাকরা উঠে দাঁড়াল। গ্রেটকোটের বেল্ট আঁটতে আঁটতে বাঁকা হাসি হেসে ক্রিভশ্‌লিকভ বলল, 'বাড়ি এসে গেলাম তাহলে!'

'কোথায়, অতিথি বরণ করতে ত কেউ আসছে না!' স্কাচ্‌কোভ ঠাট্টা করার চেষ্টা করল।

কোন জানান না দিয়ে দরজা ঠেলে গাড়ির কামরার ভেতরে ঢুকল লম্বামতন ষণ্ডামার্ক চেহারার এক কসাক মেজর। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ওপর কটমট করে তার অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল লোকটা, তারপর ইচ্ছে করে কর্কশ স্বরে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার ওপর। এবারে বলশেভিক ভদ্রমহোদয়রা, দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। জনতার কাজের আর . . . আপনাদের নিরাপত্তারও কোন গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি না।'

অন্যদের ওপরে যতটা নয় তার চেয়েও বেশি সময় ধরে লোকটার দৃষ্টি

আটকে রইল পদ্‌তিওল্‌কভের ওপর – ঠিক মতো বলতে গেলে, তার গায়ে যে অফিসারের কোর্তাটা ছিল সেটার ওপর। বিদ্বেষের ভাব এতটুকু গোপন না করে হুকুম দিল, 'বেরিয়ে আসুন, চটপট!'

'ওই যে পাজী বদমাইশগুলো! কসাকদের সঙ্গে বেইমানি করেছে!' ওরা বেরিয়ে আসতেই জনবহুল প্ল্যাটফর্ম থেকে লম্বা গোঁফওয়ালা এক অফিসার চেঁচিয়ে বলল।

পদ্‌তিওল্‌কভের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। খানিকটা ভেবাচেকা খেয়ে আড়চোখে সে তাকাল ক্রিভশ্‌লিকভের দিকে। পদ্‌তিওল্‌কভের পেছন পেছন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে মৃদু হেসে ফিসফিস করে ক্রিভশ্‌লিকভ বলল, ' 'মধুঢালা গুণগান করি না প্রত্যাশা, হিংসার উন্মত্ত রবে শুনে থাকি তারিফের ভাষা। . . .' মনে রেখো, ফিওদর।'

পদ্‌তিওল্‌কভও হাসল, যদিও উদ্ধৃতিটার শেষ কথাগুলো সে শুনতে পায় নি।

অফিসারদের একটা বেশ জোরদার দল তাদের আগলে নিয়ে চলল। আঞ্চলিক প্রশাসন দপ্তরে যাবার পথে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল এক উন্মত্ত জনতা, তারা নিজেদের হাতে বিচারের ভার নিয়ে রাস্তাতেই ওদের খতম করে ফেলার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করল। শুধু অফিসার বা শিক্ষানবিশ অফিসাররাই নয়, এমনকি কিছু কসাক, ভদ্র জামাকাপড় পরা মহিলা আর ছাত্ররাও তাদের গালাগাল আর অপমান করতে ছাড়ল না।

'আপনারা এই সব অসভ্যতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন!' ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গের একজন রক্ষী অফিসারকে লাগুতিন বলল।

অফিসারটি ঘৃণার দৃষ্টিতে আপাদমস্তক তাকে একবার দেখে নিল, তারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'ভগবানের আশীর্বাদে এখনও বেঁচে আছ। . . . আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি তোকে . . . তোকে . . . দেখে নিতাম, পাজি ইতর . . . ভাগাড়ের মড়া! . . .'

একটু কম বয়সী আরেকজন অফিসার ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে সে থেমে গেল।

'ওঃ কাদের পাল্লায় পড়েছি!' মুহূর্তের সুযোগ পেয়ে ফিসফিস করে স্কাচ্‌কোভ বলল গোলোভাচিওভকে।

যত লোক জড় হয়েছিল, আঞ্চলিক প্রশাসন দপ্তরের হল্‌-ঘরে তাদের সকলের জায়গা হল না। সভার ব্যবস্থাপক কোন এক লেফ্‌টেনাণ্টের নির্দেশে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের টেবিলের একধারে বসানো হল। তারা বসতে না বসতেই সরকারী প্রতিনিধিরা এসে হাজির হল।

বগায়েভ্স্কিকে সঙ্গে নিয়ে দম দম করে গোড়ালি আছড়াতে আছড়াতে নেকড়ের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সামান্য কোলকুঁজো কালেদিন। সে তার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল, অফিসারের সাদা ধবধবে ফিতে লাগানো খাকিরঙের টুপিটা ধীরেসুস্থে টেবিলের ওপর রাখল, হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো পাট করে নিল, বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে উর্দির বিশাল পাশ-পকেটের বোতাম আঁটল, বগায়েভ্স্কির দিকে একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে কী যেন বলল। তার প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে উঠতে লাগল ধীরস্থির দৃঢ় প্রত্যয় আর পরিণত শক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন। যারা অনেক কাল ধরে কর্তৃত্ব করে করে অন্যদের চেয়ে আলাদা, বিশেষ এক ধরনের ভাবভঙ্গি, শিরসঞ্চালনের কৌশল আর চালচলন রপ্ত করেছে সচরাচর তারাই এরকম আচরণ করে থাকে। পদ্‌তিওল্‌কভের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক কালেদিনের পাশে, কালেদিনের ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আচ্ছন্ন বগায়েভ্স্কিকে তার চেয়েও নগণ্য এবং ভাবী আলোচনা সম্পর্কে অনেক বেশি উত্তেজিত দেখাল।

লালচে বাদামী রঙের ঝোলা গোঁফের কার্ণিশে ঢাকা পড়া ঠোঁটজোড়া মৃদু নাড়িয়ে বগায়েভ্স্কি অস্ফুটস্বরে কী যেন বলছে, পাঁশনের আড়ালে জ্বলজ্বল করছে তার তেরছা চোখদুটো। যে ভাবে সে জামার কলার টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল, উৎসাহদীপ্ত চিবুকের ওপর ভাসা-ভাসা আলগা আলগা হাত বুলাতে লাগল, চোখের ওপরে পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে থাকা চওড়া ভুরুজোড়া নাচাতে লাগল তাতে তার মনের বিচলিত ভাব গোপন রইল না।

কালেদিন বসে ছিল মাঝখানে। তার দু'পাশে ফৌজী সরকারের প্রতিনিধিরা। এদের মধ্যে কেউ কেউ – কারেভ, স্ভেতোজারভ, উলানভ আর আগেয়েভ – কামেনস্কায়ায় এসেছিল। আরেকটু দূরে আসন নিল ইয়েলাতোন্‌ৎসেভ, মেল্‌নিকভ, বোস্‌সে, শোশ্‌নিকভ আর পলিয়াকভ।

পদ্‌তিওলকভের কানে গেল মিত্রোফান বগায়েভ্স্কি অর্ধস্ফুটস্বরে কী যেন বলল কালেদিনকে।

কালেদিনের উলটো দিকে বসে ছিল পদ্‌তিওল্‌কভ। তার দিকে তাকিয়ে চোখজোড়া একটু কুঁচকে কালেদিন বলল, 'আমার মনে হয় এবারে শুরু করা যেতে পারে।'

পদ্‌তিওল্‌কভ মৃদু হেসে স্পষ্ট গলায় প্রতিনিধিদলের আগমনের উদ্দেশ্য জানাল। ক্রিভশ্‌লিকভ টেবিলের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল ফৌজী বিপ্লবী কমিটির তৈরি চরমপত্রখানা। কিন্তু কালেদিন তার সাদা হাতের চেটো দিয়ে কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক সরকারী

সদস্যের এই কাগজ পড়ে সময় নষ্ট করার কোন্ মানে হয় না। দয়া করে আপনাদের চরমপত্রটা জোরে জোরে পড়ে শোনান তারপর আলোচনা করা যাবে।'

'পড়,' পদ্‌তিওল্‌কভ নির্দেশ দিল।

ক্রিভশ্‌লিকভ উঠে দাঁড়াল। ক্রিভশ্‌লিকভের আচরণের মধ্যে এতটুকু ত্রুটি ছিল না। কিন্তু প্রতিনিধিদলের আর সব সদস্যের মতোই তাকেও কেমন যেন অনিশ্চিত দেখা গেল। তার মেয়েলি ধরনের সরু গলার স্বর লোকে লোকারণ্য হল্‌-ঘরের মাথায় বেজে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল, 'দন সেনাবাহিনী বিভাগভুক্ত এলাকায় সামরিক ইউনিটগুলিকে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা, অদ্য ১৯১৮ সালের ১০ই জানুয়ারী হইতে আতামান সেনাপতির অধিকার হইতে ফৌজী বিপ্লবী কমিটির উপর বর্তাইবে।

'বিপ্লবী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচরণকারী সকল বাহিনীকে বর্তমান বৎসরের ১৫ই জানুয়ারী হইতে অপসারণ ও নিরস্ত্রীকরণ করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবী ইউনিট, অফিসার-প্রশিক্ষণ-শিক্ষায়তন এবং কর্পোরাল স্কুল সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। উক্ত সংস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে-সকল ব্যক্তি দন প্রদেশের অধিবাসী নহে তাহাদিগকে দন প্রদেশের সীমানাবহির্ভূত স্ব স্ব বাসভূমিতে প্রেরণ করা হইবে।

'বিশেষ দ্রষ্টব্য: অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য সরঞ্জাম ও সামরিক সাজসজ্জা ফৌজী বিপ্লবী কমিটির কমিসারের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। ফৌজী বিপ্লবী কমিটির কমিসার নোভোচের্‌কাস্‌স্ক পরিত্যাগের ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

'নোভোচের্‌কাস্‌স্ক শহর ফৌজী বিপ্লবী কমিটি-কর্তৃক নিযুক্ত কসাক রেজিমেন্ট-গুলির অধিকারে থাকিবে।

'বর্তমান বৎসরের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ফৌজী পরিষদের সদস্যগণ ক্ষমতাচ্যুত বলিয়া ঘোষিত হইবে।

'দন প্রদেশের খনি ও কলকারখানাগুলি হইতে ফৌজী সরকার-কর্তৃক প্রেরিত সমগ্র পুলিশ-বাহিনী প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে।

'সমগ্র দন প্রদেশে, দন প্রদেশের সকল জিলায় ও গ্রামে এই মর্মে ঘোষণা করিতে হইবে যে রক্তক্ষয় পরিহারের উদ্দেশ্যে ফৌজী সরকার স্বেচ্ছায় তাহার ক্ষমতা প্রত্যাহার করিয়া লইতেছে এবং প্রদেশে সমগ্র জনসাধারণের উপযোগী মেহনতী মানুষের এক স্থায়ী সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অনতিবিলম্বে শাসনক্ষমতা প্রাদেশিক কসাক ফৌজী বিপ্লবী কমিটির হস্তে অর্পণ করিতেছে।'

ক্রিভশ্‌লিকভের কণ্ঠস্বর থামতে না থামতেই কালেদিন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কোন্ কোন্ ইউনিট এই চরমপত্র পেশ করার অধিকার দিয়েছে আপনা-দের?'

ক্রিভশ্‌লিকভের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করে পদ্‌তিওল্‌কভ অনেকটা যেন আপন মনেই গুনতে শুরু করে দিল।

'আতামান দেহরক্ষী-রেজিমেন্ট, কসাক রক্ষিদল, ছয় নম্বর ব্যাটারী, চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেন্ট, বত্রিশ নম্বর ব্যাটারী, চৌদ্দ নম্বর স্পেশাল স্কোয়াড্রন . . .' বাঁ হাতের আঙুলে গুনে গুনে সে বলে চলল। হল্‌-ঘরের মধ্যে একটা চাপা ফিসফিস আওয়াজ আর বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। পদ্‌তিওল্‌কভ ভুরু কুঁচকে কটারঙের লোমে ভর্তি হাতদুটো টেবিলের ওপর রাখল, গলা চড়িয়ে বলল, 'আঠাশ নম্বর রেজিমেন্ট, আঠাশ নম্বর ব্যাটারী, বারো নম্বর ব্যাটারী, বারো নম্বর রেজিমেন্ট . . .'

'উনত্রিশ নম্বর রেজিমেন্ট,' অনুচ্চস্বরে তাকে ধরিয়ে দিল লাগুতিন।

'উনত্রিশ নম্বর রেজিমেন্ট,' এবারে আরও জোরে, আরও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে চলল পদ্‌তিওল্‌কভ, 'তেরো নম্বর ব্যাটারী, কামেন্‌স্কায়ার আঞ্চলিক প্লেটুন, দশ নম্বর রেজিমেন্ট, সাতাশ নম্বর রেজিমেন্ট, দু'নম্বর পদাতিক ব্যাটেলিয়ন, দু'নম্বর রিজার্ভ রেজিমেন্ট, আট নম্বর রেজিমেন্ট, চৌদ্দ নম্বর রেজিমেন্ট।'

কিছু স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত মত বিনিময়ের পর টেবিলের ধারে বুক ঠেকিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে পদ্‌তিওল্‌কভের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালেদিন জিজ্ঞেস করল।

'আপনারা গণ কমিসার সোভিয়েতের* কর্তৃত্ব স্বীকার করেন?'

ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে জলের জগটা আবার থালার ওপর রেখে দিল পদ্‌তিওল্‌কভ। আস্তিনে গোঁফ মুছে ফাঁকিবাজী ধরনের উত্তর দিল।

'একমাত্র জনসাধারণই সে কথা বলতে পারে।'

পদ্‌তিওল্‌কভ হয়ত তার সরলতার বশে বাড়তি কোন কথা বলে ফেলতে পারে এই আশঙ্কা করে ক্রিভশ্‌লিকভ কথার মাঝখানে যোগ দিল।

'যেখানে 'গণমুক্তি পার্টির'** প্রতিনিধিরা আছে এমন কোন সংস্থাকে কসাকরা বরদাস্ত করবে না। আমরা কসাক, আমাদের সরকারকে কসাক সরকারই হতে হবে।'

---

* ১৯১৭–৪৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী সংস্থা। পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ। কমিসার বা কমিশনাররা তখনকার দিনে মন্ত্রি-পর্যায়ে ছিলেন।

** 'গণমুক্তি পার্টি' – বিপ্লব-বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের পার্টি। – অনুঃ

'আপনাদের এই মন্তব্যকে আমরা কী করে ব্যাখ্যা করব, যখন দেখতে পাচ্ছি পরিষদের মাথায় নাখাম্‌কিসদের* মতো লোকজন আছে?'

'রাশিয়ার আস্থা আছে তাদের ওপর, আমাদেরও আছে!'

'তাদের সঙ্গে কি আপনারা সম্পর্ক রাখবেন?'

'হ্যাঁ!'

পদ্‌তিওল্‌কভ মুখে সমর্থনসূচক অস্ফুট ধ্বনি করল, সায় দিয়ে বলল, 'আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে মাথা ঘামাই না, আমরা চিন্তাধারার কথা বিবেচনা করি।'

ফৌজী সরকারের একজন সদস্য সরল মনে জিজ্ঞেস করল, 'গণ কমিসার পরিষদ জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করে কি?'

পদ্‌তিওল্‌কভের সন্ধানী দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ল। একটু হেসে টেবিলে রাখা জলের পাত্রটার দিকে হাত বাড়াল পদ্‌তিওল্‌কভ। পিপাসায় সে কাতর হয়ে পড়ছিল। গেলাসে জল ঢেলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল – যেন ভেতরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে খানিকটা স্বচ্ছ জল ঢেলে দিল।

কালেদিন আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর মৃদু তাল ঠুকল, কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'বলশেভিকদের সঙ্গে আপনাদের মিল কোথায়?'

'আমরা আমাদের দন প্রদেশে কসাক স্বায়ত্বশাসন চাই।'

'তা বেশ ত। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে চৌঠা ফেব্রুয়ারী ফৌজী পরিষদের এক বৈঠক ডাকা হচ্ছে। সেখানে নতুন করে সদস্য নির্বাচন করা হবে। যুক্ত-নিয়ন্ত্রণে রাজী আছেন কি আপনারা?'

'না!' পদ্‌তিওল্‌কভ এতক্ষণ চোখের পাতা নামিয়ে রেখেছিল, এবারে চোখ তুলে দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল, 'আপনারা যদি সংখ্যালঘু হন আমরা যা বলব তা-ই করতে হবে আপনাদের!'

'কিন্তু সেটা ত হবে জোর খাটানো!'

'হ্যাঁ।'

পদ্‌তিওল্‌কভের দিক থেকে ক্রিভশ্‌লিকভের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিত্রোফান বগায়েভ্‌স্কি জিজ্ঞেস করল, 'ফৌজী পরিষদকে আপনারা কি স্বীকার করেন?'

'সেই পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না . . .' পদ্‌তিওল্‌কভ তার চওড়া কাঁধদুটো

---

* ইউরি মিখাইলভিচ নাখাম্‌কিস (ছদ্মনাম স্তেক্‌লোভ), ১৮৭৩-১৯৪১। জাতিতে ইহুদী। পেত্রোগ্রাদের গণ কমিসার পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯০৩ সালে পার্টিতে যোগ দেন। – অনুঃ

ঝাঁকাল। 'প্রাদেশিক ফৌজী বিপ্লবী কমিটি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের একটা সভা ডাকবে। সবগুলো মিলিটারী ইউনিটের নিয়ন্ত্রণে তার কাজ চলবে। সেই সভায় যদি আমরা খুশি না হই তাহলে আমরা তাকে মানব না।'

'কিন্তু বিচারক কে হবে?' কালেদিন ভুরু তুলল।

'জনসাধারণ!' পদ্‌তিওল্‌কভ গর্বের সঙ্গে মাথাটা পেছন দিকে হেলাল, ধপ করে কারুকাজ-করা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। তার গায়ের চামড়ার কোটটা মসমস করে উঠল।

কিছুক্ষণের বিরতির পর বলতে শুরু করল কালেদিন। হল্‌-ঘরে কোলাহল থেমে গেল। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট বাজতে লাগল শরতের মতো নিষ্প্রভ, নীচু স্বরগ্রামে বাঁধা আতামানের কণ্ঠস্বর।

'প্রাদেশিক ফৌজী বিপ্লবী কমিটির দাবিতে সরকার তার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারে না। বর্তমান সরকার দন প্রদেশের সমস্ত জনসাধারণের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ইউনিট নয় – একমাত্র জনসাধারণই আমাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেবার দাবি করতে পারে। বলশেভিকরা এই এলাকার ওপর তাদের নিজেদের নিয়মকানুন চাপিয়ে দিতে চায়, তাদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আপনারা সরকারি ক্ষমতা আপনাদের হাতে তুলে দিতে বলছেন। আপনারা বলশেভিকদের হাতের পুতুল। আপনারা জার্মানীর ভাড়াটে দালালদের মদত দিতে যাচ্ছেন। সমস্ত কসাক সমাজের সামনে নিজেদের ওপরে যে বিরাট দায়িত্ব আপনারা নিচ্ছেন সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না। আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখুন, কারণ যে সরকারের মধ্যে জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে তার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের পথে নেমে জন্মভূমির ভয়াবহ দুঃখদুর্দশা ডেকে আনছেন আপনারা। আমি ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই না। এক বড় ফৌজী পরিষদ বসবে – সেই পরিষদই নির্ধারণ করবে দেশের ভাগ্য। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততক্ষণ আমাকে আমার পদে থাকতে হবে। শেষ বারের মতো আপনাদের বলছি, ভেবে দেখুন।'

এরপর বক্তৃতা দিল কসাক ইউনিট এবং কসাক সম্প্রদায়বহির্ভূত ইউনিটগুলোর সরকারী প্রতিনিধিরা। নানা রকম মিষ্টি-মধুর উপদেশে জড়ানো এক দীর্ঘ বক্তৃতার তোড় বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের মাথার ওপর বর্ষণ করতে লাগল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী* পার্টির বোস্‌সে।

---

* ১৯০১-১৯২৩ সালে রাশিয়ার বামপন্থী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি। ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের ঘটনার পর সরাসরি প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে চলে যায়, কৃষক জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব হারায়। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত-বিরোধী নানা চক্রান্তের সংগঠক। – অনুঃ

লাগুতিন চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের দাবি – ফৌজী বিপ্লবী কমিটির হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিন! অপেক্ষা করার কী আছে? ফৌজী সরকার যদি প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানই চায়...'

বগায়েভ্স্কি মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, 'তাহলে কী?'

'... তাহলে সকলের অবগতির জন্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে যে বিপ্লবী কমিটির হাতে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের পরিষদ কবে বসবে তার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দু'-তিন সপ্তাহ বসে থাকা পোষাবে না। লোকে অমনিতেই ভয়ঙ্কর ক্ষেপে আছে!'

কারেভ অনেকক্ষণ ধরে মিনমিন করল, স্ভেতোজারভ আপসের অসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

পদ্‌তিওল্‌কভ বিরক্তির সঙ্গে তাদের কথা শুনতে লাগল। সে তার দলের লোকজনদের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। লক্ষ করল লাগুতিন ভুরু কোঁচকাচ্ছে, তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে, ক্রিভশ্‌লিকভ টেবিলের ওপর থেকে চোখই তুলছে না, আর গোলোভাচিওভ যেন কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছে। যথাসময়ে, সুযোগ আসতেই ক্রিভশ্‌লিকভ মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এবারে বল!'

পদ্‌তিওল্‌কভ যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল সে। ঠেকে ঠেকে উত্তেজনায় তোতলাতে তোতলাতে, যেন প্রবল আঘাতে সব কিছু চুরমার করে দেওয়ার মতো, বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী বিরাট বিরাট কথা খুঁজতে লাগল।

'আপনারা ঠিক কথা বলছেন না। ফৌজী সরকারকে যদি বিশ্বাস করা যেত তাহলে আমি খুশিমনে আমাদের সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করে নিতাম।... কিন্তু জনসাধারণের আস্থা নেই যে! আমরা নই, আপনারাই শুরু করেছেন গৃহযুদ্ধ! কসাকদের দেশে আপনারা রাজ্যের যত পলাতক জেনারেলদের আশ্রয় দিতে গেলেন কেন? এই জন্যেই ত আমাদের শান্ত দনের ওপর লড়াই চালাচ্ছে বলশেভিকরা। আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করতে যাচ্ছি না আমি! সে কাজ আমার দ্বারা হবে না! একমাত্র আমার মড়া দেহের ওপর দিয়ে হতে পারে! তথ্য, ঘটনা দিয়ে আমরা ঢিঢ করব আপনাদের। ফৌজী সরকার দনকে বাঁচাতে পারবে এ আমি বিশ্বাস করি না! যে-সব ইউনিট আপনাদের কর্তৃত্ব মানতে চায় না তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন আপনারা?... হুঁ হুঁ, সেখানেই ত কথা!... খনিমজুরদের ওপর আপনাদের ভলাণ্টিয়রদের লেলিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই করেই ত চারধারে অনিষ্ট করে বেড়াচ্ছেন! আপনারা বলুন ত ফৌজী সরকার যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে পারবে তার গ্যারাণ্টি কে দেবে?... আপনাদের খেলা শেষ হয়ে

গেছে। জনগণ আর যুদ্ধ-ফেরতা কসাকরা আমাদের দিকে।'

বাতাসের সরসর আওয়াজের মতো একটা হাসির লহরী খেলে গেল হল্-ঘরের মধ্যে। পদ্‌তিওল্‌কভকে লক্ষ করে নানা কণ্ঠের কটু মন্তব্য ছোঁড়া হতে লাগল। ক্রোধে আরক্ত মুখটা সেই দিকে ফিরিয়ে এবারে রাগ চাপার আর কোন চেষ্টা না করে গর্জে উঠল সে।

'এখন আপনারা হাসছেন, কিন্তু পরে কাঁদতে হবে আপনাদের।' তারপর কালেদিনের দিকে ঘুরে তীব্র দৃষ্টির ছর্‌রায় তাকে বিদ্ধ করে বলল, 'আমরা দাবি জানাচ্ছি আমাদের হাতে – মেহনতী জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সরকার ছেড়ে দিন, সমস্ত বুর্জোয়া আর স্বেচ্ছাবাহিনীকে হটিয়ে দিন! . . . আর আপনাদের সরকারকেও হটতে হবে।'

কালেদিন ক্লান্ত ভাবে মাথা নোয়াল।

'আমি নোভোচের্‌কাস্‌স্ক ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না, যাবার কোন অভিপ্রায় আমার নেই।'

স্বল্পক্ষণের বিরতির পর সভার কাজ আবার শুরু হল। প্রথমেই জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে শুরু করল মেল্‌নিকভ।

'রেড গার্ডদের বাহিনীগুলো কসাকদের উচ্ছেদ করার জন্যে দনের দিকে ধেয়ে আসছে! ওদের কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যবস্থা রাশিয়ার সর্বনাশ ঘটিয়েছে, এখন আমাদেরও সর্বনাশ ঘটানোর চেষ্টা করছে! একদল উটকো জালিয়াত-জুয়াচোর বিচক্ষণতার সঙ্গে এবং জনগণের স্বার্থে দেশ শাসন করেছে ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই। রাশিয়ার একদিন চমক ভাঙবে, তখন সে এই সব জাল-দ্‌মিত্রিদের* ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর আপনারা কিনা অন্যদের ক্ষেপামিতে অন্ধ হয়ে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চান, বলশেভিকদের জন্যে ফটক খুলে দিতে চান! না, তা হবে না!'

'বিপ্লবী কমিটির হাতে সরকার ছেড়ে দিন – তাহলে রেড গার্ডরাও আক্রমণ বন্ধ করবে। . . .' পদ্‌তিওল্‌কভ পাল্‌টা জবাব দিল।

কালেদিনের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীর ভেতর থেকে বক্তৃতা দিতে উঠল সাব-অল্‌টার্ণ শেইন। সাধারণ কসাক থেকে শেইন ধাপে ধাপে সাব-অল্‌টার্ণের পদে উঠেছে, চারটি পর্যায়ের সেন্ট জর্জ ক্রসের সবগুলোরই অধিকারী সে। যেন

---

* আমাদের জাল-প্রতাপচাঁদ বা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো। নাম ভাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর ইভানের পুত্র দ্‌মিত্রি বলে পরিচয় দিয়ে ১৬০৫ সালে রাশিয়ার সিংহাসনে বসে। ১৬০৬ সালে রাজপুরুষদের চক্রান্তে নিহত। – অনুঃ

কুচকাওয়াজের মাঠে নামতে যাচ্ছে, এই ভাবে ফৌজী শার্টের ভাঁজগুলো টেনে ঠিকঠাক করে নিল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটল টগবগিয়ে।

'ওদের কথায় কান দেওয়ার কী আছে কসাক ভাইরা!' তলোয়ারের কোপ মারার ভঙ্গিতে শূন্যে হাত চালিয়ে গলা উঁচিয়ে ফৌজী হুকুমের সুরে হাঁক পাড়ল সে। 'বলশেভিকদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়। আমাদের দন আর কসাকদের সঙ্গে যারা বেইমানি করেছে একমাত্র তারাই সোভিয়েতের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেবার কথা বলতে পারে, বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কসাকদের ডাকতে পারে!' এর পর আঙুল দিয়ে সোজা পদ্‌তিওল্‌কভকে দেখিয়ে, সামনে ঝুঁকে পড়ে সরাসরি তাকেই উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'পদ্‌তিওল্‌কভ, আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন যে দনের কসাকরা আপনাকে, আপনার মতো লেখাপড়া-না-জানা একজন অর্ধশিক্ষিত লোককে অনুসরণ করবে? যদি অনুসরণ করেও তা হবে কাণ্ডজ্ঞানহীন বাতুল এক দঙ্গল ছন্নছাড়া কসাক। কিন্তু তাদেরও একদিন চৈতন্য হবে রে ভাই, তখন তারা তোমাকেই ফাঁসিতে লটকাবে।'

বাতাসে দোল-খাওয়া সূর্যমুখীফুলের মতো হল্‌-ঘরের সর্বত্র লোকজনের মাথা দুলতে লাগল। সমর্থনসূচক গর্জনে সকলে ফেটে পড়ল। শেইন বসে পড়ল। পশুলোমের কোঁচানো খাটো ওভারকোট গায়ে লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেলের কাঁধপটি লাগানো লম্বামতন এক অফিসার দরদ দেখিয়ে পেছন থেকে তার কাঁধে মৃদু চাপড় মারল। তার আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়াল অন্যান্য অফিসাররা। একটা ক্ষিপ্ত নারীকণ্ঠের মর্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ফেটে পড়ল।

'বেশ বলেছেন শেইন! বেশ বলেছেন!'

'বাহবা মেজর শেইন! বাহবা!' হাইস্কুলের যে-সমস্ত ছাত্র সচরাচর গ্যালারিতে উপস্থিত থাকে তাদেরই মধ্যে কেউ একজন সঙ্গে সঙ্গে শেইনের এক ধাপ পদোন্নতি ঘটিয়ে মোরগ ডাকার সুরে গমগম করে উঠল।

দন সরকারের পোঁ-ধরা, কথার জাহাজ লোকেরা আরও অনেকক্ষণ ধরে কামেন্‌স্কায়ার বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের নানা ভাবে টলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল। তামাকের নীলচে ধোঁয়ায় হল্‌-ঘর ভরে গেল, বাতাস ভারী হয়ে এলো। জানলার বাইরে সূর্য তার দৈনন্দিন পথপরিক্রমা শেষ করতে চলছে। জানলার হিমে জমাট শার্সির গায়ে ফার গাছের মতো নক্সা ফুটে উঠেছে। যারা জানলার ধারিতে বসে ছিল তাদের কানে এলো সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি আর বাতাসের হু হু আর্তনাদ ভেদ করে রেলের ইঞ্জিনের চাপা হিসহিস আওয়াজ।

লাগুতিন আর সহ্য করতে পারল না। ফৌজী সরকারের একজন বক্তাকে বাধা দিয়ে কালেদিনের দিকে ঘুরে সে বলল, 'যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নিন, আর নয়!'

অর্ধস্ফুটস্বরে তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিল বগায়েভ্স্কি।

'উত্তেজিত হবেন না, লাগুতিন! এই যে জল। সংসারী লোকজন এবং যাদের পঙ্গু হবার প্রবণতা আছে তাদের পক্ষে উত্তেজিত হওয়া ক্ষতিকর। আর তাছাড়া কোন বক্তাকে বাধা দেওয়াটা মোটেই কোন কাজের কথা নয় – এ ত আর আপনার কোন সোভিয়েত নয়!'

লাগুতিনও উত্তরে তাকে খোঁচা দিতে ছাড়ল না। কিন্তু সকলের মনোযোগ আবার গিয়ে পড়ল কালেদিনের ওপর। এখনও সে সেই আগেকার মতোই দৃঢ়তার সঙ্গে রাজনৈতিক চাল দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই ভাবেই পদ্‌তিওল্‌কভের সরল সাদামাঠা উত্তরের বর্মে ধাক্কা খাচ্ছে।

'আপনি বলছেন যে আমরা যদি আপনাদের হাতে সরকার ছেড়ে দিই তাহলে বলশেভিকরা দনের ওপর তাদের আক্রমণ বন্ধ করবে। কিন্তু এ হল আপনার অভিমত। বলশেভিকরা একবার দন এলাকায় এলে তখন যে কী করবে তা আমাদের জানা নেই।'

'কমিটি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত যে আমি যা বললাম বলশেভিকরা তার সত্যতা প্রমাণ করবে। চেষ্টা করে দেখুন। সরকার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, দন থেকে 'ভলাণ্টিয়ারদের' হটিয়ে দিন – তাহলেই দেখতে পাবেন – বলশেভিকরা লড়াই বন্ধ করে দেবে।'

একটু পরে কালেদিন উঠে দাঁড়াল। তার উত্তর আগে থাকতেই তৈরি ছিল, লিখায়া স্টেশন আক্রমণ করার জন্য সৈন্যসমাবেশের একটা নির্দেশ চের্নেৎসোভকে সে ইতিমধ্যে দিয়ে রেখেছিল। কালক্ষেপ করছিল মাত্র। এখনও সম্মেলন শেষ করার সময় কালবিলম্ব করার আরও একটা চাল দিল।

'দন সরকার বিপ্লবী কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবে, আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ তার লিখিত উত্তর দেবে।'

এগার

বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে পরদিন দন সরকার যে উত্তর দিল সেটা এই রকম:

> 'আতামান রক্ষিদল, কসাক রক্ষিদল, ৪৪ নম্বর, ২৮ নম্বর ও ২৯ নম্বর রেজিমেণ্ট, ১০ নম্বর, ২৭ নম্বর, ২৩ নম্বর ও ৮ নম্বর, ২ নম্বর রিজার্ভ ও ৪৩ নম্বর রেজিমেণ্টের ইউনিটসমূহ, ১৪ নম্বর

বিশেষ স্কোয়াড্রন, ৬ নম্বর রক্ষি-স্কোয়াড্রন, ৩২ নম্বর, ২৮ নম্বর, ১২ নম্বর ও ১৩ নম্বর ব্যাটারী, ২ নম্বর পদাতিক ব্যাটেলিয়ন ও কামেনস্কায়ার স্থানীয় প্লেটুনের পক্ষে কসাক ফৌজী বিপ্লবী কমিটির প্রস্তাবিত দাবিসকল আলোচনাপূর্বক দন-কসাক বাহিনীর ফৌজী সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে বর্তমান সরকার দন প্রদেশের সমগ্র কসাক অধিবাসীদিগের প্রতিভূস্বরূপ। নূতন ফৌজী পরিষদ আহূত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ-কর্তৃক নির্বাচিত সরকারের পদত্যাগের কোন অধিকার নাই।

'দন-কসাক বাহিনীর ফৌজী সরকার পূর্বেকার পরিষদকে ভাঙিয়া দিয়া জেলাসমূহ এবং আর্মি-ইউনিটগুলি হইতেও পুনরায় প্রতিনিধি নির্বাচন অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। সমানাধিকারসম্পন্ন প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের ভিত্তিতে স্বাধীন ভাবে (নির্বাচনী প্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহ) সকল কসাক জনসাধারণের নির্বাচিত নূতন পরিষদের সমাবেশ কসাক সম্প্রদায় বহির্ভূত অধিবাসিগণের অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেসের সহিত একযোগে, বর্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী ৪ তারিখে নোভোচের্কাস্স্ক শহরে অনুষ্ঠিত হইবে। বিপ্লবের ফলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, কসাক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী বৈধ সংস্থারূপে একমাত্র পরিষদই ফৌজী সরকারের পদচ্যুতি ঘটাইয়া তাহার পরিবর্তে নূতন সরকার নির্বাচনের অধিকার রাখেন। সেই সঙ্গে আর্মি ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং সরকারী কর্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী দলগুলির থাকা না থাকার প্রশ্নও উক্ত পরিষদ আলোচনা করিবেন। স্বেচ্ছাবাহিনীর গঠন ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে যুক্ত-সরকার ইতিপূর্বেই প্রাদেশিক সামরিক কমিটির অংশগ্রহণক্রমে সেগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

'খনি এলাকাগুলিতে ফৌজী সরকারের পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের যে অভিযোগ এবং পুলিশবাহিনী প্রত্যাহারের যে দাবি জানানো হইয়াছে সেই সঙ্গে সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে প্রশ্নটি সমাধানের নিমিত্ত ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে পরিষদে উত্থাপিত হইবে।

'সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে স্থানীয় জীবনযাত্রা গঠনের কার্যে একমাত্র স্থানীয় অধিবাসিগণই অংশগ্রহণ করিতে পারে; অতএব যে-সকল সশস্ত্র বলশেভিক বাহিনী এতদঞ্চলে নিজস্ব নিয়মকানুন আরোপ করিবার চেষ্টায় আছে, তাহাদিগের অনুপ্রবেশ

রোধ করিবার জন্য পরিষদের অভিপ্রায়ক্রমে সর্বতোভাবে সংগ্রাম করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া সরকার মনে করেন। জনসাধারণ, একমাত্র জনসাধারণই তাহাদিগের আপন জীবনধারা গঠন করিতে পারে।

'গৃহযুদ্ধ সরকারের কাম্য নহে। সরকার সর্বতোপ্রকারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রশ্ন সমাধানের প্রয়াসী। এই কারণে বলশেভিক বাহিনীগুলির নিকট যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইবে সরকার তাহাতে সামরিক বিপ্লবী কমিটিকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইতেছেন।

'সরকার মনে করেন যে অঞ্চলের সীমানার অভ্যন্তরে বহিরাগত কোন সৈন্যদলের অনুপ্রবেশ না ঘটিলে গৃহযুদ্ধ ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। সরকার যেহেতু একমাত্র দন প্রদেশের রাজ্যসীমানাই রক্ষা করিতেছেন এবং যেহেতু কোন রূপ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন না, রাশিয়ার অবশিষ্ট অংশের উপরও তাঁহার ইচ্ছা আরোপ করিতেছেন না, সেই হেতু দনে বহিরাগত কাহারও ইচ্ছা আরোপিত হয় ইহাও সরকারের কাম্য নহে।

'সরকার সকল জিলায় এবং সৈনিক ইউনিটগুলিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন অবাধ নির্বাচনের আশ্বাস দান করিতেছেন। কসাক ফৌজী পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে যে কোন নাগরিক স্বচ্ছন্দে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

'কসাকদিগের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সকল ডিভিশনে ইউনিটসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা কর্তব্য।

'যে-সমস্ত ইউনিট ফৌজী বিপ্লবী কমিটিতে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল দন ফৌজী সরকার তাহাদিগের সকলকে দন অঞ্চলের রাজ্যসীমানা রক্ষা করিবার স্বাভাবিক কার্যে প্রত্যাবর্তন করিবার আহ্বান জানাইতেছেন।

'দন প্রদেশের সামরিক ইউনিটগুলি তাহাদিগেরই সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে এবং উক্ত উপায়ে প্রশান্ত দনে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সূচনা করিবে – ইহা কসাক ফৌজী সরকারের কল্পনাতীত।

'যে-সকল ইউনিট ফৌজী বিপ্লবী কমিটি নির্বাচন করিয়াছে তাহাদিগের কর্তব্য হইবে উক্ত কমিটি ভাঙিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে

প্রদেশের সকল সামরিক ইউনিটের প্রতিনিধিত্বকারী যে প্রাদেশিক সামরিক কমিটি রহিয়াছে তথায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

'ফৌজী সরকার ফৌজী বিপ্লবী কমিটি-কর্তৃক ধৃত সকল ব্যক্তির অবিলম্বে মুক্তি দাবি করিতেছেন। দন প্রদেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে স্ব স্ব কর্মে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে হইবে।

'ফৌজী বিপ্লবী কমিটি যেহেতু মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক কসাক ইউনিটের প্রতিনিধিত্বকারী, সেই হেতু সকল ইউনিটের পক্ষ হইতে, পরন্তু সমগ্র কসাক সমাজের পক্ষ হইতে কোন দাবিদাওয়া করিবার অধিকার তাহার নাই।

'গণ কমিসার সোভিয়েতের সহিত কমিটির সম্পর্কস্থাপন এবং উক্ত সংস্থার আর্থিক আনুকূল্য গ্রহণকে ফৌজী সরকার চরম নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করেন, যেহেতু ইহার অর্থ হইবে দন প্রদেশে গণ কমিসার সোভিয়েতের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি; অথচ দন কসাক পরিষদ, সমগ্র প্রদেশের অ-কসাক অধিবাসিবৃন্দের কংগ্রেস ইউক্রেনিয়া, সাইবেরিয়া ও ককেশাসের ন্যায় এবং বিনা ব্যতিক্রমে সকল কসাক বাহিনীই সোভিয়েত সরকারকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কসাক ফৌজী সরকারের সভাপতি,
সহকারী ফৌজী আতামান
বগায়েভ্স্কি
দন কসাক বাহিনীর কম্যাণ্ডার:
ইয়েলাতোন্ৎসেভ, পলিয়াকভ, মেল্নিকভ'

সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য দন সরকারের পাঠানো প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কামেন্স্কায়া বিপ্লবী কমিটির সদস্য হিশেবে লাগুতিন আর স্কাচ্কোভও তাগান্রোগে গেল। পদ্তিওল্কভ এবং বাকি কয়েকজন সাময়িক ভাবে নোভোচের্কাস্স্কে আটকে রইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকশ' বেয়নেট নিয়ে, মালগাড়ির পাটাতনের ওপর ভারী তোপ বসিয়ে এবং দুটো হাল্কা কামানের সাহায্যে মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে চের্নেৎসোভের বাহিনী জ্ভেরেভো আর লিখায়া স্টেশন দখল করে ফেলল, ঘাঁটি আগলানোর জন্য একটা কোম্পানির সঙ্গে দুটো

কামান সেখানে রেখে মূল সৈন্যবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কামেন্‌স্কায়ার ওপর। সেভের্‌নি দনেৎস স্টেশনের কাছাকাছি বিপ্লবী কসাক ইউনিটগুলোর প্রতিরোধ ভেঙে জানুয়ারীর ১৭ তারিখে কামেন্‌স্কায়া দখল করে ফেলল চের্নেৎসোভ। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদেই খবর পাওয়া গেল যে সাব্‌লিনের পরিচালনায় রেড গার্ডদের বাহিনীগুলো জ্‌ভেরেভো থেকে এবং অতঃপর লিখায়া থেকেও ঘাঁটি আগলানোর জন্য চের্নেৎসোভের রেখে যাওয়া সৈন্যদলকে হটিয়ে দিয়েছে। চের্নেৎসোভ ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে ছুটল। স্বল্প সময়ের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে ৩ নম্বর মস্কো বাহিনীকে সে বেসামাল করে দিল, মারাত্মক লড়াইয়ে খার্‌কভ বাহিনীকে তুলোধুনো করে ছেড়ে দিল, তারপর আতঙ্কগ্রস্ত রেড গার্ডদের পিছু হটে আগের পজিশনে সরে যেতে বাধ্য করল।

লিখায়া পুনরুদ্ধার করে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনার পর চের্নেৎসোভ ফিরে এলো কামেন্‌স্কায়ায়। ১৯শে জানুয়ারী নোভোচের্‌কাস্‌স্ক থেকে আরও সামরিক সাহায্য এসে পৌঁছুল তার কাছে। পর দিন তাই সে গ্লুবোকায়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল।

সামরিক পরিষদে লেফ্‌টেনান্ট লিন্‌কোভের প্রস্তাব অনুযায়ী পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে গ্লুবোকায়া দখল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রেল লাইন ধরে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে চের্নেৎসোভের শঙ্কা ছিল। তার ভয় ছিল এই পথে গেলে কামেন্‌স্কায়া বিপ্লবী কমিটির ইউনিটগুলোর কাছ থেকে এবং চের্ত্‌কোভ থেকে তাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসা রেড গার্ড বাহিনীগুলোর কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে আক্রমণের জন্য যাত্রা শুরু হল রাত্রে। চের্নেৎসোভ নিজে সৈন্য পরিচালনা করল।

ভোরের কিছু আগে আগে গ্লুবোকায়ার কাছাকাছি চলে এলো সৈন্যদল। নিখুঁত ভাবে ঢেলে সাজানো হল সৈন্যদলের সারি, শৃঙ্খলের আকারে ছড়িয়ে পড়ল তারা। শেষবারের মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল চের্নেৎসোভ, ঝিমধরা পাদুটো টানটান করল, তারপর একটা কোম্পানির কম্যাণ্ডারকে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'ভদ্রতার কোন বালাই রাখবেন না। আমি কী বললাম বুঝতে পারছেন ত মেজর?'

মচমচ আওয়াজ তুলে কঠিন বরফের স্তর গুঁড়িয়ে যেতে লাগল তার পায়ের বুটজোড়া। আস্ত্রাখান ভেড়ার লোমের ছাইরঙা লম্বা টুপিটা মাথার একপাশে কাত করল সে, হাতের দস্তানা দিয়ে ঠাণ্ডায় গোলাপী রঙধরা কানটা ঘসল। তার হাল্‌কা রঙের অসমসাহসী চোখের কোলে কালি পড়েছে – অনিদ্রার চিহ্ন। ঠোঁটদুটো ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। ছোট করে ছাঁটা গোঁফের ওপর হাল্‌কা হিমের কণা জমেছে।

শরীর গরম করে নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। সামরিক অফিসারের পোশাক – পশুলোমের খাটো ওভারকোটের ভাঁজ ঠিক করে নিল সে, জিনের মাথা থেকে ঘোড়ার মুখের লাগামটা তুলে নিয়ে লোমপড়া লালচে বাদামী রঙের বিশাল ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিল, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ়তাব্যঞ্জক হাসি হেসে বলল, 'এইবার শুরু করা যাক!'

বারো

কামেনস্কায়াতে যুদ্ধ-ফেরতা কসাকদের কংগ্রেস শুরু হওয়ার আগে আগে সাব-অল্টার্ণ ইজ্‌ভারিন তার রেজিমেন্ট ছেড়ে ফেরার হয়ে গেল। এর আগের দিন গ্রিগোরির কাছে সে এসেছিল, সে যে পল্টন ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছিল।

'এখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে রেজিমেন্টে কাজ করাই দুরূহ। এক দিকে বলশেভিক আরেক দিকে পুরনো রাজতন্ত্রী ব্যবস্থা – এই দুই চরমপন্থার মাঝখানে পড়ে কসাকদের নাভিশ্বাস উঠছে। কালেদিনের সরকারকে কেউ সমর্থন করতে চায় না, তার অন্তত একটা কারণ এই যে সমতার দাবি নিয়ে একটা বাচ্চাছেলের মতো সে আবদার জুড়ে দিয়েছে। আমাদের দরকার একজন শক্ত জবরদস্ত লোক, যে কসাক-ভূমির অ-কসাক চাষীদের যথাস্থানে পাঠাতে পারে।... কিন্তু আমার মনে হয় এ খেলায় আমরা যাতে একেবারে হেরে না যাই তার জন্যে ঠিক এই মুহূর্তে কালেদিনকে সমর্থন করাই ভালো।' একটু চুপ করে থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা গ্রিগোরি... তুমি 'লালদের' ধর্মে দীক্ষা নিয়েছ বলে যেন মনে হচ্ছে?'

'প্রায় তাই,' গ্রিগোরি স্বীকার করল।

'মনেপ্রাণে? নাকি ওই গোলুবোভের মতন – কসাকদের কাছে নাম কেনার মতলবে?'

'নাম কেনার কোন দরকার নেই আমার। আমি নিজেই বেরোবার একটা পথ খুঁজছি।'

'কিন্তু তুমি যে সরতে সরতে দেয়ালে এসে ঠেকেছ, এটাকে বেরোবার পথ বলে না।'

'দেখা যাক।...'

'আশঙ্কা হচ্ছে, গ্রিগোরি, এর পর আমাদের দেখা হবে শত্রু হিশেবে।'

'লড়াইয়ের ময়দানে মুখোমুখি হলে বন্ধু বন্ধুকে চিনতে পারে না ইয়েফিম ইভানিচ,' মৃদু হেসে গ্রিগোরি বলল।

আরও খানিকক্ষণ বসে থাকার পর ইজ্‌ভারিন চলে গেল। সকালে তাকে আর পাওয়া গেল না। কর্পূরের মতো উবে গেল।

কংগ্রেস যেদিন হল সেই দিন ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার লেবিয়াজি গ্রাম থেকে আতামান রক্ষিদলের এক কসাক এলো গ্রিগোরির কাছে। গ্রিগোরি তখন তার নাগান রিভল্‌ভারে তেল দিচ্ছিল, ঘসেমেজে সাফ করছিল সেটা। রক্ষিদলের লোকটা খানিকক্ষণ বসে বসে বকবক করল, তারপর একেবারে যাবার মুখে অনেকটা যেন কথায় কথায়, বলে ফেলল সেই সংবাদটা যার জন্য আসলে তার এখানে আসা। সে জানত যে গ্রিগোরির মেয়েমানুষ হাতছাড়া হয়ে আতামান রেজিমেণ্টের প্রাক্তন অফিসার লিস্তনিৎস্কির কাছে চলে গেছে। তাই দৈবাৎ স্টেশনে তাকে দেখতে পেয়ে গ্রিগোরিকে সতর্ক করে দিতে এসেছে।

'গ্রিগোর পান্তেলেয়েভিচ, আমি কিন্তু আজ স্টেশনে তোমার এক দোস্তের দেখা পেলাম।'

'কে? কার কথা বলছ?'

'লিস্তনিৎস্কি। মনে আছে ত?'

'কবে, কখন দেখলে?' গ্রিগোরি চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ঘণ্টা খানেক আগে।'

গ্রিগোরি বসে পড়ল। পুরনো জ্বালাটা যেন নেকড়ের থাবার মতো তার বুকের ওপর চেপে বসল। আগের মতো সেই প্রচণ্ড বিদ্বেষ এখন আর সে তার শত্রুর ওপর উপলব্ধি করল না, তবে এটা ঠিক বুঝতে পারল যে এখন এই গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেখা হয়ে গেলে তাদের দু'জনের মধ্যে রক্তারক্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। লিস্তনিৎস্কির খবরটা আচমকা কানে যেতে সে বুঝতে পারল যে সময়ের ব্যবধানে পুরনো ক্ষত মোটেই শুকিয়ে যায় নি – একটু অসতর্ক কথার খোঁচায় সেখান থেকে রক্ত ঝরতে পারে। বহুকাল আগের সেই ঘটনার জন্য – এই যে ইতর লোকটার দোষে তার জীবনের ফুল শুকিয়ে ঝরে গেল, যে-বিপুল উচ্ছ্বসিত আনন্দের কথা সে জানত তার বদলে রয়ে গেল মনের মধ্যে কুরে কুরে খাওয়া এক অতৃপ্ত কামনার আর্তি, একটা বিষণ্ণ ম্লানিমা – সে জন্য লোকটার ওপর প্রতিহিংসা নিতে পারলে কী মধুরই না লাগত!

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে, উপলব্ধি করল মুখের ওপর যে রক্তিমাভা

খেলে গিয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে জিজ্ঞেস করল, 'এখানেই এসেছে কি? জান কিছু?'

'মনে ত হয় না। খুব সম্ভব চের্কাস্স্ক যাচ্ছে।'

'ও। . . .'

কংগ্রেস আর রেজিমেণ্টের টুকিটাকি নানা খবর দিয়ে লোকটা চলে গেল। বুকের ভেতরে ধিকিধিকি করে যে বেদনার আগুন জ্বলতে লাগল এরপর কয়েক দিন ধরে গ্রিগোরি তা নেভানোর কত চেষ্টাই না করল! কিন্তু সবই বিফলে গেল। ভূতগ্রস্তের মতো চলাফেরা করতে লাগল সে, এখন আগের চেয়েও ঘন ঘন মনে পড়তে লাগল আক্সিনিয়াকে, মুখের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ল একটা তিক্ত স্বাদ, বুকের ওপরে নেমে এলো পাথরের ভাব। মনে মনে ভাবার চেষ্টা করল নাতালিয়ার কথা, বাচ্চাদের কথা, কিন্তু তাতে যে আনন্দ পেল তা বহুকালের ঘর্ষণে ক্ষয়ে গেছে, সময়ে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার হৃদয়টা বাঁধা পড়ে আছে আক্সিনিয়ার কাছে, আগের মতোই প্রবল আকর্ষণ আর শক্তি আছে আক্সিনিয়ার ভালোবাসার।

চের্নেৎসোভ যখন চাপ সৃষ্টি করল তখন কামেন্স্কায়া থেকে তাড়াহুড়ো করে পিছু হটতে হল। দন বিপ্লবী কমিটির বিচ্ছিন্ন বাহিনী আর আধা খসে-পড়া কসাক স্কোয়াড্রনগুলো এলোমেলো ভাবে হুড়মুড় করে ট্রেনে চাপতে লাগল, কিংবা মার্চ করে চলল – যা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, ভারী সে সবই ফেলে চলে গেল। সংগঠনের অভাব বিশেষ করে অনুভব করা যাচ্ছিল। বস্তুতপক্ষে এই সৈন্যদলের শক্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এমন কোন জবরদস্ত লোক ছিল না যে এদের সকলকে জড় করতে পারে, সঠিক ভাবে সাজাতে পারে।

সম্প্রতি নির্বাচিত কম্যাণ্ডারদের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে লেফটেনাণ্ট-কর্নেল গোলুবোভ। লোকটা কোথা থেকে যেন ভুস্ করে ভেসে উঠেছে। সবচেয়ে জঙ্গী রেজিমেণ্ট – ২৭ নম্বর কসাক রেজিমেণ্টের পরিচালনার ভার নিয়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা নিষ্ঠুরতার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। কসাকরা যখন দেখতে পেল রেজিমেণ্টে যে গুণের অভাব – অর্থাৎ সৈন্যদল গঠন, দায়িত্ববণ্টন আর পরিচালনার ক্ষমতা – সে সবই তার আছে, তখন তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে নিল। মোটাসোটা, ফুলোগাল আর প্রগল্ভতায় ভরা চাউনি এই অফিসার গোলুবোভকে আজ স্টেশনে দেখা যাচ্ছে। যে সমস্ত কসাক গাড়িতে মাল ওঠাতে দেরি করছে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের ওপর সে খেঁকিয়ে উঠছে।

'কী হল কী তোমাদের? লুকোচুরি খেলা পেয়েছ নাকি? গুষ্টির নিকুচি করেছি

তোদের! . . . মাল ওঠাও! . . . বিপ্লবের নামে তোমাদের হুকুম করছি, যা বলছি তা-ই করতে হবে! . . . কী? কী বললি? . . . কে সেই বাক্যবাগীশ। এখুনি গুলি করে মারব, হারামজাদা! . . . চোপ্! . . . যারা অন্তর্ঘাতী কাজ করে, যারা তলে তলে প্রতিবিপ্লবী আমি তাদের কমরেড নই!'

কসাকরা কিন্তু মেনে নিল তাকে। এমনকি বহুকালের অভ্যাসের জন্যই বা হবে – গোলুবোভের এই কায়দাটা অনেকের মনেও ধরল – পুরনো অভ্যাস এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আগেকার দিনে যে সবচেয়ে বেশি চোটপাট করতে পারত কসাকদের চোখে সে-ই হত সেরা কম্যাণ্ডার। গোলুবোভের মতো লোক সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, 'এমনই লোক যে খুঁত দেখলে তোমার ছালচামড়া খুলে নিতে পারে, আবার খুশি হলে আরেকটা লাগিয়েও দিতে পারে।'

দন বিপ্লবী কমিটির ইউনিটগুলো ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে বানের জলের মতো এসে পড়ল গ্লুবোকায়ায়। কার্যত সমস্ত বাহিনীর নেতৃত্ব চলে গেল গোলুবোভের হাতে। দু'দিনের কম সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ইউনিটগুলোকে নতুন করে গড়ে নিল সে, গ্লুবোকায়া ধরে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করল। তার সনির্বন্ধ দাবিতে দু'নম্বর রিজার্ভ রেজিমেন্টের দুটো স্কোয়াড্রন আর আতামান রক্ষিদলের একটা স্কোয়াড্রন নিয়ে গড়া একটা ইউনিটের নেতৃত্ব নিল গ্রিগোরি মেলেখভ।

রেল লাইনের ওপাশে আতামান রক্ষীদের যে চৌকিগুলো বসানো হয়েছে সেগুলো দেখার জন্য জানুয়ারী ২০ তারিখে গোধূলির আলো-অন্ধকারে গ্রিগোরি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে – এমন সময় গেটের একেবারে সামনে দেখা হয়ে গেল পদ্‌তিওল্‌কভের সঙ্গে। পদ্‌তিওল্‌কভ তাকে চিনতে পারল।

'মেলেখভ না?'

'হ্যাঁ আমিই।'

'কোথায় চলেছ এই সময়?'

'চৌকিগুলো একবার দেখে আসি। চের্‌কাস্‌স্ক থেকে ফিরলে কবে? খবর-টবর কী?'

পদ্‌তিওল্‌কভ ভুরু কোঁচকাল।

'যারা দিব্যি গেলে সাধারণ মানুষের দুশমন হয়েছে তাদের সঙ্গে শান্তির কথা বলে কোন লাভ নেই। চুলের মুঠি ধরে কী বেধড়ক দিল দেখলে ত? আলাপ-আলোচনা . . . ওদিকে চের্নেৎসোভকে লাগিয়ে দিয়েছে। কালেদিন একটা কেউটে সাপ। উঃ কী সাঙ্ঘাতিক! যাক গে, আমার আবার বিশেষ সময় নেই – এক্ষুনি সদর ঘাঁটিতে যেতে হবে।'

তাড়াহুড়ো করে গ্রিগোরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় বড় পা ফেলে শহরের কেন্দ্রের দিকে হাঁটা দিল সে।

বিপ্লবী কমিটির সভাপতিপদে নির্বাচিত হওয়ার আগে গ্রিগোরি এবং বাকিসব চেনাপরিচিত কসাকদের সঙ্গে তার ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। তার কণ্ঠস্বরে ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে একটা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব, এমনকি খানিকটা দম্ভও। ক্ষমতা মাথা ঘুরিয়ে দিল সহজ-সরল স্বভাবের লোকটার।

গ্রিগোরি গ্রেটকোটের কলার তুলে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। রাতে বেশ হিম পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। কির্গিজ স্তেপভূমি থেকে মৃদু হাওয়া বইছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। মাটিতে বরফ জমেছে। ঝুরঝুরে বরফ পায়ের নীচে মচমচ করছে। কাঁকাল বেঁকিয়ে ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে চাঁদ উঠছে – যেন কোন পঙ্গু লোক ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। বাড়িঘরের ওপাশে গোধূলির বেগনী-নীল রঙের ধোঁয়া তুলছে স্তেপভূমি। এ হল রাত ঘনিয়ে আসার আগের সেই মুহূর্ত, যখন সমস্ত রেখা, সীমানা, রঙ, দূরত্ব ধুয়েমুছে যায়; দিনের আলো তখনও রাতের ফাঁদে পড়ে জড়িয়ে গিয়ে ছটফট করছে, সব মনে হয় কেমন যেন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, ধরা ছোঁয়ার বাইরে; এমনকি গন্ধ পর্যন্ত এই মুহূর্তে তার তীব্রতা হারিয়েছে, বিশেষ ধরনের চাপা মৃদু ভাব ছড়াচ্ছে।

চৌকিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল গ্রিগোরি, তারপর ঘরে ফিরে এলো। বাড়িওয়ালা এক রেলকর্মচারী, ফোকলা দাঁত, ধূর্ত-ধূর্ত চেহারা। চায়ের জন্য সামোভার বসিয়ে টেবিলের ধারে এসে বসল: 'আপনারা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন নাকি?'

'তা জানি নে।'

'নাকি ভাবছেন ওদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করবেন?'

'দেখা যাক।'

'একেবারে খাঁটি কথা! আমার ত মনে হয় আপনাদের কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে আপনারা আক্রমণ করতে পারেন, অপেক্ষা করা অবশ্যই ভালো। বরং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা ভালো। আমি নিজে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় স্যাপার-দলে ছিলাম, তাই লড়াইয়ের কায়দাকানুন, তার স্বাদ আর অর্থ আমার জানা আছে। . . . সেনাবল ত একটু কমই, তাই না?'

'যথেষ্ট আছে,' কথাবার্তা অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে দেখে এড়ানোর চেষ্টা করে গ্রিগোরি।

কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে, টেবিলের চারধারে ঘুরঘুর করতে থাকে, বনাতের ওয়েস্টকোটের নীচে হাত চালিয়ে চিমসে পেটটা চুলকোতে চুলকোতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে।

'গোলন্দাজ কি অনেক? কামান? কামান কত আছে?'

'বললে পল্টনে চাকরি করেছ, কিন্তু পল্টনের নিয়মকানুন জান না দেখছি!' হিমকঠিন ক্রুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলো বলে এমন ভাবে চোখ পাকিয়ে গ্রিগোরি লোকটার দিকে তাকাল যে তার প্রায় ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হল। 'পল্টনে চাকরী করেছ, অথচ জান না! . . . আমাদের সৈন্যদলের সংখ্যা, আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করার কী অধিকার আছে তোমার? এবারে ধরে জেরা করার জন্যে পাঠিয়ে দেব, তখন টের পাবে . . .'

'অ-অ-অফিসার সাহেব! . . .হু-হু-হুজুর! . . .' একেবারে সাদা হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা শব্দের শেষে ঢোক গিলতে গিলতে তোতলাতে তোতলাতে বলল গ্রিগোরির বাড়িওয়ালা। তার আধখোলা মুখের ফোকলা জায়গাগুলো জেগে রইল কালো হয়ে। 'বো-বোকামি হয়ে গেছে . . . বোকামি! মাপ করবেন! . . .'

চা খেতে খেতে গ্রিগোরি একবার দৈবাৎ তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, লক্ষ করল বিদ্যুৎ-চমকের মতো দ্রুত তার চোখের পলক পড়ছে। চোখের পাতা যখন ওপরে উঠছে তখন সে চোখের প্রকাশভঙ্গি হয়ে যাচ্ছে অন্যরকম – ঝরে পড়ছে দরদ, এমনকি প্রায় ভক্তিগদগদ ভাব। বাড়িওয়ালার পরিবারের লোকেরা – তার বৌ আর বয়স্কা দুই মেয়ে – চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। দ্বিতীয় পেয়ালাটা শেষ না করেই গ্রিগোরি চলে গেল তার নিজের ঘরে।

এর কিছুক্ষণ পরেই দু'নম্বর রিজার্ভ রেজিমেন্টের চার নম্বর স্কোয়াড্রনের ছয়জন কসাক কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল। গ্রিগোরির সঙ্গে একই বাড়িতে তারা থাকে। হৈ চৈ করে হাসিগল্প করতে করতে তারা চা খেতে লাগল। গ্রিগোরি ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে শুনতে পেল তাদের কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ। একজন কথা বলছিল (গলার স্বরে লুগান্স্কায়া জেলার কসাক, ট্রুপ-কম্যাণ্ডার বাখ্‌মাচিওভ বলে গ্রিগোরি চিনতে পারল), বাকিরা মাঝে-মধ্যে ফোড়ন কাটছিল।

'আমার নিজের চোখে দেখা। গোর্‌লভ্‌কা জেলার এগারো নম্বর খনির তিনজন মজুর এলো, এসে নানা রকম ধানাইপানাই করে বলে কি আমাদের এই সোম্‌গঠন হয়েছে, এখন কিছু অস্তরশস্তর দরকার – ভাগ দিন না। ইদিকে বিপ্লবী কোমিটির সেই লোকটা . . . আরে ভাই, আমার নিজির কানে শোনা!' কার যেন একটা অস্পষ্ট টিপ্পনী শোনা গেল – তার উত্তরে গলা চড়াল সে। 'বলে কি, 'কমরেড, আপনারা বরং কমরেড সাব্‌লিনের কাছে যান। আমাদের কাছে কিছু নেই।' কিছু নেই কেমন? আরে আমি জানি যে বাড়তি রাইফেল ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।... ওই যে চাষারা জড়িয়ে পড়ছে, তাইতেই না হিংসে?'

'তা সে ঠিকই বাপু!' আরেকজন বলে উঠল। 'ওদের হাতে হাতিয়ার দিলে ওরা লড়তে পারে আবার নাও পারে। কিন্তু জমির প্রশ্ন যখন আসবে তখন ঠিক হাত বাড়িয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের হাড়ে হাড়ে জানা আছে।' তৃতীয় আরেকজন হেঁড়ে গলায় বলল।

বাখ্‌মাচিওভ গেলাসের গায়ে চামচ দিয়ে চিন্তিত ভাবে টুংটাং আওয়াজ করল; তারপর এককেটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে, কথার তালে তালে চামচ নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'নাঃ, এরকম ব্যাপার চলতে পারে না। বলশেভিকরা সমস্ত জনসাধারণের মুখ চেয়ে রফা করছে, আর আমরা? – কিসের ছাই বলশেভিক আমরা? কালেদিনকে লাথি মেরে ভাগাতে পারলেই হল – পরে আমরা চাপ দেব . . .'

এবারে প্রায় বাচ্চাছেলের মতো কচি গলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কে একজন বলে উঠল, 'কিন্তু দাদা, একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা কর না! দেখতে পাচ্ছ না, দেবার মতো কিছুই নেই আমাদের। ভাগাভাগিতে চাষবাসের যুগ্যি জমি আমরা পাই বড়জোর বিঘে দশেক – বাদবাকি সব দো-আঁশ মাটি, পাহাড়ী খাত আর গোরুবাছুর চরানোর জমি। তা থেকে আমরা দেবটা কী?'

'তোমার কাছ থেকে নেবেও না। কিন্তু এমন লোকও আছে যারা অনেক জমির মালিক।'

'আর আমাদের ফৌজের যে জমি, তার কী হবে?'

'আহা, কী কথাই শোনালে! নিজেরটা দান করে অন্যের কাছে হাত পাত! . . . আহা, কী বিচার!'

'ফৌজের জমি আমাদের নিজেদের কাজে লাগবে।'

'তা নয়ত কী!'

'লোভেই ত গেলে!'

'লোভের আর কী আছে!'

'দনের উজানে আমাদের যে কসাক-ভাইরা আছে তাদের উঠিয়ে এনে ওখানে বসানো যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি ওদের জমি কেমন – গেরিমাটি আর বালি ছাড়া আর কিছু নেই।'

'যা বলেছ।'

'আমরা নিজেরা ব্যবস্থা না করলে কে আর করে দেবে আমাদেরটা?'

'দু'-এক ফোঁটা পেটে না পড়লে এসব বোঝা মুশ্‌কিল।'

'আরে ভাই, এই সেদিন একটা মদের ভাঁড়ার লুট হল। একজন ত মদের মধ্যে ডুবে গিয়ে খাবি খেয়ে মারা গেল।'

'আহা, এখন পেলে খাওয়া যেত! পাঁজরার হাড়গুলো একটু গরম হত।'

আধা ঘুমের ঘোরে গ্রিগোরির কানে এলো কসাকরা মেঝের ওপর বিছানা পাতছে, হাই তুলছে, গা-হাত-পা চুলকোচ্ছে, তখনও চালিয়ে যাচ্ছে জমি নিয়ে, জমির ভাগাভাগি নিয়ে তাদের সেই তর্কাতর্কি।

ভোরের আগে আগে জানলার ঠিক বাইরে গুড়ুম করে গুলির আওয়াজ হল। কসাকরা লাফিয়ে উঠে পড়ল। গ্রিগোরি ফৌজী শার্টটা গায়ে গলাতে গেল, হাতা আটকে গেল; ওই অবস্থাতেই খপ করে গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে জুতো পরতে পরতে ছুটে বেরোল। জানলার বাইরে বাদামের খোসার মতো গুলিগোলা ছিটকে পড়ছে। ঘর্ঘর করতে করতে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কে একজন ভয়ার্তকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছে।

'হাতিয়ার তৈয়ার! . . . হাতিয়ার তৈয়ার! . . .'

চের্নেৎসোভের সৈন্যদল ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে গ্লুবোকায়া শহরে ঢুকে পড়ছে। ধূসর আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়সওয়াররা ছুটোছুটি করছে, ভারী বুটের খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে ছুটছে পদাতিক সৈন্যের দল। চৌরাস্তার মোড়ে মেশিনগান বসানোর তোড়জোড় চলছে। জনা তিরিশেক কসাকের একটা দল আড়াআড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রাস্তা আটকে রেখেছে। আরও একটা দল ছুটে গলি পার হয়ে গেল। রাইফেলে গুলি ভরার খটাংখটাং আওয়াজ হতে লাগল। পরের বাড়িটায় গমগমে উঁচু গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে কে একজন দিয়ে চলেছে ফৌজী হুকুম।

'তিন নম্বর স্কোয়াড্রন, চটপট! কে ওখানে লাইন ভাঙছে? . . . অ্যাটেন্‌-শন্! মেশিনগানরা – ডান পাশে! তৈয়ার? স্কোয়া-ড্রন্ . . .'

একসারি কামান নিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে একটা দল চলে গেল। ঘোড়াগুলো চার পা তুলে লাফিয়ে চলেছে। চালকেরা চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। গোলাগুলির বাক্সের ঝনঝন, গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আর গাড়ির ওপর কামানের বেদিগুলোর আর্তনাদ উপকণ্ঠে ক্রমাগত ফেটে পড়া গুলিগোলার আওয়াজের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি কোন এক জায়গা থেকে হঠাৎ একযোগে মেশিনগানের গর্জন শুরু হয়ে গেল। পাশের মোড়ে কোথা থেকে কে জানে ছুটতে ছুটতে এসে একটা ফৌজী খানা-গাড়ি বেড়ার ধারে পোঁতা খুঁটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্‌টে পড়ে গেল।

'শালা অন্ধ! কোথায় চলেছ দেখতে পাও না? চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?' মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত এক কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল সেখান থেকে।

গ্রিগোরি অনেক কষ্টে তার স্কোয়াড্রন জড় করল, দুলকি চালে স্কোয়াড্রনটাকে

চালিয়ে নিয়ে গেল জেলা সদরের উপকণ্ঠে। বিপুল বন্যাস্রোতের মতো সেখান থেকে হটে আসছে কসাকরা। প্রথম যে লোকটাকে হাতের সামনে পেল তার রাইফেল চেপে ধরল গ্রিগোরি।

'কোথায় চলেছ?'

'ছেড়ে দাও!' কসাকটা হেঁচকা টান মারল। 'ছেড়ে দে বলছি হারামজাদা! . . . ওরকম টানাটানি করছিস কেন? দেখতে পাচ্ছিস না পিছু হটছে? . . .'

'জোরে আমরা এঁটে উঠতে পারছি না! . . .'

'ভীষণ ঠেলা মারছে! . . .'

'আমরা এখন কোন্ দিকে যাব? মিল্লেরোভোর দিকে?' চারধার থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করতে লাগল সকলে।

শহরের শেষ প্রান্তে একটা লম্বামতন চালাঘরের সামনে গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রনটাকে সার বেঁধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পলায়নপর কসাকদের আরেকটা নতুন ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। গ্রিগোরির স্কোয়াড্রনের কসাকরা পলায়নপরদের দলে মিশে এ রাস্তা ও রাস্তা ধরে ছত্রাকার হয়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

'থাম! . . . পালিও না! . . . গুলি করব কিন্তু! . . .' ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে গর্জন করতে থাকে গ্রিগোরি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? রাস্তা ঝেঁটিয়ে চলে গেল মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি। কসাকরা মুহূর্তের জন্য দল বেঁধে রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, বুকে হেঁটে পাঁচিলের কাছাকাছি গিয়ে আড়াআড়ি রাস্তাগুলো ধরে চোঁ চাঁ দৌড় মারল।

গ্রিগোরির পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে কাছে থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ট্রুপ-অফিসার বাখ্‌মাচিওভ চিৎকার করে বলল, 'এখন আর ওদের ধরে রাখতে পারবে না মেলেখভ!'

দাঁত কড়মড় করতে করতে রাইফেল তুলে নাচাতে নাচাতে তাকে অনুসরণ করল গ্রিগোরি।

ইউনিটগুলোর মধ্যে যে আতঙ্ক পেয়ে বসল তার পরিণতি হল গ্লুবোকায়া থেকে বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন। বাহিনীর বেশির ভাগ রসদ আর সাজসরঞ্জাম ফেলে তারা পিটটান দিল। স্কোয়াড্রনগুলোকে আবার জড় করে পাল্‌টা আক্রমণে পাঠানো সম্ভব হল একমাত্র সেই ভোরের দিকে।

গোলুবোভ গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে, লাল টকটক করছে তার মুখ। গায়ে পশুলোমের খাটো ওভারকোট, সামনের বোতাম খোলা। তার সাতাশ নম্বর

রেজিমেন্ট সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে। গোলুবোভ কাঁসির মতো ক্যানকেনে গলায় চিৎকার করতে করতে সার বরাবর ছুটছে।

'কদম বাড়াও! উঠে এসো! . . . কুইক মার্চ! . . .'

১৪ নম্বর গোলন্দাজ বাহিনী পজিশন নিতে চলল, গাড়ি থেকে তোপগুলো নামানো শুরু হল। সিনিয়র অফিসার গোলাবারুদের একটা বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগল।

লড়াই শুরু হল ভোর ছয়টার দিকে। কসাকরা আর পেত্রোভের ভরোনেজ বাহিনীর রেড গার্ডরা মিলেমিশে ঘন সার বেঁধে বন্যাস্রোতের মতো এগোতে লাগল, কালো কালো মূর্তির ঝালরে ছেয়ে গেল তুষার ঢাকা মাঠের কিনারা।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়ায় ওড়ানো কালো মেঘের নীচে রক্তরাঙা ভোরের উদয় হল।

১৪ নম্বর গোলন্দাজ বাহিনীকে আড়াল দেওয়ার জন্য আতামান স্কোয়াড্রনের অর্ধেক সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়ে বাকিদের নিয়ে গ্রিগোরি আক্রমণে নেমে পড়ল।

প্রথম গোলাটা চের্নেৎসোভের সৈন্যদের সারির অনেকখানি সামনে এসে পড়ল। ছিন্নভিন্ন নীল-কমলা পতাকার মতো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিস্ফোরণ। টস করে এসে ফেটে পড়ল আরও একটা গোলা। একটার পর একটা কামান থেকে গোলা ছুঁড়ে লক্ষ্য স্থির করা হতে লাগল। দূরে সরে যেতে থাকে কামানের গর্জন। এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, রাইফেলের গুলির আওয়াজে আরও যেন তীব্র হয়ে ওঠে – পরক্ষণেই বিস্ফোরণের দূরাগত প্রতিধ্বনি। প্রথমে লক্ষ্য ছাড়িয়ে পড়ার পর এবারে গোলা ঘন হয়ে সারিগুলোর কাছাকাছি এসে পড়তে লাগল। হাওয়ার জন্য চোখ কোঁচকাল গ্রিগোরি, উৎফুল্ল হয়ে মনে মনে ভাবল, 'এবারে পাল্লার মধ্যে পেয়ে গেছি!'

ডান দিকের রক্ষণভাগে চলেছে ৪৪ নম্বর রেজিমেন্টের স্কোয়াড্রনগুলো। গোলুবোভ তার রেজিমেন্ট চালাচ্ছে মাঝখানে। গ্রিগোরি তার বাঁয়ে। তার পেছনে বাঁ দিকের রক্ষণব্যূহকে আড়াল দিচ্ছে রেড গার্ডদের দলগুলো। গ্রিগোরিদের স্কোয়াড্রনগুলোকে দেওয়া হয়েছে তিনটে মেশিনগান। তাদের কম্যাণ্ডার একজন বেঁটেখাটো রেড গার্ড, গম্ভীর প্রকৃতির মুখ, হাতগুলো তার লোমশ, চওড়া। লোকটা নিপুণ ভাবে নিশানা করে গোলা ছুঁড়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণের উদ্যোগ পঙ্গু করে দিচ্ছে। আতামান রক্ষিদলের সৈন্যরা সারি বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে, সেও সর্বক্ষণ তাদের মেশিনগানের কাছে কাছে আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে ফৌজী গ্রেটকোট গায়ে ভারী চেহারার এক মহিলা রেড গার্ড। সারির পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, মনে মনে ভাবল, 'মাগীবাজ! লড়াই করতে চলেছে,

অথচ মাগকে পেছনে রেখে আসতে পারে না। এরকম লোকজন নিয়ে খুব লড়াই হবে! সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা, পালকের গদি আর সংসারের যত হাবিজাবি নিলেও পারত! . . .' মেশিনগান-প্লেটুনের কম্যাণ্ডার গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এলো, বুকের ওপর নাগান রিভল্‌ভারের ডুরিটা ঠিকঠাক করে নিল।

'আপনি এই বাহিনীর কম্যাণ্ড দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আতামান গার্ডদের অর্ধেক স্কোয়াড্রনটার সেক্টরে আড়াল দেবার জন্যে গুলি ছুঁড়ব। আপনি দেখছেন ত আমরা এগুনোর পথ পাচ্ছি না।'

'চালান,' গ্রিগোরি রাজী হল। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ মেশিনগানের দিক থেকে একটা চিৎকার শুনে সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বিশাল চেহারার এক দাড়িওয়ালা মেশিনগানার ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাচ্ছে।

'বুন্‌চুক! . . . মেশিনগান গলে যাবে যে! অমন করলে কি চলে?'

লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ফৌজী গ্রেটকোট পরা মেয়েছেলেটা। ফুরফুরে পশমী রুমালের নীচে তার কালো চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে – দেখে গ্রিগোরির মনে পড়ে গেল আক্সিনিয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে ব্যাকুল হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

দুপুরবেলা গোলুবোভের কাছ থেকে একখানা চিরকুট নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রিগোরির কাছে এসে হাজির হল এক আর্দালি। ফৌজী নোটবুকের একটা ছেঁড়া পাতার ওপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে টানা টানা লেখা। পাতাটা দেখলেই মনে হয় বিচলিত হাতে ছেঁড়া হয়েছে।

> দন বিপ্লবী কমিটির নামে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে আপনি যেন আপনার পরিচালনাধীন স্কোয়াড্রন দুইটিকে বর্তমান অবস্থান হইতে প্রত্যাহারপূর্বক দ্রুত চালে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে তাহার দক্ষিণ রক্ষণভাগ হইতে বেষ্টন করেন। এই স্থান হইতে, হাওয়া কলের কিঞ্চিৎ বামে, গিরিখাত বরাবর যে অংশটি দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহাই আপনার যাত্রার লক্ষ্যস্থল হইবে। . . . গতিবিধি প্রচ্ছন্ন রাখিবেন (কিছু অস্পষ্ট শব্দ)। . . . আমরা যখন চূড়ান্ত চাপ সৃষ্টি করিব তখনই পার্শ্বভাগ হইতে আঘাত হানিবেন।
>
> গোলুবোভ

গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রনদুটিকে সরিয়ে আনল, তারা কোন দিকে চলেছে শত্রুপক্ষ যাতে বুঝতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়ায় উঠিয়ে পেছনে সরে গেল।

ছয় ক্রোশ ধরে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গেল তারা। ঘোড়াগুলো চলতে চলতে ঘন তুষাররাশির ভেতরে ডুবে যেতে লাগল। যে গিরিখাত ধরে পাশ দিয়ে তারা ঘুরে যেতে লাগল সেটা বরফে ঢেকে গেছে। জায়গায় জায়গায় ঘোড়ার বুক সমান বরফ। গ্রিগোরির ভয় হতে লাগল পাছে দেরি হয়ে যায়। কান পেতে তোপের আওয়াজ শুনতে শুনতে উদ্‌গ্রীব হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল সে। রুমানিয়ায় এক মৃত জার্মান-অফিসারের হাত থেকে সে খুলে নিয়েছিল এই হাতঘড়িটা। কম্পাস দেখে দিক ঠিক করছিল – তা সত্ত্বেও দেখা গেল যতটা দরকার তার চেয়ে একটু বেশি বাঁয়ে সরে এসেছে। পাহাড়ের চওড়া শাখা বেয়ে তারা এসে পড়ল একটা খোলা জায়গায়। ঘোড়াগুলোর গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, তাদের কুঁচকির ভাঁজ ভিজে গেছে। সকলকে ঘোড়া থেকে নামার নির্দেশ দিয়ে গ্রিগোরি নিজে প্রথম নেমে পড়ল কাছের একটা ঢিবির ওপর। ঘোড়াগুলো গিরিখাতের ভেতরে দেখাশোনা করার লোকদের হেফাজতে রেখে দেওয়া হল। গ্রিগোরিকে অনুসরণ করে অন্য কসাকরা চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। গ্রিগোরি যখন পিছু ফিরে দেখতে পেল গিরিখাতের বরফাচ্ছন্ন খাতে তার পেছন পেছন হয়ে একশ' জনেরও বেশি সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তখন নিজের ওপর তার আস্থা বেড়ে গেল, নিজেকে আরও শক্তিমান মনে হল। আর দশটা লোকের মতোই লড়াইয়ে নেমে যূথচারিতার উপলব্ধি তাকে সব সময় ভীষণ ভাবে পেয়ে বসে। পথটা যে এত কঠিন হবে তা গ্রিগোরি ধারণা করতে পারে নি। তার বুঝতে বাকি রইল না যে অন্তত আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে।

এক দুঃসাহসিক রণকৌশলের সাহায্যে চের্নেৎসোভের পিছু হটার পথ প্রায় কেটে দিয়েছে গোলুবোভ। দু'পাশে আড়াল দেওয়ার ব্যবস্থা রেখে অর্ধেক ঘেরাও হয়ে পড়া শত্রুকে এখন সে সামনে থেকে ঘা মারতে নেমেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কামানের গোলা বর্ষণের গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। লোহার কড়াইয়ে ছর্‌রা গড়িয়ে পড়ার মতো চড়বড় শব্দ করে ছুটছে রাইফেলের গুলি। অবিরল ধারায় গোলা এসে পড়ছে, গোলার ভাঙা টুকরোয় ছেয়ে যাচ্ছে চের্নেৎসোভের সৈন্যদের বিধ্বস্ত সারিগুলো। গ্রিগোরি হাঁক দিল, 'সার বেঁধে! সার বেঁধে! . . .'

গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রন নিয়ে পাশ থেকে ঘা মারল। ওরা নিজেদের আড়াল না দিয়ে, মাটিতে একবারও শুয়ে না পড়ে নেহাৎই গুলি ছোঁড়ার মহড়া

দেওয়ার কায়দায় এগোতে গেল। কিন্তু চের্নেৎসোভের দলের কোন এক ঝানু মেশিনগানার সারিটার ওপর এমন তোড়ে গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল যে কসাকরা তাদের জান বাঁচাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ল, তাদের দলের তিনজন খোয়া গেল।

বেলা তিনটের দিকে একটা গুলি গ্রিগোরিকে তার স্নেহস্পর্শ দিয়ে গেল। নিকেলের পাতে মোড়া সীসের গনগনে ডেলাটা তার হাঁটুর খানিকটা ওপরে চিড়বিড় করতে করতে মাংস ছিঁড়ে ভেতরে গেঁথে গেল। একটা আগুনঢালা যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণের ফলে একটা পরিচিত বমি-বমি ভাব উপলব্ধি করল সে। দাঁতে দাঁত চাপল। বুকে হেঁটে সারি থেকে বেরিয়ে এলো সে এবং উত্তেজনার মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে গোলার শব্দে ঝিম ধরা মাথাটা ভীষণ ভাবে ঝাঁকাল। গুলিটা না বের হওয়ায় পায়ের ব্যথাটা বেড়ে চলল। গুলিটা যখন উড়তে উড়তে গ্রিগোরির হাঁটুতে এসে বিঁধল তখন সেটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল; গ্রিগোরির গ্রেটকোট, প্যান্ট আর চামড়া ভেদ করে একগাদা মাংসপেশীর ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেখানে জুড়োতে থাকল। একটা আগুনের মতো গরম যন্ত্রণা সমানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, নড়তে চড়তে অসুবিধা হতে লাগল। শুয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগোরির মনে পড়ে গেল রুমানিয়ায় ট্রান্‌সিলভানিয়া পাহাড়ে ১২ নম্বর রেজিমেণ্টের আক্রমণের কথা। সেই সময় হাতে চোট পেয়েছিল সে। তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল সেই আক্রমণের দৃশ্য – ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন, রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে মিশ্‌কা কশেভয়ের মুখ, আহত লেফ্‌টেনাণ্টকে টানতে টানতে পাহাড়ের নীচে ছুটে নামছে ইয়েমেলিয়ান গ্রোশেভ।

স্কোয়াড্রনদুটো পরিচালনার ভার নিল গ্রিগোরির সহকারী, পাভেল লিউবিশ্‌কিন নামে এক অফিসার। ঘোড়াগুলো যেখানে পাহারায় রাখা হয়েছিল, অফিসারের নির্দেশে দু'জন কসাক গ্রিগোরিকে সেখানে ফিরে যেতে সাহায্য করল। ধরাধরি করে তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিয়ে সহানুভূতির স্বরে তারা উপদেশ দিল।

'হাঁটুটা বরং বেঁধেই ফেলুন না।'

'ব্যাণ্ডেজ আছে?'

গ্রিগোরি ততক্ষণে জিনের ওপর চড়ে বসেছিল, কিন্তু একটু ভেবে সে নেমে পড়ল, সালোয়ারটা খুলে নামিয়ে দিল। তার ঘর্মাক্ত পিঠ, তলপেট আর পায়ের ওপর দিয়ে কাঁপুনি বয়ে গেল। ক্ষতস্থানটা সামান্য ঝলসে গেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, দেখলে মনে হয় যেন পেন্সিল-কাটা ছুরিতে কেটে গেছে। গ্রিগোরি যন্ত্রণায় ভুরু কুঁচকে দ্রুত হাতে হাঁটু ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল।

গ্রিগোরি তার আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে সেই একই ঘোরাপথে ফিরে চলল

সেখানে, যেখান থেকে তারা পাল্‌টা আক্রমণ শুরু করেছিল। চলতে চলতে দেখতে পেল তুষার মথিত করে ঘোড়ার চলার চিহ্ন, যে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে এই কয়েক ঘণ্টা আগেও গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রনদুটোকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, তার পরিচিত দৃশ্যরেখা। তার ঘুম পেতে লাগল। টিলার ওপরে যা ঘটছে তা এখন তার কাছে কেন যেন দূরের আর অবান্তর বলে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে টিলার ওপরে রাইফেলের গুলিবর্ষণ কেমন যেন বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো হয়ে উঠেছে। শত্রুপক্ষের ভারী কামানগুলো গর্জন করছে, আত্মরক্ষা-কারীদের সাহায্য এগিয়ে এসেছে। মাঝে মধ্যে মেশিনগানের কট্‌কট্‌ আওয়াজ হচ্ছে, শুনে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধের ফলাফলের নীচে কতকগুলো বিন্দুর সারি দিয়ে অদৃশ্য রেখা এঁকে যাচ্ছে।

গিরিখাতের মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ মতো তারা ঘোড়ায় চড়ে এলো। বরফের মধ্যে আটকে যেতে লাগল তাদের ঘোড়া।

'ফাঁকা জায়গায় নিয়ে চল . . .' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর্দালিকে এই কথা বলে বরফের একটা উঁচু স্তূপের ওপর গ্রিগোরি উঠিয়ে দিল তার ঘোড়াটা।

দূরে মাঠের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কালো কালো মৃতদেহ – যেন ঝাঁকে কাক এসে বসেছে। দিগন্তরেখার ঠিক গায়ে ছুটছে সওয়ারহীন একটা ঘোড়া – এখান থেকে ছোট্ট এতটুকু দেখাচ্ছে।

গ্রিগোরি দেখতে পেল চের্নেৎসোভের সৈন্যবাহিনীর মূল অংশটা বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে গ্লুবোকায়ার দিকে সরে যাচ্ছে। গ্রিগোরি তার কপিল রঙের ঘোড়াটাকে টগবগিয়ে ছুটিয়ে দিল। দূরে দেখা গেল কসাকদের বিচ্ছিন্ন কতকগুলো দল। ঘোড়া ছুটিয়ে প্রথম দলটার কাছে আসতেই গোলুবোভকে চিনতে পারল গ্রিগোরি। গোলুবোভ পেছনে হেলে জিনের ওপর বসে আছে। গায়ে তার পশুলোমের খাটো ওভারকোট, বুকের দু'ধারের আস্ত্রাখান-ভেড়ার লোমের পাড় হলদেটে ছাঁট ধরা, বুকের বোতাম খোলা, লম্বা পশমী টুপিটা মাথার একপাশে ঠেলে দেওয়া, কপাল ঘামে ভিজে জবজব করছে। সার্জেন্ট-মেজরের উপযুক্ত ছুঁচালো গোঁফে তা দিতে দিতে গোলুবোভ ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'সাবাস মেলেখভ! একি চোট লেগেছে মনে হচ্ছে? মরুক গে। হাড় ভাঙে নি ত?' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই একগাল হেসে বলল, 'খুব দিয়েছি ওদের। গুঁড়িয়ে দিয়েছি! . . . অফিসারদের দলটাকে এমন ছাতু ছাতু করে দিয়েছি যে আর কখনও জড় করতে হবে না। ওদের জারিজুরি খতম!'

গ্রিগোরি একটা সিগারেট চেয়ে নিল। সারা মাঠ জুড়ে কসাক আর রেড গার্ডদের স্রোত বয়ে চলেছে। দূরের কালো জনতার মাঝখান থেকে আগে আগে

ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল এক কসাক ঘোড়সওয়ারকে।

'চল্লিশজন লোক ধরা পড়েছে, গোলুবোভ! . . . দূর থেকে সে চেঁচিয়ে বলল। 'চল্লিশজন অফিসার, তাদের মধ্যে খোদ চের্নেৎসোভ।'

'মিথ্যে কথা!' গোলুবোভ উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে বসল জিনের ওপর। তারপর তার সাদা-পা উঁচু ঘোড়াটার পিঠে নির্মম ভাবে চাবুক কষতে কষতে ছুটিয়ে দিল সেটাকে।

একটু অপেক্ষা করে গ্রিগোরিও তার পিছন পিছন দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল।

২৭ নম্বর রেজিমেণ্টের একটা স্কোয়াড্রন আর ৪৪ নম্বর রেজিমেণ্টের কসাকরা – তিরিশজনের পাহারাদারদের একটি দল চারদিক থেকে চক্রাকারে বেষ্টন করে নিয়ে চলেছে ঘন দলবদ্ধ বন্দী অফিসারদের। সকলের আগে আগে হাঁটছে চের্নেৎসোভ। পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পশুলোমের খাটো ওভারকোটটা সে গা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছিল, এখন তাই তার গায়ে শুধু পাতলা চামড়ার একটা কোর্তা। তার বাঁ কাঁধের কাঁধপটিটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বাঁ চোখের নীচে সদ্য ছড়ে যাওয়ার একটা রক্তাক্ত দাগ। দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটছে সে। মাথার একপাশে তেরছা করে পরা লম্বা পশমী টুপিটা তার চেহারায় একটা ভাবনাচিন্তাহীন বেপরোয়া ভাব এনে দিয়েছে। তার গোলাপী মুখখানায় ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। চেহারা দেখে বোঝা যায় বেশ কয়েকদিন দাড়ি কামানো হয় নি – গালে আর চিবুকে বাদামী চুলের পাতলা গোছা সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে। তার দিকে ছুটে আসা কসাকদের কঠিন দৃষ্টিতে দ্রুত নিরীক্ষণ করল সে – তীব্র ঘৃণায় তার দুই ভুরুর মাঝখানে ফুটে উঠল কালো ভাঁজ। দৃঢ়তাব্যঞ্জক গোলাপী ঠোঁটের কোনায় সিগারেট চেপে ধরে চলতে চলতে দেশলাই জ্বালিয়ে সে সিগারেট ধরাল।

বেশির ভাগ অফিসারই তরুণ, শুধু দু'-একজনের চুলে সাদা পাক ধরেছে। একজনের পায়ে চোট লেগেছে, সে পিছিয়ে পড়ছিল। মুখে বসন্তের দাগ, বেঁটেখাটো, হেঁড়ে মাথা এক কসাক পেছন থেকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল তাকে। চের্নেৎসোভের প্রায় পাশাপাশি চলেছে লম্বা, ডাকাবুকো গোছের এক মেজর। আর দু'জন – একজন কর্ণেট আর একজন লেফটেনাণ্ট – হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের পেছনে আছে এক বৃষস্কন্ধ, কোঁকড়া-চুল শিক্ষানবিশ অফিসার, তার মাথায় টুপি নেই। আরেকজন অফিসার ফৌজী গ্রেটকোটটা তার দুই কাঁধের ওপর ছড়িয়ে ফেলে রেখেছে, সেটার ওপরে তার পদমর্যাদার চিহ্নসূচক কাঁধপটিদুটো জবরদস্ত সেলাই-করা। আরও একজনের মাথায় টুপি নেই, সুন্দর মেয়েলী কালো দুটি চোখের ওপর নামিয়ে রেখেছে

অফিসারদের লাল গরম কাপড়ের ঘোমটা, বাতাসে ঘোমটার কিনারাগুলো তার কাঁধের ওপর লটরপটর করছে।

গোলুবোভ ঘোড়ায় চড়ে তাদের পেছন পেছন চলল। একবার একটু ঘোড়া থামিয়ে কসাকদের চেঁচিয়ে সে বলল, 'এদিকে শোনো তোমরা সবাই! . . . ফৌজী বিপ্লবের সময়কার যে-সমস্ত কড়াকড়ি আছে সেই অনুযায়ী বন্দীদের নিরাপত্তার জন্যে তোমরা দায়ী থাকবে। দেখবে, যেন অক্ষত শরীরে সদর ঘাঁটিতে রেখে আসা হয়!'

একজন কসাক ঘোড়সওয়ারকে কাছে ডাকল সে, জিনের ওপরে বসেই খসখস করে একটা চিরকুট লিখে ভাঁজ করে তার হাতে দিয়ে বলল, 'শিগ্গির ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও! পদ্‌তিওল্‌কভকে দেবে।'

গ্রিগোরির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওখানে যাচ্ছ মেলেখভ?'

সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে ঘোড়া চালিয়ে গ্রিগোরির পাশাপাশি এসে গোলুবোভ বলল, 'পদ্‌তিওল্‌কভকে বলবে যে চের্নেৎসোভের জন্যে আমি জামিন রইলাম! বুঝেছ? . . . এই কথাই জানাবে। আচ্ছা, এখন যাও!'

বন্দীদের ভিড়টাকে পেছনে ফেলে গ্রিগোরি ঘোড়া ছুটিয়ে চলল বিপ্লবী কমিটির সদর ঘাঁটির দিকে। সদর ঘাঁটিটা বসানো হয়েছে একটা গ্রামের কাছাকাছি এক মাঠের মধ্যে। মেশিনগানের একটা চওড়া ইউক্রেনীয় গাড়িতে সবুজ খোলঢাকা মেশিনগান, গাড়ির চাকাগুলো বরফে জমে গেছে, তারই পাশে পায়চারি করছে পদ্‌তিওল্‌কভ। সেখানেই জুতোর গোড়ালির খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে একঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে দপ্তরের কিছু লোক, বার্তাবহ, কয়েকজন অফিসার এবং কসাক আর্দালিরা। পদ্‌তিওল্‌কভের মতো মিনায়েভও এইমাত্র লড়াইয়ের জায়গা থেকে ফিরে এসেছে। গাড়ির কোচবাক্সের ওপর বসে সে কচরমচর করে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া সাদা রুটি চিবুচ্ছিল।

'পদ্‌তিওল্‌কভ!' গ্রিগোরি একপাশে সরে এসে ডাক দিল। 'এক্ষুনি বন্দীদের নিয়ে আসা হবে। গোলুবোভের চিরকুটটা পড়েছ ত?'

পদ্‌তিওল্‌কভ সজোরে হাতের চাবুকটা আছড়াল। চোখের পাতা নামিয়ে, রক্তজমাট চোখের দৃষ্টি মাটিতে বিদ্ধ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'রাখ দেখি তোমার গোলুবোভ! . . . ও চাইলেই হল? ওকে খুনে ডাকাত প্রতিবিপ্লবী চের্নেৎসোভের জামিন হতে দাও? না তা হবে না! . . . ওদের সবগুলোকে গুলি করে খতম করে দাও – আর কোন কথা নয়!'

'গোলুবোভ বলেছে যে ওর জামিন হবে।'

'হতে দেব না! . . . বললাম ত হতে দেব না! সাফ কথা! বিপ্লবী আদালতে

ওর বিচার হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাজাও হবে। দেখে যেন অন্যদের শিক্ষা হয়! . . . তুমি জান,' বন্দীদের ভিড়টা সামনে এগিয়ে আসতে থাকায় কঠিন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে এবারে একটু শান্ত গলায় সে বলল, 'তুমি জান, কত রক্তপাত ও ঘটিয়েছে? রক্তের বন্যা বইয়েছে! . . . কত খনিমজুরকে ও খুন করেছে?' আবার ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, ভয়ঙ্কর ভাবে চোখদুটো পাকিয়ে বলল, 'দেব না! হতে দেব না!'

'অত চেঁচানোর কী আছে?' গ্রিগোরিও গলা চড়াল। ভেতরে ভেতরে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, পদ্‌তিওল্‌কভের উন্মত্ততা যেন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। 'এখানে তোমরা অনেক বিচারক আছ দেখছি! ওখানে যাও না কেন?' গ্রিগোরির নাকের পাটাদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। আঙুল দিয়ে পিছনে লড়াইয়ের মাঠটা দেখিয়ে দিল সে। 'এখানে বন্দীদের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর জন্যে তোমরা অনেকে আছ!'

হাতের মুঠোয় চাবুকটা পাকিয়ে ধরে পদ্‌তিওল্‌কভ পিছিয়ে গেল। দূর থেকে চিৎকার করে বলল, 'ওখানেও ছিলাম আমি। ভেবো না যে এই মেশিনগানের গাড়িতে থেকে গা বাঁচাচ্ছি। আর তুমি মেলেখভ, তোমাকে বলে দিচ্ছি, চুপ করে থাক! . . . বুঝেছ? . . . তুমি কার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ? . . . অ্যাঁ? . . . তোমার ওই সব অফিসারী ঢং ছাড়! বিচার করবে বিপ্লবী কমিটি, এ তোমার আর কেউ নয় . . .'

গ্রিগোরি তার দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল, চোট লাগার কথা ভুলে গিয়ে জিন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই তীব্র যন্ত্রণায় চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। চোট লাগা জায়গাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল, প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল সেখানে। কারও সাহায্য ছাড়াই সে উঠে পড়ল, ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে কোন রকমে মেশিনগানের গাড়িটার কাছে এসে কাত হয়ে গাড়ির পেছনের স্প্রিংয়ে হেলান দিল।

বন্দীরা এসে পড়েছে। সদর ঘাঁটির পাহারায় যে-সমস্ত আর্দালি ও অন্যান্য কসাক সৈন্য ছিল পদাতিক প্রহরীদের একটা অংশ তাদের সঙ্গে মিশে গেল। কসাকদের মধ্যে লড়াইয়ের তাপ তখনও জুড়োয় নি, লড়াইয়ের বিশদ বিবরণ ও তার পরিণতি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করতে করতে ক্রোধে ও উত্তেজনায় তাদের চোখ জ্বলতে লাগল।

ভুসভুসে বরফের স্তূপের মধ্যে ভারী ভারী পা ফেলে বন্দীদের দিকে এগিয়ে এলো পদ্‌তিওল্‌কভ। দলটার সকলের সামনে দাঁড়িয়ে চের্নেৎসোভ। তার হাল্কা রঙের স্পর্ধিত চোখদুটো অবজ্ঞাভরে কুঞ্চিত করে সে তাকাল পদ্‌তিওল্‌কভের

দিকে; বাঁ পাটা সামনে রেখে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নাচাচ্ছে সে, তার ওপরের দাঁতের সাদা পাটি বেরিয়ে আছে ঘোড়ার নালের আকারে, তাই দিয়ে সে ভেতরে কামড়ে ধরে আছে নীচের গোলাপী ঠোঁটটা। পদ্‌তিওল্‌কভ তার একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। পায়ে-মাড়ানো বরফের ওপর স্থির দৃষ্টি বুলাল। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই চের্নেৎসোভের অবজ্ঞাভরা নিঃশঙ্ক দৃষ্টির সঙ্গে সংঘাত বাধল, প্রবল ঘৃণার ভারে পদ্‌তিওল্‌কভ ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইল চের্নেৎসোভের সেই দৃষ্টি।

'এইবার ধরা পড়েছে... শয়তান!' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চাপা গলায় কথাগুলো বলে এক পা পিছিয়ে গেল পদ্‌তিওল্‌কভ। একটা বাঁকা হাসি তলোয়ারের কোপের মতো তার দুই গাল কেটে বসে গেল।

'কসাকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস! ইতর! বেইমান!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝনঝন শব্দে উচ্চারণ করল চের্নেৎসোভ।

পদ্‌তিওল্‌কভ এক ঝটকায় মাথাটা একদিকে সরিয়ে নিল, যেন একটা চপেটাঘাত এড়িয়ে গেল। তার মুখ কালো হয়ে গেল, মুখ হাঁ করে সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

এর পরের ঘটনা ঘটে গেল বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে। দাঁত খিঁচিয়ে, পাণ্ডুর মুখে, দু'হাত মুঠো করে বুকে চেপে ধরে গোটা শরীর সামনে ঝুঁকিয়ে চের্নেৎসোভ এগিয়ে গেল পদ্‌তিওল্‌কভের দিকে। তার খিঁচুনি ধরা ঠোঁট থেকে অনর্গল ঝরতে লাগল অশ্লীল গালাগাল মেশান অস্পষ্ট কতকগুলো শব্দ। সে যে কী বলছিল, পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসতে আসতে একমাত্র পদ্‌তিওল্‌কভই তা শুনতে পেল।

'তোর... তোরও সময় আসবে... জেনে রাখিস!' হঠাৎ গলা চড়াল চের্নেৎসোভ।

বন্দী অফিসাররা, তাদের সঙ্গের পাহারাদার আর সদর ঘাঁটির লোকেরা – সবাই এই কথাগুলো শুনতে পেল।

'তবে রে...' তলোয়ারের হাতলটা হাতড়াতে হাতড়াতে এমন ভাবে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে উঠল পদ্‌তিওল্‌কভ যে মনে হল বুঝি কেউ তার গলা টিপে ধরেছে।

হঠাৎ নেমে এলো নিস্তব্ধতা। মিনায়েভ, ক্রিভশ্‌লিকভ এবং আরও কয়েকজন লোক ধেয়ে গেল পদ্‌তিওল্‌কভের দিকে, তাদের পায়ের নীচে মচমচ করে বরফ গুঁড়িয়ে যাওয়ার স্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু তাদের আগেই এগিয়ে গেছে পদ্‌তিওল্‌কভ। গোটা শরীরটা ডান দিকে ঘুরিয়ে গুড়ি মেরে বসে পড়ে হেঁচকা

টানে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ফেলল সে, এক লাফে সামনে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে চের্নেৎসোভের মাথায় কোপ বসিয়ে দিল।

গ্রিগোরি দেখল, চের্নেৎসোভ শিউরে উঠল, বাঁ হাতটা ওপরে তুলে মাথা আড়াল করল; দেখল হাতটা কব্জির কাছে কোনাকুনি কেটে ভেঙে পড়ল, চের্নেৎসোভ মাথাটা পেছন দিকে হেলাল, কিন্তু তলোয়ারখানা নিঃশব্দে তার মাথার ওপর এসে পড়ল। প্রথমে পড়ে গেল তার মাথার লম্বা পশমী টুপিটা, তার পর একটা ডাঁটা-ভাঙা গমের শীষের মতো ধীরে ধীরে পড়ে গেল চের্নেৎসোভ; তার মুখটা অদ্ভুত রকম বেঁকে গেল, যন্ত্রণায় সে চোখ কোঁচকাল, বুজে ফেলল দুইচোখ – যেন বিদ্যুতের চমকে ধাঁধিয়ে গেছে।

পদ্‌তিওল্‌কভ আরও একটা কোপ মারল। তলোয়ারের রক্তমাখা ধারগুলো মুছতে মুছতে যে ভাবে ভারী ভারী পা ফেলে সেখান থেকে পিছিয়ে এলো তাতে মনে হল বুঝি হঠাৎ তার বয়স বেড়ে গেছে।

মেশিনগানের গাড়িতে ধাক্কা খেতে পাহারাদারদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

'কেটে ফেল... চুলোয় যাক! সব কটাকে সাবাড় কর! ওসব বন্দী-টন্দী আমরা কাউকে রাখি না!... রক্ত চাই! কলজে উপড়ে ফেল!...'

পাগলের মতো গুলি ছুঁড়তে লাগল ওরা। অফিসাররা ধাক্কাধাক্কি করে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। অফিসারদের লাল গরম কাপড়ের ঢাকনায় মাথা ঢাকা সেই সুন্দর মেয়েলি-চোখ লেফ্‌টেনাণ্ট দু'হাতে মাথা চেপে ধরে পালাতে গেল। একটা গুলি লেগে বাধা টপকানোর ভঙ্গিতে শূন্যে লাফিয়ে উঠল সে। মাটিতে পড়ে আর উঠল না। ডাকাবুকো চেহারার লম্বা মেজরটিকে দু'জন লোক কাটতে গেল। তলোয়ারের ফলা হাতে চেপে ধরতে হাতের তালু কেটে গিয়ে দরদর ধারে তার জামার হাতায় রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। একটা বাচ্চাছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, বরফের ওপর গড়াতে লাগল মাথাটা; তার মুখের মধ্যে চোখে পড়ে শুধু রক্তজমাট চোখদুটো আর ভয়ঙ্কর আর্তনাদে ছিন্নভিন্ন তার কালো মুখবিবরটা। তার মুখে, কালো মুখবিবরের ওপর একের পর এক তলোয়ারের কোপ পড়তে লাগল, কিন্তু সে আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে চলল। পেছনের বেল্ট ছেঁড়া গ্রেটকোট পরা এক কসাক দু'পা ফাঁক করে তার ওপর দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়ে তাকে খতম করে দিল। কোঁকড়ানো-চুল শিক্ষানবিশ অফিসারটি সারি ভেঙে আরেকটু হলেই পালিয়ে যাচ্ছিল – কিন্তু আতামান রক্ষিদলের কোন এক কসাক মাথার পেছনে এক ঘা মেরে তাকে ধরাশায়ী করল। একজন লেফ্‌টেনাণ্ট এই

ফাঁকে ছুটে পালানোর চেষ্টা করল, বাতাসে তার গ্রেটকোটটা পাখির ডানার মতো উড়তে লাগল। আতামান রক্ষিদলের সেই কসাকটাই তার কাঁধের ফলার মাঝখানে গুলি চালিয়ে দিল। লেফটেনান্ট মাটিতে বসে পড়ল, যতক্ষণ না মরল ততক্ষণ আঙুল দিয়ে বুক খামচাতে লাগল। পাকা চুল সাব-অল্টার্ণকে সেই জায়গায়ই মেরে ফেলা হল; শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পা আছড়াতে আছড়াতে বরফের মধ্যে একটা গভীর গর্ত করে ফেলল; কসাকরা যদি দয়াপরবশ হয়ে তার ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়ে না দিত তাহলে দড়িতে বাঁধা তেজী ঘোড়ার মতো আরও কতক্ষণ পা ছুঁড়ত বলা যায় না।

হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার মুহূর্তে পদ্‌তিওল্‌কভের ওপর ঘোলাটে স্থির দৃষ্টি রেখে মেশিনগানের কাছ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল গ্রিগোরি। পেছন থেকে তাকে খপ্ করে চেপে ধরল মিনায়েভ, হাত মুচড়ে নাগান রিভল্‌ভারটা কেড়ে নিল, নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বলি তুমি কী ভেবেছিলে, অ্যাঁ?'

তেরো

সূর্যের ঝলমলে আলো আর মেঘমুক্ত দিনের নীলিমার ঢল নেমেছে টিলার বুকে, সাদা ধবধবে হয়ে উঠেছে টিলার চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল বরফঢাকা টিলার শিরদাঁড়াটা, ঝকঝক করছে চিনির দানার মতো। টিলার পায়ের কাছে বিচিত্রবর্ণের একফালি কাঁথার মতো পড়ে আছে ওল্‌খোভি রোগ বসতি। বাঁ দিকে নীলিমার বুকে উধাও স্‌ভিনিউখা, ডান দিকে কুয়াশার ছোপের মতো চোখে পড়ে কিছু কসাক পল্লী আর জার্মান কলোনি, আরও দূরে বাঁক ছাড়িয়ে হাল্‌কা নীলের মধ্যে ডুবে আছে তের্‌নোভ্‌স্কায়া। পুবে গুড়ি মেরে ওপরে উঠে গেছে আরেকটা টিলা – একটু ছোট আকারের। এটার ঢাল গিরিখাতের দাগে ক্ষতবিক্ষত, ধীরে ধীরে গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে, গায়ে বেড়ার খুঁটির মতো পোঁতা টেলিগ্রাফের খুঁটি – চলে গেছে কাশারির দিকে।

দিনটা অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কার, হিমেল। সূর্যের কাছ থেকে নেমে আসছে রামধনুরঙ-ছিটানো কুয়াশার কতকগুলো স্তম্ভ। উত্তুরে হাওয়া বইছে। স্তেপের বুকে হিসহিসিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। কিন্তু দিগন্তের আলিঙ্গনে বাঁধা বরফ-ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঝকঝকে পরিষ্কার। শুধু পুবে, দিগন্তের একেবারে কিনারা ঘেঁসে বেগনী রঙের আবছা অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাচ্ছে স্তেপভূমি।

গাড়ি হাঁকিয়ে মিল্লেরোভো থেকে গ্রিগোরিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। ঠিক করেছিল ওল্‌খোভি রোগে না থেমে আরও এগিয়ে কাশারি পর্যন্ত চলে যাবে, সেখানেই রাতটা কাটাবে। গ্রিগোরির একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিল। ২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যার দিকে মিল্লেরোভোতে এসে পৌঁছায়। সেখানে এসে দেখে গ্রিগোরি এক সরাইখানায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। পরদিন সকালে তারা সেখান থেকে রওনা দিল। বেলা যখন প্রায় এগারোটা তখনই তারা পেরিয়ে গেল ওল্‌খোভি রোগ।

গ্লুবোকায়ার লড়াইয়ে আহত হওয়ার পর মিল্লেরোভোর এক ফিল্ড-হাসপাতালে গ্রিগোরি এক সপ্তাহ পড়ে ছিল। অল্পস্বল্প চিকিৎসার পর পা'টা সেরে গেলে ঠিক করল বাড়ি যাবে। তাদের জেলার কসাকরা তার ঘোড়াটা নিয়ে এসেছিল। অসন্তোষ আর আনন্দের একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বাড়ি চলেছে গ্রিগোরি। অসন্তোষ এই জন্য যে দনের ক্ষমতা দখলের লড়াই যখন চরমে উঠেছে তখনই তাকে তার ইউনিট ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আবার বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা হবে, আবার সে যে তার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে – একমাত্র এই চিন্তা করে সে মনে আনন্দও উপলব্ধি করছিল। আক্সিনিয়াকে দেখার বাসনাটা নিজেই নিজের কাছ থেকে গোপন করে রাখে, কিন্তু মনে মনে সে চিন্তাটাও ছিল বৈ কি!

বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎটা তেমন আন্তরিক হল না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ (পেত্রো তার কান ভারী করেছে) ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরিকে। তার চোখের ক্ষণকালের কটাক্ষ যেন চাবুক হানছে, তাতে জমে আছে অসন্তোষ আর গভীর উদ্বেগ। দন প্রদেশে যে লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলছে সন্ধ্যাবেলায় স্টেশনে গ্রিগোরিকে সে ঘটনা সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে সে জিজ্ঞেসবাদ করে। স্পষ্টই বোঝা গেল ছেলের উত্তরগুলো তার মনঃপূত হল না। সে তার সাদা ছোপ ধরা দাড়ি চিবুতে চিবুতে পায়ে চামড়ার সোল লাগানো যে ফেল্‌ট বুট পরা ছিল সে দিকে তাকাল, নাক সিঁটকাল। তর্ক করার কোন আগ্রহ তার ছিল না, কিন্তু কালেদিনের সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে তাকে বেশ উত্তেজিত দেখা গেল – উত্তেজনার মুহূর্তে আগে যেমন করত এখনও তেমনি গ্রিগোরিকে দাবড়ানি দিল, এমনকি খোঁড়া পা'টা মাটিতেও ঠুকল।

'তুই আমাকে কী বোঝাবি? গত শরতে কালেদিন নিজে এসেছিলেন আমাদের গাঁয়ে। ময়দানে জমায়েত হল। একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে গ্রামের বুড়ো মাতব্বরদের সঙ্গে কথা বললেন। ভবিষ্যতের কথা বলে গেলেন – একেবারে বাইবেলের মতো। বললেন, চাষাভুষোরাসব এসে ঢুকে পড়বে, লড়াই বেধে যাবে; তখনও যদি আমরা ইতি-উতি করে বেড়াই তাহলে আর দেখতে হবে না – সর্বস্ব

লুটেপুটে নেবে, এদেশে বসবাস শুরু করবে। তখনই তিনি বলেছিলেন লড়াই হবে। এখন তোরা, শুয়োরের বাচ্চারা, কী বলবি, বল? উনি কি তোদের চাইতে কম জানেন? ওঁর মতো একজন জ্ঞানীগুণী জেনারেল, একটা গোটা আর্মি চালাচ্ছেন উনি – বলতে চাস তোর চেয়ে কম জানেন? কামেন্স্কায়াতে এসে জুটেছে তোর মতো যত রাজ্যের লেখা-পড়া-না-জানা বাক্যবাগীশ লোকজন – তারাই লোকের মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। তোর ওই পদ্‌তিওল্‌কভ – ওটা কে? সার্জেন্ট-মেজর? . . . আরে ছোঃ! ও ত আমারই র‍্যাঙ্কের। বোঝ কাণ্ড! এই দেখার জন্যেই কিনা বেঁচে ছিলাম! . . . এর পর আর কী হওয়ার বাকি থাকল!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রিগোরি তর্ক করতে লাগল তার সঙ্গে। বাপের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রিগোরির জানা ছিল। কিন্তু এখন এসে জুটেছে এক নতুন উপসর্গ: চের্নেৎসোভের মারা যাওয়ার ঘটনা, বিনা বিচারে বন্দী অফিসারদের গুলি করে মারা – কিছুতেই সে ক্ষমা করতে পারছে না, ভুলতে পারছে না।

হাল্‌কা স্লেজে-জোতা ঘোড়াদুটো স্বচ্ছন্দে পথ চলেছে। গ্রিগোরির ঘোড়াটা স্লেজের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা, সঙ্গে সঙ্গে চলছে। ঘোড়াটার পিঠের জিন যেমনকার তেমনই বাঁধা আছে। রাস্তায় একের পর এক আসতে লাগল কাশারি, পপোভ্‌কা, কামেন্‌কা, ভাটির ইয়াব্‌লনোভ্‌স্কি, গ্রাচোভ, ইয়াসেনোভ্‌কা – তার আশৈশব পরিচিত যত বসতি আর পল্লী। গ্রামে ফেরার সময় সারাটা রাস্তা গ্রিগোরি কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া, অসংলগ্ন ভাবে ভাবতে লাগল সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো, চেষ্টা করল ভবিষ্যতের অন্তত কিছু দিশারী খুঁজে পাবার, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করা ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারল না, একটু দূরে গিয়েই ভাবনাচিন্তাগুলো যেন কানাগলিতে আটকে যায়। মনে মনে ভাবল, 'বাড়ি গিয়ে কিছু দিন বিশ্রাম নেব, পায়ের চোটটা সারাব, তারপর . . .' কিন্তু তারপর যে কী, ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে মনে মনে বলল, 'তারপর দেখা যাবে। ঘটনা কোন্ দিকে গড়ায় দেখাই যাক না! . . .'

লড়াই করে করে ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়েছে। ঘৃণায় বিক্ষুব্ধ সমস্ত কিছুকে, এই ইতরভাবাপন্ন, দুর্বোধ্য জগৎটাকে ছেড়েছুড়ে চলে যাবার একটা প্রবল বাসনা তার হচ্ছিল। পেছনে যা পড়ে রইল তার সবটাই জট পাকানো, পরস্পরবিরোধী। অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পথটি খুঁজে পেয়েছিল সে, কিন্তু হঠাৎ জলকাদার ওপরে পাতা তক্তাটা দুলে উঠতে পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল, পথটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, এখন কোন্ পথে গেলে ঠিক হবে সে আর বুঝে উঠতে পারছে না। তার বিশ্বাস যেন টাল খেয়েছে। বলশেভিকদের দিকে টান অনুভব করেছিল – তাই সে-পথে গিয়েছিল, অন্যদেরও টেনে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে

করে। কিন্তু পরে আবার চিন্তা করতে গিয়ে দেখা গেল বুকের ভেতরের সে আগুন আর নেই। 'তাহলে কি ইজ্‌ভারিনের পথই ঠিকই? কার দিকে যাব?' স্লেজের পিঠে হেলান দিয়ে বসে বসে অস্পষ্ট ভাবে এই সব কথা মনে মনে আন্দোলন করতে লাগল গ্রিগোরি। কিন্তু যখন যে ভাবল বসন্তকালের ক্ষেতের কাজের জন্য মই আর গোরুর গাড়ি ঠিকঠাক করতে হবে, উইলো গাছের ডালপালা দিয়ে গোরুবাছুরের জাবনার চেঙ্গারি বুনতে হবে, তারপর বরফ সরে গিয়ে মাটি আলগা হয়ে শুকিয়ে গেলে গাড়ি নিয়ে সে স্তেপে চলে যাবে, কাজের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকা হাতে লাঙলের মুঠো চেপে ধরবে, পেছন পেছন যেতে যেতে ধাক্কা খাবে, তার প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করবে; যখন মনে মনে কল্পনা করল যে-কালোমাটির বুকে এখনও লেগে রয়েছে বরফের মিষ্টি সোঁদা গন্ধ, সেই মাটি লাঙলের ফালে ওলট-পালট হতে থাকবে, কচি ঘাসের সঙ্গে তার মিষ্টি গন্ধে সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে, তখন আনন্দে ভরে উঠল তার বুক। তার ইচ্ছে হচ্ছিল গোয়াল পরিষ্কার করে, খড়ের গাদার ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে খড় ফেলে, বুনো লতাপাতার মৃদু গন্ধ আর পচা গোবরের ঝাঁঝাল গন্ধে নিঃশ্বাস নেয়। সে চায় শান্তি আর নীরবতা – তাই ত চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে, ঘোড়াগুলোর দিকে আর বাপের বলিষ্ঠ পিঠের ওপর লেপটে-থাকা ভেড়ার চামড়ার কোটটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার কঠিন চোখদুটোতে ফুটে উঠল সযত্ন লালিত আনন্দের এক চাপা উপলব্ধি। ভেড়ার চামড়ার কোটের বোটকা গন্ধ, সাফসুতর না করা ঘোড়াগুলোর সাদাসিধে ঘরোয়া চেহারা, লোকালয় থেকে ভেসে আসা কোন এক মোরগের তারস্বরে ডাক – সব কিছুই তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল তার সেই বিস্মৃতপ্রায় বিগত জীবনের কথা। এখানকার, অজ পাড়াগাঁয়ের এই জীবন এখন তার কাছে বড় মধুর, ঘোর-লাগানো আর নেশা-ধরানো মনে হতে লাগল।

পরের দিন সন্ধ্যার আগে তারা গ্রামে এসে পৌঁছুল। টিলার ওপর থেকে গ্রিগোরি তাকাল দনের দিকে। ওই ত পেছনের জলা সেই 'মাগ্‌খানা', ধারে ধারে কাশবনে ছেয়ে আছে; ওই সেই শুকিয়ে আসা পপ্‌লার গাছটা; কিন্তু দনের ওপরকার স্লেজ পারানির ঘাটটা এখন আর আগের সেই জায়গায় নেই। সেই গ্রাম, চৌকোনা ছকের মতো দেখাচ্ছে সেই পরিচিত পাড়াগুলো, গির্জা আর বারোয়ারিতলা। নিজেদের বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই গ্রিগোরির বুকের ভেতরে রক্ত নেচে উঠল। স্মৃতির জোয়ার এসে যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উঠোন থেকে কুয়োর মাথার ওপরে উঠে আছে জলতোলার কপিকল, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'চোখ জুড়িয়ে যায়, তাই না?' পিছন ফিরে ছেলের দিকে তাকিয়ে মুচকি

হেসে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল। নিজের অনুভূতি গোপন করার কোন চেষ্টা করল না গ্রিগোরি। উত্তরে বলল, 'চোখ জুড়িয়ে দেয় না আবার! দিচ্ছে বৈ কি! . . .'

'একেই বলে দেশের মাটি!' তৃপ্তিভরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল সে। ঘোড়াদুটো দ্রুতগতিতে পাহাড় থেকে নামতে লাগল, এধারে ওধারে ধাক্কা খেয়ে লাফাতে লাফাতে চলল স্লেজ। গ্রিগোরি বাপের অভিপ্রায় ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, তবু জিজ্ঞেস করল, 'গ্রামের ভেতর দিয়ে চালাচ্ছ যে? আমাদের বাড়ির রাস্তা ধর না।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাড় ফেরাল, হিমে জমাট বাঁধা দাড়ির ফাঁকে মুচকি হেসে চোখ টিপল।

'ছেলেদের যখন লড়াইয়ে পাঠিয়েছিলাম তখন তারা ছিল সাধারণ সেপাই, এখন তারা অফিসারের পদে উঠেছে। ছেলেকে গ্রামের পথে ঘোরাতে গর্বে আমার বুক কেমন ফুলে ওঠে জানিস? লোকে দেখুক, দেখে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরুক। আমি মনের ভেতরে বড় শান্তি পাই!'

বড় রাস্তায় পড়ে একটু সংযত হয়ে ঘোড়াদুটোকে তাড়া দিল সে। এক দিকে ঝুঁকে পড়ে ঝালর দেওয়া চাবুকটা নাচাল। ঘোড়াদুটোও বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে বুঝতে পেরে (দেখে কে বলবে যে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে এসেছে!) নতুন উদ্যমে জোরে ছুটতে লাগল। পথ চলতে চলতে কসাকরা তাদের দেখে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল, বৌঝিরা বাড়ির জানলা থেকে হাত দিয়ে চোখের রোদ আড়াল করে তাদের দেখতে লাগল, কতকগুলো মুরগী কঁক কঁক করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল। সব চলেছে চমৎকার, যেমন চলা উচিত। বারোয়ারিতলা পেরিয়ে গেল তারা। মোখভ্‌দের বেড়ার খুঁটির সঙ্গে কাদের যেন একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। গ্রিগোরির ঘোড়াটা তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাথা উঁচিয়ে চিঁহিহি ডাক ছাড়ল। গ্রামের শেষ প্রান্তে আস্তাখভ্‌দের বাড়ির ছাদটা চোখে পড়ল। . . . ঠিক এই সময় চৌরাস্তার প্রথম মোড়টাতেই ঘটে গেল একটা বিশ্রী ব্যাপার। একটা বাচ্চাশুয়োর ছুটে রাস্তা পেরোনোর সময় একটু এদিক ওদিক করতে থাকায় ঘোড়ার খুরের তলায় পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চাপা খেয়ে একদিকে গড়িয়ে পড়ল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ভাঙা শিরদাঁড়া তোলার চেষ্টা করল।

'ধুত্তোর! মরতে এখানে এসেছিস!' চাপাখাওয়া শুয়োরছানাটার গায়ে চাবুকের একটা ঘা বসিয়ে দিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গালাগাল করে উঠল।

কপাল এমনই খারাপ যে শুয়োরছানাটা ছিল আফোন্‌কা ওজেরভের বিধবা-বৌ

আনিউত্‌কার। সাঙ্ঘাতিক রগচটা মেয়েমানুষ, মুখের কোন আগল নেই তার। এই দেখে তড়াক করে উঠোন থেকে ছুটে এলো সে; মাথার ওপর চট করে ওড়নাটা ফেলে বাছা বাছা গালাগালের এমন তোড় সে ছুটিয়ে দিল যে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে পর্যন্ত ঘোড়ীর রাশ টেনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হল।

'চোপ্‌ রও হারামজাদী! অমন চেল্লাচ্ছ কেন? তোমার ওই ঘেয়ো জন্তুটার দাম দিয়ে দেব! . . .'

'তবে রে মুখপোড়া! বজ্জাত! তুই নিজেই ঘেয়ো, খোঁড়া কুকুর! . . . দাঁড়া না, এখুনি মোড়লের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোকে!' দু'হাত নাড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল সে। 'তোর গাড়ি চালানো আমি বার করে দেব হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, অনাথা বিধবার বাড়ির পোষা জন্তু গাড়ি চাপা দিয়ে মারার শিক্ষে দিয়ে দেব আমি! . . .'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, চোখমুখ লাল করে চিৎকার করে উঠল।

'বেহায়া মাগী!'

'মরণ হোক তোর হারামজাদা তুর্কী!' চটপট উত্তর দিল আনিউত্‌কা।

'খানকী মাগী! চুলোয় যাক তোর চৌদ্দ পুরুষ!' মোটা গলা চড়িয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

কিন্তু গালাগাল দিতে গিয়ে কথার ঝুলি হাতড়ে মরবে সে পাত্রী আনিউত্‌কা নয়।

'বেজাত! ওরে বুড়ো মিন্‌সে। চোর কোথাকার। অন্যের চাষের মই চুরি করেছিস! খানকীবাজী করে বেড়াস! . . .' কিচিরমিচির করে ঝড়ের বেগে সে বলে চলল।

'মুখ সামলে বলছি, কুত্তী কোথাকার! নইলে বসিয়ে দেব চাবুকের ঘা!'

কিন্তু তার উত্তরে আনিউত্‌কা এমন একটা খিস্তি করে উঠল যে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মতো লোকও – জীবনে যে অনেক কিছুই দেখেছে, শুনেছে – সে পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘামতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে একটু একটু করে রাস্তায় লোকজনের ভিড় জমতে শুরু করেছে, তারা বেশ মনোযোগ দিয়ে ওজেরভের সতীসাধ্বী বিধবা স্ত্রী আর মেলেখভের মধ্যে এই আকস্মিক চাপান-কাটান শুনতে লাগল। তাই দেখে গ্রিগোরি রেগে গিয়ে তার বাপকে বলল, 'আরে ছেড়ে দাও না গাড়ি! ওকে নিয়ে আবার পড়লে কেন?'

'বাবাঃ, চোপা আর কাকে বলে। মুখের কোন আগল নেই!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ প্রবল বিরক্তিভরে থুতু ফেলল, তারপর ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে

এত জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল যে মনে হল বুঝি আনিউত্‌কাকেই গাড়ি চাপা দেওয়ার মতলব।

পাড়াটা পেরিয়ে আসার পর সে পেছন ফিরে তাকাল। তখনও অবশ্য তার মন থেকে আশঙ্কা একেবারে দূর হয় নি।

'থুতু ছিটিয়ে শাপশাপান্ত করে কী কাণ্ড! . . . ওঃ পাজীর পাঝাড়া আর কাকে বলে। পেট ফেটে মরেও না মুটকীটা!' মনের সাধ মিটিয়ে সে বলল। 'তোর ও শুয়োরছানাটার সঙ্গে তোকেও চাপা দেওয়া উচিত ছিল। অমন মাগীর চোপার সামনে পড়লে তোমার আর কিছু আস্ত থাকবে না।'

মেলেখভ্‌দের বাড়ির জানলার নীল খড়খড়িগুলো পাশ দিয়ে চলে গেল। পেত্রোর মাথায় টুপি নেই, ফৌজী শার্টের ওপর বেল্‌ট বাঁধা নেই, সে-ই এসে গেট খুলে দিল। বাড়ির দেউড়ির ধাপে ঝলক মারল মাথার সাদা ধবধবে রুমাল, দুনিয়াশ্‌কার জ্বলজ্বলে কালো চোখ আর হাসি-হাসি মুখ।

ভাইকে চুমো খেয়ে পেত্রো এক ঝলক তার চোখের দিকে তাকাল।

'ভালো আছিস ত!'

'জখম হয়েছি।'

'কোথায়?'

'গ্লুবোকায়াতে।'

'ওখানে টালবাহানা করে পচে মরার বড়ই দরকার ছিল বুঝি? অনেক আগেই বাড়ি ফিরে আসা উচিত ছিল!'

বন্ধু ভাবে গ্রিগোরিকে ধরে ঝাঁকুনি দিল সে, তারপর তাকে ছেড়ে দিল দুনিয়াশ্‌কার হাতে। বোনের পরিণত হয়ে ওঠা বলিষ্ঠ কাঁধদুটো জড়িয়ে ধরে গ্রিগোরি তার ঠোঁটে আর চোখে চুমু খেল, তারপর পিছিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'আরে দুনিয়াশ্‌কা, এ কী কাণ্ড রে! . . .কী সুন্দরীই না হয়ে উঠেছিস তুই! আমি ত ভেবেছিলাম তুই একটা হাঁদা আর বদখত গোছের দেখতে হবি!'

'হয়েছে হয়েছে, দাদা!' চিমটি কাটা এড়ানোর জন্য ঘুরে দাঁড়াল দুনিয়াশা, তারপর গ্রিগোরির মতোই সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে সরে গেল।

ইলিনিচ্‌না বাচ্চাদুটোকে কোলে করে নিয়ে আসছিল। এক ছুটে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো নাতালিয়া। নাতালিয়া যেন এক অপূর্ব বন্য সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। পাট করে আঁচড়ানো চকচকে কালো চুল, পেছন দিকে বাঁধা ভারী খোঁপাটা তার আনন্দোচ্ছল গোলাপী মুখের ওপর ছায়া ফেলেছে। গ্রিগোরির গা ঘেঁসে দাঁড়াল সে, কয়েকবার ঠোঁটদুটো ঠিক জায়গায় ঠেকাতে না পেরে দ্রুত

আনাড়ির মতো তার গাল আর গোঁফ স্পর্শ করল, ইলিনিচ্‌নার কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল গ্রিগোরির সামনে।

'কেমন চমৎকার ছেলে হয়েছে একবার চেয়ে দেখ!' তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল গর্ব আর আনন্দ।

'দাও দেখি, আমার ছেলেকে একবার দেখি আমি!' উত্তেজিত ভাবে তাকে সরিয়ে দিল ইলিনিচ্‌না।

গ্রিগোরির মাথাটা টেনে নীচু করে মা তার কপালে চুমু খেল, ছেলের মুখের ওপর রুক্ষ হাতখানা তাড়াতাড়ি বুলাতে বুলাতে উত্তেজনায় আর আনন্দে কেঁদে ফেলল।

'আর মেয়ে! মেয়েটাকেও কোলে নে রে!...'

এই বলে চাদরে জড়ানো মেয়েটাকে সে গ্রিগোরির আরেক হাতের ওপর বসিয়ে দিল। গ্রিগোরি ফাঁপড়ে পড়ে গেল – নাতালিয়ার দিকে তাকাবে, না মা'র দিকে, নাকি বাচ্চাদের দিকে – কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না। ভুরু কোঁচকানো, থমথমে চোখের দৃষ্টি – ছেলেটা মেলেখভ বংশেরই ধাঁচ পেয়েছে: সেই রকমই লম্বাটে গড়নের, একটু রুক্ষ, কালো চোখ, টানা ভুরু, চোখের সাদা অংশটা নীলচে, একটু বেশি ফোলা, গায়ের রং তামাটে। নোংরা হাতের মুঠোটা মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাপের মুখের দিকে। মেয়েটার গ্রিগোরি শুধু দেখতে পেল একাগ্র দুটো খুদে খুদে চোখ – সেই রকমই কালো; মুখটা চাদর দিয়ে জড়ানো।

দু'জনকে দু'কোলে নিয়ে দেউড়ির ধাপের দিকে পা বাড়াতে গেল গ্রিগোরি, কিন্তু ব্যথায় টনটন করে উঠল পা'টা।

'ওদের নাও গো নাতাশা।...' কাচুমাচু হয়ে মুখের এক কোণে হাসি ফুটিয়ে গ্রিগোরি বলল। 'নইলে চৌকাট পেরোতে পারব না।...'

রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল দারিয়া। মুচকি হেসে অকুণ্ঠ ভাবে সে এগিয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে, হাসি-হাসি চোখদুটো বুজে ভেজা উষ্ণ ঠোঁটদুটো চেপে ধরল গ্রিগোরির ঠোঁটে।

'ইশ্! তামাকের কী কড়া গন্ধ!' রঙ্গভরে সে রং দিয়ে টানা, ভুষোকালির মতো আঁকা ভ্রূধনু বাঁকাল।

'দেখি দেখি, আরেকবার দেখি তোকে! আহা, আমার সোনার ছেলে!'

গ্রিগোরি মৃদু হাসল, মা'র কাঁধে বুক ঠেকাতে একটা উত্তেজনার সুড়সুড়ি খেলে গেল তার বুকের ভেতরে।

উঠোনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়াদুটোর কাঁধ থেকে গাড়ির জোয়াল খুলছিল। স্লেজের চারধারে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরছে, সন্ধ্যার ম্লান আলোয়

জ্বলজ্বল করছে তার কোমরে বাঁধা লাল পটি আর মাথার তিন পাশ ঢাকা টুপির লাল চুড়োটা। ইতিমধ্যে গ্রিগোরির ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে এসেছে পেত্রো। দুনিয়াশ্‌কা স্লেজগাড়ি থেকে কেরোসিনের একটা ছোট পিপে নামাচ্ছিল। ঘোড়ার পিঠের জিনটা ভেতরের বারান্দায় তুলে রেখে আসার জন্য যেতে যেতে পেত্রো তার দিকে ফিরে কী যেন বলল।

গ্রিগোরি জামাকাপড় ছাড়ল, ভেড়ার চামড়ার কোট আর গ্রেটকোটটা খাটের বাজুতে ঝুলিয়ে রাখল, চুল আঁচড়াল। বেঞ্চের ওপর বসে ছেলেকে কাছে ডাকল।

'এদিকে এসো ত লক্ষ্মীটি, মিশ্‌কা। কী হল, আমাকে চেন না?'

হাতের মুঠোটা মুখের মধ্যে পুরেই ছোট্ট ছেলেটা কাত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলো, ইতস্তত করে টেবিলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুল্লীর কাছ থেকে স্নেহ আর গর্ব ভরে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল তার মা। মেয়েটার কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল, তারপর তাকে আস্তে করে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'যাও, যাও না!'

গ্রিগোরি দু'জনকেই দু'হাতে জাপটে ধরল, হাঁটুর ওপর বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরে আমার মিষ্টিরা, আমি কে জানিস নে? আর তুই পোলিউশ্‌কা? – তুইও চিনিস নে তোর বাপকে?'

'তুমি আমাদের বাবা নও,' ছেলেটা ফিসফিস করে বলল (বোনের সঙ্গে যখন থাকে তখন তার সাহস বেড়ে যায়)।

'তাহলে আমি কে?'

'তুমি অমনি একজন কসাক – অন্য লোক।'

'বটে, বটে!' গ্রিগোরি হো হো করে হেসে উঠল। 'তাহলে তোমার বাবা কোথায়?'

'আমাদের বাবা পল্টনে কাজ করে,' ঘাড় কাত করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে মেয়েটা বলল (দু'জনের মধ্যে সে-ই বেশি ছটফটে)।

'এই ত চাই! ঠিক বলেছিস সোনারা আমার! নিজের বাড়িঘর জানুক। তা নয়ত সারাটা বচ্ছর কোথায় কোথায় ঘুরে ঘুরে কাটাল, এখন এসেই চাইছে তোরা ওকে জান!' কপট রুক্ষতার সঙ্গে এই কথা বলে গ্রিগোরির হাসির উত্তরে ইলিনিচ্‌নাও হাসল। 'অমন করলে শিগ্‌গিরই তোর বৌও তোকে ছেড়ে চলে যাবে। আমরা ত ওর জন্যে জামাই খুঁজব বলে ঠিক করেছিলাম।'

'তুমি কী বল নাতালিয়া, অ্যাঁ?' গ্রিগোরি বৌয়ের দিকে ফিরে ঠাট্টা করে বলল।

নাতালিয়ার মুখ লাল হয়ে উঠল। বাড়ির লোকের সামনে তার লজ্জা হতে লাগল, কিন্তু সে-ভাব কাটিয়ে উঠে গ্রিগোরির দিকে এগিয়ে গেল। পাশে বসে পড়ল। পরম সুখাবেশ ভরা চোখের দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে তাকে

দেখল, স্বামীর শুকনো বাদামী হাতের ওপর রুক্ষ তপ্ত হাত বুলাতে লাগল।

'খাবারের জায়গা কর দারিয়া!'

'ওর নিজের বৌ আছে,' এই বলে হাসতে হাসতে তার সেই লীলায়িত ভঙ্গিতে হাল্‌কা পা ফেলে এগিয়ে গেল উনুনের দিকে।

আগের মতোই তন্বী আর ছিমছাম আছে দারিয়া। পাতলা, সুন্দর গড়নের পাদুটো জড়িয়ে আছে টানটান করে আঁটা বেগনী রঙের পশমী মোজা। নিখুঁত সুন্দর চামড়ার চটিজোড়া তার পায়ে বেশ মানিয়েছে – যেন পায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। লাল টকটকে রঙের কুঁচি দেওয়া ঘাঘরাটা শক্ত করে কোমরে বাঁধা, বুকের ওপর ঝোলানো নক্সাকাটা কাপড়টা সাদা ধবধব করছে – এতটুকু দাগ নেই তার ওপরে। গ্রিগোরি এবারে তার বৌয়ের দিকে ফিরে তাকাল। নাতালিয়ার চেহারার কিছু পরিবর্তন গ্রিগোরির চোখে পড়ল। গ্রিগোরির আগমন উপলক্ষে সে সাজগোজ করেছে। তার সুন্দর দেহসৌষ্ঠবকে ঘিরে রেখেছে কবজির কাছে লেসের কাজ-করা সরু হাতার নীল সাটিনের জামা, বড় বড় নরম দুটি স্তনের ওপর ফুলে আছে; গাঢ় নীল ঘাঘরার পাড় কুঁচি দিয়ে নক্সাতোলা, ঘাঘরার নীচের দিকটা চওড়া, কোমরের কাছে শক্ত করে আঁটা। গ্রিগোরি আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার শক্ত সমর্থ সুন্দর গড়নের পাদুটো, ঘাঘরার নীচে ভয়ঙ্কর আঁটো করে বাঁধা তার পেট আর ভালো দানাপানি খাওয়া মাদী ঘোড়ার মতো চওড়া নিতম্ব। দেখে মনে মনে ভাবল, 'কসাক মেয়েদের আর সব মেয়েদের থেকে আলাদা করে ঠিক চেনা যায়। চেনা যায় পোশাকে – তাদের পোশাক পরার রীতিই হল সব কিছু চোখের সামনে তুলে ধরা। ইচ্ছে হয় দেখ, ইচ্ছে না হয় দেখো না! কিন্তু 'চাষাদের' মেয়েদের পেট-পাছা কিছু বোঝার উপায় নেই – পুঁটলির মতো। . . .'

গ্রিগোরির দৃষ্টি কোন্ দিকে সেটা ধরে ফেলতে ইলিনিচ্‌না বেশ জাঁক করেই বলল, 'আমাদের অফিসারদের বৌরা কেমন জামাকাপড় পরে দেখুক সবাই! শহুরে মেয়েদেরও হার মানিয়ে দিতে পারে!'

'কী যে বলেন মা!' তাকে বাধা দিয়ে বলল দারিয়া। 'শহুরেদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্যি কী আমাদের! এই যে আমার কানের একটা দুল ভাঙা – তারও আবার এক কানাকড়ি দাম হবে কিনা সন্দেহ!' তিক্তকণ্ঠে সে শেষ করল।

গ্রিগোরি তার বৌয়ের খেটে-খাওয়া চওড়া পিঠের ওপর হাত রাখল। এই প্রথম তার মনে একটা চিন্তার উদয় হল: 'সুন্দরী মেয়েমানুষ, চোখে লাগার মতোই। . . . আমাকে ছাড়া কী করে দিন কাটাত ও? আমার ত মনে হয় পুরুষরা ওর ওপর নজর দিত, বলা যায় না ওরও হয়ত কারও ওপর নজর

পড়েছিল। আচ্ছা যাদের স্বামীরা বাইরে আছে তাদের অনেকেরই মতো যদি নষ্টামি করে থাকে?' এই অপ্রত্যাশিত ভাবনায় তার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল, শশার সুবাসিত অঙ্গরাগে স্নিগ্ধ নাতালিয়ার চকচকে গোলাপী মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল। তার এই একাগ্র দৃষ্টির সামনে লাল হয়ে উঠল নাতালিয়া – সাহস করে লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে উঠে ফিসফিস করে বলল, 'অমন ভাবে তাকিয়ে আছ যে? আমার জন্যে মন খারাপ করছিল কি তোমার?'

'তা আবার নয়!'

গ্রিগোরি বাজে চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বৌয়ের ওপর কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য বৈরভাব তার মনের ভেতরে নড়াচড়া করে উঠল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। গলা খাঁকারি দিয়ে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করল। তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'আচ্ছা, আরও একবার বলি, তোমাদের মঙ্গল হোক!'

'ভগবান আশীর্বাদ করুন। . . . ঠাণ্ডায় জমে গেলে নাকি গো? আমরা বসে আছি তোমার জন্যে। গরম গরম বাঁধাকপির ঝোল – কষমষে গরম,' হাতা-চামচ ঝনঝনিয়ে টেবিলের ওপর রেখে ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল ইলিনিচ্‌না।

গলায় বাঁধা লাল রুমালটা খুলে ফেলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, বরফে জমে যাওয়া ফেল্‌ট বুটের গোড়ালি ঠুকল মেঝেতে। ভেড়ার চামড়ার কোটটা গা থেকে টেনে খুলল। দাড়ি-গোঁফে বরফ জমে কাঠি হয়ে ঝুলছিল – সেগুলো টেনে টেনে ছাড়াল, গ্রিগোরির পাশে এসে বসে বলল, 'ওঃ ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলাম! কিন্তু গাঁয়ে ঢোকার পর গরম হয়ে নিয়েছিলাম। . . . আনিউত্‌কার শুয়োরছানাটা চাপা দিয়ে ফেললাম . . .'

দারিয়া একটা বড় সাদা রুটি কাটছিল। রুটিকাটা বন্ধ করে সে সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ আনিউত্‌কা?'

'ওজেরভের বিধবা-বৌ – আনিউত্‌কা ওজেরভা। ওঃ নচ্ছার মাগীর সে কী লাফালাফি দাপাদাপি! যা নয় তাই বলে দিল আমাকে। আমি নাকি চোর, কার কাছ থেকে নাকি ক্ষেতের মই চুরি করেছি। কার মই? কে জানে ছাই!'

যে-সব নাম করে আনিউত্‌কা তার ওপর গালাগাল বর্ষণ করেছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সবিস্তারে তার সবগুলোর উল্লেখ করল – শুধু একটা বাদ দিল – তার অল্পবয়সের খানকীবাজীর প্রসঙ্গ তুলে যে খোঁটা দিয়েছিল সেটা আর বলল না। গ্রিগোরি হাসতে হাসতে টেবিলের ধারে এসে বসল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ

ছেলের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় উত্তেজিত হয়ে এই বলে শেষ করল :

'এমন সমস্ত আজেবাজে কথা বলে যেতে লাগল যে মুখে আনাও পাপ! একবার ইচ্ছে হল ফিরে গিয়ে দিই মাগীকে আচ্ছা করে চাবকে। কিন্তু গ্রিগোরি সঙ্গে ছিল বলে কেমন যেন লাগল, তাইতে ছেড়ে দিলাম।'

পেত্রো দরজা খুলে দিল। দুনিয়াশ্‌কা একটা লাল রঙের বাছুরকে গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এলো। বাছুরটার কপালে সাদা চাঁদির দাগ।

'পিঠে-পরবের দিনে আমরা ঘন দুধের ননী দিয়ে গোলা সরা-পিঠে খাব!' বাছুরটাকে লাথি মেরে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল পেত্রো।

খাওয়াদাওয়ার পর গ্রিগোরি তার পুঁটলি খুলে বাড়ির সকলকে উপহারগুলো বিলোতে লাগল।

'এটা তোমার জন্যে মা,' এই বলে গ্রিগোরি একটা গরম শাল বাড়িয়ে ধরল।

ভুরু কুঁচকে অল্পবয়সী মেয়ের মতো লজ্জায় লাল হয়ে ইলিনিচ্‌না উপহারটা নিল। নিয়ে কাঁধে জড়াল, তারপর আয়নার দিকে চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁধদুটোকে এমন নাচাল যে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠল :

'বুড়ো মাগীর ঢং দেখ! . . . আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে! ছ্যাঃ! . . .'

'এটা তোমার জন্যে বাবা,' আগুনের মতো লাল টকটকে পটি দেওয়া, সামনের দিকটা উঁচুতে ওল্টানো একটা নতুন কসাক টুপি সকলের চোখের সামনে খুলে বার করতে করতে গ্রিগোরি তাড়াতাড়ি বলল।

'ভগবান বাঁচিয়ে রাখুন বাবা! একটা টুপির বড্ড দরকার ছিল আমার। গত বছর দোকানে একটাও ছিল না। . . . তুই যদি জানতিস গরমকালটা কী অসুবিধের মধ্যে দিয়ে কেটেছে! পুরনোটা মাথায় দিয়ে গির্জেয় যেতে লজ্জা করে। ওটা অনেক দিন আগেই কাকতাড়ুয়ার মাথায় বসানো উচিত ছিল, তবু পরে যেতে হত।' ক্ষুব্ধকণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে সে এমন ভাবে চারপাশে তাকাতে লাগল যে মনে হল তার যেন ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ এসে ছেলের দেওয়া উপহারটা কেড়ে নেয়।

আয়নার সামনে গিয়ে মাথায় দিয়ে দেখার মতলব ছিল তার। কিন্তু ইলিনিচ্‌না তার ওপর ঠিক চোখ রেখেছিল। তার চোখে চোখ পড়ে যেতেই বুড়ো চট করে ঘুরে গিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামোভারের কাছটায় চলে গেল। টুপিটা তেরছা করে মাথায় পরে সামোভারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগল ঠিক আছে কিনা।

'ও আবার কী হচ্ছে বুড়ো মিনসে?' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ইলিনিচ্‌না।

কিন্তু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পাল্‌টা খেঁকিয়ে উঠে জবাব দিল, 'হা ভগবান!

কী বুদ্ধি তোমার! এটা যে সামোভার! আয়না ত আর নয়! তফাতটা ত এইখানেই!'

বৌকে গ্রিগোরি দিল ঘাঘরার জন্য এক টুকরো পশমী কাপড়, ছেলেমেয়েদের দিল পাউণ্ডখানেক মধু দেওয়া কেক, দারিয়াকে পাথর বসানো রূপোর দুল, দুনিয়াশ্‌কাকে জামার জন্য কাপড়ের টুকরো, পেত্রোকে সিগারেট আর পোয়াটেক তামাক।

মেয়েরা কলবল করতে করতে উপহার দেখতে লাগল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সেই সময় বুক ফুলিয়ে ইস্কাবনের সাহেবের মতো রান্নাঘরে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল।

'একেই বলে কসাক! লাইফ গার্ড রেজিমেন্টের কসাক! পুরস্কার পেয়েছে! সম্রাট যখন কুচকাওয়াজ দেখতে আসেন তখন প্রথম হয়েছে! ঘোড়ার জিন আর পুরো এক প্রস্ত সাজসরঞ্জাম পেয়েছে! ওঃ দেখ দিকি! . . .'

গমরঙের গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে বাপের কাণ্ডকারখানা উপভোগ করছিল পেত্রো। গ্রিগোরি মুখ টিপে হাসল। ওরা সকলে সিগারেট ধরাল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আশঙ্কাভরে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীর দল এসে পড়ার আগে . . . পেত্রোকে অন্তত বল্‌ ওখানে কী হচ্ছে।'

গ্রিগোরি হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

'কী আবার হচ্ছে? লড়ছে।'

'বলশেভিকরা এখন কোথায়?' একটু জুত করে বসে নিয়ে পেত্রো জিজ্ঞেস করল।

'তিখোরেৎস্কায়া, তাগান্‌রোগ আর ভরোনেজ – এই তিন দিক থেকে এগিয়ে আসছে।'

'কিন্তু তোমাদের বিপ্লবী কমিটি কী ভাবছে? আমাদের দেশের ভেতরে তাদের ঢুকতে দিচ্ছে কেন? খ্রিস্তোনিয়া আর ইভান আলেক্সেয়েভিচ আগড়ম বাগড়ম নানা কথা বলছে, কিন্তু ওদের কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ওরা যা বলে ঠিক তা নয় . . .'

'বিপ্লবী কমিটির কোন জোর নেই। কসাকরা সব বাড়ির দিকে ছুটছে।'

'এই কারণেই কি কমিটি সোভিয়েতের দিকে ঝুঁকছে?'

'নিশ্চয়ই! এই কারণেই ত!'

একটু চুপ করে থেকে পেত্রো আবার সিগারেট ধরাল, তারপর খোলাখুলি দৃষ্টি মেলে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'তুই কাদের পক্ষে?'

'আমি সোভিয়েত সরকারের পক্ষে।'

'বোকা আর কাকে বলে!' বারুদের মতো ফেটে পড়ল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'ওরে পেত্রো, তুই অন্তত ওকে বুঝিয়ে বল!'

পেত্রো হাসল। গ্রিগোরির পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'ও আমাদের বড় তেজী – টগবগে ঘোড়ার মতন। ওকে কেউ বোঝাতে পারবে, বাবা?'

'আমাকে বোঝানোর কোন দরকার নেই!' গ্রিগোরি উত্তেজিত হয়ে বলল। 'আমি ত আর অন্ধ নই! . . . আমাদের এখানে যারা লড়াই-ফেরতা তারা সব কী বলছে?'

'আরে ওসব লড়াই-ফেরতা দিয়ে আমাদের কী হবে? ওই আকাট মুখ্যু খ্রিস্তোনিয়াটাকে জানিস নে? কী বোঝে ও? লোকজনের সব বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, কোন্ দিকে যাবে বুঝে উঠতে পারছে না। . . . বড় দুঃখের কথা!' পেত্রো গোঁফের ডগা কামড়াল। 'বসন্ত আসুক – দ্যাখ না কী হয়! – ওদের আর একসঙ্গে জড় করা যাবে না। . . . আরে বাবা, লড়াই করতে গিয়ে আমরাও বলশেভিক বলশেভিক খেলা খেলেছি, কিন্তু এখন আর নয় – আমাদের চৈতন্য ফিরে আসা উচিত। 'আমরা পরের কিছু চাই নে, তোমরাও আমাদেরটা নিও না!' – যারা নির্লজ্জের মতো আমাদের ওপর চড়াও হতে আসে, কসাকদের উচিত এই কথাই তাদের সকলকে বলা। আর কামেন্স্কায়াতে তোমরা যা করেছ সেটা একটা নোংরা কাজ হয়েছে। বলশেভিকদের সঙ্গে তোমরা গাঁটছড়া বাঁধলে – এখন তারা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা কায়েম করতে যাচ্ছে।'

'তুই একবার ভেবে দ্যাখ গ্রিশ্‌কা। তুই ত আর বোকা ছেলে নোস। ঠাণ্ডা মাথায় তোর ভেবে দেখা উচিত, তুই হলি কসাক। একবার যে কসাক হয় সে চিরকালই কসাক থাকে। জঘন্য রুশ দেশ আমাদের শাসন করবে এ হতে দেওয়া যায় না। কসাক সমাজের বাইরে যে-সব ভিনদেশী এখানে থাকে তারা এখন কী বলছে জানিস? বলছে সমস্ত জমি নাকি জন প্রতি সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। এটা কী রকম মনে হয় তোর?'

'কসাক সমাজের বাইরের যারা স্থায়ী ভাবে বহুকাল হল দন প্রদেশে আছে বসবাস করছে তাদের আমরা জমি দেব।'

'কচু পোড়া দেব! ওসব আবদার চলবে না!' হাত মুঠো করে পাকিয়ে নখওয়ালা বুড়ো আঙুলটা তুলে গ্রিগোরির বাঁকা নাকের সামনে কাঁচকলা দেখিয়ে দোলাতে দোলাতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

এমন সময় দেউড়ির ধাপে লোকজনের পায়ের দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল। বরফ-জমাট ধাপগুলো আর্তনাদ করে উঠল। ভেতরে এসে ঢুকল আনিকুশ্‌কা,

খ্রিস্তোনিয়া আর খরগোসের লোমের বেখাপ্পা উঁচু এক ককেশীয় টুপি মাথায় ইভান তোমিলিন।

'এই যে সেপাইজী! ছেলের বাড়ি আসা উপলক্ষে অতিথিদের জন্যে কিছু হবে-টবে নাকি পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ?' গাঁক গাঁক করে বলল খ্রিস্তোনিয়া।

গরম চুল্লীর গা ঘেঁসে বাছুরটা ঝিমোচ্ছিল। খ্রিস্তোনিয়ার চিৎকার চেঁচামেচিতে সেটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে হাম্বা-হাম্বা ডাক ছাড়ল। পাগুলো তার এখনও শক্ত-পোক্ত হয়ে ওঠে নি, তারই ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টলমল করতে করতে জ্বলজ্বলে গোলগোল চোখ মেলে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষকালে সম্ভবত ভয়েই মেঝের ওপর সরু ধারা ছেড়ে দিল। দুনিয়াশ্‌কা হাল্‌কা করে পিঠে চাপড় মেরে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। জায়গাটা মুছে তার পেটের নীচে একটা পুরনো লোহার পাত্র রেখে দিল।

'গলাবাজটা ভড়কে দিল বাছুরটাকে!' ইলিনিচ্‌না ক্ষুব্ধ হয়ে বলল।

গ্রিগোরি কসাকদের সঙ্গে করমর্দন করল, ওদের বসতে বলল। শিগ্‌গিরই গ্রামের এই পাড়ারই আরও কিছু কসাক এলো। গল্পগুজব করতে করতে সকলে মিলে তামাক খেয়ে ঘর এমন ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার করে ফেলল যে বাতিটা দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল, বাছুরটা জোরে জোরে শুকনো কাশি কাশতে লাগল।

অতিথিরা যখন ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন মাঝরাত। তাদের ঠেলে বিদেয় করে দিতে দিতে ইলিনিচ্‌না শাপশাপান্ত করতে লাগল।

'জ্বরবিকার হয়ে মরগে তোরা! যাও যাও উঠোনে গিয়ে ধোঁয়া ছাড় গে যত খুশি। ভস ভস করে চিমনির ধোঁয়া ছাড়া হচ্ছে! যাও দিকি সব! আমাদের বাছা এতটা পথ এলো, একটু জিরোতে পারল না। ভগবানের নাম করে বলছি, সরে পড় বাপু!'

চৌদ্দ

সকালে গ্রিগোরির ঘুম ভাঙল সকলের শেষে। ছাদের আলিসায় আর জানলার ধারে একদল চড়াইপাখি এত জোরে কিচিরমিচির করতে লাগল যেন বসন্ত এসে গেছে। তাইতে গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। জানলার খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে সোনালি সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ে আগুন ছিটোচ্ছে। গির্জায় উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। গ্রিগোরির মনে পড়ল আজ রবিবার। নাতালিয়া তার পাশে নেই, কিন্তু পালকের বিছানায় তার শরীরের উষ্ণ স্পর্শ তখনও রয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে বেশিক্ষণ আগে ওঠে নি।

'নাতাশা!' গ্রিগোরি ডাকল।

দুনিয়াশ্‌কা এসে ঘরে ঢুকল।

'কী চাই দাদা?'

'জানলাটা খোল, খুলে নাতালিয়াকে ডাক। কী করছে সে?'

'হেঁসেলে মা'র সঙ্গে রান্নার কাজে লেগেছে। এখুনি এসে পড়বে।'

নাতালিয়া এসে ঢুকল, অন্ধকারে ঢুকে চোখ কোঁচকাল।

'ঘুম ভাঙল?'

নাতালিয়ার হাত থেকে টাটকা মাখা-ময়দার গন্ধ আসছে। গ্রিগোরি না উঠেই তাকে জড়িয়ে ধরল। রাত্রের কথা মনে পড়তেই হেসে উঠল।

'উঠতে দেরি হয়ে গেল?'

'হুঁ! উঃ কী রাতটা গেল!...' নাতালিয়া হাসল। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে গ্রিগোরির লোমশ বুকে মুখ লুকোল।

গ্রিগোরিকে নতুন করে ঘা'টা বাঁধতে সাহায্য করল সে, সিন্দুক থেকে একটা পোশাকী সালোয়ার বার করে জিজ্ঞেস করল, 'ক্রস লাগানো উর্দিটা পরবে?'

'ধুত্তোর! যাক ওটা!' গ্রিগোরি সভয়ে হাত নেড়ে বারণ করল।

কিন্তু নাতালিয়া ছাড়বার পাত্রী নয়।

'পর, পর! বাবা খুশি হবেন। সিন্দুকেই যদি পচতে থাকবে তাহলে আর ওগুলো পেতে গেলে কেন?'

নাতালিয়ার অনুরোধ উপরোধে রাজী হতে হল গ্রিগোরিকে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, পেত্রোর কাছ থেকে ক্ষুর চেয়ে নিয়ে দাড়ি কামাল, মুখ আর ঘাড় ধুয়ে ফেলল।

'ঘাড়ের পেছনটা কামাতে ভুলে গেলি নাকি?' পেত্রো জিজ্ঞেস করল।

'ওঃ হো! ভুলেই গেছি ছাই!'

'ঠিক আছে বোস, আমি কামিয়ে দিচ্ছি।'

সাবানমাখা ঠাণ্ডা বুরুশটা ঘাড়ে ছ্যাঁকা ধরিয়ে দিল। গ্রিগোরি আয়নায় দেখতে পেল বাচ্চা ছেলের মতো জিভটা একপাশে বার করে পেত্রো ক্ষুর চালাচ্ছে।

'চাষের কাজের পর বলদের যেমন হয় তোরও ঘাড়টা দেখি তেমনি সরু হয়ে গেছে,' পেত্রো হাসল।

'পল্টনের যা খোরাক তাতে কি আর কারও গায়ে চেকনাই লাগার কথা?'

কর্ণেটের কাঁধপটি লাগানো আর ঘন সারি করে ক্রস-ঝোলানো উর্দিটা গায়ে চাপাল গ্রিগোরি। ঠাণ্ডায় আয়নাটার গায়ে ভাপ জমেছে, তার ভেতর দিয়ে গ্রিগোরি যখন উঁকি মেরে নিজের চেহারা দেখল তখন নিজেই নিজেকে প্রায় চিনতে

পারল না: তারই প্রতিরূপ – জিপসীদের মতো কালো চুল লম্বা একহারা চেহারার একজন অফিসার তার দিকে চেয়ে আছে।

'তোকে দেখাচ্ছে ঠিক কর্ণেলের মতো!' উল্লসিত হয়ে পেত্রো মন্তব্য করল। ভাইকে তারিফ করার সময় তার কণ্ঠস্বরে ঈর্ষার লেশমাত্র ছিল না।

দাদার এই তারিফে গ্রিগোরি, তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও, খুশি না হয়ে পারল না। ঘর থেকে বেরিয়ে সে রান্নাঘরে গেল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল দারিয়া। দুনিয়াশ্‌কা ত একেবারে হাঁ হয়ে গেল। বলল, 'মাগো। কী সাজের ঘটা!'

ইলিনিচ্‌না এবারেও চোখের জল সামলাতে পারল না। বুকের সামনে ঝোলানো নোংরা উড়নিতে চোখের জল মুছতে মুছতে দুনিয়াশ্‌কার ঠাট্টার উত্তরে সে বলল, 'ওরে ছুঁড়ি, অমন যে ছাতার পাখির মতো কিচিরমিচির করছিস, অমন ছেলে হোক দেখি তোর! আমি অন্তত বলতে পারি আমার দুই ছেলে – দুটোই মানুষের মতো মানুষ হয়েছে!'

বাষ্পাকুল দুই চোখ মেলে মুগ্ধ আবেগে একদৃষ্টে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল নাতালিয়া।

গ্রিগোরি তার গ্রেটকোটটা আলগা করে গায়ে চাপিয়ে বাইরে বেরোল। পায়ের ব্যথার জন্য দেউড়ির ধাপ বয়ে নামতে তার বেশ কষ্ট হতে লাগল। রেলিংটা চেপে ধরে সে মনে মনে ভাবল, 'লাঠি ছাড়া চলবে না দেখছি!'

গুলিটা মিল্লেরোভোতেই বার করে ফেলা হয়েছিল, ঘা শুকিয়ে গিয়ে সেখানে একটা খয়েরি রঙের মামড়ি পড়েছে, তাইতে চামড়ায় টান ধরেছে, স্বচ্ছন্দে বাঁকানো যাচ্ছে না পা'টা।

রোয়াকে বেড়ালটা রোদ পোয়াচ্ছে। দেউড়ির কাছে চড়া রোদ্দুর পড়ে বরফ গলে জল জমেছে। গ্রিগোরি খুশি খুশি মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল উঠোনের চারধার। ধাপের ঠিক কাছেই একটা খুঁটি পোঁতা, তার মাথায় চাকা লাগানো। গ্রিগোরির মনে পড়ল ছেলেবেলা থেকেই ওটাকে ওই ভাবে এখানে দেখে আসছে। মেয়েদের কাজের সুবিধার জন্য ওটা তৈরি। রাত্রে সিঁড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওটায় দুধের কেঁড়েগুলো রাখা যায়, দিনের বেলায় ওর ওপর বাসনকোসন শুকানো হয়, মাটির হাঁড়িকুড়ি রোদে শুকানোর জন্য ফেলে রাখা হয়। উঠোনের কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো – পুরানো উঠে যাওয়া রঙের জায়গায় গোলাবাড়ির দরজাটায় গেরিমাটির প্রলেপ লাগানো হয়েছে, চালাটা নতুন করে রাইয়ের খড়ে ছাওয়া হয়েছে, খড়ের হলুদ রঙ এখনও ধুসর হয়ে ওঠে নি; কাঠের গাদাটা মনে হল যেন অনেকখানি কমে গেছে – একটা

অংশ সম্ভবত বেড়াবাঁধার কাজে খরচ হয়েছে। মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরের ওপরকার ঢিবিটাতে নীলচে ধূসর ছাই স্তূপাকার হয়ে আছে; কাকের মতোই কালো কুচকুচে একটা মোরগ ঠাণ্ডায় গুটিসুটি হয়ে একটা পা গুটিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঘিরে আছে বংশবৃদ্ধির জন্য রেখে দেওয়া বিচিত্রবর্ণের গোটা দশেক মুরগী। শীতকালের খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য চালার নীচে রাখা হয়েছে চাষবাসের নানা সরঞ্জাম: পাঁজরার মতো বেরিয়ে আছে গোরুর গাড়ির ছই, চালের একটা ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ফসল-কাটা কলের ধাতব একটা অংশের ওপর, তাইতে ঝকমক করছে সেটা। আস্তাবলের কাছে গোবরের গাদার ওপর রাজহাঁসগুলো বসে আছে। গ্রিগোরিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশ দিয়ে যেতে দেখে একটা ঝুঁটিওয়ালা ওলন্দাজী রাজহাঁস উদ্ধতভঙ্গিতে আড়চোখে কটমট করে তাকাল তার দিকে।

ঘর-গেরস্থালি সব ঘুরে ঘুরে দেখার পর গ্রিগোরি আবার বাড়ির ভেতরে ফিরে গেল।

গাওয়া ঘি আর গরম সেঁকা রুটির মিষ্টি গন্ধে রান্নাঘর ম' ম' করছে। শীতকালের জন্য কিছু আপেল নুনে জারিয়ে রাখা হয়েছিল। দুনিয়াশ্‌কা একটা কারুকাজকরা রেকাবে করে সেই জারানো আপেল জলে ভিজিয়ে ধুচ্ছে। তা দেখে গ্রিগোরি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'নুনে জারানো তরমুজ আছে?'

'যাও দেখি নাতালিয়া, নিয়ে এসো!' ইলিনিচ্‌না বলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গির্জা থেকে ফিরে এলো। প্রসাদী রুটির টুকরোটা পরিবারের প্রত্যেকের জন্য ভেঙে ভেঙে নয়টা ভাগ করল, টেবিলের চারধারে সকলের হাতে হাতে দিল। সকলে সকালের খাবার খেতে বসল। পেত্রোও সাজগোজ করেছে, এমনকি কী দিয়ে যেন গোঁফজোড়া তেলচকচকে করেছে। সে এসে গ্রিগোরির পাশে বসল। তাদের মুখোমুখি একটা টুলের ধারে বসেছে দারিয়া। তার চর্বির প্রলেপ দেওয়া গোলাপী মুখের ওপর ভারী থামের মতো সূর্যকিরণ এসে পড়ায় সে চোখ কোঁচকাচ্ছে, অসন্তুষ্ট হয়ে চকচকে কালো ভ্রূধনু নীচে নামিয়ে নিচ্ছে। নাতালিয়া উনুনে সেঁকা কুমড়োর তরকারী খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদের, থেকে থেকে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। দুনিয়াশ্‌কা বাপের পাশে বসে আছে। ইলিনিচ্‌নার জায়গা হয়েছে টেবিলের শেষ প্রান্তে, উনুনের ধারে।

ছুটিছাটার দিনে সর্বদা যেমন হয় আজও সকলে তেমনি অনেক খেল, পেট পুরে খেল। ভেড়ার মাংস দেওয়া বাঁধাকপির ঝোলের পর এলো সেদ্ধ করা সেমাই, তারপর সেদ্ধ করা ভেড়ার মাংস, মুরগী, ভেড়ার ঠ্যাঙের ক্বাথ থেকে তৈরি মাংসের জেলি, আলুভাজা, কাউনের জাউ, সেই সঙ্গে গাওয়া ঘি, পিটুলি

গোলা মেশানো ফল, গোলা-পিঠে, তার সঙ্গে ঘন দুধের ননী আর জারানো তরমুজ। আকণ্ঠ পরিপূরিত খাওয়ার ভারে অতি কষ্টে আসন ছেড়ে উঠল গ্রিগোরি, মাতালের মতো টলতে টলতে ক্রস করল, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তখনও জাউ নিয়ে ব্যস্ত: চামচ দিয়ে বেশ করে থাবড়ে থাবড়ে থালায় ছড়িয়ে মাঝখানে সে একটা ইঁদারার মতো গর্ত খুঁড়ে খানিকটা হলুদ স্ফটিক-রঙের ঘি ঢেলে দিল তার মধ্যে, তারপর কায়দা করে চামচ দিয়ে তুলে তুলে ঘি জবজবে জাউ মুখে পুরতে লাগল। ছেলেপুলে বড় ভালোবাসে পেত্রো। সে তাই মিশাত্‌কাকে* খাওয়াতে লাগল, মাঝে মাঝে মজা করে তার নাকে গালে ঘোল লাগিয়ে দিতে লাগল।

'ইয়ার্কি কোরো না জেঠু!'

'কেন, কী করলাম?'

'মাখিয়ে দিচ্ছ কেন?'

'কী হয়েছে তাতে?'

'মাকে বলে দেব কিন্তু।'

'তাতে কী হবে?'

মিশাত্‌কার চোখদুটো – সেই মেলেখভ বংশের বিষণ্ণ থমথমে চোখদুটো – রাগে চকচক করে উঠল, বিরক্তিতে তার চোখে জল টলমল করতে লাগল। জ্যাঠাকে ভালো কথায় বোঝানোর আশা ছেড়ে দিয়ে মুঠো করা হাত দিয়ে নাক মুছতে মুছতে মরিয়া হয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'বলছি মাখাবে না! . . . বোকা! . . . হাঁদা কোথাকার!'

পেত্রো গলা ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠল, তারপর আবার ভাইপোকে খাওয়াতে শুরু করল: এক চামচ মুখে, পরের চামচ নাকে।

'একেবারে বাচ্চা ছেলের মতন . . . ওর পেছনে লেগেছিস কেন?' ইলিনিচ্‌না গজগজ করে বলল। দুনিয়াশ্‌কা গ্রিগোরির পাশে এসে বসল, বলল:

'জানো, বড়দাটার মাথায় না পোকা আছে, সব সময় কোন না কোন একটা ফন্দি ওর মাথার ভেতরে ঘুরছে। এই ত সেদিন মিশাত্‌কাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছে – ছেলেটার বাহ্যি চেপেছে, বলল, 'জেঠু, বাড়ির ধাপের কাছে করি?' বড়দা বলল, 'না না এখেনে করে না, আরেকটু দূরে সরে যা।' মিশাত্‌কা তার কথায় ছুটে একটু দূরে চলে গেল। বলল, 'এখানে?' 'না, না, ছুটে চলে যা গোলাবাড়ির কাছে।' তারপর গোলাবাড়ি থেকে আস্তাবল, আস্তাবল থেকে

---

* মিশার আরেকটি ডাকনাম – আদরার্থে। – অনুঃ

মাড়াই-উঠোন ওকে ছুটোছুটি করাল। এমনই ছুটোছুটি করাল যে বেচারি শেষকালে প্যান্টই নষ্ট করে ফেলল। . . . আর নাতালিয়াও যা বকাটা দিল!'

'দাও, আমি নিজেই খাব!' ডাকগাড়ির ঘোড়ার গলার ঘুন্টির মতো বেজে উঠল মিশাত্‌কার কণ্ঠস্বর। ঠাট্টা করে গোঁফজোড়া নাড়াল পেত্রো, রাজী হল না।

'না রে ছোঁড়া! আমিই খাওয়াব।'

'আমি নিজে হাতে খাব।'

'তুই খাবি নিজে হাতে? তোকে খেতে হবে ওই শুয়োরদের মতন। দেখেছিস ঠাকুমাকে ওদের ওই যে নর্দমার যত হাবিজাবি খাওয়ায়?'

ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে গ্রিগোরি মুচকি হাসল, একটা সিগারেট পাকাতে লাগল সে। এমন সময় এগিয়ে এলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'আজ একবার ভিওশেন্‌স্কায়াতে যাব ভাবছি।'

'কেন? কী দরকার?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পিটুলিগোলা ফলের একটা প্রচণ্ড ঢেকুর তুলল, দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'জিনের কারিগরের কাছে একটু কাজ আছে ওখানে – ঘোড়ার দুটো গলার বাঁধন সারাতে দিয়েছি।'

'আজকের মধ্যে ফিরতে পারবে?'

'তা পারব না কেন? সন্ধে নাগাদ ঠিক ফিরে আসব।'

বিশ্রাম করার পর একটা খোলা স্লেজগাড়িতে মাদী ঘোড়াটাকে জুতল সে। সেই বছরই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঘোড়াটা। ঘাস-জমির ওপর দিয়ে পথ ধরল, দু'ঘন্টার মধ্যে ভিওশেন্‌স্কায়ায় পৌঁছে গেল। পোস্টাপিসে গেল, জিনওয়ালার কাছ থেকে ঘোড়ার গলার বাঁধনদুটো নিল। তারপর স্লেজ চালিয়ে এলো গির্জার কাছে তার বহুকালের পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে। গৃহকর্তাটি খুবই অতিথিবৎসল, পেড়ে ধরে দুপুরের খাবার খেতে বসিয়ে দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে।

'পোস্টাপিসে গিয়েছিলে?' গেলাসে কী যেন ঢালতে ঢালতে সে জিজ্ঞেস করল।

'গিয়েছিলাম,' অবাক হয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে ডিক্যাণ্টারটার দিকে তাকিয়ে বুনো জন্তুর সন্ধানকারী শিকারী কুকুরের মতো বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ধীরে ধীরে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'নতুন খবর কিছু শুনলে না?'

'নতুন? না ত, যত দূর মনে হয় সে রকম কিছু শুনি নি। কেন? কী হয়েছে?'

'কালেদিনের খবর। আলেক্সেই মাক্সিমভিচ কালেদিন গত হয়েছেন।'

'বল কী!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মুখের বর্ণ একেবারে সবুজ হয়ে গেল। সেই সন্দেহজনক ডিক্যান্টার আর তার ভেতরকার তরল পদার্থের গন্ধের কথা ভুলে গিয়ে চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়ল সে। ভুরু কুঁচকে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে করতে গৃহকর্তা বলল, 'টেলিগ্রাফে খবর এসেছে এই কয়েক দিন আগে নাকি নোভো-চের্‌কাস্‌স্কে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের এই গোটা প্রদেশে একমাত্র যোগ্য জেনারেল ছিলেন। কত সম্মান পেয়েছিলেন, একটা আর্মি চালিয়েছেন! আর কত বড় মন ছিল লোকটার! কসাকদের মানসম্মান খোয়া যায় এমন কিছু হতে তিনি দিতেন না।'

'দাঁড়াও ভাই! কিন্তু এখন কী হবে?' গেলাসটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'ভগবান জানেন। বড় কঠিন সময় আসছে। যদি ভালোই হত তাহলে কি আর কেউ গুলি ক'রে আত্মহত্যা করে?'

'কেন তিনি একাজ করলেন?'

রক্ষণশীল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মতো শক্তসমর্থ চেহারার কসাক, পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের এই বন্ধুটি ক্রুদ্ধ হয়ে হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

'লড়াই-ফেরতা কসাকরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে, বলশেভিকদের ঢুকতে দিয়েছে আমাদের দেশে, তাইতেই ত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। অমন লোক কি আর হবে? এখন কে আমাদের বাঁচাবে? কামেন্‌স্কায়াতে একটা ফৌজী বিপ্লবী কমিটি না কী ছাই যেন হয়েছে – লড়াই-ফেরতা কসাকরা তার মধ্যে আছে। আর আমাদের এখানে... খবর শুনেছ কি? ওদের কাছ থেকে হুকুম এসেছে – আতামানদের হটাও, বিপ্লবী কমিটি বসাও। চাষারা সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল দেখছি! যতসব ছুতোর, কামার আর চোর-ছ্যাঁচড়ে জলার ডাশ মশার মতো থিকথিক করছে ভিওশেন্‌স্কায়া!'

পাকাচুলভরা মাথাটা হেঁট করে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। যখন মুখ তুলে তাকাল তখন তার চোখের দৃষ্টি কঠোর, রুক্ষ।

'তোমার এই পাত্রটাতে কী আছে হে?'

'কিছু কড়া মদ। ককেশাস থেকে ভাইপো এনেছে।'

'তাহলে এসো ভাই, আমাদের স্বর্গীয় আতামান কালেদিনের আত্মার শান্তি কামনা করে খাওয়া যাক। অক্ষয় স্বর্গবাস হোক তার!'

তারা মদ খেল। বাড়ির কর্তার মেয়েটা লম্বা, মুখে মেচেতার দাগ। সে-ই খাবার নিয়ে এলো। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ প্রথমে বার কয়েক জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল ঘোড়াটা ক্লান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রভুর স্লেজগাড়ির কাছে।

কিন্তু বন্ধু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ঘোড়া নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। এখুনি বলে দিচ্ছি দানাপানির ব্যবস্থা করে দিতে।'

উত্তেজিত আলোচনা আর ডিক্যান্টারের সেই তরল পদার্থের গুণে দেখতে দেখতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার ঘোড়া আর বিশ্বসংসারের সব কথা ভুলে গেল। গ্রিগোরি সম্পর্কে এলোমেলো বকবক করল, আধা-মাতাল বন্ধুর সঙ্গে কী নিয়ে যেন তর্ক জুড়ে দিল, তর্ক আরম্ভ করে পরে ভুলে গেল কী নিয়ে শুরু করেছিল। যখন তার চমক ভাঙল ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ঠিক করল। বাড়ির কর্তার ছেলে ঘোড়াটা স্লেজে জুতে দিল, বন্ধু তাকে গাড়িতে উঠে বসতে সাহায্য করল। তারপর ঠিক করল অতিথিকে খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে, তাই স্লেজগাড়িতে উঠে বসল। দু'জনে দু'জনার আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে স্লেজগাড়ির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। ওদের স্লেজটা প্রথমে বাড়ির গেটের গায়ে ধাক্কা খেল, তারপর রাস্তায় প্রতি পদক্ষেপে ধাক্কা খেতে খেতে শেষকালে ঘাস-জমির ওপর গিয়ে পড়ল। এখানে আসার পর বন্ধু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, স্বেচ্ছায় স্লেজগাড়ি থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ একটা কাঁকড়ার মতো চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সমানে মুখখিস্তি করে যেতে লাগল। পায়ে ভর দিয়ে ওঠার মতো অবস্থা তার ছিল না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার ঘোড়াটাকে দুলকি চালে ছুটিয়ে দিল। সে দেখতেই পেল না যে তাকে এগিয়ে দিতে এসে বন্ধুটি বরফের ওপর হামা দিচ্ছে, বরফের ভেতরে নাক গুঁজে দিব্যি মজা পেয়ে হি-হি করে হাসছে আর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় অনুনয় করে বলছে, 'কাতুকুতু দিও না! . . . আহা, কাতুকুতু দিও না . . . লক্ষ্মীটি দাদা, ছেড়ে দাও!'

কয়েকবার চাবুকের বাড়ি খেয়ে উত্তেজিত হয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের অন্ধ ঘোড়াটা জোরে জোরে কিন্তু অনিশ্চিত ভাবে দুলকি চালে চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রভুও নেশার ঘোরে ঝিমুতে ঝিমুতে অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে স্লেজগাড়ির গায়ে মাথা রেখে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। লাগামটা ফসকে নীচে পড়ে গেল, চালকবিহীন অসহায় ঘোড়াটা এবারে চাল ছেড়ে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল। রাস্তার প্রথম মোড়ে এসেই সে পথ ভুল করে ছোট গ্রোম্‌চেনোক নামে একটা গ্রামের রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে সেই রাস্তাটাও হারিয়ে ফেলল। এবারে চলল রাস্তাঘাটহীন ধু ধু অনাবাদী মাঠের ওপর দিয়ে, চলতে চলতে এক বনের প্রান্তে গভীর বরফের স্তূপের মধ্যে আটকে গেল, তারপর নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে হড়হড় করে উপত্যকার ভেতরে নামতে লাগল। এই সময় স্লেজগাড়িটা একটা ঝোপের সঙ্গে আটকে

যাওয়ায় ঘোড়াটা থেমে গেল। ঝাঁকুনি খেয়ে বুড়ো মুহূর্তের জন্য জেগে উঠল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাথাটা একটু উঁচু করে কর্কশ গলায় হাঁক দিল।

'তবে রে শয়তান! . . .' বলেই আবার শুয়ে পড়ল।

ঘোড়াটা নির্বিঘ্নে বন পার হয়ে চলে গেল, বেশ ভালো ভাবেই দনের ধারে এসে নামল, পরে পুবের বাতাসে উড়িয়ে আনা ঘুঁটে পোড়ানো ধোঁয়ার গন্ধ ধরে এগিয়ে চলল সেমিওনভ্স্কায়া গ্রামের দিকে।

গ্রামের সিকি ক্রোশটাক এদিকে দনের বাঁ পাড়ের কাছে একটা খাদ ছিল, বসন্তকালে বরফগলা জল তার ভেতরে তোড়ে এসে পড়তে থাকে। খাদটার কাছে বালির পাড় থেকে উৎসজলের ধারা বয়ে চলে – শীতকালে কখনও সেখানে বরফ জমাট বাধতে পারে না, একটা চওড়া সবুজের অর্ধচন্দ্রাকার উষ্ণ জলা হয়ে থাকে। দনের ধারে স্লেজ চলার রাস্তাটা তাই এই জায়গাটাকে সাবধানে এড়িয়ে হঠাৎ একদিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে। বসন্তকালে এই জল যখন মুক্তি পেয়ে খাদ বয়ে উপছে পড়ে দুর্নিবার স্রোতে আবার দনের বুকে ফিরে যেতে থাকে তখন এই জায়গায় প্রচণ্ড ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়, তলদেশ ধুইয়ে দিয়ে তুমুল গর্জন করতে করতে শতধারায় পাক খেয়ে ছুটে চলে জলস্রোত; খাদের কাছাকাছি দনের গভীর তলদেশে বন্যাস্রোতে যে সমস্ত কাঠকুটো এসে জড়ো হয় তারই পাশে সারাটা গ্রীষ্মকাল রুই-কাতলা মাছের ঝাঁক লুকিয়ে থাকে।

এই জলারই একেবারে বাঁ ধারের দিকে এগোতে লাগল মেলেখভ্দের অন্ধ ঘোড়াটা। আর যখন শ' খানেক গজ বাকি এমন সময় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পাশ ফিরে অর্ধেক চোখ খুলল। কালো আকাশ থেকে কাঁচা চেরীফলের মতো হলদে-সবুজ তারাগুলো চেয়ে আছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের আবছা আবছা মনে হল, 'এখন রাত . . .।' প্রচণ্ড জোরে ঘোড়ার লাগামে টান মারল সে।

'হই হেই! . . . তবে রে বজ্জাত!'

ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে দুলকি চালে চলতে শুরু করল। জল আর বেশি দূরে নেই। ঘোড়ার নাকে মুখে এসে লাগল তার গন্ধ। কানদুটো খাড়া করে অবাক হয়ে অন্ধ চোখ একটু টেরিয়ে সে তাকাল তার প্রভুর দিকে। হঠাৎ তার কানে এসে বাজল ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। সেই শব্দে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে ঝট করে এক পাশে সরে গিয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। তার পায়ের নীচে মচমচ করে গুঁড়িয়ে গেল তলাকার ক্ষয়ে যাওয়া নরম বরফ, ভেঙে পড়ল মিহি বরফ জমা ধারটা। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ঘোড়াটা নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পেছনের দু'পায়ে ভর রেখে পতন রোধের চেষ্টা করল, কিন্তু সামনের দু'পা

ইতিমধ্যেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে – জলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, আর পেছনের দু'পাও সরাতে গিয়ে পায়েব নীচের নরম বরফের স্তর ভাঙতে শুরু করেছে। মড়মড় করে বরফ ভেঙে ছপাত ছপাত করে ছিটকে পড়ল। এইবারে জলা ঘোড়াটাকে গ্রাস করে নিল। ঘোড়া ছটফট করতে করতে পেছনের দু'পায়ে লাথি ছুঁড়ল, লাথিটা স্লেজের জোয়ালের ডাণ্ডায় এসে লাগল। সেই মুহূর্তে কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে আঁচ করতে পেয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এক লাফে স্লেজ থেকে নেমে পেছনে গড়িয়ে চলে গেল। সে দেখতে পেল ঘোড়ার শরীরের ভারে সামনে থেকে টান পড়তে স্লেজটা খাড়া হয়ে উঠে গেল, স্লেজের তলার লোহার পাতদুটো চোখে পড়ল, তারার আলোয় একবার ঝলক দিয়েই সবুজ কালো জলের অতলে তলিয়ে গেল। টুকরো টুকরো বরফ মেশানো জলরাশি মৃদু হিসহিস শব্দ করতে করতে সেটাকে ঢেকে দিল, একটা ঢেউ প্রায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কাছে এসে ভেঙে পড়ল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে গেল। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে দু'পায়ে শক্ত করে খাড়া হয়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

'বাঁ-চা-ও! বাঁ-চা-ও! কে কোথায় আছ? ডুবে ম'লাম! . . .'

কে যেন এক কোপে উড়িয়ে দিল তার নেশা। জলাটার কাছে ছুটে গেল সে। সদ্যভাঙ্গা বরফ চকমক করছে। বাতাস আর জলধারা জলার অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালো ঘূর্ণিস্রোতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে টুকরো টুকরো বরফ, রাশি রাশি সবুজ ঢেউ জটা দুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে, ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ আওয়াজ তুলছে। এছাড়া চারধারে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা। দূরের গ্রামে অন্ধকারের মধ্যে মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে কিছু হলুদ আলোর কণা। সদ্য ঝেড়ে তোলা গমের দানার মতো তারাগুলো মখমলী আকাশের বুকে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে, মিট্‌মিট্‌ করছে। মাটি থেকে একটা হাওয়া উঠল, ফুঁসে উঠে ময়দার মতো মিহি বরফের গুঁড়ো উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে জলার কালো গহ্বরটার মধ্যে। জলা থেকে একটু একটু করে বরফের ধোঁয়া উঠছে, তেমনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মারাত্মক ভাবে হাঁ করে আছে জলার কালো গহ্বরটা।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বুঝতে পারল এখন চিৎকার করাটা বোকামি, কোন মানেই হয় না চিৎকার করার। চারদিকে তাকিয়ে দেখার পর বুঝতে পারল নেশার ঘোরে ভুল করে কোথায় এসে পড়েছে। নিজের ওপর এবং যা ঘটেছে তার ওপর খাপ্পা হয়ে রাগে কাঁপতে লাগল সে। তখনও চাবুকটা তার হাতে ধরা ছিল। সেটা হাতে নিয়েই সে স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। মুখ খিস্তি করতে করতে সে তার নিজের পিঠেই বেশ কয়েকবার সপাং সপাং করে চাবুক মারল,

কিন্তু তাতে ব্যথা লাগল না, ভেড়ার চামড়ার মোটা কোটটা তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছিল। তার মনে হল একমাত্র এর জন্য ওটা খুলতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। দাড়ি টেনে এক গোছা চুল ছিঁড়ে ফেলল। কেনা জিনিসপত্র, ঘোড়া, স্লেজগাড়ি আর ঘোড়ার গলবন্ধনীদুটোর দাম মনে মনে হিসাব করে সে ভীষণ শাপশাপান্ত করতে লাগল, জলার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

'কানা শয়তান কোথাকার! . . .' ডুবে যাওয়া ঘোড়াটার উদ্দেশে কাঁপা কাঁপা আর্তস্বরে সে বলল। 'হারামজাদী! তুই নিজে ত ডুবেইছিস, আমাকেও ডুবিয়ে মারতিস আরেকটু হলে! কোন্ ভূত চেপেছিল রে বাবা তোর কাঁধে! এখন শয়তানরা তোর কাঁধে জোয়াল পরাবে, তোকে চালানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু তোকে চালাবে কী করে? চাবুক নেই যে! . . . এই নাও বাবারা, চাবুকও নাও! . . .' এই বলে ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে চেরী গাছের চাবুকটা জলার মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

চাবুকটা ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল, এক মুহূর্ত খাড়া হয়ে থেকে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর তলদেশে।

পনেরো

কালেদিনের সৈন্যদের হাতে কসাক বিপ্লবী ইউনিটগুলো যে ভাবে পর্যুদস্ত হয়ে গেল তার পরে মিল্লেরোভোতে সরে আসা ছাড়া দনের বিপ্লবী কমিটির গত্যন্তর রইল না। ইউক্রেনের প্রতিবিপ্লবী পার্লামেণ্ট আর কালেদিনের বিরুদ্ধে সেই সময় সামরিক অপারেশনে সরাসরি নেতৃত্ব দিচ্ছিল আন্তোনভ-অভ্‌সেয়েন্‌কো। দনের বিপ্লবী কমিটি তাড়াতাড়ি তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তাকে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি পাঠাল:

> লুগান্স্ক, ১৯ শে জানুয়ারী ১৯১৮, নং ৪৪৯, ১৮ঘঃ ২০
> মিঃ খার্‌কভ। কমিসার আন্তোনভ সমীপে—
>
> দন-কসাক ফৌজী বিপ্লবী কমিটি দন প্রদেশের নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি পেত্রোগ্রাদের গণকমিসার পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছে।
>
> কামেন্‌স্কায়া জিলায় যুদ্ধ-প্রত্যাবৃত্ত সৈন্যদিগের যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তথায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কসাক ফৌজী বিপ্লবী কমিটি মনে করে:

১। রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, কসাক, কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধিবর্গের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং তৎকর্তৃক নির্বাচিত গণকমিসার পরিষদের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশাসনক্ষমতা স্বীকার করা উচিত।

২। কসাক, কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধিবর্গের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের ভিত্তিতে দন প্রদেশে আঞ্চলিক সরকার গঠন করা উচিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসই দন প্রদেশের ভূমিসমস্যার সমাধান করিবে।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে ওয়ারেন্ট অফিসার ক্রিভশ্লিকভ
সম্পাদক দরোশেভ
সদস্যবৃন্দ: ওয়ারেন্ট অফিসার স্তেনিয়ানভ,
কোপালেই, ক্রিভুশেভ, চের্নোউখভ, ইয়েরোনিন

এই ঘোষণাপত্র পাওয়ার পরই বিপ্লবী কমিটির সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য রেড গার্ড দলগুলোকে পাঠানো হয়, আর তাদেরই সাহায্যের ফলে চের্নেৎসোভের পিটুনি বাহিনীর পরাভব ঘটিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হল। এবারে উদ্যোগ চলে এলো বিপ্লবী কমিটির হাতে। জ্ভেরেভো ও লিখায়া দখল করার পর বিপ্লবী কমিটির কসাক ইউনিটগুলোর সাহায্যপুষ্ট হয়ে সাব্লিন ও পেত্রোভের রেড গার্ড বাহিনী প্রবল আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে নোভোচের্কাস্কের দিকে ঠেলে দিল।

ডান দিকের রক্ষণভাগে, তাগান্‌রোগ সেক্টরের নেক্‌লিনোভ্‌কায় কর্ণেল কুতেপভের স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর হাতে সিভের্সের* পরাভব ঘটল। একটা ভারী কামান, বিশটা মেশিনগান আর একটা সাঁজোয়া গাড়ি খুইয়ে তাকে আম্‌ভ্রোসিয়েভ্‌কায় চলে আসতে হল। কিন্তু সিভের্সের পরাভব ও পশ্চাদপসরণের দিনই তাগান্‌রোগে বল্‌টিক কারখানায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। কারখানার মজুররা শিক্ষানবিশ অফিসারদের শহর থেকে তাড়িয়ে করে দিল। সিভের্স্ ধাক্কা সামলে উঠে আক্রমণে নেমে পড়ল, আক্রমণের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসৈন্যদলকে ঠেলে তাগান্‌রোগের দিকে পাঠিয়ে দিল।

সাফল্যের পাল্লা এবারে স্পষ্টই ঝুঁকে পড়ল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দিকে।

---

* রুদল্‌ফ ফের্দিনান্দভিচ সিভের্স্ (১৮৯২-১৯১৮) – এককালে এন্‌সাইন ছিলেন। বলশেভিক। ইউক্রেনে ও দন অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী ও হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম নেতা। ১৯১৮ সালে যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। – অনুঃ

স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী আর কালেদিনের অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা সৈন্যদলগুলোকে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। ২৮ জানুয়ারী কর্নিলভ কালেদিনকে টেলিগ্রাম করে জানাল যে স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী রস্তোভ ছেড়ে কুবানে চলে যাচ্ছে।

২৯ তারিখে সকাল নয়টার সময় আতামান ভবনে দন সরকারের সদস্যদের একটা জরুরী সভা ডাকা হল। কালেদিন এলো সবার পরে। ধপ্ করে টেবিলের ধারে এসে বসে কাগজপত্রগুলো কাছে টেনে নিল। অনিদ্রায় তার দু'গালের ঢিবির ওপর হলুদ ছোপ পড়েছে, কঠিন চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, চোখের কোলে কালি পড়েছে; মুখখানা বিশীর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে এসেছে, যেন বিনাশের করাল ছায়া পড়েছে তার ওপর। কর্নিলভের টেলিগ্রামটা আর নোভোচের্‌কাস্‌স্কের উত্তরে রেড গার্ডদের প্রবল আক্রমণের মুখে-পড়া ইউনিটগুলোর কম্যাণ্ডারদের পাঠানো বিবরণী-গুলো ধীরে ধীরে পড়ে গেল কালেদিন। সাদা হাতের চওড়া তেলো দিয়ে টেলিগ্রামের গাদাটা সযত্নে পাট করতে করতে কালিপড়া চোখের ফুলো ফুলো পাতা নামিয়ে রেখেই চাপা গলায় সে বলল, 'ভলাণ্টিয়ারবাহিনী পিছু হটছে। প্রদেশ আর নোভোচের্‌কাস্‌স্ক রক্ষা করার জন্যে আমাদের একশ' সাতচল্লিশটা বেয়নেট সম্বল আছে। . . .'

স্নায়বিক অবসাদে তার বাঁ চোখের পাতাটা দপদপ করে কাঁপতে লাগল, শক্ত করে চাপা দুই ঠোঁটের কোনায় অস্থির হয়ে উঠল মাংসপেশী। কণ্ঠস্বর চড়িয়ে সে বলে চলল, 'আমাদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক। স্থানীয় লোকেরা আমাদের সমর্থন করা ত দূরের কথা, বরং আমাদের শত্রু বলে মনে করে। আমাদের শক্তি বলতে কিছু নেই, তাই প্রতিরোধ করতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। অযথা প্রাণহানির, অযথা রক্তপাত ঘটানোর বাসনা আমার নেই। আমি তাই প্রস্তাব করছি আমাদের উচিত হবে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়া। কসাক আর্মির আতামান হিশেবে আমার নিজের ক্ষমতা আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

মিত্রোফান বগায়েভ্‌স্কি ঘরের চওড়া জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই দিকে তাকিয়েই মাথাটা না ঘুরিয়ে, চোখের পাঁশনে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে সে বলল, 'আমিও পদত্যাগ করছি।'

'সেক্ষেত্রে দেখাই যাচ্ছে পুরো সরকারও পদত্যাগ করছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তাহলে কার হাতে আমরা ক্ষমতা তুলে দেব?'

'পুর শাসন পরিষদের হাতে–দুমার হাতে,' শুষ্ককণ্ঠে বলল কালেদিন।

'তাহলে সেটা কাগজে কলমে লিখে পাকাপাকি করতে হয়,' সরকারের জনৈক সদ্য কারেভ ইতস্তত করে বলল।

সবাই কেমন যেন আনাড়ির মতো চুপ করে গেল। মুহূর্তের জন্য নেমে এলো ভারী নিস্তব্ধতা। ভেতরের লোকজনের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে ঘেমে ওঠা জানলার শার্সির বাইরে ক্লান্তিতে ঝরে পড়ছে জানুয়ারীর মেঘলা সকালের নিস্তেজ আলো। কুয়াশা আর শিশিরের অবগুণ্ঠনে ঢাকা শহরটা নিস্তব্ধ, তন্দ্রায় ঢুলছে। শহরের প্রাণধমনীর অভ্যস্ত স্পন্দন কানে আসছে না। কামানের গর্জন (সুলিন জেলা সদরের কাছাকাছি কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, তারই প্রতিধ্বনি) শহরের সমস্ত গতিবিধি পঙ্গু করে দিয়েছে, শহরের বুকের ওপর ঝুলছে একটা অব্যক্ত চাপা বিপদের লক্ষণ।

জানলার বাইরে কাকের দল স্পষ্ট গলায় রুক্ষ ডাক ছাড়তে ছাড়তে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভাগাড়ের মড়ার ওপর ঘুরপাক খাওয়ার মতো ঘণ্টা মিনারের মাথার ওপর তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের ওপর সদ্য বরফ পড়েছে, বেগনী রং ধরেছে বরফের বুকে। কদাচিৎ কোন পথ চলতি লোকের পদচিহ্ন পড়ছে তার ওপর, কদাচিৎ কোন স্লেজগাড়ি তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পেছনে রেখে যাচ্ছে লম্বা কালো রেখা।

হিমকঠিন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শহ্‌রের দুমার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা আনুষ্ঠানিক দলিল রচনা করার প্রস্তাব দিল বগায়েভ্‌স্কি।

'ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গেলে তাদের সঙ্গে একটা যুক্ত মিটিং-এ বসতে হয় আমাদের।'

'কোন্ সময় সেটা সবচেয়ে সুবিধের হবে?'

'একটু দেরিতে, বিকেল চারটে নাগাদ।'

নিস্তব্ধতার লৌহবন্ধন খুলে বেরিয়ে আসতে পেরে সরকারের সদস্যরা যেন খুবই খুশি হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর আর মিটিং-এর সময় নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠল। কালেদিন চুপ করে রইল, আঙুলের স্ফীত নখগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে সমান তালে টেবিল ঠুকে যেতে লাগল। তার ঝুলে পড়া ভুরুর নীচে অভ্রের মতো অস্পষ্ট চিকচিক করতে লাগল ঝাপসা চোখদুটো। একটা সীমাহীন ক্লান্তিতে, প্রবল বিতৃষ্ণায়, অতিরিক্ত চাপে তার চোখের দৃষ্টি ভারী আর ন্যক্কারজনক হয়ে উঠেছে।

সরকারের কোন এক সদস্য আরেকজন কার যেন কথার প্রতিবাদ করতে উঠে অনেকক্ষণ ধরে বকবক করে সকলের বিরক্তি ধরিয়ে দিতে লাগল। তাকে বাধা দিয়ে চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কালেদিন বলল, 'আপনারা সংক্ষেপে বলুন মশাই, সংক্ষেপে বলুন! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। এই ভাবে বকবক করেই ত রাশিয়া উচ্ছন্নে গেল। আধঘণ্টার বিরতি ঘোষণা করছি। আপনারা যা আলোচনা

করার করে নিন – ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।'

কালেদিন তার নিজের কামরায় চলে গেল। সরকারের সদস্যরা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। কে একজন বলল কালেদিনকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। বগায়েভ্‌স্কি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রায় ফিসফিস করে বলা হলেও তার কানে এলো:

'আলেক্সেই মাক্সিমভিচের মতো লোকের পক্ষে এখন আত্মহত্যাই উদ্ধারের একমাত্র পথ।'

বগায়েভ্‌স্কি চমকে উঠল। দ্রুত পায়ে সে চলল কালেদিনের কামরার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো কালেদিনকে সঙ্গে নিয়ে।

ঠিক হল আনুষ্ঠানিক ভাবে লেখাপড়া করে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চারটের সময় শহরের দুমার সঙ্গে সভায় বসা হবে। কালেদিন উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও। সরকারের একজন আদি সদস্যের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কালেদিনের নজরে পড়ল কারেভের সঙ্গে ফিসফিস করে ইয়ানভ কী যেন বলছে।

'কী ব্যাপার?' সে জিজ্ঞেস করল।

ইয়ানভ কিছুটা বিব্রত ভাবে তার দিকে এগিয়ে এলো।

'কসাক ছাড়া সরকারের আর যে সমস্ত প্রতিনিধি আছেন তাঁরা পথখরচার টাকা চাইছেন।'

চোখমুখ কুঁচকে কঠিনস্বরে কালেদিন বলল, 'আমার কাছে কোন টাকাপয়সা নেই। . . . ঘেন্না ধরিয়ে দিল!'

সকলে চলে যেতে লাগল। এই কথাবার্তা বগায়েভ্‌স্কির কানে গিয়েছিল। ইয়ানভকে এক পাশে ডেকে নিয়ে সে বলল, 'আমার কাছে আসুন। স্‌ভেতোজারভকে বলুন বাইরের বড়ঘরে অপেক্ষা করতে।'

কালেদিন ঝুঁকে পড়ে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন ওরা দু'জন। বগায়েভ্‌স্কি তার ঘরে এসে ইয়ানভের হাতে একতাড়া কাগজের নোট তুলে দিল।

'এখানে চৌদ্দ হাজার আছে। ওদের দিয়ে দিন।'

বাইরের বড়ঘরে ইয়ানভের জন্য অপেক্ষা করছিল স্‌ভেতোজারভ। ইয়ানভের হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে সে ধন্যবাদ জানাল, তারপর বিদায় নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। দারোয়ানের হাত থেকে ইয়ানভ গ্রেটকোটটা নিচ্ছে, এমন সময় ওপরের সিঁড়িতে কিসের একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল কালেদিনের এড্‌জুটাণ্ট মোল্‌দাভ্‌স্কি লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামছে।

'ডাক্তার! শিগ্‌গির ডাক্তার ডাকুন!'

গ্রেটকোটটা পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার দিকে ছুটে গেল ইয়ানভ। মোল্‌দাভ্‌স্কিও ততক্ষণে প্রায় নীচে নেমে আসতে হল্‌-ঘরে ডিউটিরত এড্‌জুটান্ট আর আর্দালিরা ভিড় করে তাকে ঘিরে ফেলল।

ইয়ানভের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। চিৎকার করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন!' সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর বুক ঠেকিয়ে আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মোল্‌দাভ্‌স্কি।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বগায়েভ্‌স্কি। তার ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল - যেন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা লেগেছে। তোতলাতে লাগল সে।

'কী? কী?'

ভিড় করে, এ ওকে ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে ওপরে ছুটল। তাদের ছোটার ধপধপ খটখট আওয়াজ বাজতে লাগল সিঁড়িতে। বগায়েভ্‌স্কি হাঁ করে খাবি খেতে খেতে ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ছুটল। সে-ই প্রথম দড়াম করে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল, সামনের ঘর পেরিয়ে ছুটে গেল কাজের ঘরে। কাজের ঘরের পরে যে ছোট ঘরটা তার দরজা হাঁ-খোলা। সেখান থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে নীলচে ধোঁয়া আর পোড়া বারুদের কটু গন্ধ।

'ওঃ! আঃ-হা-হা-হা! . . . আলিওশা! ওগো, কোথায় গেলে গো! . . .' শোনা গেল কালেদিনের স্ত্রীর চাপা গলার করুণ বিলাপ। তার কণ্ঠস্বর চেনা যাচ্ছিল না।

বগায়েভ্‌স্কির মনে হল বুঝি তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটানে নিজের জামার কলারটা ছিঁড়ে ফেলল সে, দৌড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল। জানলার কাছে রঙ-জ্বলা গিল্‌টি-করা হাতলটা আঁকড়ে ধরে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কারেভ। গায়ের ফ্রক কোটের নীচে তার কাঁধের ফলাদুটো ভয়ঙ্কর ভাবে উঠছে আর পড়ছে, থেকে থেকে দারুণ কাঁপুনি উঠছে তার শরীরে। একজন বয়স্ক লোক পশুর মতো চাপা আর্তনাদ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে - এ দৃশ্য দেখে বগায়েভ্‌স্কির পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল।

অফিসারের ক্যাম্প-বেডে বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে, পাদুটো টানটান করে চিত হয়ে শুয়ে আছে কালেদিন। মাথাটা সামান্য কাত হয়ে আছে দেয়ালের দিকে, বালিশের সাদা ওয়াড়ের ওপর ভিজে-ভিজে নীলচে কপালটা আর বালিশের গায়ে লেগে থাকা গালটা কিসের যেন একটা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। চোখদুটো ঘুমন্ত মানুষের মতো আধবোজা, কঠিন ঠোঁটের দুই কোণ যন্ত্রণায় বেঁকে আছে। পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে তার স্ত্রী। বাধো বাধো গলার উন্মত্ত বন্য বিলাপ কানের ভেতর দিয়ে যেন কেটে ভেতরে বসে যাচ্ছে।

খাটের ওপর পড়ে আছে একটা কোল্ট রিভল্ভার। একটা খুশির কালচে লাল ক্ষীণ ধারা এঁকেবেঁকে গড়িয়ে চলে গেছে তার গায়ের শার্টের ওপর দিয়ে।

খাটের পাশে চেয়ারের পিঠে নিখুঁত ভাবে ঝুলিয়ে রাখা আছে উঁচু কলারওয়ালা আঁটো ফৌজী জামাটা, টেবিলের ওপর হাতঘড়ি।

বগায়েভ্স্কি আস্তে করে দুলে উঠল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে উষ্ণ নরম বুকের ওপর কান পাতল। পুরুষের ঘামের ভিনিগারের মতো ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল। কালেদিনের হৃৎপিণ্ডের কোন স্পন্দন নেই। সেই মুহূর্তে তার সমস্ত মনপ্রাণ যেন হয়ে উঠল শ্রবণেন্দ্রিয় – অস্বাভাবিক ব্যগ্র হয়ে একাগ্রচিত্তে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল বুকের স্পন্দন ; কিন্তু তার বদলে কেবল শুনতে পেল টেবিলে রাখা হাতঘড়ির স্পষ্ট টিকটিক আওয়াজ, মৃত সেনাপতির স্ত্রীর ফুলে ফুলে ভাঙা গলায় কান্না আর জানলার বাইরে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে হতভাগা একপাল কাকের অশুভ কা-কা ডাক।

ষোল

জ্ঞান ফিরে আসার পর প্রথম চোখ মেলতেই বুনচুক দেখতে পেল আন্নার কালো চোখদুটো – হাসি-হাসি, চিকচিক করছে চোখের জল।

তিন সপ্তাহ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, ভুল বকছিল। তিন সপ্তাহ ধরে সে ঘুরে বেড়িয়েছে আরেক জগতে – এক কল্পনাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত জগতে। চব্বিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তার জ্ঞান ফিরে এলো। ঝাপসা চোখ মেলে গুরুগম্ভীর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আন্নাকে, আন্নার সঙ্গে জড়িত সব কিছু মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার সে প্রয়াস আংশিকমাত্র সফল হল। স্মৃতি তখনও অনড়, অবাধ্য – অনেক কিছুই তখনও লুকিয়ে রেখে দিয়েছে কোন্ গভীর অতলে।

'জল... জল দাও।...' তার নিজের গলার স্বর আগের মতোই আবার তার নিজেরই কানে অদ্ভুত হয়ে বাজতে লাগল – মনে হল যেন কোন্ দূর থেকে ভেসে আসছে। তাতে মজা পেল সে, মৃদু হাসল।

আন্না চটপট এগিয়ে এলো তার দিকে। আন্নার সারা মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যদিও কৃপণের মতো সে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

বুনচুক মগটা ধরার জন্য নিস্তেজ হাতখানা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু আন্না তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার হাত থেকেই খাও।'

অনেক চেষ্টা করে কাঁপতে কাঁপতে মাথা তুলে জলটুকু খেয়ে ক্লান্তিভরে বালিশে এলিয়ে পড়ল বুনচুক। অনেকক্ষণ ধরে একপাশে তাকিয়ে রইল, কিছু

একটা বলতে চাইল, কিন্তু দুর্বলতা বাধা হয়ে দাঁড়াল – ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আবার ঘুম ভেঙে যেতে সেই প্রথম বারের মতোই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ল আন্নার উদ্বেগাকুল চোখদুটো – তারই দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে, তারপর দেখতে পেল বাতির গেরুয়া আলো আর ছাদের রঙ-না-করা তক্তার ওপর ঠিকরে পড়া আলোর সাদা চক্রটা।

'আমার কাছে এগিয়ে এসো আনিয়া।'

আন্না এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। উত্তরে বুন্‌চুক দুর্বল ভাবে চাপ দিল তার হাতে।

'এখন কেমন বোধ করছ?'

'আমার জিভটা যেন আমার নয়, মাথাটা আমার নয়, পাদুটোও তাই। আর আমার নিজের যেন বয়স হয়ে গেছে দু'শ' বছর,' প্রতিটি শব্দ অতি সন্তর্পণে উচ্চারণ করল সে। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কি টাইফাস হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ঘরটার চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অস্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোথায় আছি?'

প্রশ্নটা বুঝতে পেরে আন্না মুচকি হাসল।

'ত্সারিৎসিনে।'

'তুমি . . . তুমি এখানে কী করে?'

'আমি একা রয়ে গেছি তোমার সঙ্গে,' তারপর অনেকটা যেন নিজের সমর্থনে অথবা বুন্‌চুকের কোন না-বলা-চিন্তাকে এড়ানোর চেষ্টায় চটপট বলে উঠল, 'অচেনা-অজানা লোকজনের হাতে ত আর তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না! আব্রাম্‌সন আর ব্যুরোর কমরেডরা আমাকে ধরেছিলেন তোমার দেখাশোনা করতে। . . . তাই দেখতেই পাচ্ছ পাকেচক্রে পড়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হল আমাকে।'

বুন্‌চুকের চোখের দৃষ্টিতে, তার ক্ষীণ হাত নাড়ায় ঝরে পড়ল কৃতজ্ঞতা।

'ক্রুতগোরভ কোথায় গেল?'

'ভরোনেজ হয়ে লুগান্‌স্কে চলে গেছে।'

'আর গেভোর্‌কিয়ান্‌ৎস?'

'সে . . . সে মারা গেছে . . . টাইফাসে।'

'ইশ!'

ওরা দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল – যেন মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান জানাল।

'তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছিল। তোমার অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল,' মৃদুস্বরে আন্না বলল।

'আর বগভোয়?'

'এদের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি আমি। কেউ কেউ কামেন্স্কায়া চলে গেছে। কিন্তু শোনো, কথা বলাটা কি তোমার পক্ষে খারাপ না? একটু দুধ খাবে কি?' -

বুনচুক মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। অতি কষ্টে জিভের আড় ভেঙে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল।

'আব্রাম্সন?'

'এক হপ্তা আগে ভরোনেজ চলে গেছে।'

আনাড়ির মতো নড়েচড়ে উঠল সে; মাথাটা ঘুরে গেল, চোখে এক রাশ রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, ব্যথায় টনটন করে উঠল চোখদুটো। কপালে আন্নার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করে চোখ মেলে চাইল। কেবল একটা প্রশ্নই তার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল: সে ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল – এই সময় তাকে সেবাশুশ্রূষা করার নোংরা কাজটা তাহলে কে করেছিল? ও-ই কি? মনে হতেই তার গালদুটো সামান্য লাল হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সেবাশুশ্রূষা কি তুমি একাই করেছিলে?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

বুনচুক দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল, ফিসফিস করে বলল, 'পাজী বদমাশ! . . . লজ্জাও হল না ওদের! তোমার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল! . . .'

টাইফাসের প্রতিক্রিয়া ঘটল কানের ওপর – বুনচুক কানে খাটো হয়ে গেল। ত্সারিৎসিনের পার্টি কমিটি থেকে যে ডাক্তার এসেছিল সে দেখেশুনে বলল রোগী সম্পূর্ণ সেরে উঠলেই এর চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হতে পারে। বুনচুক অত্যন্ত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ক্ষিদে তার পেত রাক্ষসের মতো, কিন্তু পথ্যের ব্যাপারে আন্না খুব কড়া। এই নিয়েই দু'জনের মধ্যে খটাখটি বাধতে লাগল।

বুনচুক হয়ত বলল, 'আরেকটু দুধ দাও।'

'এর বেশি দেওয়া যাবে না।'

'আমি বলছি. . . দাও! না খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি আমাকে?'

'ইলিয়া তুমি ত জান তোমার যতটুকু বরাদ্দ তার চেয়ে বেশি খাবার আমি তোমাকে দিতে পারব না!'

অভিমানভরে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে থাকে বুন্‌চুক, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অনেকক্ষণ কোন কথাবার্তা বলে না। ওর ওপর করুণাবশত মনে মনে কষ্ট পেলেও আন্না নতিস্বীকার করে না। কিছুক্ষণ পরে পাশ ফেরে বুন্‌চুক। মুখটা তার থমথমে। তাতে আরও করুণ দেখায় তাকে। অনুনয় করে বলে, 'আচ্ছা কিছু নুনে জারান বাঁধাকপি। তাও কি মানা? লক্ষ্মীটি, দাও না আন্না! . . . আমার কথাটা শোনোই না। . . . কিসের খারাপ হবে? ওসব ডাক্তারদের বানানো কথা!'

আন্না দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করলে সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে অনেক সময় রূঢ় ভাষায় তাকে অপমান করে।

'আমার সঙ্গে এরকম মস্করা করার কোন অধিকার তোমার নেই! আমি নিজে বাড়িউলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করব! তোমার কোন দয়ামায়া নেই, তুমি একটা জঘন্য মেয়ে! . . . সত্যি কথা বলতে গেলে কি, দেখেশুনে তোমার ওপর আমার ঘেন্না জমে যাচ্ছে।'

'এত কষ্ট করে এই যে তোমার এত সেবাশুশ্রূষা করলাম এই কিনা তার প্রতিদান!' আন্নাও নিজেকে সামলাতে পারে না।

'আমি তোমাকে থাকতে বলি নি আমার পাশে! ওই কথা তুলে আমাকে খোঁটা দেওয়া অন্যায়। তুমি আমার অবস্থার সুযোগ নিচ্ছ। বেশ ঠিক আছে। . . . কিন্তু দিও না আমাকে! আমি না খেতে পেয়ে মরি। . . . তাতে কার আর এমন কী ক্ষতি হচ্ছে!'

আন্নর ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়, চুপ করে যায়, বুন্‌চুকের মুখ চেয়ে ধৈর্য ধরে সব সহ্য করে যায়।

কেবল একবার বাড়তি পিঠে তাকে দিতে না চাইলে তাই নিয়ে তুমুল কথা কাটাকাটি হওয়ার পর বুন্‌চুক যখন মুখ ঘুরিয়ে নিল তখন তার চোখে জল চিকচিক করছে দেখে আন্না আর স্থির থাকতে পারল না – বেদনায় টনটন করে উঠল তার বুকের ভেতরটা।

'তুমি যে একেবারে ছেলেমানুষ!' বলে উঠল সে।

তারপর দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে থালা ভরা পিঠে নিয়ে এলো।

'খাও লক্ষ্মীটি ইলিউশা, খাও! আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, আমার ওপর রাগ করো না! এই যে এটা ভালো ভাজা হয়েছে!' কাঁপা কাঁপা হাতে বুন্‌চুকের হাতের মধ্যে সে গুঁজে দিতে লাগল পিঠে।

ভেতরে ভেতরে ভীষণ কষ্ট পেতে লাগল বুন্‌চুক। ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে বসে পিঠেটা খেয়ে ফেলল। নরম কোঁকড়ানো দাড়িতে ঘন হয়ে ছেয়ে যাওয়া তার বিশীর্ণ মুখের

ওপর অপরাধীর হাসি খেলে গেল। চোখের দৃষ্টিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বলল, 'আমি একটা ছেলেমানুষেরও অধম।... দেখলে ত, প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম।...'

'আন্না তাকিয়ে দেখল ওকে। ওর ঘাড়টা, গলাটা অদ্ভুত রকম লিকলিকে হয়ে গেছে, জামার খোলা কলারের ভেতর থেকে উঁকি মারছে গর্তে ঢোকা মাংসহীন বুকটা, হাতের হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। এমন এক গভীর প্রেমে আর মমতায় সে অভিভূত হয়ে পড়ল যা এর আগে আর কখনও সে উপলব্ধি করে নি। এই প্রথম সরল ভাবে, দরদভরে বুনচুকের শুকনো পাণ্ডুর কপালে সে চুমু খেল।

অন্যের সাহায্য ছাড়া ঘরের মধ্যে চলাফেরা করার মতো অবস্থায় আসতে তার লেগে গেল আরও দুই সপ্তাহ। শুকিয়ে পাটকাঠির মতো লিকলিকে হয়ে গেছে তার পাদুটো, চলতে গেলে পা ভেঙে আসে। নতুন করে হাঁটা শেখা শুরু করল বুনচুক।

'দেখ দেখ আন্না, হাঁটছি!' অন্যের সাহায্য না নিয়ে হাঁটার চেষ্টা করে সে তড়বড় করে পা বাড়ায়, কিন্তু পাদুটো শরীরের ভার ধরে রাখতে পারে না, মেঝেটা পিছলে যায় পায়ের নীচ থেকে।

হাত বাড়িয়ে প্রথমেই সামনে যা পায় সেটা চেপে ধরে ভর রাখার চেষ্টা করে, বুড়োদের মতো একগাল হাসে, তার স্বচ্ছ গালের চামড়া টানটান হয়ে ওঠে, গালে ভাঁজ পড়ে। বুড়োদের মতো খনখনে গলায় হাসে, উত্তেজনায় ও হাসিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আবার ধপ করে শুয়ে পড়ে খাটের ওপর।

যে বাসাটা তারা নিয়েছিল সেটা জাহাজ-ঘাটা থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। জানলা থেকে দেখা যায় বরফ ঢাকা ভোল্‌গার বিপুল বিস্তার, তার পেছনে প্রশস্ত চক্রাকার ধূসর বনভূমি, দূরের মাঠের ঢেউ-খেলানো কোমল রেখা। আন্না অনেকক্ষণ ধরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তার জীবনে যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সে-কথাই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুনচুকের অসুখ আশ্চর্য ভাবে তাদের দু'জনকে কাছাকাছি এনে ফেলেছে।

কিন্তু তারও আগে সেই রস্তোভে তাদের যখন প্রথম দেখা হয় তখনই ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা শিহরনে কাঁপতে কাঁপতে সে উপলব্ধি করেছে যে এই মানুষটির সঙ্গে চিরকালের জন্য এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে গেছে। কী অসময়েই না, যখন অশুভ সমস্ত ঘটনা ঘটছে এমন এক বছরে, সংক্ষিপ্ত যৌবনের উনিশটি বসন্তের কোঠায় এসে, বুনচুকের জন্য তার উপলব্ধির জাগরণ ঘটল! বুনচুক দেখতে সাদাসিধে, আকর্ষণ করার মতো কিছু নেই তার চেহারায়, তবু আন্না মনে মনে তাকেই বরণ করে নিয়েছে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সে বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে। এখন আন্না তাকে যমের হাত থেকে

ছিনিয়ে এনেছে, সেবাশুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছে। . . .

প্রথম দিকে যখন দীর্ঘ, কষ্টকর পথ পেরিয়ে তাকে নিয়ে ত্সারিৎসিন এসে পৌঁছুল তখন কী অসহ্য আর তিক্তই না লাগছিল! কান্না পেয়ে যাচ্ছিল তার। এই প্রথম ভালোবাসার পাত্রের সঙ্গে দিন কাটানোর বিপরীত দিকটা এত কাছে থেকে এমন নগ্ন হয়ে তার সামনে ধরা পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বুনচুকের গায়ের জামাকাপড় বদলেছে, তার জ্বরতপ্ত মাথা থেকে আঁচড়ে আঁচড়ে উকুন বার করেছে, পাথরের মতো ভারী শরীরটাকে পাশ ফিরিয়েছে, বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠে চোর চাউনিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে তার জীর্ণশীর্ণ নগ্ন দেহ – একজন পুরুষের নগ্ন দেহ, দেহের আবরণ, যার নীচে সামান্য উষ্ণতায় স্পন্দিত হচ্ছে বড় মূল্যবান এক জীবন। ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, রুখে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু অন্তরের গভীরে যে অনুভূতি সে সযত্নে বহন করে আসছিল বাহ্যিক মালিন্য তাকে কলঙ্কিত করতে পারে নি। সেই অনুভূতির প্রবল তাড়নায় চালিত হয়ে সমস্ত বেদনা আর বৈকল্যকে জয় করতে শিখল সে। শেষ পর্যন্ত যখন জয় করতে শিখল তখন টিকে রইল শুধু মমতা আর প্রেম, যে প্রেম তার গভীর উৎস থেকে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বয়ে চলেছে।

একবার বুনচুক জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই সবের পর আমাকে তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?'

'এটা ছিল একটা পরীক্ষা।'

'কিসের পরীক্ষা? ধৈর্যের?'

'না। আমার অনুভূতির।'

বুনচুক মুখ ঘুরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠোঁটের কাঁপুনি সে থামাতে পারল না। এই বিষয়ের ওপর আর কোন কথা তাদের হল না। যে কোন কথাই এখানে হত অবান্তর, অর্থহীন।

বুনচুক সুস্থ হয়ে ওঠার পর একবারও কোন ঝগড়াঝাঁটিতে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে এতটুকু ফাটল ধরে নি। আন্না তার জন্য যে দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে বুনচুক যেন তার সবটুকু পুষিয়ে দিতে চায় তাকে। আন্নার প্রতি বড় বেশি মনোযোগী হয়ে উঠতে লাগল সে, তার প্রতিটি ইচ্ছা-অনিচ্ছা আগে থাকতে অনুমান করতে লাগল; কিন্তু কোন ভাবেই আন্নাকে উত্যক্ত সে করল না, সবই করতে লাগল তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী – শিষ্টতা বজায় রেখে। আন্নারও সেটা ভালো লাগল। সে যখন আন্নার দিকে তাকায় তখনও তার দৃষ্টিতে সেই রুক্ষতা, কিন্তু তারই মধ্যে অন্য রকম – তাতে ফুটে ওঠে বিনয়নম্রতা আর সীমাহীন অনুরাগ।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি তারা ত্সারিৎসিন থেকে ভরোনেজ রওনা দিল। শহর

পেছনে সরে যাচ্ছে, তাই দেখতে দেখতে বুনচুকের কাঁধে হাত রেখে যেন তাদের মধ্যে আগে যে কথোপকথন হয়েছিল তারই পরিসমাপ্তি টানার জন্য আন্না বলতে লাগল:

'আমাদের দু'জনার দেখা হয়েছিল এক অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে।... হয়ত দেখা না হলেই ভালো হত।... এ কথাগুলো অবশ্য আমি ভেবেচিন্তে বলছি, কিন্তু আমার মন বলছে অন্য কথা। কেন একথা বলছি জান? তাকিয়ে দেখ...' রেলরাস্তার চারধার ঘিরে একটা বিশাল চাঁদির টাকার মতো পড়ে আছে বরফে ঢাকা স্তেপের প্রান্তর – আঙুল দিয়ে সেই দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'ওখানে সব কিছু টগবগ করে উথলে উঠছে। আমাদের যত শক্তি আছে সব লাগানো উচিত ওখানে। কিন্তু আমার মনে হয় আবেগ আমাদের সঙ্কল্পকে টলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেখা হওয়া উচিত ছিল আরও আগে, নয়ত বা আরও পরে।'

'না, আমি তা মানি না!' বুনচুক হেসে তাকে কাছে টেনে নিল। 'তুমি আর আমি মিলে হব একপ্রাণ। তাতে আমাদের সঙ্কল্প ত টলবেই না বরং আরও জোরাল হবে। এই দেখ না কোন একটা ডাল ভাঙা কত সহজ, কিন্তু দুটো যখন একসঙ্গে জড়ানো থাকে তখন ভাঙা বেশ কঠিন।'

'খুব একটা ভালো উদাহরণ হল না, ইলিয়া।'

'ওতেই চলবে।... কিন্তু এসব কথার কোন শেষ নেই।'

'তা সত্যি, তাছাড়া আমরা...' একটু ভেবাচেকা খেয়ে ইতস্তত করে সে বলল, '.. আমরা যে একসঙ্গে আছি, কিংবা অন্তত আধাআধি কাছে এসেছি, তার জন্যে সত্যিই আমার তেমন দুঃখ নেই। যাই হোক না কেন ব্যক্তিগত কিছুই আমাদের লড়াই করার ইচ্ছেকে টুঁটি টিপে মারতে পারে না...'

'... আমাদের জয় করার ইচ্ছেকেও। যাক গে, রাখ ওসব!' আন্নার জঙ্গী কায়দায় মুঠো করা ছোট্ট হাতটা চেপে ধরে বুনচুক যোগ করল।

এখনও যেহেতু তারা দৈহিক সংস্পর্শে আসে নি, সেই কারণে তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা শিশুসুলভ প্রগাঢ় কোমল ভাব লক্ষ করা যায়। অন্তরঙ্গতার শেষ সীমাটুকু লঙ্ঘন করার কোন কামনা তাদের পীড়িত করে না। আন্না তার নিজের মতো ক'রে মনে মনে এটা উপভোগ করে, সেই কথা ভেবেই সে জিজ্ঞেস করল, 'এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয় আমাদের সম্পর্কটা ঠিক তেমন নয়, তাই না? ত্সারিৎসিনে আমাদের বাড়িউলী আর অন্য সকলে ধরেই নিয়েছিল যে আমরা স্বামী-স্ত্রী, তাই না? আর সব কথা বাদ দিলেও মধ্যবিত্তদের যে ধ্যানধারণা আমরা যে তার গণ্ডি ছাড়াতে পেরেছি এটা ভালোই বলতে হবে। লড়াইয়ের মধ্যে আমরা দু'জন দু'জনাকে ভালোবেসেছি, সমস্ত রকম নীচতা আর

পাশবিকতার নোংরা ছোঁয়া থেকে আমাদের অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। . . .'

'এ যে রোমাণ্টিসিজম দেখছি!' বুন্‌চুক মুচকি হাসল।

'কী বললে?' আন্না জিজ্ঞেস করল।

বুন্‌চুক কোন উত্তর দিল না, মৃদু চাপড় মারল তার মাথায়।

বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আন্না তাকিয়ে দেখল তুষারাচ্ছন্ন বিস্তার, দূরে সরে সরে যাচ্ছে একের পর এক গ্রামের অস্পষ্ট সীমারেখা, বেগনী হয়ে ফুটে উঠেছে বনজঙ্গলের রেখাগুলো, চোখে পড়ে গিরিপথের সরু ফাটলগুলো। অতি দ্রুত কথা বলে চলল সে। গলার স্বর বেহালার সুরের মতন নরম, সুরেলা।

'আর তাছাড়া এখন, এই সময় কারও কোন ব্যক্তিগত ছোটখাটো সুখের জন্যে চেষ্টা করাটাই কেমন যেন নীচ আর জঘন্য বলে মনে হয়। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানবজাতি যে সীমাহীন সুখ লাভ করছে তার সঙ্গে তুলনা করলে এর কীই বা অর্থ হয়? তাই না? মুক্তির জন্যে যে চেষ্টা চলছে তার মধ্যে আমাদের মিশে যেতে হবে, একাকার হয়ে যেতে হবে, নিজেকে একটা খণ্ড, আলাদা সত্তা বলে না ভেবে আমাদের . . . আমাদের মিশে যেতে হবে আর দশজনের মধ্যে।' তার কোমল অথচ দর্পিত ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠল ঘুমন্ত শিশুর মতো প্রশান্ত হাসি। সেই হাসির জন্য তার ওপরের ঠোঁটে একটা ছায়া দুলতে লাগল। 'জান ইলিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনকে আমার মনে হয় যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসা এক অপূর্ব সুন্দর বাজনা – যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। এমন বাজনা যা লোকে অনেক সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পায়। . . . তুমি কি কখনও স্বপ্নে বাজনা শুনতে পাও? বিশেষ কোন একটা সুর নয়, কোন মিহি সূক্ষ্ম তান নয়, এ যেন অনেক বাজনা মিলে এক উত্তাল ঐকতান – ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে। সকলেই সুন্দরকে ভালোবাসে। আমি সুন্দরকে ভালোবাসি তার সবটুকু নিয়ে, এমনকি তার অতি তুচ্ছ প্রকাশকেও। . . . সমাজতন্ত্রে জীবন কি সুন্দর হয়ে উঠবে না? লড়াই থাকবে না, গরিবী থাকবে না, কোন অত্যাচার থাকবে না, জাতিতে জাতিতে বিভেদের কোন চিহ্ন থাকবে না! . . . মানুষ এই পৃথিবীটাকে কী নোংরাই না করে ফেলেছে! . . . কত মানুষের দুঃখদুর্দশা ঘটিয়েছে! . . .' বুন্‌চুকের দিকে দ্রুত ফিরে তার হাতের দিকে হাত বাড়াল সে। 'বলো, আমাকে বলো! এর জন্যে প্রাণ দেওয়া কি মধুর হবে না? বলো! তাই নয় কি? তা যদি না হয় তাহলে কী বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকার কী অর্থ হয় তাহলে? . . . আমার মনে হয় আমি যদি লড়াই করতে গিয়ে মরি . . .' বলতে বলতে বুন্‌চুকের হাতখানা টেনে নিয়ে সে তার নিজের বুকের সঙ্গে এমন ভাবে চেপে ধরল যাতে বুন্‌চুক তার বুকের ভেতরকার চাপা হৃৎস্পন্দন

শুনতে পায়; তারপর গভীর কালো চোখ মেলে বুন্‌চুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আর যদি সঙ্গে সঙ্গে আমার মরণ না হয় তাহলে শেষ যা আমি শুনতে পাব তা হবে ভবিষ্যতের সেই তুমুল সাড়া জাগানো বিজয়ের অপূর্ব স্তোত্র।'

বুন্‌চুক মাথা নীচু করে শুনে গেল। আন্না এই যৌবনদীপ্ত আবেগের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস যেন আগুন ধরিয়ে দিল তার বুকের মধ্যে; গাড়ির চাকার একটানা ঘটাং ঘটাং, কামরার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আর রেল লাইনের গুঞ্জনের মধ্যে সে যেন ক্ষীণ ভাবে শুনতে পেল জীবনের সেই মহাসঙ্গীত। উত্তেজনায় তার শিরদাঁড়া বয়ে একটা শিরশিরে স্রোত নেমে গেল। কামরার বাইরের দিকের দরজার কাছে গিয়ে এক লাথি মেরে সে খুলে দিল দরজাটা। শিস দিতে দিতে করিডরের ভেতরে হুড়মুড় ঘুরে ঢুকে পড়ল একরাশ দমকা বাতাস, সেই সঙ্গে ইঞ্জিনের বাষ্প, গায়ে ছুঁচ ফোটানো মিহি বরফের গুঁড়ো আর ইঞ্জিনের অবিরাম ঘোর গর্জন।

সতেরো

ষোলই জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা বুন্‌চুক আর আন্না ভরোনেজে এসে পৌঁছুল। তারা যেদিন রওনা হয় সেই দিনই সংবাদ পাওয়া গেল যে কালেদিনের সৈন্যদলের চাপে পড়ে দনের বিপ্লবী কমিটি ও তার অনুগত ইউনিটগুলো কামেন্‌স্কায়া থেকে বিতাড়িত হয়ে মিল্লেরোভোয় এসে উঠেছে। তাই ভরোনেজে দু'দিন কাটানোর পর তারাও চলে গেল মিল্লেরোভোয়।

বহু লোকের সমাগমে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে মিল্লেরোভো। সেখানে বুন্‌চুককে কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকতে হল, পরের ট্রেনে সে রওনা দিল গ্লুবোকায়ায়। তার পর দিন সে একটা মেশিনগান প্লেটুনের ভার নিল। পরদিন সকালেই চের্নেৎসোভের বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়ল।

চের্নেৎসোভের পরাজয়ের পর বুন্‌চুক আর আন্নার মধ্যে আকস্মিক ভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সকাল বেলায় উত্তেজিত হয়ে সদর দপ্তর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল আন্না; তাকে উত্তেজিত আর একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

'জানো, আব্রাম্‌সন এসেছেন এখানে। তোমার সঙ্গে দেখা করার ভীষণ ইচ্ছে ওঁর। আর হ্যাঁ, আরও একটা খবর – আজই আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে গেল বুন্‌চুক।

'আব্রাম্‌সন, আমি আর আরও কয়েকজন কমরেড লুগান্‌স্ক যাচ্ছি, যেখানে প্রচারের কাজ চালাতে হবে।'

'তুমি তাহলে সৈন্যদল ছেড়ে দিচ্ছ?' উদাসীন ভাবে জিজ্ঞেস করল বুন্‌চুক।

হেসে উঠল আন্না, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বুন্‌চুকের বুকে মুখ গুঁজল।

'স্বীকার কর, সৈন্যদল ছেড়ে যাচ্ছি বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে না, তোমার দুঃখ আসলে আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে! কিন্তু সে ত অল্প কিছুদিনের জন্যে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার পাশে পাশে থাকার চেয়ে এতে আমি বেশি ভালো কাজ করতে পারব। মেশিনগানের চেয়ে প্রচারের কাজটাই বোধহয় আমার বেশি ভালো আসে...' তারপর দুষ্টুমিভরা চোখে বুন্‌চুকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদিও বুন্‌চুকের মতো একজন অভিজ্ঞ কম্যাণ্ডারের অধীনে থেকে আমি তালিম পেয়েছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হল আব্রাম্‌সন। আগের মতোই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর, কাজ-পাগল, ছটফটে। তার কালো কুচকুচে চুলের ওপর সেই রকমই চকচক করছে সাদা চুলের ছোপ। বুন্‌চুককে দেখে সে বাস্তবিকই খুশি হল।

'পায়ে খাড়া হয়েছ তাহলে? খু-উ-ব ভালো! আন্নাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর কিছু যেন একটা আঁচ করতে পেরে তারই ইঙ্গিত দিয়ে চোখ টিপে বলল, 'তোমার আপত্তি নেই ত? আপত্তি নেই?... বেশ, বেশ... খুবই ভালো। প্রশ্নটা আমি করছি এই কারণে যে ত্‌সারিৎসিনে থাকতে তোমাদের মধ্যে সম্ভবত অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।'

'অস্বীকার করছি না, ওকে ছেড়ে দিতে আমার দুঃখ হচ্ছে।' ভুরু কুঁচকে কাষ্ঠহাসি হেসে বুন্‌চুক বলল।

'দুঃখ হচ্ছে? বটে! এটাই অনেক কিছু... আন্না, শুনছ?'

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারী করল সে, পায়চারী করতে করতেই সিন্দুকের পেছন থেকে গারিন-মিখাইলোভ্‌স্কির* লেখা ধুলোয় ভরা একটা বই তুলে নিয়ে দেখল; তারপর হঠাৎই বিদায় নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'আন্না, আর কতক্ষণ?'

'তুমি যাও। আমি এক্ষুনি আসছি,' পার্টিশানের ওপাশ থেকে উত্তর এলো।

জামাকাপড় বদলে বেরিয়ে এলো আন্না। তার গায়ে খাকি ফৌজী শার্ট, দু'পাশে পকেট, কোমরে বেল্ট আঁটা, বুকটা সামান্য উঁচু হয়ে আছে, সেই পুরনো কালো ঘাঘরাটাই পরেছে সে – জায়গায় জায়গায় রিফু করা, তবে নিখুঁত পরিষ্কার।

---

* প্রকৃত নাম নিকোলাই গেওর্গিয়েভিচ মিখাইলভ্‌স্কি (১৮৫২-১৯০৬)। রুশ লেখক, ইঞ্জিনীয়র। বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে চার খণ্ডের একটি রচনার লেখক। – অনুঃ

মাথায় ভারী চুলের গোছা, হালে ধুয়ে পরিষ্কার করে ঘসে ফাঁপিয়ে তোলা, খোঁপার বাঁধন থেকে খুলে পড়ছে। গ্রেটকোটটা গায়ে দিয়ে বেল্টটা কষে বাঁধতে বাঁধতে সে জিজ্ঞেস করল (কিন্তু আগে যে সজীবতা তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল তা আর নেই, গলার স্বর নিস্তেজ, মিনতিভরা):

'আজকের আক্রমণে তুমি যোগ দেবে নাকি?'

'অবশ্যই! হাত গুটিয়ে বসে থাকব নাকি আমি?'

'তাহলে শোন, তোমার কাছে আমার একটা মিনতি... সাবধান থাকবে কিন্তু! আমার কথা মনে রেখে তুমি এটা করবে ত? কী বল? আমি একজোড়া বাড়তি গরম মোজা রেখে যাচ্ছি তোমার জন্যে। ঠাণ্ডা লাগিও না, দেখো পায়ে যেন জল না লাগে। আমি লুগান্স্ক থেকে চিঠি দেব তোমাকে।'

হঠাৎ কেমন যেন তার চোখদুটো ম্লান হয়ে গেল। বিদায় নিতে গিয়ে সে স্বীকার করল, 'দেখছ ত তোমাকে ছেড়ে যেতে কত কষ্ট হচ্ছে আমার! প্রথমে আব্রাম্‌সন যখন আমাকে লুগান্স্ক যাবার কথা বললেন তখন খুবই খুশি হয়েছিলাম আমি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তুমি ছাড়া ওখানে ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। এতে আরও একবার প্রমাণিত হচ্ছে যে আজকের দিনে আবেগের কোন জায়গা নেই – আবেগ মানুষকে বেঁধে রাখে।... সে যাই হোক, আচ্ছা এখন চলি!...'

ওদের বিদায় নেওয়াটা নিস্পৃহ আর সংযত ধরনের হল। কিন্তু বুন্‌চুক ব্যাপারটা যেমন বোঝার ঠিকই বুঝতে পারল: আন্নার ভয় হচ্ছিল পাছে তার মনের জোর ভেঙে পড়ে।

বুন্‌চুক তাকে এগিয়ে দেবার জন্য বেরিয়ে এলো। ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাঁধদুটো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে চলল, একবার ফিরেও তাকাল না। বুন্‌চুকের ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে ডাকে, কিন্তু বিদায় নেওয়ার সময় আন্না যখন আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিল তখনই বুন্‌চুক দেখতে পেয়েছিল তার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে, চোখের কোনায় জল চিকচিক করছে। নিজের ইচ্ছার ওপর জোর খাটিয়ে অনেক কষ্টে খুশির ভান করে সে চেঁচিয়ে বলল, 'আশা করি রস্তোভে দেখা হবে! ভালো থেকো আনিয়া!'

আন্না ফিরে তাকাল, তারপর পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

সে চলে যাবার পর ভীষণ একা-একা লাগতে শুরু করল বুন্‌চুকের। রাস্তা থেকে ঘরে ফিরে এলো সে, কিন্তু পরক্ষণেই দৌড়ে বাইরে চলে গেল, যেন আগুনে পুড়ে গেল সে।... সেখানকার প্রতিটি জিনিসে তখনও তার উপস্থিতির নিঃশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে। ভুলে ফেলে যাওয়া রুমালটা, ফৌজী ব্যাগ, তামার মগ – যা কিছু সে তার হাতে ছুঁয়েছিল, সর্বত্রই লেগে আছে তার গন্ধ।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বুন্‌চুক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। এরকম অস্থিরতা সে এর আগে কখনও উপলব্ধি করে নি, তার মনে হতে লাগল যেন তার কোন একটা অঙ্গ কেটে বাদ চলে গেল, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই সে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না নিজেকে। পথে যেতে যেতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রেড আর্মির অপরিচিত লোকজন আর কসাকদের দিকে তাকাতে লাগল, কাউকে কাউকে চিনল, অনেকেই তাকে চিনতে পারল।

এক জায়গায় একজন কসাক তাকে ধরল। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের সময় একই সঙ্গে তারা দু'জন পল্টনে ছিল। লোকটা তাকে ধরে নিয়ে গেল নিজের বাসায়, তাস খেলায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। পেত্রোভের বাহিনীর কিছু রেড গার্ড আর মোক্রোউসভের পরিচালনায় সদ্য-আগত কিছু জাহাজী টেবিলের ধারে বসে জোর তাস পেটাপেটি করছে। তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে বসে বসে তারা চটাস চটাস শব্দে টেবিলের ওপর তাস ফেলছে, কেরেন্‌স্কির ছাপমারা নোট নিয়ে খস্‌খস্‌ করছে, ভয়ঙ্কর চিৎকার চেঁচামেচি আর খিস্তি খেউড় করে যাচ্ছে। বুন্‌চুক খোলা হাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই সে বেরিয়ে পড়ল।

মনোকষ্ট থেকে উদ্ধারলাভের একটাই সহায় তার ছিল – এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে আক্রমণে যোগ দিতে যেতে হবে।

আঠারো

কালেদিনের মৃত্যুর পর নোভোচের্‌কাস্‌স্ক জেলা দন কসাক সেনাবাহিনীর অভিযানকালীন কসাক সেনাপতি জেনারেল নাজারভের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিল। ২৯শে জানুয়ারী ফৌজী কাউন্সিলে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভায় নাজারভ দন কসাক ফৌজের সহকারী আতামান নির্বাচিত হল। সভায় মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল – তাদের বেশির ভাগই দক্ষিণের ভাটি এলাকার কয়েকটি জেলার প্রতিনিধি। কাউন্সিলের নাম হল ছোট কাউন্সিল। কাউন্সিলের সমর্থন পেয়ে নাজারভ আঠারো বছর থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সব কসাককে লড়াইয়ের জন্য সামিল হওয়ার হুকুম দিল। কিন্তু নানা হুমকি সত্ত্বেও এবং সৈন্যসমাবেশ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো সত্ত্বেও কসাকরা অস্ত্র হাতে নিতে গড়িমসি করতে লাগল।

নোভোচের্‌কাস্‌স্কে যে দিন ছোট কাউন্সিলের কাজ শুরু হয় সেদিন লেফ্‌টে-নাণ্ট-কর্ণেল তাৎসিনের পরিচালনায় জেনারেল ক্রাস্নোশ্চোকভের ৬ নম্বর দন কসাক রেজিমেণ্ট অভিযান করে এগোতে এগোতে রুমানিয়া ফ্রণ্ট থেকে নোভোচের্‌কাস্‌স্কে

এসে উপস্থিত হল। রেজিমেণ্টটি সেই ইয়েকাতেরিনোস্লাভ্ থেকে যুদ্ধ করতে করতে বলশেভিকদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। পিয়াতিখাত্‌কা, মেজেভায়া, মাত্‌ভেয়েভ-কুর্‌গান এবং আরও বহু জায়গায় বেশ যাঁতা খেয়েছে রেজিমেণ্টটা, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় অটুট অবস্থায়, সব অফিসারদের নিয়ে পৌঁছেছে।

রেজিমেণ্টকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা জানানো হল। ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারে ভজনানুষ্ঠানের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অস্ত্র হাতে দন প্রদেশ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসাতে কসাকদের কৃতজ্ঞতা জানাল নাজারভ।

কিছুকাল পরেই সুলিন স্টেশনের কাছাকাছি ফ্রন্টলাইনে রেজিমেণ্টটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার দু'দিন বাদে দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুল নোভোচের্‌কাস্‌স্কে: বলশেভিক প্রচারের প্রভাবে পড়ে রেজিমেণ্ট স্বেচ্ছায় পজিশন ছেড়ে দিয়েছে, ফৌজী সরকারকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়াতে অস্বীকার করেছে।

কাউন্সিলের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। সকলেই বুঝতে পারল বলশেভিকদের সঙ্গে সংগ্রামের পরিণতি আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে। কাউন্সিলের অধিবেশনের সময় নাজারভের মতন একজন উদ্যোগী, অত্যুৎসাহী জেনারেলও টেবিলে কনুই ভর দিয়ে হাত দিয়ে কপাল ঢেকে এমন ভাবে বসে রইল যেন কোন গভীর চিন্তা তাকে পীড়িত করছে।

পচা কাঠের খুঁটির মতো শেষ আশাভরসাও ধসে পড়ল। রেড গার্ডরা নোভোচের্‌কাস্‌স্ক আর রস্তোভের দিকে এগিয়ে আসছে। তিখোরেৎস্কায়ার কাছেই কামানগর্জন শোনা যাচ্ছে। গুজব শোনা গেল যে বলশেভিক কম্যাণ্ডার কর্ণেট আভ্‌তোনোমভ ত্‌সারিৎসিন থেকে রস্তোভের দিকে এগোচ্ছে।

২৩ শে ফেব্রুয়ারী* লেনিন দক্ষিণ ফ্রণ্টকে রস্তোভ দখল করার নির্দেশ দিলেন।

সিভের্সের আক্রমণের চাপে পড়ে এবং পেছন দিক থেকে গ্নিলোভ্‌স্কায়া জেলার কসাকদের গুলিগোলার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে বাইশ তারিখ সকালে ক্যাপ্টেন চের্নোভের বাহিনী রস্তোভে এসে ঢুকল।

সংযোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং রস্তোভে থাকাটা যে নিরাপদ

---

* এখান থেকে অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় সন-তারিখ নূতন রীতি অনুযায়ী। ইতিপূর্বে যে সমস্ত সন-তারিখের উল্লেখ আছে সেগুলো পুরনো ক্যালেণ্ডারমতে। বর্তমানে যে খ্রীষ্টীয় ক্যালেণ্ডার সর্বত্র প্রচলিত তা গ্রিগরিয়ান ক্যালেণ্ডার নামে পরিচিত। কিন্তু রাশিয়ায় বিপ্লবের আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল পুরানো রীতির জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের সন-তারিখ অধুনা প্রচলিত গ্রিগোরিয়ান ক্যালেণ্ডারের ১৩ দিন পশ্চাদ্বর্তী। বিপ্লবের পর, ১৯১৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন রীতির ক্যালেণ্ডার প্রবর্তিত হয়। - অনুঃ

নয় এটা বুঝতে পেরে ওল্‌গিন্‌স্কায়া জেলা-সদরে পিছু হটার নির্দেশ দিল কর্নিলভ। সারা দিন ধরে তেমের্‌নিক জেলায় মজুররা টহলদারী অফিসারদের দল আর স্টেশন লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। সন্ধ্যার আগে আগে কর্নিলভের সৈন্যদের এক ঘন সারি রস্তোভ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দনের বুক জুড়ে একটা মোটা কালো সাপের মতো সারিটা কিলবিল করতে করতে সরসরিয়ে চলল আক্সাইয়ের দিকে। ক্ষয়ে-আসা কোম্পানিগুলো ভিজে আল্‌গা বরফের ওপর দিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝলক দিচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের কলাবিদ্যার ছাত্রদের কোটের হাল্‌কা রঙের বোতাম অথবা বিজ্ঞানের ছাত্রদের গায়ের সবুজেটে কোট।* তবে দলের মধ্যে বেশির ভাগই নিয়মিত সৈন্য আর অফিসারদের গ্রেটকোট চোখে পড়ে। প্লেটুনগুলো পরিচালনা করছে কর্ণেল আর ক্যাপ্টেনরা। সারিতে আছে শিক্ষানবিশ অফিসাররা এবং এন্‌সাইন থেকে শুরু করে কর্ণেল পর্যন্ত নিয়মিত পর্যায়ের নানাস্তরের অন্যান্য অফিসার। মালপত্তর বোঝাই দলবাঁধা অসংখ্য গাড়ির সারির পেছন পেছন চলেছে উদ্বাস্তুর দল – ভদ্র চেহারার প্রৌঢ় লোকজন, গায়ে তাদের শহুরে ওভারকোট, পায়ে গামবুট। মহিলারা গাড়িগুলোর পাশে পাশে খুট্‌খুট্‌ করে হেঁটে আসছে, গভীর বরফের ভেতরে তাদের জুতোর উঁচু হিল আটকে যাওয়াতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে তারা।

কর্নিলভের রেজিমেন্টের একটা কোম্পানিতে আছে মেজর লিস্তনিৎস্কি। তার পাশে পাশে চলেছে বেশ চটপটে চেহারার একজন পদাতিক অফিসার – জুনিয়ার-ক্যাপ্টেন স্তারোবেল্‌স্কি, সুভোরভ গ্রেনাডিয়ার রেজিমেন্টের লেফ্‌টেনাণ্ট বচাগোভ আর একজন মাঝবয়সী ফিল্‌ড-কম্যাণ্ডার – লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল লোভিচেভ ; লোকটার দাঁত নেই, মাথার কটা চুলে পাক ধরেছে, দেখতে ঠিক যেন একটা বুড়ো শেয়াল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। হিম পড়ছে। দনের মুখ থেকে ভিজে-ভিজে নোনা হাওয়া ভেসে আসছে। লিস্তনিৎস্কি তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঠিক ঠিক পা ফেলে চূর্ণ বরফের স্তূপ ভেঙে চলেছে, কেউ তার কোম্পানিকে পাশে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে দেখলেই তার মুখ নিরীক্ষণ করছে। রাস্তার পাশ দিয়ে চলে গেল রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন নেজেন্‌ৎসেভ আর প্রেওব্রাজেন্‌স্কি গার্ড-রেজিমেন্টের এককালের কম্যাণ্ডার কর্ণেল কুতেপভ। কুতেপভের গ্রেটকোটের বোতামগুলো খোলা, টুপিটা মাথার উঁচু পেছন দিকটাতে ঠেলে দেওয়া।

'কম্যাণ্ডার!' কায়দা করে রাইফেলটা হাত বদল করতে করতে নেজেন্‌ৎসেভকে ডাকল লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল লোভিচেভ।

---

* এগুলো ছিল তাদের ইউনিফর্মের অঙ্গ। – অনুঃ

কুতেপভ ফিরে তাকাল। চওড়া কপাল, ষাঁড়ের মতো বিরাট মুখ, দু'চোখের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান, মুখে সুন্দর করে ছাঁটা ইয়া চাপ দাড়ি। লোভিচেভের ডাক শুনে তার কাঁধের পেছন থেকে উঁকি মারল নেজেন্‌ৎসেভ।

'এক নম্বর কোম্পানিকে আরও জোরে জোরে পা কদম ফেলার হুকুম দিন! এ ভাবে চললে আমরা ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব! আমাদের পা বরফগলা জলে ভিজে গেছে। তাছাড়া মার্চের সময় এমন কদমে চলা . . .'

'যাচ্ছেতাই কাণ্ড!' হৈ হট্টগোলে ওস্তাদ, গলাবাজ স্তারোবেল্‌স্কি গমগম করে বলল।

নেজেন্‌ৎসেভ কোন উত্তর না দিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। কুতেপভের সঙ্গে কী নিয়ে যেন তার তর্ক চলছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের ছাড়িয়ে চলে গেল জেনারেল আলেক্সেয়েভের গাড়িটা। দানাপানি খাওয়া কালো কুচকুচে ঘোড়াদুটোকে গাড়োয়ান জোর হাঁকাচ্ছে, তাদের খুর থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ছে চাপ চাপ বরফ। বাতাসে আলেক্সেয়েভের গালদুটো লাল হয়ে উঠেছে, তার সাদা গোঁফজোড়া মুচড়ে ওপরে তোলা, সেই রকমই সাদা রঙের খাড়া খাড়া তার দুই ভুরু, টুপিটা একেবারে কান অবধি টেনে নামানো; একপাশে কাত হয়ে গাড়ির পিঠে হেলান দিয়ে সে বসে আছে, ঠাণ্ডায় গুটিসুটি মেরে বাঁ হাতে কলারটা তুলে ধরে আছে। পরিচিত মুখটাকে দেখতে পেয়ে অফিসাররা সকলে বিগলিত হয়ে হাসল।

অসংখ্য লোকের পায়ে মাড়ানো রাস্তার এখানে ওখানে হলদে ঘোলা জলের গর্ত দেখা দিয়েছে। পথ চলা কষ্টকর – পা পিছলে যায়, বুটের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ে। লিস্ত্‌নিৎস্কি চলতে চলতে সামনের অফিসারদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। একজনের গায়ে পশুলোমের কোর্তা, মাথায় ভেড়ার লোমের সাধারণ কসাক টুপি, গলার স্বর গুরুগম্ভীর। সে বলছিল:

'আপনি দেখলেন লেফ্‌টেনাণ্ট? স্টেট দুমার প্রেসিডেণ্ট রদ্‌জিয়ান্‌কো বৃদ্ধ মানুষ – উনি চলেছেন পায়ে হেঁটে।'

'রাশিয়া রসাতলে যেতে বসেছে! . . .'

কে একজন ঘড় ঘড় করে কেশে গয়ার মাটিতে ফেলে গলা সাফ করে একটা রসিকতা করার চেষ্টা করল।

'রসাতলই বটে, এক শুধু তফাত এই যে পাথুরে রাস্তার বদলে এখানে বরফ, তাও আবার গলা বরফ, তার সঙ্গে হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা।'

'রাতের আস্তানা কোথায় ঠিক করা হয়েছে আপনারা জানেন কি মশাই?'

'ইয়েকাতেরিনোদারে।'

'প্রাশিয়ায় এরকম একটা মার্চ একবার আমাদের করতে হয়েছিল। . . .'

'কুবান আমাদের কী ভাবে নেবে কে জানে? . . . কী বলছেন? . . . হ্যাঁ, সে ত বটেই, সেখানে ব্যাপার-স্যাপার অন্য রকম।'

'সিগারেট হবে নাকি আপনার কাছে?' লেফ্‌টেনাণ্ট গোলোভাচিওভ জিজ্ঞেস করল লিস্তনিৎস্কিকে।

হাতের মোটা দস্তানাটা খুলে লিস্তনিৎস্কির দেওয়া সিগারেটটা নিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল সে, তারপর নাকের শিকনি ঝেড়ে সাধারণ সেপাইদের মতো গ্রেটকোটের গায়ে আঙুল মুছল।

'আপনি দেখছি গণতান্ত্রিক অভ্যেস রপ্ত করছেন, লেফ্‌টেনাণ্ট। . . .' মুচকি হেসে বলল লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল লোভিচেভ।

'ইচ্ছে না থাকলেও রপ্ত করতে হয়। আপনি হলে . . . নাকি আপনি ডজনখানেক রুমাল বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

লোভিচেভ কোন উত্তর দিল না। তার লালচে-সাদা গোঁফ থেকে ছোট ছোট বরফের কাঠি হয়ে সবজেটে শিকনি ঝুলছে। থেকে থেকে সে নাক টানছে, গায়ের গ্রেটকোট ফুঁড়ে কনকনে ঠাণ্ডা ঢুকছে, তাইতে ভুরুদুটো কোঁচকাচ্ছে।

ভাঙাচোরা সারিগুলোর মাথা আর আঁকাবাঁকা গতিতে পথের ওপর তাদের চলতে দেখে ভয়ানক করুণায় ভরে উঠল লিস্তনিৎস্কির মনটা। মনে মনে ভাবল, 'রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তান এরা!'

কয়েকজন ঘোড়সওয়ার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তাদের মধ্যে দন-প্রদেশের একটা উঁচু ঘোড়ায় চড়ে কর্নিলভও আছে। পশুলোমের হাল্‌কা সবুজ খাটো কোর্তা তার গায়ে, দু'পাশে তেরছা করে কাটা পকেট, মাথায় ভেড়ার লোমের সাদা লম্বা টুপি – অনেকক্ষণ ধরে তার এই মূর্তিটা সারিগুলোর মাথার ওপর নেচে বেড়াতে লাগল। অফিসারদের ব্যাটেলিয়নগুলো অনেকক্ষণ ধরে তার পেছন পেছন সগর্জনে জয়ধ্বনি করল।

'এর কোনটাই হয়ত কিছু নয়, কিন্তু আমার পরিবার . . .' বুড়োদের মতো কাতরস্বরে লোভিচেভ বলল। যেন সহানুভূতির খোঁজেই একবার আড়চোখে তাকাল লিস্তনিৎস্কির দিকে। 'আমার পরিবারের লোকজন রয়ে গেছে স্মলেন্‌স্কে . . .' সে বলে চলল, 'বৌ আর মেয়ে – মেয়েটা বাচ্চাই বলতে হয়। এই বড়দিনে সতেরো বছরে পড়ল। . . . কী রকম লাগে বলুন দেখি মেজর?'

'সে ত বটেই। . . . বটেই ত। . . .'

'আপনারও কি পরিবার আছে? আপনি কি নোভোচের্‌কাস্‌স্কের লোক?'

'না, আমি দনেৎস্ক মহকুমার লোক। বাড়িতে আমার বাবা আছেন।'

'জানি না, ওদের কী অবস্থা। . . . আমাকে ছাড়া ওরা ওখানে কী ভাবে

কাটাচ্ছে?' লোভিচেভ বলে চলল।

বিরক্ত হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল স্তারোবেল্‌স্কি।

'আমরা সকলেই পরিবারের লোকজনকে ফেলে এসেছি। আমি বুঝতে পারছি না আপনি অমন কাঁদুনি গাইছেন কেন সাব-কর্ণেল। কিছু কিছু লোক বড় অদ্ভুত! রস্তোভ ছেড়ে আসতে না আসতেই . . . যত্ত সব! . . .'

'স্তারোবেল্‌স্কি! পিওত্‌র পেত্রোভিচ! তাগান্‌রোগের লড়াইয়ে আপনি ছিলেন?' একটা সারি পরে পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

স্তারোবেল্‌স্কি ঘুরে দাঁড়াল, তার চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, থমথমে মুখের ওপর দেখা দিল হাসির ক্ষীণ রেখা।

'ও, ভ্‌লাদিমির গেওর্গিয়েভিচ যে! আমাদের প্লেটুনে কী ভাবে এলেন? বদল হয়ে এসেছেন? কার সঙ্গে আবার বনিবনা হল না? আচ্ছা আচ্ছা . . . হুঁ, সে ত বুঝতেই পারছি। আপনি তাগান্‌রোগের কথা জিজ্ঞেস করলেন না? . . . হ্যাঁ ছিলাম আমি তাগান্‌রোগের লড়াইয়ে . . . কিন্তু কেন? একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? খবরটা ঠিকই – ওই লড়াইয়ে মারা গেছে।'

অন্যমনস্ক ভাবে কথাবার্তা শুনতে শুনতে ইয়াগদ্‌নোয়ে থেকে তার যাত্রার মুহূর্তটি, তার বাবা আর আক্সিনিয়ার কথা লিস্তনিৎস্কির মনে পড়ল। হঠাৎ এক আর্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে যেন তার দম বন্ধ হয়ে এলো। চোখের সামনে পা ফেলার তালে তালে বেয়নেট লাগানো সারি সারি রাইফেল, টুপি আর মাথার ঢাকনাগুলো হেলছে দুলছে। সেদিকে তাকাতে তাকাতে সে ভাবল, 'এই যে পাঁচ হাজার মানুষকে একঘরে ক'রে দেওয়া হয়েছে আমারই মতন তাদের প্রত্যেকের মনের ভেতরে জমে আছে অপরিসীম ক্রোধ আর ঘৃণার বারুদ। শালা শুয়োরের বাচ্চারা রাশিয়ার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আমাদের, ভাবছে এখানে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলবে! আচ্ছা, দেখা যাবে! . . . কর্নিলভ আমাদের ঠিক মস্কোয় নিয়ে যাবেন!'

সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল কর্নিলভের মস্কো আগমনের ঘটনাটা। সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার স্মৃতিচারণে নিজেকে সঁপে দিয়ে পরম সুখ উপভোগ করতে লাগল।

অদূরেই, পেছনে কোথাও, সম্ভবত কোম্পানির শেষ প্রান্তে একটা তোপশ্রেণী চলেছে। ঘোড়াগুলো নাক ঝাড়া দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে, ঝনঝন ঠনঠন শব্দ উঠছে কামানের গাড়ির চাকার, এমনকি ঘোড়ার ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে। সেই পরিচিত উত্তেজনাকর গন্ধ নাকে আসার সঙ্গে সঙ্গে লিস্তনিৎস্কি চঞ্চল হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল। সামনের দলের তোপের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক অল্পবয়স্ক এন্‌সাইন। লিস্তনিৎস্কিকে দেখে পরিচিতের ভঙ্গিতে হাসল সে।

* * *

এগারোই মার্চের মধ্যে ওল্‌গিন্‌স্কায়া জেলার এলাকায় স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত হল। দন কসাক ফৌজের সামরিক অভিযানের আতামান জেনারেল পপোভের আগমন প্রতীক্ষায় কর্নিলভ নড়াচড়া করা মুলতবী রাখল। প্রায় ১৬০০টি তলোয়ারসুদ্ধ সৈন্যদের একটি দল, সেই সঙ্গে ৫টি কামান আর ৪০টি মেশিনগান নিয়ে পপোভ নোভোচের্‌কাস্‌স্ক থেকে দনের ওপারের স্তেপ অঞ্চলে চলে এসেছে।

১৩ তারিখ সকালে পপোভ তার সদর দপ্তরের প্রধান কর্ণেল সিদোরিন আর জনা কয়েক কসাক পাহারাদারের একটা দল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ওল্‌গিন্‌স্কায়ায় এসে পৌঁছুল।

কর্নিলভ যে বাড়িতে এসে উঠেছিল, তার কাছাকাছি পল্টন ময়দানে এসে পপোভ রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। জিনের কাঠামো ধরে কষ্টেসৃষ্টে জিনের ওপর দিয়ে পা'টা ওঠাল সে। সঙ্গের বার্তাবহ আর্দালিটি এক তরুণ কসাক। কালো চুলের ঝুঁটি, রোদে পোড়া তামাটে মুখ, পুঁতির মতো চোখদুটো - তীক্ষ্ণ, সজাগ। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এলো সে। ঘোড়ার লাগাম তার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে পপোভ মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে পা ফেলে বাড়ির ধাপের দিকে এগোল। সিদোরিন আর অন্যান্য অফিসাররা ঘোড়া থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করল। আর্দালিরা গেটের ভেতর দিয়ে ঘোড়াগুলোকে বাড়ির আঙিনায় নিয়ে এলো। আর্দালিদের মধ্যে যে লোকটা মাঝবয়সী তার একটু পায়ের দোষ আছে। সে-ই ঘোড়াগুলোর মুখে খাবারের থলি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে লাগল। অন্যজন কালো ঝুঁটিওয়ালা সেই যে কসাকটা, যার পুঁতির মতো চোখ - এই ফাঁকে বাড়ির চাকরানীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। মেয়েটার বয়স অল্প, দুই গালে গোলাপী আভা, মাথায় রুমালটা বেঁধেছে রঙ্গ করে, খালি পায়ের ওপর হাঁটু পর্যন্ত গামবুট পরেছে। আর্দালি তাকে লক্ষ্য করে কিছু একটা রসিকতা করতে উঠোনে জমে থাকা জলকাদা ছিটিয়ে হড়কাতে হড়কাতে তার পাশ দিয়ে সে ছুটে চালাঘরের ভেতরে চলে গেল।

গুরুগম্ভীর চেহারার প্রৌঢ় জেনারেল পপোভ বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল। সামনের ঘরে ঢুকতে একজন আর্দালি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে আসতে গ্রেটকোটটা খুলে তার হাতে দিল, ঝোলানোর জায়গায় হাতের চাবুকটা ঝোলাল, তারপর অনেকক্ষণ ধরে জোরে জোরে শব্দ করে রুমালে নাক ঝাড়ল। আর্দালি তাকে আর সিদোরিনকে হল্‌-ঘরে নিয়ে এলো। সিদোরিন চলতে চলতে হাত দিয়ে মাথার চুল পাট করে নিল।

আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত জেনারেলেরা সকলে সমবেত হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা ম্যাপ ছড়ানো, তার ওপর কনুইদুটো রেখে টেবিলের ধারে বসে আছে কর্নিলভ। কর্নিলভের ডান পাশে শুকনো চেহারার, ঋজুদেহ আলেক্সেয়েভ। তার মাথার চুলগুলো সাদা ধবধবে, দাড়ি সদ্য কামানো। দেনিকিনের চতুর তীক্ষ্ণ চোখ ঝলক দিচ্ছে। রমানোভ্স্কিকে কী যেন বলছে সে। লুকোম্স্কি চিম্‌টি দিয়ে দাড়ি টানতে টানতে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। দেনিকিনের সঙ্গে তার চেহারার খানিকটা মিল আছে। মার্কভ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে উঠোনে কসাক আর্দালিরা ঘোড়াগুলোর যত্ন আত্তি করছে আর চাকরানী ছুঁড়িটার সঙ্গে রগড় করছে।

নবাগত দু'জন সকলকে অভিবাদন জানিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। পথযাত্রা আর নোভোচের্কাস্স্ক থেকে অপসারণ সম্পর্কে আলেক্সেয়েভ গোটা কয়েক মামুলী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল তাদের। এবারে এসে ঢুকল কুতেপভ। তার সঙ্গে আছে যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কয়েকজন লাইন-অফিসার। কর্নিলভ তাদেরও ডেকেছে আলোচনার জন্য।

শান্তশিষ্ট ভাবে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পপোভ আসন গ্রহণ করলে কর্নিলভ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'বলুন দেখি জেনারেল, আপনার দলের সংখ্যা কত?'

'দেড় হাজার তলোয়ারধারী, একটা ব্যাটারি আর চল্লিশটা মেশিনগান আর তার আনুষঙ্গিক লোকজন।'

'ভলান্টিয়ার আর্মি যে কী পরিস্থিতিতে রস্তোভ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তা আপনার জানা আছে। গতকাল আমরা একটা আলোচনা সভা ডেকেছিলাম। সেই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ইয়েকাতেরিনোদার লক্ষ্য করে আমরা কুবানের দিকে যাব। ইয়েকাতেরিনোদারের আশেপাশে ভলান্টিয়ার দলগুলো ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে। আমরা যাব এই রাস্তা ধরে...' পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা ম্যাপের ওপর চালিয়ে কর্নিলভ তড়বড় করে বলতে লাগল, 'পথে যেতে যেতে আমরা কুবানের কসাকদের দলে টেনে নেব। রেড গার্ডদের দলগুলো আমাদের এগোনোর পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে; কিন্তু তারা ভালোমতো সংগঠিত নয়, যুদ্ধের ক্ষমতাও তাদের তেমন নেই। ওদের এরকম ছোটখাটো দু'চারটে দলকে আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব।' পপোভ চোখ কুঁচকে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তার মুখের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে কর্নিলভ শেষ করল, 'আমরা প্রস্তাব করছি আপনি আপনার দল নিয়ে ভলান্টিয়ার

আর্মিতে যোগ দিয়ে আমাদের সঙ্গে ইয়েকাতেরিনোদারে চলুন। শক্তি ভাগ করে আমাদের কোন স্বার্থ সিদ্ধি হবে না।'

'এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!' পপোভ দৃঢ় কণ্ঠে মুখের ওপর জানিয়ে দিল।

আলেক্সেয়েভ তার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'কেন সম্ভর নয়, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'কারণ এই যে দন-প্রদেশের এলাকা ছেড়ে সেই কোন্ কুবানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তর দিক থেকে দনের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ঘটনা কোন্ দিকে গড়ায় দেখার জন্য রস্তোভের গঞ্জ এলাকায় আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারি। শত্রুপক্ষের কর্মতৎপরতার ওপর ভরসা করার কোন কারণ দেখি না, কেননা যে-কোন দিন বরফগলা শুরু হয়ে যেতে পারে, তখন শুধু কামান কেন ঘোড়সওয়ার দলকেও দন পেরিয়ে পাঠানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। অথচ রস্তোভের এই গঞ্জ এলাকায় প্রচুর দানাপানি আর ফসল মজুত থাকায় এখান থেকে আমরা যে কোন সময় যে কোন দিকে গেরিলা আক্রমণ জোরদার করে তুলতে পারি।'

কর্নিলভের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে পপোভ বেশ গুরুত্ব দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল। দম নেবার জন্য সে একটু থামল, সেই ফাঁকে কর্নিলভ কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে নিজের জিদ বজায় রেখে প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে সে বলল, 'আমাকে শেষ করতে দিন। . . . এছাড়া আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, যা আমরা যারা নেতৃত্বে আছি তাদের সকলের জানা উচিত। তা হল কসাকদের মতিগতি।' তর্জনীর নরম মাংসের গায়ে কেটে বসা সোনার আঙটি সমেত মাংসল হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে উপস্থিত সকলের মুখের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে সামান্য গলা চড়িয়ে সে বলে চলল, 'এই অবস্থায় আমরা যদি কুবানের দিকে হটে যাই তাহলে দল ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে। কসাকরা আমাদের সঙ্গে নাও যেতে পারে। ভুলে গেলে চলবে না যে আমার দলের স্থায়ী এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মূল অংশটিই কসাকদের নিয়ে তৈরি, অথচ তাদের মনোবল আদৌ তেমন দৃঢ় নয় . . . আপনার ইউনিটগুলোর মতোও নয়। আসলে তারা একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন। তারা একবার বেঁকে বসলে আর করার কিছু থাকবে না। আমার সমস্ত দলটা হারানোর ঝুঁকি আমি নিতে পারি না,' স্পষ্টভাষায় তার বক্তব্য বলে আবার কর্নিলভকে বাধা দিয়ে পপোভ বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানালাম, আর একথাও স্পষ্ট করে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এ সিদ্ধান্ত পালটানোর কোন উপায় আমাদের নেই। বলাই বাহুল্য, শক্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করা আমাদের স্বার্থের

পরিপন্থী, কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে তা থেকে বাঁচার একটি মাত্র রাস্তাই আছে। আমার মনে হয়, আমি এখন যে উপায় বাতলালাম তার ভিত্তিতে, কুবানে সরে না গিয়ে দন-ফৌজের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে দনের ওপারে স্তেপ অঞ্চলে যাওয়াটাই স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর পক্ষে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে – বর্তমানে কুবান কসাকদের যা মতিগতি তাতে আমি বিশেষ চিন্তিত। দনের ওপারে স্তেপ অঞ্চলে যেতে পারলে বাহিনী দম ফেলার সময় পেয়ে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে, তারপর বসন্তের দিকে রাশিয়া থেকে পাঠানো নতুন নতুন ভলন্টিয়ার দিয়ে দল ভারী করে তোলা যাবে। . . .'

যদিও মাত্র গতকালই কর্নিলভ দনের ওপারের স্তেপে যাওয়ার অনুকূলে ছিল এবং আলেক্সেয়েভ তার বিপরীত মত প্রকাশ করলে প্রবল আপত্তি তুলেছিল, তবু আজ সে বলে উঠল, 'না! গঞ্জ এলাকায় যাবার কোন অর্থ হয় না। আমরা সংখ্যায় হাজার ছয়েক। . . .'

'আর খাবারদাবারের কথা যদি বলেন, তাহলে মহামান্য, নিশ্চিত থাকতে পারেন যে গঞ্জ এলাকার চেয়ে ভালো জায়গা আর হতেই পারে না। তাছাড়া ওখানে ভালো জাতের ঘোড়ার লালনপালন আর বংশবৃদ্ধির অনেক প্রাইভেট ফার্ম আছে, তাদের কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে আপনাদের সৈন্যদলের একটা অংশকে ঘোড়সওয়ার বাহিনী করে তোলা যেতে পারে। খোলা মাঠের লড়াইয়ে নতুন কৌশল চালানোর সুযোগ পাবেন আপনি। ঘোড়সওয়ার সৈন্য থাকা আপনার একান্ত দরকার, আপনার ভলন্টিয়ার আর্মি সেদিক থেকে খুব একটা সম্পন্ন নয়।'

আজ আলেক্সেয়েভের মতের প্রতি বড় বেশি সশ্রদ্ধ হয়ে কর্নিলভ তার দিকে তাকাল। কোন্ পথে যাবে সে ব্যাপারে সম্ভবত দ্বিধা থাকায় আরেকজনের জ্ঞানবুদ্ধির মুখাপেক্ষী হয়ে তার কাছ থেকে সমর্থন চাইল সে। আলেক্সেয়েভের কথা সকলে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল। অল্প সময়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা ছিল এই বৃদ্ধ জেনারেলের। সংক্ষিপ্ত গুটিকয়েক কথার মধ্যে সে ইয়েকাতেরিনোদারে যাওয়ার পক্ষে কারণ ব্যাখ্যা করল।

'এই পথে এগোলে বলশেভিকদের ব্যূহ ভেদ করে, ইয়েকাতেরিনোদারের কাছে যে দলটা অপারেশন চালাচ্ছে তার সঙ্গে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে বেশি সহজ হবে,' এই বলে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

'কিন্তু যদি আমরা সেখানে ব্যর্থ হই, তাহলে কী হবে মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ?' লুকোম্স্কি সাবধানে জিজ্ঞেস করল।

আলেক্সেয়েভ ঠোঁট কামড়াল, ম্যাপের ওপর হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'আমরা

যদি ব্যর্থও হই, সেক্ষেত্রে ককেশাসের পাহাড়ে সরে গিয়ে আমাদের সৈন্যদলকে ভেঙে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ থাকবে।'

রমানোভ্স্কি তাকে সমর্থন জানাল। মার্কভ কিছু জ্বালাময়ী কথা যোগ করল। সব শুনে মনে হল আলেক্সেয়েভের ওজনদার যুক্তির বিপক্ষে বুঝি বা আর কোন যুক্তিই খাটে না। কিন্তু কথা বলতে উঠল লুকোম্স্কি, এবারে পাল্লার ভার অন্য দিকে ঝুঁকল।

'আমি জেনারেল পপোভের প্রস্তাব সমর্থন করছি,' ধীরেসুস্থে সযত্নে বেছে বেছে শব্দ উচ্চারণ করে সে জানাল। 'কুবানের দিকে অভিযান চালাতে গেলে যে সমস্ত বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলো এখান থেকে ঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের দুটো রেলপথ পার হতে হবে।...'

এই বলে ম্যাপের ওপর যেখানটা সে তার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। লুকোম্স্কি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল, 'বলশেভিকরা আমাদের যোগ্য সমাদর জানানোর সুযোগ হাতছাড়া করবে না। তারা সাঁজোয়া ট্রেন নিয়ে এগিয়ে আসবে। আমাদের থাকার মধ্যে আছে ভারী মালপত্র বোঝাই সরবরাহ গাড়ি আর একগাদা আহত লোকজন – তাদের আমরা ফেলে রেখে যেতে পারি না। এ সবই আর্মির বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, ফলে তার পক্ষে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার বাধা হবে। তাছাড়া কুবানের কসাকরা আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এরকম দৃঢ় বিশ্বাস কী করে সৃষ্টি হল এ আমার কাছে বোধগম্য নয়। শোনা গিয়েছিল যে দন কসাকরাও নাকি বলশেভিকদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এখন তাদেরই দৃষ্টান্ত থেকে আমার মনে হয় এই সব গুজবকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত, বিপুল মাত্রায় সুস্থ সন্দেহবাদী মনোভাব নিয়ে এগুলো বিচার করে দেখা উচিত। আগেকার রুশ ফৌজের ছড়ানো সেই একই চোখের রোগে কুবানের কসাকরাও ভুগছে।... আমাদের সম্পর্কে ওরা শত্রুভাবাপন্ন হবে না সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সর্বশেষে আবারও এই কথা বলতে চাই – আমার মত হল পুবে স্তেপের দিকে যাওয়া, সেখানে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে আমরা বলশেভিকদের বিপদের কারণ হতে পারি।'

অধিকাংশ জেনারেলের সমর্থনক্রমে শেষ কালে কর্নিলভ সিদ্ধান্ত নিল ভেলিকোকনিয়াজেস্কায়ার খানিকটা পশ্চিমের দিকে যেতে যেতে পথেই ঘোড়া যোগাড় করে নিয়ে যুদ্ধের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিটটাকে ভারী করবে, তারপর কুবানের দিকে ঘুরবে। আলোচনা সভা ভেঙে দিল কর্নিলভ। পপোভের

সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলে উদাসীন ভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। তার পেছন পেছন চলল আলেক্সেয়েভ।

দন বাহিনীর সদর দপ্তরের প্রধান সিদোরিন পায়ের জুতোর ঘোড়া দাবড়ানোর কাঁটায় ঝনঝন আওয়াজ তুলে দেউড়ির ধাপে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে গাঢ় স্বরে সহর্ষে আর্দালিদের চেঁচিয়ে ডেকে ঘোড়া দিতে বলল।

হাল্‌কা লাল রঙের গোঁফওয়ালা এক তরুণ কসাক লেফ্‌টেনান্ট হাত ঠেকিয়ে কোমরের তলোয়ার সামলাতে সামলাতে উঠোনের জলকাদা ডিঙিয়ে দেউড়ির কাছে এগিয়ে এলো। নীচের ধাপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কী ঠিক হল কর্ণেল?'

'মন্দ নয়!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে চাপা গলায় সিদোরিণ উত্তর দিল। 'আমাদের মহামান্য কুবানে যেতে অস্বীকার করেছে। এখুনি আমরা বেরিয়ে পড়ছি। আপনি তৈরি, ইজ্‌ভারিন?'

'হ্যাঁ, ওরা ঘোড়া নিয়ে আসছে।'

আর্দালিরা নিজেদের ঘোড়ায় উঠে বসে ঘোড়াদুটোকে নিয়ে আসছে। কালো ঝুঁটিওয়ালা, পুঁতির মতো গোল গোল চোখ আর্দালিটি তার সঙ্গীর দিকে আড় চোখে তাকাল।

'মালটা কী রকম? খাসা, তাই না?' মুখ টিপে হেসে সে জিজ্ঞেস করল।

মাঝবয়সী লোকটা তার উত্তরে কাষ্ঠহাসি হাসল।

'ঘোড়ার দাদের মতো চুলকুলুনিই সার।'

'আচ্ছা সুযোগ পেলে যদি ডাকত?'

'থাম দেখি আহাম্মক! এখন সংযমব্রত পালনের সময়। লেণ্ট পরব চলছে না?'

গ্রিগোরি মেলেখভের সঙ্গে ফৌজে একসঙ্গে যে কাজ করত সেই ইজ্‌ভারিন লাফিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়াটার সারা কপাল জুড়ে টাক, বিশাল পশ্চাদ্দেশ ঝুলে পড়েছে, নাকটা সাদা। ঘোড়ার পিঠে বসেই আর্দালিদু'জনকে হুকুম দিল, 'রাস্তায় বেরিয়ে পড়!'

পপোভ আর সিদোরিন জেনারেলদের মধ্যে কার একজনের কাছ থেকে যেন বিদায় নিয়ে দেউড়ির ধাপ বয়ে নীচে নামল। আর্দালিদের একজন ঘোড়াটাকে ধরে জেনারেলের পা রেকাবে ঢোকাতে সাহায্য করল। কদাকার কসাক চাবুকটা দুলিয়ে পপোভ দুলকি চালে ঘোড়া চালিয়ে দিল, রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বার্তাবহ আর্দালি দু'জন, সিদোরিন আর অন্যান্য অফিসাররাও তার পেছন পেছন ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

দু'দিন মার্চ করে চলার পর স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী যখন মেচেতিনস্কায়া জেলা

সদরে এসে উপস্থিত হল তখন গঞ্জ এলাকা সম্পর্কে কর্নিলভ বাড়তি কিছু সংবাদ পেল। সে সংবাদ ভরসা জাগানোর মতো নয়। যুদ্ধরত ইউনিটগুলোর নেতাদের সকলকে ডেকে কর্নিলভ কুবানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।

স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য আরও একবার প্রস্তাব দিয়ে বার্তাবহ পাঠানো হল পপোভের কাছে। বার্তাবহ অফিসার বার্তাটি যথাস্থানে সমর্পণ করার পর স্তারো-ইভানোভ্স্কয়েতে এসে তাদের সৈন্যবাহিনীর নাগাল ধরল। পপোভের উত্তর সেই একই - ভদ্র ভাবে, পরম ঔদাস্যভরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, লিখে পাঠিয়েছে যে তার সিদ্ধান্তের কোন বদল হওয়া সম্ভব নয়, আপাতত সে সাল্স্ক মহকুমার এলাকায় থেকে যাচ্ছে।

উনিশ

গোলুবোভের দলটা যখন চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে নোভোচের্কাস্স্ক দখল করার জন্য এগোচ্ছিল তখন বুনচুকও ছিল তাদের সঙ্গে। তেইশে ফেব্রুয়ারী তারা শাখ্‌তনায়া ছাড়ল, রাজ্‌দোর্স্কায়া জেলা সদরও পার হয়ে গেল, আর রাত নাগাদ পৌঁছাল মেলিখোভ্স্কায়া। পরের দিন ভোর হতে না হতেই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

গোলুবোভ দ্রুত মার্চ করে বাহিনী চালিয়ে নিয়ে চলল। সারির মাথায় চোখে পড়ছে তার গাঁট্টাগোঁট্টা মূর্তিটা, অধৈর্য হয়ে চাবুক মারছে ঘোড়ার পাছায়। সে রাত্রে তারা বেস্‌সেরগেনেভ্স্কায়া পার হল, ঘোড়াগুলোকে সামান্য জিরানোর অবকাশ দিয়েই আবার নক্ষত্রবিহীন রাতের ধূসর অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়সওয়ারদের মূর্তিগুলো ঝাপসা নড়তে চড়তে শুরু করে দিল, ঘোড়ার খুরের তলায় পাকা রাস্তার কঠিন জমাট বরফ মচমচিয়ে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল।

ক্রিভিয়ান্স্কায়ার কাছাকাছি এসে তারা পথ গুলিয়ে ফেলল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সঠিক রাস্তায় এসে পড়ল। ক্রিভিয়ান্স্কায়ায় যখন তারা এসে ঢুকল তখন সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। জায়গাটা তখনও জনশূন্য। বারোয়ারিতলায় কুয়োর কাছে একজন বুড়ো কসাক একটা কাঠের ডাবার মধ্যে বরফ ভাঙছিল। গোলুবোভ তার দিকে এগিয়ে গেল। তাদের দলটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'নমস্কার বুড়ো কত্তা।'

বুড়ো তার দস্তানা পরা হাতটা ধীরে ধীরে উঠিয়ে মাথার লম্বা পশমী টুপিতে ঠেকাল, বিরূপ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'নমস্কার।'

'আপনাদের এই জেলার কসাকরা কি নোভোচের্কাস্স্ক চলে গেছে দাদু? আপনি বলতে পারেন? ফৌজে লোকজন জড় করে নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছে এখান থেকে?'

বুড়ো কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি করে কুড়ুলটা তুলে নিয়ে বাড়ির গেটের ভেতরে ঢুকে গেল।

'আগে চল!' গোলুবোভ চিৎকার করে উঠে খিস্তি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ওইদিন ছোট ফৌজী কাউন্সিল নোভোচের্কাস্স্ক ছেড়ে কন্স্তান্তিনোভ্স্কায়া যাবার তোড়জোড় করতে লাগল। দন ফৌজের সামরিক অভিযানের নতুন আতামান এখন জেনারেল পপোভ। ইতিমধ্যেই সে নোভোরেচ্কাস্স্ক থেকে সশস্ত্র বাহিনী সরিয়ে নিয়েছিল, ফৌজের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রীও উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে গোলুবোভ মেলিখোভ্স্কায়া থেকে বেস্সেরগেনেভ্-স্কায়ার দিকে এগিয়ে আসছে। নোভোচের্কাস্স্ক সমর্পণের শর্তাদি নিয়ে গোলুবোভের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য কাউন্সিল মেজর সিভোলোবভকে পাঠাল। কিন্তু এরই পর পর গোলুবোভের ঘোড়সওয়াররা কোন বাধা না পেয়ে হুড়মুড় করে নোভোচের্কাস্স্কে ঢুকে পড়ল। গোলুবোভ নিজে ঘেমে নেয়ে ওঠা ঘোড়াটাকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটিয়ে দিয়ে এক দঙ্গল কসাক পরিবৃত হয়ে কাউন্সিলের বাড়ির দিকে চলল। গেটের সামনে একদল লোক হাঁ করে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জেনারেল নাজারভের জিন চাপানো ঘোড়াটা নিয়ে একজন আর্দালি অপেক্ষা করছিল।

বুনচুক লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, তার হাত-মেশিনগানটা চেপে ধরল। গোলুবোভ আর বাকি কসাকদের বিরাট দলটা নিয়ে সে ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। প্রশস্ত হল্-ঘরের দরজা দড়াম্ করে খুলে যেতে প্রতিনিধিরা ঘাড় ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখগুলো সব সাদা ফেকাসে হয়ে গেল।

'উঠে দাঁড়াও!' উত্তেজিত হয়ে গোলুবোভ এমন ভাবে হাঁক দিল যেন কুচকাওয়াজের মাঠে হুকুম দিচ্ছে। চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা কসাকদের দলটাকে নিয়েই তাড়াহুড়োয় হোঁচট খেতে খেতে সে এগিয়ে গেল সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের দিকে।

কাউন্সিলের সদস্যরা তার ওই রাশভারী কণ্ঠের চিৎকার শুনে সশব্দে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। শুধু বসে রইল নাজারভ।

'আপনার এতদূর আস্পর্ধা যে ফৌজী পরিষদের অধিবেশনে বাধা দিতে এসেছেন!' ক্রোধে বেজে উঠল তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল! চোপ!' গোলুবোভ চটে লাল হয়ে উঠল, নাজারভের কাছে দৌড়ে গিয়ে তার উর্দি থেকে জেনারেলের কাঁধপট্টিটা পটপট করে ছিঁড়ে তুলে ফেলল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়াও বলছি, উঠে দাঁড়াও! নিয়ে যাও একে। . . . হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে! . . . কাকে বললাম, শুনতে পাচ্ছ না? হুঁঃ, সোনার তকমা পরার বড় শখ, না! . . .'

বুনচুক যতক্ষণ দরজার সামনে মেশিনগান বসাতে লাগল সেই সময় কাউন্সিলের সদস্যরা ভেড়ার পালের মতো ভিড় করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। বুনচুকের পাশ দিয়ে নাজারভ, কাউন্সিলের সভাপতি ভলোশিনভ এবং আরও কয়েক জনকে কসাকরা টানতে টানতে নিয়ে গেল। আতঙ্কে মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেছে ভলোশিনভের মুখ।

তাদের পেছন পেছন তলোয়ার ঝনঝন করতে করতে চলল গোলুবোভ। তার ধূসর বাদামী মুখের ওপর লালচে ছোপ পড়েছে। কাউন্সিলের একজন সদস্য তার জামার হাতা টেনে বলল, 'কর্ণেল সাহেব দয়া করে বলবেন কি আমাদের কোথায় যেতে হবে?'

আরেকজন সুড়ুৎ করে চটপট সেই সদস্যটির কাঁধের পেছন থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কি ছেড়ে দেওয়া হল?'

'চুলোয় যাও সব!' হাত ঝাড়া দিয়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল গোলুবোভ। বুনচুকের কাছাকাছি যখন চলে এসেছে তখন কাউন্সিলের সদস্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ঠুকে বলল, 'চলে যাও সব! তোমাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই আমার! কী বললাম! . . .'

তার ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলা আরও অনেকক্ষণ ধরে হল্-ঘরের ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগল।

বুনচুক সেই রাতটা মা'র কাছে কাটাল। পরের দিন যেই নোভোচের্কাস্কে খবর এলো যে সিভের্স্ রস্তোভ দখল করেছে, অমনি গোলুবোভের কাছে রস্তোভ যাবার অনুমতি চাইল। পরদিন সকালে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল।

বুনচুক যখন বলশেভিক কাগজ 'অকোপ্নায়া প্রাভ্দা'-র সম্পাদক ছিল তখনই সিভের্স্ তাকে চিনত। রস্তোভে পৌঁছে বুনচুক দু'দিন সিভের্সের সদর ঘাঁটিতে কাজ করল, অবসর সময় বিপ্লবী কমিটিতে গিয়ে খোঁজ খবর নিল – কিন্তু আব্রাম্সন কিংবা আন্না কেউই সেখানে নেই। সিভের্সের সদর ঘাঁটিতে একটা বিপ্লবী ট্রাইবুনাল সংগঠিত হয়েছিল, ধৃত প্রতিবিপ্লবীদের চটপট বিচার করে ট্রাইবুনাল তাদের শাস্তিবিধান করতে লাগল। বুনচুক একদিন সেখানে কাজ করল – বিচারের কাজে ও অপরাধীদের ঘেরাও করে ধরার কাজে যোগ দিল। পরের দিন, আশা একেবারে

ছেড়ে দিলেও আরও একবার বিপ্লবী কমিটির অফিসে ছুটল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই শুনতে পেল আন্নার গলার পরিচিত স্বর। তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। পরের ঘরটা থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর আর আন্নার হাসি ভেসে আসছিল। বুনচুক চলার গতি কমিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল।

তামাকের ধোঁয়া এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। এককালে এটা কম্যাণ্ডান্টের ঘর ছিল। এক কোনায় মেয়েদের লেখার ছোট্ট একটা টেবিল। একটা লোক সেখানে বসে কী যেন লিখছে। তার গায়ে ফৌজী গ্রেটকোট, বোতাম ছেঁড়া, তার ফৌজী টুপিটার দু'পাশের কানঢাকা খোলা, লটপট ঝুলছে। তাকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে পশুলোমের কোর্তা আর ওভারকোট গায়ে সামরিক ও অসামরিক লোকজন। তারা দলে দলে ভাগ ভাগ হয়ে সিগারেট টানছে, কথাবার্তা বলছে। দরজার দিকে পিঠ করে জানলার ধারে আন্না দাঁড়িয়ে আছে, জানলার ধারিতে একটা হাঁটু মুড়ে দু'হাতের আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে আছে আব্রাম্‌সন। তার পাশে মাথাটা একদিকে কাত করে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা মতো এক রেড গার্ড, লাত্‌ভীয় ধরনের চেহারাটা তার। কড়ে আঙুলটা উঁচিয়ে রেখে মুখ থেকে সিগারেট সরাতে সরাতে সে কিসের যেন গল্প করে চলেছে – গল্পটা মজার বলেই মনে হচ্ছে। মাথা পেছনে হেলিয়ে আন্না প্রাণভরে হাসছে, হাসিতে কুঁচকে উঠেছে আব্রাম্‌সনের মুখটা, আশেপাশের সকলে কান পেতে শুনছে, তাদেরও মুখে হাসি ফুটে উঠছে। রেড গার্ডের মুখের প্রতিটি রেখা যেন কুড়ুল দিয়ে কোঁদা, তার মুখের রেখায় রেখায় ফুটে বেরোচ্ছে কেমন যেন একটু ভয়ঙ্কর ধরনের, তীব্র বুদ্ধির দীপ্তি।

আন্নার কাঁধে হাত রাখল বুনচুক।

'এই যে আন্না!'

ফিরে তাকাল আন্না। তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, সেই উচ্ছ্বাস ঘাড় বয়ে কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, নিংড়ে বার করল তার চোখের জল।

'তুমি কোত্থেকে এলে? আরে আব্রাম্‌সন, দেখ দেখ! দেখ দেখি কেমন টাকশাল থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা চাঁদির টাকার মতো জেল্লা দিচ্ছে! আর তুমি কিনা ওর কথা ভেবে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলে!' চোখ না তুলেই তোতলাতে তোতলাতে বলল সে। তারপর বিহ্বলতা সামলাতে না পেরে দরজার দিকে সরে গেল।

আব্রাম্‌সনের গরম হাতটায় চাপ দিল বুনচুক। আব্রাম্‌সনের সঙ্গে দু'-চারটে কথা হল তার। অপরিসীম আনন্দে মুখের ওপর একটা বোকা-বোকা হাসি ফুটে উঠেছে উপলব্ধি করে শেষকালে আব্রাম্‌সনের কোন একটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই (প্রশ্নের অর্থটা পর্যন্ত তার মাথায় ঢুকল না) আন্নার কাছে চলে গেল।

আন্না ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে যখন বুনচুকের মুখোমুখি হল তখন নিজের বিমূঢ় হাসির কথা ভেবে নিজের ওপর তার একটু রাগই হচ্ছিল।

'তারপর আছ কেমন? ভালো আছ ত? কবে এলে? নোভোচের্‌কাস্‌ক থেকে? গোলুবোভের সৈন্যদের দলে ছিলে? তাই নাকি? . . . তারপর এখন?'

আন্নার মুখের ওপর থেকে গুরুভার অপলক দৃষ্টি না সরিয়েই বুনচুক তার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল। বুনচুকের দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে আন্নার দৃষ্টি ভেঙে পড়ল, পিছলে পাশে সরে গেল।

'চল, একটু রাস্তায় বের হই,' আন্না বলল।

আব্রাম্‌সন ওদের পেছন থেকে ডাক দিল।

'তোমরা কি শিগ্‌গিরই আসছ? তোমার সঙ্গে আমার একটা কাজের কথা আছে কমরেড বুনচুক। তোমাকে একটা কাজে লাগানোর কথা ভাবছি আমরা।'

'আমি একঘণ্টা পরে ফিরছি।'

রাস্তায় এসে আন্না স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে সোজাসুজি তাকাল বুনচুকের চোখের দিকে। রাগত ভাবে হাত নাড়ল।

'ইলিয়া ইলিয়া! দেখ দেখি কী বোকার মতো লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম। . . . একেবারে একটা বাচ্চা মেয়ের মতন। এর প্রথম কারণ হঠাৎ-দেখা, দ্বিতীয় কারণ আমাদের আধা খেঁচড়া সম্পর্ক। সত্যিই ত আসলে তোমার আমার সম্পর্কটা কী? কাব্যিজগতের 'দয়িত আর দয়িতার' সম্পর্ক নাকি? জান, লুগানস্কে আব্রাম্‌সন একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি বুনচুকের সঙ্গে থাকছ?' আমি অস্বীকার করলাম ওর কথাটা। কিন্তু ছোকরার চোখের দৃষ্টি সাঙ্ঘাতিক, যা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল তা ওর নজরে পড়ে নি এ হতেই পারে না।'

'তোমার নিজের কথা বল না। কেমন আছ? কী করলে?'

'ওঃ ওখানে আমরা যা কাজ করে এলাম! আমরা দুশ' এগারোটা বেয়নেটের পুরো একটা দল গড়ে দিয়ে এসেছি। সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়েছি। . . . কিন্তু দু'-চার কথায় কি আর সব বলা যায়? তোমার এই হঠাৎ আসার চমক থেকে আমি এখনও ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারছি না। তুমি কো-থায় থাক? . . . রাত কোথায় কাটাচ্ছ?' আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্‌টে সে জিজ্ঞেস করল।

'এখানেই . . . এক কমরেডের বাড়িতে।'

বুনচুক আমতা-আমতা করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল। আসলে গত দু'রাত সে সিভের্সের সদর দপ্তরে কাটিয়েছে।

'আজই তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। আমি কোথায় থাকি মনে আছে তোমার? একবার তুমি আমাকে এগিয়ে দিয়েছিলে বাড়ি পর্যন্ত। . . .'

‘খুঁজে বার করে নেব। কিন্তু . . . বাড়ির লোকজনের কোন অসুবিধে হবে না ত?’

‘ওসব কথা ছাড় ত! তুমি থাকলে কারও কোন অসুবিধে হবে না। মোটের ওপর, আর কোন কথা নয়!’

সম্পত্তি বলতে যা ছিল সন্ধ্যাবেলায় একটা বড়সড় ফৌজী থলের ভেতরে সব পুরে আন্না যেখানে থাকে শহরের উপকণ্ঠের সেই গলিটাতে এসে হাজির হল বুন্‌চুক। বাড়ির উঠোনে ইঁটের তৈরি ছোট সদর দালান। দালানের চৌকাটেই দেখা হয়ে গেল এক বৃদ্ধার সঙ্গে। তার মুখে আন্নার চেহারার একটা অস্পষ্ট আদল ধরা পড়ে। চোখে সেই একই রকম নীলচে-কালো দীপ্তি, সেই রকমই একটু বাঁকা নাক; শুধু চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, মাটি মাটি গায়ের রঙ, আর তোবড়ানো মুখটা ভীষণ ভাবে মনে করিয়ে দেয় বার্ধক্যের কথা।

‘আপনিই কি বুন্‌চুক?’ বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ।’

‘ভেতরে আসুন। আমার মেয়ে আপনার কথা বলেছে আমাকে।’

বুন্‌চুককে সে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এলো, কোথায় জিনিসপত্র রাখতে হবে দেখিয়ে দিল, বাতে বেঁকে যাওয়া আঙুল দিয়ে চারদিক দেখিয়ে বলল, ‘এইখানে আপনার থাকার জায়গা হয়েছে। ওটা আপনার শোয়ার খাট।’

তার কথায় ইহুদী টান স্পষ্ট। বৃদ্ধা ছাড়া বাড়িতে আছে অল্পবয়সী একটি মেয়ে – রুগ্‌ণচেহারার, আন্নার মতোই গভীর চোখের দৃষ্টি।

আন্না এলো খানিকক্ষণ বাদে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হৈচৈ আর প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠল।

‘কেউ এসেছিল? বুন্‌চুক আসে নি?’

উত্তরে মা তার মাতৃভাষায় তাকে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল ভঙ্গিতে দৃঢ় পদক্ষেপে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

‘ভেতরে আসতে পারি?’

‘এসো, এসো।’

বুন্‌চুক চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল।

‘কেমন? সব ঠিক আছে ত?’

খুশিমনে হাসতে হাসতে বুন্‌চুকের দিকে তাকিয়ে আন্না জিজ্ঞেস করল, ‘কিছু খেয়েছ? চল ও ঘরে যাই।’

বুন্‌চুকের জামার হাতা ধরে টানতে টানতে সামনের ঘরে নিয়ে এসে সে বলল, ‘মা, এই আমার কমরেড,’ তারপর হেসে বলল, ‘তোমরা কিন্তু এমন কিছু করো না যাতে ওর মনে লাগে।’

'কী যে বলিস! তাও কি হয়? আমাদের অতিথি যে। . . .'

রাত্রে বাবলার পাকা ছড়ার মতো রস্তোভের ওপর পটপট শব্দে গুলির শব্দ ফেটে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে মেশিনগানের কটকট আওয়াজ, তারপর সব শান্ত। আবার রাত, ফেব্রুয়ারীর সেই মহিমময়ী তামসী রাত তার নিস্তব্ধতায় জড়িয়ে ফেলল রাস্তাঘাট। বুনচুক আর আন্না অনেকক্ষণ তার সেই নিখুঁত পরিপাটী ঘরের মধ্যে বসে রইল। আন্না বলল:

'আমার ছোট বোন আর আমি এখানে থাকতাম। দেখতে পাচ্ছ কেমন সাদাসিধে ব্যবস্থা – একেবারে মঠের সন্ন্যাসিনীদের মতো। কোন শস্তার ছবি নেই, কোন ফোটো নেই, এমন কিছুই নেই যা দেখে বোঝা যায় যে আমি হাই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম।'

'তোমাদের কী করে চলত?' কথাপ্রসঙ্গে বুনচুক জিজ্ঞেস করল।

আন্না ভেতরে ভেতরে একটু গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিল, 'আমি আস্‌মোলোভ্‌স্কায়া কারখানার কাজ করতাম আর টুইশানি করতাম।'

'কিন্তু এখন?'

'মা সেলাইয়ের কাজ করে। ওদের দু'জনের আর কতই বা লাগে?'

বুনচুক সবিস্তারে নোভোচের্‌কাসস্ক দখলের বৃত্তান্ত দিল, জ্‌ভেরেভো আর কামেন্‌স্কায়ার লড়াইয়ের কথা বলল। আন্নাও লুগান্‌স্ক আর তাগান্‌রোগের কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল।

রাত এগারোটার সময় মা তার ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই বুনচুকের ঘর ছেড়ে চলে গেল আন্না।

বিশ

মার্চে দন বিপ্লবী কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিপ্লবী ট্রাইবুনালে কাজ করতে পাঠানো হল বুনচুককে। কমিটির সভাপতি লম্বা গড়নের, চোখদুটো তার ঘোলাটে, একটানা কাজ আর বিনিদ্র রজনীর ফলে মুখটা চোপসানো। বুনচুককে সে তার ঘরের জানলার কাছে নিয়ে এসে হাতঘড়ির ওপর হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করল (অধিবেশনে যাওয়ার তাড়া ছিল তার), 'কোন্ সাল থেকে পার্টিতে আছ? . . . আচ্ছা, বেশ। তুমি আমাদের এখানকার কম্যাণ্ডাণ্ট হবে। গতকাল রাতে আমরা

আমাদের কম্যাণ্ডান্টকে . . . ঘুষ নেওয়ার অপরাধে তাকে 'দুখোনিনের সদর দপ্তরে'* পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটা ছিল পশুরও অধম, বর্বর, হারামজাদা – ওরকম লোককে আমরা চাই নে। কাজটা নোংরা ধরনের বটে, কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে পার্টির প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। যা বলছি তা বুঝে নাও এই বেলা . . .' বেশ জোর দিয়ে সে যোগ করল, 'মানবতা বজায় রাখতে হবে। আমরা প্রয়োজনের খাতিরেই প্রতিবিপ্লবীদের ধরে ধরে মেরে ফেলছি, কিন্তু এটাকে রং তামাশার ব্যাপার করে তোলা উচিত নয়। আমার কথাটা বুঝতে পারছ ত? বেশ বেশ! এবারে যাও, কাজের ভার নাও গিয়ে।'

সেই রাত্রেই বুন্‌চুক আর ষোলজন রেড গার্ডের একটা দল পাঁচজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লোককে শহরের বাইরে ক্রোশখানেক দূরে নিয়ে গিয়ে মাঝরাতে গুলি করে মারল। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল গ্লিলভ্‌স্কায়া জেলার কসাক, বাকিরা রস্তোভের লোক।

প্রায় রোজই মাঝরাতে ট্রাকে করে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের কবর দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে গর্ত খোঁড়া হয়। কবর খোঁড়ার কাজে রেড গার্ডদের একটা অংশের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তরাও হাত লাগায়। বুন্‌চুক রেড গার্ডের দলটাকে সার বেঁধে দাঁড় করায়, তারপর ঢালাই লোহার আওয়াজের মতো ভারী চাপা গলায় উচ্চারণ করে, 'বিপ্লবের যারা শত্রু তাদের ওপর . . .' হাতের নাগান রিভল্‌ভারটা দুলে ওঠে, বলে, 'গুলি কর! . . .'

এক সপ্তাহের মধ্যে সে শুকিয়ে কালি ঢালা হয়ে গেল, দেখে মনে হয় যেন মাটিতে ছেয়ে গেছে তার মুখ। তার চোখ বসে গেল, চোখের পাতা অস্থির ভাবে কাঁপতে থাকে, পাতার নীচে বিষণ্ণ জ্বলজ্বলে দৃষ্টি গোপন থাকে না। আন্নার সঙ্গে তার দেখা হয় শুধু রাত্রে। আন্না কাজ করে বিপ্লবী কমিটিতে, রাতে দেরিতে বাড়ি ফেরে; কিন্তু রোজই সে অপেক্ষা করে থাকে কখন জানলায় পরিচিত টোকা দিয়ে বুন্‌চুক তার আগমন বার্তা জানাবে।

একদিন বুন্‌চুক রোজকার মতো মাঝরাতের পর বাড়ি ফিরল। আন্না তাকে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খাবার খাবে ত?'

বুন্‌চুক কোন উত্তর দিল না। মাতালের মতো টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে গেল, যেমন ছিল তেমনি ভাবে গ্রেটকোট, বুট আর টুপি পরা অবস্থায়ই

---

* নিকলাই নিকলায়েভিচ দুখোনিন (১৮৭৬-১৯১৭) – প্রতিবিপ্লবের অন্যতম সংগঠক। লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল। সৈন্যদের হাতে নিহত। কম্যাণ্ডান্ট যে দুখোনিনের গতি প্রাপ্ত হয়েছে তারই ইঙ্গিত। – অনুঃ

ধপাস্‌ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আন্না কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকাল। তার চোখদুটো কোঁচকানো, আঠার মতো কেমন যেন চটচটে, শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে, দাঁতের ফাঁকে লালা চকচক করছে; টাইফাসের পর চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল – এখন সেই চুল ভিজে গোছা হয়ে কপালের ওপর ঝুলছে।

আন্না ওর পাশে এসে বসল। একটা মমতা ও বেদনা তার বুকের ভেতরটা যেন কুরে কুরে খেতে লাগল। ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ইলিয়া?'

বুনচুক চেপে ধরল আন্নার হাতখানা, দাঁত কড়মড় করল, তারপর পাশ ফিরল দেয়ালের দিকে। ওই ভাবেই সে ঘুমিয়ে পড়ল, একটি কথাও না বলে। ঘুমের মধ্যে অস্ফুট ভাবে করুণস্বরে কী সব বিড়বিড় করতে লাগল, লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠারও চেষ্টা করল। তার দিকে চেয়ে আতঙ্কিত হয়ে কী যেন এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল আন্না: সে ঘুমোচ্ছে চোখদুটো আধবোজা রেখে, কপালে উঠে গেছে তার চোখ, পাতার ফাঁক দিয়ে যেন জ্বরের তাড়সে জ্বলজ্বল করছে হলদে ছোঁটের ফুলো ফুলো সাদা অংশটা।

'ও কাজ ছেড়ে দাও তুমি!' পরদিন সকালে আন্না তাকে অনুনয় করে বলল। 'বরং ফ্রন্টেই চলে যাও! তোমার এ কী চেহারা হয়েছে ইলিয়া! এ কাজ করতে গিয়ে তুমি নির্ঘাত মারা যাবে।'

'চুপ কর!' একটা অন্ধ ক্রোধ তার চোখের রক্ত যেন শুষে নিল। চোখ পিটপিট করতে করতে চিৎকার করল সে।

'অমন চেঁচিও না। তোমার রাগ হওয়ার মতো কিছু আমি করেছি?'

বুনচুক সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল। বুকের মধ্যে যে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমা হয়েছিল ক্ষিপ্ত চিৎকারের মধ্য দিয়ে যেন তা ছিটকে বেরিয়ে পড়ায় মনটা জুড়িয়ে এলো। ক্লান্ত ভাবে নিজের হাতের তালু নিরীক্ষণ করতে করতে সে বলল, 'মানুষের নাম নিয়ে যে কদর্যতা আছে তাকে ধ্বংস করতে যাওয়া নোংরা কাজ। একটা ফায়ারিং স্কোয়াডের দায়িত্বে থাকা, দেখতেই পাচ্ছ, শরীর আর মনের পক্ষে ক্ষতিকর।... যত্ত সব...' এই প্রথম আন্নার সামনে একটা অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করে বসল। 'নোংরা কাজে যারা যায় তারা হয় নির্বোধ, পশু, নয়ত অন্ধ বিশ্বাসী। তাই না? আমরা সকলেই বেড়াতে চাই ফুলের বাগানে, কিন্তু তা করতে হলে যে... কে জানে ছাই!... ফুলগাছ বসাবার আগে যে নোংরা সাফ করা দরকার! মাটিতে সার দেওয়া দরকার! তাতে হাতেও ময়লা লাগবে!' আন্না মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপচাপ থাকলেও বুনচুক গলা চড়াল। 'জঞ্জাল সাফ করতে হবে। অথচ এ কাজের জন্যে লোকে খুঁত খুঁত করে!...' এবারে

বুন্‌চুক চিৎকার করে উঠল, টেবিলের ওপর্র দড়াম্ করে ঘুসি মেরে বসল, রক্তরাঙা চোখদুটো ঘন ঘন পিটপিট করতে লাগল।

আন্নার মা ঘরের মধ্যে উঁকি মারতে বুন্‌চুকের সংবিৎ ফিরে এলো। এবারে শান্ত গলায় সে বলতে লাগল:

'এ কাজ আমি ছাড়ছি না! এখানে আমি দেখতে পাই, স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি যে আমি একটা উপকার করছি! জঞ্জাল আঁচড়ে তুলছি! সার দিয়ে মাটিকে আরও রসাল করে তুলছি, তার উর্বরাশক্তি বাড়াচ্ছি! কোন একদিন হয়ত সুখী লোকেরা এই মাটিতে হেঁটে বেড়াবে। . . . হয়ত বা আমার সন্তানই, যে সন্তান আমার নেই। . . .' সে হাসল – নিরানন্দ, ভাঙা-ভাঙা শোনাল তার হাসিটা। 'এরকম কেউটে সাপ, এঁটুলি পোকা আমি কত গুলি করে মেরেছি। . . . এঁটুলি হল এক ধরনের পোকা, যা গায়ের মাংসের ভেতরে গেঁথে বসে মাংস কুরে কুরে খায়। . . . গণ্ডাখানেক মেরেছি আমি আমার এই হাতে। . . .' চিলের মতো বাঁকা নখওয়ালা কালো লোমশ হাতদুটো মুঠো করে পাকিয়ে সামনে বাড়িয়ে ধরল বুন্‌চুক, তারপর ধপ করে হাঁটুর ওপর ফেলে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু সে সব মরুক গে! ধোঁয়া ওঠানো কোন কাজের কথা নয়, জ্বলতে হলে এমন ভাবে জ্বলা দরকার যেন ফুলকি উড়তে থাকে। . . . তবে হ্যাঁ, এটাও সত্যি যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। . . . আর অল্প কিছু দিন . . . তারপর ফ্রন্টে চলে যাব। . . . তুমি ঠিকই বলেছ। . . .'

আন্না চুপচাপ ওর কথা শুনে যাচ্ছিল। মৃদু স্বরে বলল, 'ফ্রন্টে চলে যাও, নয়ত অন্য কোন কাজ নাও। . . . চলে যাও ইলিয়া, নইলে . . . নইলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।'

বুন্‌চুক তার দিকে পিছন ফিরে জানলায় তাল ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'না, আমি শক্ত আছি। . . . তুমি ভেবো না কোন মানুষ লোহা দিয়ে তৈরি হতে পারে। সব মানুষই এক ধাতুতে গড়া। . . . বাস্তব জীবনে এমন কেউ নেই যে লড়াই করতে গিয়ে ভয় পায় না, এমন কেউ নেই মানুষ মারার পর যে কিছুই উপলব্ধি করে না, যার মনের মধ্যে এতটুকু আঁচড় পড়ে না। অফিসারের তকমাধারী যারা তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয় না। . . . তারা তোমার আমার মতোই জানে কী তারা করতে যাচ্ছে। কিন্তু এই গতকাল . . . যে নয়জনকে গুলি করে মারতে হল তাদের মধ্যে তিনজন ছিল কসাক . . . খেটে খাওয়া মানুষ। . . . একজনের বাঁধন খুলতে শুরু করলাম . . .' বুন্‌চুকের গলা আরও চাপা আরও অস্পষ্ট হয়ে এলো, মনে হল যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। 'ওর হাতে হাতটা ঠেকে গিয়েছিল, জুতোর তলার মতো . . . শক্ত চড়চড়ে। . . . কড়ায় ভর্তি। . . . হাতের চেটো

কালো, কঠিন, সর্বত্র ফাটাফাটা, ঢিবি হয়ে আছে। . . . যাক গে, আমায় এখন যেতে হয়,' আচমকা কথা থামিয়ে দিল বুন্‌চুক। একটা বিশ্রী হেঁচকি তুলে এমন ভাবে গলায় হাত ঘসতে লাগল যেন চুলের ফাঁস লেগেছে গলায়। আন্না কিন্তু সেটা লক্ষ করল না।

বুন্‌চুক জুতো পরল। এক গেলাস দুধ খেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। আন্না ছুটতে ছুটতে এসে বাড়ির দরদালানে তাকে ধরল। অনেকক্ষণ তার ভারী হাতখানা নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রাখল, তারপর তপ্ত গালের ওপর চেপে ধরল; শেষকালে দৌড়ে উঠোনে বেরিয়ে গেল।

* * *

একটু একটু করে গরম পড়ছে। আজভ সাগর থেকে বসন্ত এসে দনের শাখাপ্রশাখায় হানা দিচ্ছে। মার্চের শেষে ইউক্রেনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী হাইদামাক* দল আর জার্মানদের চাপে পড়ে ইউক্রেনীয় রেড গার্ড দলগুলো রস্তোভে আসতে শুরু করল। খুন রাহাজানি নির্বিচার জবরদখলের ঘটনা ঘটতে লাগল শহরে। কতকগুলো বাহিনীর মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। বিপ্লবী কমিটি তাদের নিরস্ত্র করতে বাধ্য হল। বিনা সঙ্ঘর্ষে, গুলিগোলা না চালিয়ে একাজ করা সম্ভব হল না। নোভোচের্কাস্‌স্কের কাছে কসাকরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পপলার গাছে মুকুল ধরার মতো মার্চ মাসে জেলায় জেলায় কসাক আর অ-কসাক লোকজনের মধ্যে বিরোধ ফুটে বেরোতে লাগল। কোন কোন জায়গায় তা বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল, প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল। কিন্তু রস্তোভে জীবন পূর্ণমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বয়ে চলেছে। সন্ধ্যাবেলায় শহরের বড় বুল্‌ভারের ওপর দলে দলে সৈন্য, জাহাজী আর মজুররা ঘুরে বেড়ায়। তারা সভা করে, সূর্যমুখী ফুলের বিচি পটপট করে ভেঙে খায়, ফুটপাতের পাশ দিয়ে যে জলের ধারা গড়িয়ে চলেছে তার ওপর থুথু ফেলে খোসা ছড়ায়, মেয়েমানুষদের নিয়ে ফুর্তি করে। আগেকার মতোই এখনও লোকে কাজ করে, খায়দায়, ঘুমোয়, মরে। সন্তানের জন্ম দেয়, প্রেম করে, ঘৃণা করে, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা নোনা

---

* তুর্কী শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'হামলা'। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউক্রেনের যে সমস্ত বিদ্রোহী কসাক পোল্‌দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তারা এই নামে অভিহিত হত। পরবর্তীকালে বিপ্লবের সময় ইউক্রেনে যে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয়েছিল তারই সৈন্যবাহিনীর বিশেষ ঘোড়সওয়ার ইউনিট। – অনুঃ

হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়, ছোট বড় বৃহৎ ও তুচ্ছ কামনাবাসনায় আচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটায়। রস্তোভের দিকে ঘন হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আতঙ্কের দিন। বরফগলা কালো মাটির গন্ধ আর আসন্ন সংঘর্ষের রক্তের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস।

এই রকম এক চমৎকার রোদেঝলমল দিনে বুনচুক রোজকার চেয়ে আগে বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ি ফিরে আন্নাকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে গেল।

'তুমি ত রোজই দেরিতে আস, আজ এত সকাল সকাল কেন?'

'আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই।'

বুনচুকের পেছন পেছন তার ঘরে এসে ঢুকল সে। বাইরের জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে উচ্ছ্বসিত আনন্দের হাসি খেলে গেল বুনচুকের মুখে। সে বলল, 'আন্না আজ থেকে আমি আর ট্রাইবুনালে কাজ করছি না।'

'বল কী? কোথায় পাঠাচ্ছে তাহলে তোমাকে?'

'বিপ্লবী কমিটিতে। আজ ক্রিভশ্‌লিকভের সঙ্গে কথা হল। কথা দিয়েছে আমাকে কোন একটা মহকুমা-শহরে পাঠানো হবে।'

ওরা একসঙ্গে রাতের খাওয়া সারল। বুনচুক তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় কিছুতেই ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল, শক্ত তোষকটার ওপর এপাশ ওপাশ করল, আনন্দে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। ট্রাইবুনাল ছাড়তে পেরে দারুণ খুশি হয়েছে সে, কেননা সে মনে মনে বুঝতে পারছিল আর সহ্য করতে পারবে না – আরেকটু হলেই বুঝি বা ভেঙে পড়ত। চতুর্থ সিগারেটটা সবে শেষ করছে, এমন সময় দরজায় একটা মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। মাথা তুলতে আন্নাকে দেখতে পেল। খালি পায়ে, শুধু সেমিজ গায়ে চৌকাট পেরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, নিঃশব্দে এগিয়ে এলো বিছানার দিকে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তার খোলা গড়ানে কাঁধের ওপর এসে পড়েছে চাঁদের আবছা সবুজ আলো। আন্না ঝুঁকে পড়ে তার উষ্ণ হাতখানা বুনচুকের ঠোঁটের ওপর রাখল।

'সরে শোও।... কথা বলো না।...'

বুনচুকের পাশে এসে শুয়ে পড়ল। অধৈর্য হয়ে আঙুরের থোকার মতো ভারী চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে দিল। ধোঁয়াটে নীলচে আগুন ঝলকে উঠল তার চোখে। অনেক কষ্ট করে, কেমন যেন একটু খসখসে গলায় ফিসফিস করে সে বলল, 'আজ কিংবা কাল যে-কোন দিন আমি হারাতে পারি তোমাকে।... আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে ভালোবাসতে চাই!' নিজের সঙ্কল্পে সে কেঁপে উঠল। 'তাড়াতাড়ি কর!'

বুনচুক আঁটসাঁট শীতল স্তনদুটোতে চুমু খেতে লাগল, তার সম্পূর্ণ সঁপে

দেওয়া নমনীয় শরীরে হাত বুলাতে লাগল। কিন্তু এমন সময় তার সমস্ত চেতনা ছেয়ে গেল এক অসহ্য লজ্জায়, মহা আতঙ্কিত হয়ে সে উপলব্ধি করল যে সে অক্ষম।

তার মাথাটা কাঁপতে লাগল, এক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় গালদুটো জ্বলতে লাগল। আন্না নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সক্রোধে ঠেলে সরিয়ে দিল তাকে; প্রবল ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় রুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর, অবজ্ঞাভরে ফিসফিসিয়ে সে বলল, 'তুমি... তুমি কি অক্ষম? নাকি... তুমি অসুস্থ? উঃ কী জঘন্য! ছেড়ে দাও আমাকে!'

বুনচুক তার আঙুলগুলো এত জোরে চেপে ধরল যে মট করে সামান্য আওয়াজ উঠল, তার অস্পষ্ট কালো রঙ ধরা শত্রুভাবাপন্ন বিস্ফারিত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি বিঁধিয়ে পক্ষাঘাতের মতো মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তোতলাতে তোতলাতে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? অমন ভাবে বিচার করছ কেন আমাকে? হ্যাঁ, জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছি।... এমনকি এখন এ ক্ষমতাও আমার নেই।... না, অসুস্থ আমি নই।... আমাকে বোঝার চেষ্টা কর, বোঝার চেষ্টা কর আমাকে! আমি ফুরিয়ে গেছি।... আ-হা-হা।...'

চাপাস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সে, বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, সিগারেট ধরাল। অনেকক্ষণ ধরে কুঁজো হয়ে জানলার ধারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন প্রহারে জর্জরিত।

আন্না উঠে দাঁড়িয়ে চুপচাপ তাকে জড়িয়ে ধরল, শান্ত ভাবে মায়ের মতন করে তার কপালে চুমু খেল।

কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে যখন যেমন ঘটা উচিত ছিল তা-ই ঘটল তখন বুনচুকের হাতের নীচে লজ্জায় রাঙা তপ্ত মুখখানা আড়াল করে আন্না স্বীকার করল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আগে অন্য কারও কাছে শেষ করে দিয়ে এসেছ।... আমি বুঝতে পারি নি যে তোমার এ কাজ তোমার সমস্ত কিছু বার করে নিয়েছে।'

এর পর আরও বহু দিন পর্যন্ত বুনচুক কেবল তার প্রিয়তমার সোহাগই অনুভব করল না, অনুভব করতে লাগল কানায় কানায় পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের তুল্য এক উত্তাপ।

বুনচুককে মফস্বলে আর পাঠানো হল না। পদ্‌তিওল্‌কভের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাকে রস্তোভেই থেকে যেতে হল। সোভিয়েতের প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে আর দনের ওপাড়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেই সময় দন বিপ্লবী কমিটিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

উপকূলের উইলোঝোপের পেছনে নানা স্বরে ব্যাঙ ডাকছে। সূর্য দিনের চৌকাট পেরিয়ে টিলার ওপাশে ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যার আগের মুহূর্তে ঠাণ্ডা ছড়িয়ে পড়ছে সেত্রাকভ গ্রামের বুকে। শুকনো খটখটে রাস্তাগুলোর ওপর তেরছা হয়ে পড়েছে বাড়িঘরের বিশাল বিশাল ছায়া। স্তেপের প্রান্তর থেকে ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ার পাল ফিরছে। চারণভূমি থেকে ডালের পাচনবাড়ি দিয়ে গোরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কসাকদের বাড়ির বৌ-ঝিরা, যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে নানারকম গল্পগুজব করছে। কসাকদের ছেলেপুলেরা ইতিমধ্যে রোদে পুড়ে উঠেছে। পাড়ার অলিতে গলিতে তারা খালি পায়ে ব্যাঙ লাফানো খেলছে। বুড়োরা গম্ভীর ভঙ্গিতে বাড়ির রোয়াকে বসে আছে।

বীজ বোনা শেষ হয়ে গেছে। শুধু এখানে ওখানে সূর্যমুখী ফুল আর জনার বোনার পাট শেষ করা হচ্ছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তের একটা বাড়ির কাছে পড়ে থাকা একটা ওক গাছের ওপর বসে আছে জনা কয়েক কসাক। বাড়ির কর্তা, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা এক গোলন্দাজ, জার্মানির সঙ্গে লড়াইয়ের কোন একটা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। শ্রোতা দু'জন – বুড়ো পড়শী আর তার জামাই – অল্পবয়সী, কোঁকড়াচুল এক কসাক ছোকরা। তারা নীরবে শুনে যাচ্ছিল। ঘরের দাওয়া থেকে ধাপ বয়ে নেমে এলো বাড়ির গিন্নি। মহিলা লম্বা, দেখতে সুন্দরী, বড়ঘরের মেয়েদের মতো মোটাসোটা গড়নের। তার গায়ের গোলাপী জামাটা ঘাঘরার ভেতরে গোঁজা, জামার হাতা গোটানো, তাইতে রোদে পোড়া তামাটে রঙের সুঠাম বাহুদুটো বেরিয়ে পড়েছে। তার হাতে একটা কেঁড়ে। এমন স্বচ্ছন্দ লীলায়িত ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গোয়ালের দিকে চলে গেল যা শুধু একজন কসাক মেয়ের পক্ষেই স্বাভাবিক। নিখুঁত সাদা নীলচে আভার রুমাল মাথায় বাঁধা, তার ভেতর থেকে চুলের রাশি বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে (কাল সকালে উনুন ধরাতে হবে বলে উনুনে ঘুঁটে সাজিয়ে এসেছে এইমাত্র)। মোজা ছাড়া পায়ে চটিজুতো ফটর ফটর করতে করতে উঠোনের সর্বত্র উদ্দাম গতিতে বেড়ে ওঠা সবুজ কচি আগাছাগুলো আলতো ভাবে মাড়িয়ে চলে গেল সে।

কসাকরা যেখানে বসে ছিল সেখান থেকেই তাদের কানে ভেসে আসতে থাকে কেঁড়ের গায়ে দুধের ধারা পড়ার চড়বড় শব্দ। দুধ দোয়া শেষ হতে বাড়ির গিন্নি বাঁ হাতটা রাজহাঁসের গলার মতো বাঁকিয়ে দুধভর্তি কেঁড়েটা নিয়ে একটু কুঁজো হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

'সিওমা তুমি উঠে গিয়ে একটু বাছুরটা দেখ না!' সিঁড়ির ধাপ থেকে চড়া গলায় সে হেঁকে বলল।

'মিতিয়াশ্‌কাটা গেল কোথায়?' স্বামী জিজ্ঞেস করল।

'কী জানি ছাই! কোথায় পালিয়েছে।'

গৃহকর্তা ধীরেসুস্থে উঠে কোনার দিকে চলে গেল। বুড়ো আর তার জামাইও বাড়ি যাবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় কোনা থেকে গৃহকর্তাবুড়োকে ডেকে বলল, 'আরে, আরে এদিকে তাকিয়ে দেখ দরোফেই গাভ্‌রিলিচ! এদিকে এসো!'

বুড়ো আর তার জামাই এগিয়ে এলে গৃহকর্তা নিঃশব্দে স্তেপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বড় রাস্তা দিয়ে বিশাল লাল গোলার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে একটা ধুলোর কুণ্ডলী, তার পেছন পেছন এগিয়ে আসছে সারি সারি পদাতিক সৈন্য, গাড়ি ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার।

'সৈন্যদল বলেই মনে হচ্ছে যেন?' বুড়ো অবাক হয়ে চোখ কুঁচকে সাদা ভুরুর ওপর হাতের চেটোর আড়াল দিয়ে দেখতে লাগল।

'কী ব্যাপার? কারা এই সব লোকজন?' গৃহকর্তা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

তার বৌ ইতিমধ্যে একটা জ্যাকেট দু'কাঁধের ওপর ফেলে গেটের বাইরে চলে এসেছে। স্তেপের দিকে তাকিয়ে সে হতভম্ব হয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

'ওরা কারা? ওরে বাবা, কত লোক!'

'গতিক সুবিধের বলে হচ্ছে না। . . .'

বুড়ো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস করছিল, এবারে সে তার বাড়ির দিকে পা বাড়াল, ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে জামাইকে বলল, 'বাড়ি চলে এসো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কী আছে?'

মেয়েরা আর ছোট ছোট বাচ্চারা ছুটে এলো গলির মুখে, দলে দলে এসে জুটল পুরুষরা। গ্রাম থেকে আধ ক্রোশখানেক দূরে স্তেপের মধ্যে বড় রাস্তা বরাবর সার বেঁধে চলেছে সৈন্যদল। এখন বাতাসে তাদের অস্পষ্ট গলার স্বর, ঘোড়ার চিঁহিহি ডাক আর চাকার ঘড়ঘড়ানি ভেসে আসছে।

'ওরা কসাক নয়। . . . আমাদের লোক নয়,' কসাক-গিন্নি তার স্বামীকে বলল।

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল।

'কসাক নয় ঠিকই। কিন্তু তাহলে কি জার্মান? না, রুশী। . . . আরে দেখ দেখ লাল কাপড়ের টুকরো ওদের সঙ্গে! . . . আচ্ছা, তা-ই বল! বুঝেছি এবারে। . . .'

আতামান রক্ষিদলের লম্বা মতন এক কসাক এগিয়ে এলো। দেখেই বোঝা যায় জ্বরে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছে। মুখের রঙ বালির মতো হলুদ – যেন পাণ্ডুরোগে শয্যাশায়ী ছিল। পরনে পশুলোমের ওভারকোট আর পশমী জুতো।

ভেড়ার লোমের ঝাঁকড়া টুপিটা মাথা থেকে একটু উঠিয়ে সে বলল, ‘ওদের ঝাণ্ডাটা কী রকম দেখছ ত? . . . ওরা বলশেভিক।’

‘হ্যাঁ ওরাই বটে।’

সারি থেকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো। তারা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল গ্রামের দিকে। কসাকরা মুখ চাওয়াচাউয়ি করতে করতে নিঃশব্দে সরে পড়তে লাগল, অল্পবয়সী মেয়েরা আর বাচ্চারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এধার ওধার ছড়িয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা একেবারে খাঁ খাঁ হয়ে গেল। ঘোড়সওয়াররা দঙ্গল বেঁধে গলির ভেতরে এসে ঢুকল – ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে তুলে ছুটিয়ে এলো সেই ওকগাছটার কাছে, যেটার ওপর এই মিনিট পনেরো আগেও তিনজন কসাক বসে ছিল। বাড়ির কর্তা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। সামনের ঘোড়সওয়ারটাকে দেখে মনে হল দলের পাণ্ডা। তার ঘোড়াটা কালচে বাদামী, মাথায় কুবান-কসাক টুপি, খাকি শার্টের কোমরে বাঁধা মিলিটারী বেল্টের ওপর একটা লাল রঙের বিশাল রেশমী ফিতে জড়ানো। গেটের কাছে এগিয়ে এসে লোকটা বলল, ‘নমস্কার কর্তা! ফটকটা খুলে দাও গো।’

গোলন্দাজের বসন্তের দাগওয়ালা মুখটা ফেকাসে হয়ে গেল। মাথার টুপি খুলে প্রতি-নমস্কার জানাল সে।

‘তোমরা কারা বট?’

‘ফটক খোল!’ কুবান-টুপি মাথায় সৈন্যটা চিৎকার করে উঠল।

কালচে-বাদামী রঙের তেজী ঘোড়াটা আড়চোখে কটমট করে তাকাতে তাকাতে ফেনাভর্তি মুখের ভেতরে মুখের কড়াটা নাড়াচাড়া করতে লাগল, সামনের একটা পায়ের লাথি কষিয়ে দিল বেড়ার গায়ে। বাড়ির কর্তা গেট খুলে দিল। ঘোড়সওয়াররা একের পর এক উঠোনে এসে ঢুকল।

কুবান-টুপি পরা লোকটা বেশ চটপট ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, বাঁকা বাঁকা দুই পায়ে দ্রুত ঘরের ধাপের দিকে এগিয়ে গেল। বাকিরা ঘোড়া থেকে নামতে নামতেই সে দেউড়ির ধাপে বেশ জুত করে বসে সিগারেট-কেস বার করল। একটা সিগারেট ধরাল, বাড়ির কর্তার দিকে সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিল। কিন্তু সে নিল না।

‘কী হল? তামাক খাও না?’

‘ধন্যবাদ।’

‘তোমাদের এখানকার লোকজন সনাতনপন্থী খ্রীষ্টান নাকি?’

‘না, গ্রীক অর্থডক্স মতের। . . . কিন্তু তোমরা? তোমরা কে বট?’ গোমড়ামুখে আবার জানতে চাইল বাড়ির কর্তা।

‘আমরা? আমরা হলাম দু’নম্বর সোশ্যালিস্ট আর্মির রেডগার্ড।’

বাকি ঘোড়সওয়াররাও ততক্ষণে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে দেউড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। মুখের লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে এনে তারা রেলিঙের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তাদের মধ্যে একজন দৈত্যাকার লোক – সামনের চুলের ঝুঁটিটা ঘোড়ার কেশরের মতো জট পাকিয়ে কপালের ওপর এসে পড়েছে – ভেড়ার খোঁয়াড়ের দিকে চলল। চলার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বেধে তার কোমরে ঝোলানো তলোয়ারটা বাজতে লাগল। এমন ভাবে সে খোঁয়াড়ের দরজাটা খুলে ফেলল যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। চালার খোঁড়লের ভেতরে ঝুঁকে পড়ে শিঙ ধরে ভারী লেজওয়ালা একটা বিরাট ভেড়া টেনে বার করল। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে সে বলল, ‘পেত্রিচেন্‌কো, এদিকে এসে একটু হাত লাগাও!’

খাটো অস্ট্রীয় গ্রেটকোট গায়ে ছোটখাটো চেহারার এক সেপাই ছুটে এলো তাকে সাহায্য করতে। বাড়ির কর্তা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে এমন ভাবে চারপাশে তাকাতে লাগল যেন উঠোনটা তার নিজের বাড়ির নয়। একটি কথাও সে বলল না। কিন্তু তলোয়ারের কোপে গলাকাটার পর ভেড়াটা যখন সরু সরু ঠ্যাঙ ছুঁড়ে ছটফট করতে লাগল, একমাত্র তখনই অস্ফুট আর্তনাদ করে দেউড়ির দিকে সরে গেল সে।

বাড়ির কর্তার পেছন পেছন কুবান-টুপি পরা সৈন্যটা এবং আরও দু’জন এসে ঢুকল বাড়ির ভেতরে। তাদের মধ্যে একজন চীনে, অন্যজন রুশী – কামচাত্‌কার আদিবাসীর মতন চেহারা।

‘রাগ করো না গো কর্তা!’ চৌকাট পেরোতে পেরোতে মজা করে চেঁচিয়ে বলল কুবানের লোকটা। ‘আমরা ভালো দাম দেব এর জন্যে!’

প্যাণ্টের পকেটে চাপড় মেরে হো হো করে হেসে উঠল সে। কিন্তু বাড়ির কর্ত্রীর ওপর দৃষ্টি পড়তেই হঠাৎ তার হাসি থেমে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত চোখে সে চেয়ে আছে তার দিকে।

কুবান-টুপি পরা লোকটা এবারে শঙ্কিত চোখের দৃষ্টি চারদিকে বুলাতে বুলাতে চীনেটার দিকে ফিরে বলল, ‘তুমি বাপু হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলে যাও ত এর সঙ্গে – এই যে এই দাদার সঙ্গে।’ বাড়ির কর্তাকে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ‘যাও এর সঙ্গে চলে যাও – ঘোড়ার জন্যে খড় দেবে। . . . হ্যাঁ ছাড় দেখি। বুঝলে কী বললাম? এর জন্যে ভালো দাম দেব আমরা! রেড গার্ডরা লুঠতরাজ করে না। কী হল গো? যেতে বললাম যে!’ লোকটার কণ্ঠস্বরে একটা ধাতব কাঠিন্য বেজে উঠল।

কসাক পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চীনেটা এবং অন্য সেপাইটির সঙ্গে

ঘর ছেড়ে চলে গেল। সিঁড়ির ধাপ বয়ে সবে নীচে নামছে এমন সময় শুনতে পেল তার স্ত্রীর আর্তকণ্ঠের চিৎকার। ছুটে সে বারান্দায় উঠে এলো, দরজাটা ধরে এক হেঁচকা টান দিল। ছিটকিনিটা আলগামতো থাকায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে বেরিয়ে এলো। কুবানের সেই সেপাইটা তখন মোটাসোটা চেহারার গৃহবধূটির নগ্ন হাতের কুনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে আধা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ভেতরের ঘরে। সেও বাধা দিচ্ছে, লোকটার বুকে কিল ঘুষি মারছে। তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বয়ে নিয়ে যাবার তাল করছিল সেপাইটা, এমন সময় ঘটাং করে দরজা খুলে গেল। কসাক লম্বা লম্বা পা ফেলে ভেতরে এসে ঢুকে বৌকে আড়াল দিয়ে দাঁড়াল। তার কণ্ঠস্বর চাপা জড়ানো জড়ানো শোনাল।

'তুমি আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছ। . . . বাড়ির মেয়েছেলেকে অপমান করছ কেন? কী লোক তুমি? . . . ছেড়ে দাও? তোমার ওই বন্দুককে আমি থোড়াই ডরাই! যা খুশি তাই নিয়ে যাও, সব লুটে নিয়ে যাও, কিন্তু আমার বৌয়ের ইজ্জত নষ্ট করো না! তার আগে আমাকে মারতে হবে। . . . আর তুমি, নিউরা . . .' তার নাকের পাটা কাঁপতে লাগল, বৌয়ের দিকে ফিরে সে বলল, 'দরোফেই খুড়োদের বাড়ি চলে যাও বরং। এখানে তোমার থাকার কোন মানে হয় না!'

কুবানের সেপাইটি তার জামার সামরিক বেল্টগুলো ঠিকঠাক করতে করতে বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'তুমি ত দেখছি বড় রাগী মানুষ, কত্তা! . . . আরে একটু হাসিঠাট্টা করারও উপায় নেই! আমি হলাম গিয়ে আমাদের গোটা কোম্পানির ভাঁড় . . . তা জান না বুঝি? ও আমি অমনি অমনি করছিলাম। ভাবলাম একবার বাজিয়ে দেখি মেয়েমানুষটাকে, কিন্তু এমন হাউমাউ শুরু করে দিল . . . কী হল, খড় দিয়েছ? নেই বলছ? পড়শীদের কারও বাড়িতে আছে কি?'

চাবুকটা সজোরে ঘোরাতে ঘোরাতে শিস দিতে দিতে সে বেরিয়ে গেল। এর কিছু পরেই গোটা দলটা গ্রামে এসে ঢুকল। দলে সঙিনধারী ও তলোয়ারধারী মিলে প্রায় আটশ'জন সৈন্য। রেড গার্ডদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চীনে লাত্‌ভীয় ও অন্যান্য বিদেশী জাতের। তারা গ্রামের বাইরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল। স্পষ্টই বোঝা গেল নানা জাতের লোকজন নিয়ে তৈরি এই উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলটার ওপর কোন আস্থা না থাকায় তাদের কম্যাণ্ডার গ্রামের ভেতরে রাত না কাটানোই সমীচীন বিবেচনা করেছে।

ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী শক্তি হাইদামাক আর যে-সমস্ত জার্মান ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে মার্চ করতে করতে আসছে, তাদের হাতে পরাস্ত হয়ে দু'নম্বর সমাজতন্ত্রী ফৌজের তিরাস্পোল্‌ দলটি লড়াই করতে করতে ব্যূহ ভেদ করে দনের দিকে বেরিয়ে এসেছে। শেপ্‌তুখোভ্‌কা স্টেশনে এসে তারা গাড়ি থেকে

নেমে পড়ল। যেহেতু সামনেই জার্মানরা আছে তাই উত্তরে ভরোনেজ প্রদেশে গিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে মিগুলিন্‌স্কায়া জেলার বসতিগুলোর ওপর দিয়ে অভিযানের কায়দায় চলতে লাগল। গুণ্ডা-বদমাশ জাতীয় লোকজনে ছেয়ে গেছে সৈন্যদল, তাদের প্রভাবে রেড গার্ডরা মনোবল হারিয়ে পথে উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে। রাত্রে সেত্রাকভ গ্রামের বাইরে তাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল। কিন্তু কম্যাণ্ডারদের ধমকানি ও নিষেধ সত্ত্বেও ষোলই এপ্রিল রাত্রে তারা দলে দলে গ্রামে গিয়ে ঢুকে ভেড়া জবাই করতে লাগল, গ্রামের প্রান্তে দুটি কসাক মেয়েকে ধর্ষণ করল, বারোয়ারিতলায় অকারণে গুলিগোলা চালাল, তাদের নিজেদেরই একজন তাতে আহত হল। চৌকির পাহারাদাররা রাত্রে আকণ্ঠ মদ খেয়ে চুর হয়ে রইল (সঙ্গের রসদ ইউনিটের প্রত্যেকটা গাড়িতে মদের মজুত ছিল)। কিন্তু ইতিমধ্যে আশেপাশের গ্রামগুলোকে সাবধান করে দেবার জন্য কসাকরা তিনজন ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে কসাকরা ঘোড়ায় জিন চাপাল, অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে তৈরি হল, লড়াই-ফেরতা লোকজন আর বুড়োদের নিয়ে চটপট কয়েকটা সৈন্যদল বানিয়ে ফেলল। বিভিন্ন গ্রামে যে-সব অফিসার, এমনকি সার্জেন্ট-মেজর বাস করত তাদের পরিচালনায় সেত্রাকভের অভিমুখে জমা হতে লাগল, গিরিখাতের ভেতরে আর টিলার আড়ালে জমায়েত হয়ে তারা রেড গার্ডদের দলগুলোকে ঘেরাও করে রইল। মিগুলিন্‌স্কায়া, কলোদেজ্‌নি আর বগমোলভ থেকে সে রাত্রে অর্ধেক হয়ে একেকটা স্কোয়াড্রন বেরিয়ে পড়ল। চির-এর উজান অঞ্চল, নাপোল, কালিনভ্‌কা, এইয়া আর কলোদেজের লোকজনের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেল।

আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাগুলো ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে নিভে আসছে। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, এমন সময় হারে-রে-রে করতে করতে চারদিক থেকে প্রবল বন্যাস্রোতের মতো রেড গার্ডদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কসাক ঘোড়সওয়াররা। একটা মেশিনগান গর্জন করে উঠল – পরক্ষণেই থেমে গেল। বিশৃঙ্খল, এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ চলল – তা-ও থেমে গেল ; এরপর নিঃশব্দে চলল কাটাকাটি।

এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ খতম। বাহিনীটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দু'শ' জনেরও বেশি কাটা পড়ে কিংবা গুলিগোলায় প্রাণ হারাল, প্রায় পাঁচশ' জন বন্দী হল। চারটে করে ভারী কামানের দুটো ব্যাটারি, ছাব্বিশটা মেশিনগান, এক হাজার রাইফেল আর বিপুল পরিমাণে মজুত সামরিক সরঞ্জাম কসাকদের হাতে এলো।

পরদিন দেখা গেল সমস্ত মহকুমাজুড়ে বড় বড় সড়ক আর পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে ছোট ছোট লাল পতাকা উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে বার্তাবহরা।

গ্রামেগঞ্জে সাড়া পড়ে গেল। সোভিয়েতগুলো উচ্ছেদ করে দিয়ে তার জায়গায় তাড়াহুড়ো করে আতামান নির্বাচন করা হয়ে গেল। কাজান্‌স্কায়া ও ভিওশেন্‌স্কায়া জেলা সদর থেকে বিলম্বে স্কোয়াড্রন যাত্রা করল মিগুলিন্‌স্কায়ার দিকে।

এপ্রিলের তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যেই দনেৎস প্রদেশের উজানের জেলাগুলো বেরিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তারা দনের উজান এলাকা নাম দিয়ে নিজেদের এক প্রদেশ গঠন করে ফেলল। গ্রামের সংখ্যাধিক্যে এবং আয়তনে এই প্রদেশের মধ্যে মিখাইলোভ্‌স্কায়া জেলার পর যার স্থান সেই জনবহুল ভিওশেন্‌স্কায়াকে প্রদেশের কেন্দ্র নির্বাচন করা হল। তাড়াতাড়ি করে আগেকার বিভিন্ন পল্লী থেকে কেটে কেটে নতুন নতুন জেলা বার করা হতে লাগল। শুমিলিন্‌স্কায়া, কার্গিন্‌স্কায়া ও বকোভ্‌স্কায়া জেলা গড়ে উঠল। বারোটি জেলা ও একটি ইউক্রেনীয় বিভাগ নিয়ে তৈরি দনের এই উজান এলাকা মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার নিজস্ব জীবনযাত্রা শুরু করে দিল। আগেকার দনেৎস প্রদেশের কাজান্‌স্কায়া, মিগুলিন্‌স্কায়া, শুমিলিন্‌স্কায়া, ভিওশেন্‌স্কায়া, ইয়েলান্‌স্কায়া, কার্গিন্‌স্কায়া, বকোভ্‌স্কায়া ও পনমারিওভ্‌-স্কায়া বিভাগ, আগেকার উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসার উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া ও ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া আর খোপিওর্‌স্কায়া প্রদেশের বুকানোভ্‌স্কায়া, স্লাশ্চেভ্‌স্কায়া ও ফেদোসে-য়েভ্‌স্কায়া – দনের উজান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হল। মিলিটারী একাডেমীর এক স্নাতক, ইয়েলান্‌স্কায়া জেলার জনৈক কসাক জেনারেল জাখার আকিমভিচ আল্‌ফিওরভ সর্বসম্মতিক্রমে প্রদেশের আতামান নির্বাচিত হল। লোকে বলে আল্‌ফিওরভ নাকি একমাত্র তার স্ত্রীর গুণেই নিম্নপদস্থ অফিসার থেকে এত উঁচুতে উঠতে পেরেছে। তার স্ত্রী অত্যন্ত উদ্যোগী ও বুদ্ধিমতী মহিলা। শোনা যায় সে-ই তার অপদার্থ পতিদেবতাটিকে কানে ধরে টেনে তুলেছে, একাডেমীর পরীক্ষায় তিন তিন বার ফেল করার পর চার বারের বার পাশ না করা পর্যন্ত তাকে স্বস্তি দেয় নি।

কিন্তু আজকের দিনে আল্‌ফিওরভকে নিয়ে গল্পগুজব হলেও তা খুবই কম। কসাকদের মনের অবস্থা এখন সেরকম নেই।

বাইশ

বন্যার জল সবে মাঠ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। ঘাস-জমিতে, বাগানের বেড়ার ধারে ধারে বাদামী রঙের পলিমাটি জেগে উঠেছে; যে সব নলখাগড়া, শুকনো ডালপালা আর গত বছরের ঝরা পাতা বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিল, ভেঙে পড়া গাছের যে-সমস্ত গুঁড়ি দনের কূলপ্লাবী তরঙ্গের স্রোতে

এখানে এসে আটকে পড়েছে সেগুলো চারধারে সীমানার দাগের মতো দেখাচ্ছে। দনের ধারের বনভূমি ডুবে গিয়েছিল। সেখানকার উইলোঝাড়গুলো চোখে পড়ার মতো সবুজ হতে শুরু করেছে, তাদের ডালপালা থেকে গোছা গোছা ঝুমকো ঝুলছে। পপ্‌লার গাছের কোঁড়া ফুটি ফুটি করছে। উঠোনের চারধারে এখনও বন্যার জল জমে আছে, উইলোর তরুণ শাখাগুলো তার ওপর ঝুঁকে আছে। তার হলুদ ফুরফুরে কুঁড়িগুলো হাওয়া দুলতে দুলতে সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়ে-আসা হাঁসের ছানার মতো ঢেউতোলা জলের মধ্যে ডুবছে ভাসছে।

ভোরবেলায় বুনো হাঁস, পাতিহাঁস আর বালিহাঁসের দল খাবারের খোঁজে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বেড়ার ধারে চলে আসে। জলার পাখিগুলো বিলের জলে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে থাকে। এমনকি দুপুরবেলাও চোখে পড়ে হাওয়ায় উত্তাল দনের বিপুল বিস্তারের মধ্যে তরঙ্গমালা সাদা পেটওয়ালা বালিহাঁসগুলোকে পরম আদরে দোল খাওয়াচ্ছে।

সে বছর বাসাবদলকারী পাখি অনেক এসেছিল। ভোরবেলায় সূর্যোদয়ের মদির লাল ছটার জলে যখন রক্তের ছোপ ধরে, তখন নৌকো বেয়ে পাতা জালের কাছে যেতে যেতে কসাক জেলেরা প্রায়ই দেখতে পায় বনজঙ্গলে আড়াল করা জলের ওপর রাজহাঁসের দল বিশ্রাম করছে। কিন্তু খ্রিস্তোনিয়া আর মাত্‌ভেই কাশুলিন দাদু গ্রামে যে খবর নিয়ে এলো তা রীতিমতো অদ্ভুত। তারা গেরস্থালির কাজের জন্য গোটা দুয়েক করে ওকের চারা আনতে সরকারী জঙ্গলে গিয়েছিল। বনের ভেতরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা জায়গা দিয়ে তারা যখন যাচ্ছিল সেই সময় একটা গিরিখাতের ভেতর থেকে বাচ্চাসুদ্ধ এক বুনোছাগল তাদের দেখে চমকে যায়। হলদে বাদামী রঙের রোগা ছাগলটা বুনো কাঁটাঝোপ আর আগাছায় ভর্তি নাবাল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে কাঠুরেদের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, তার সুন্দর ছাঁদের সরু সরু ঠ্যাঙগুলো উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল, ছানাটা দাঁড়িয়ে রইল তার গা ঘেঁষে। খ্রিস্তোনিয়া অবাক হয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠতে ওকের চারাগুলোর মধ্য দিয়ে সেটা এত জোরে দৌড়ে গেল যে তার নীলচে-ময়ূরকণ্ঠী রঙের চকচকে খুরগুলোর তলা আর উটের গায়ের রঙের মতো বেঁড়ে লেজটা কসাক দু'জন শুধু এক ঝলক চোখে দেখতে পেল।

'কী ধরনের জীব এটা?' অবাক হয়ে কুড়ুলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে মাত্‌ভেই কাশুলিন জিজ্ঞেস করল।

একটা দুর্বোধ্য পুলকে অভিভূত হয়ে যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ গোটা বনটা কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল খ্রিস্তোনিয়া, 'ছাগল! পাহাড়ী ছাগল! ভগবানের আশীর্বাদে বেঁচে আছে! কার্পাথিয়ার পাহাড়ে এরকম ছাগল আমরা দেখেছি!'

'আহা লড়াইয়ের তাড়া খেয়ে বেচারি আমাদের স্তেপে ঢুকে পড়েছে!'

সায় দেওয়া ছাড়া খ্রিস্তোনিয়ার আর কোন উপায় রইল না।

'তা-ই হবে। বাচ্চাটাকে দেখেছ দাদু? শালা, কী সুন্দর মাইরি! একেবারে একটা বাচ্চা ছেলের মতো!'

গ্রামে ফেরার পথে সর্বক্ষণ তারা এ অঞ্চলে আগে কারও চোখে-না-দেখা বুনো জন্তুটার কথা আলোচনা করতে করতে চলল। মাত্‌ভেইদাদু কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর মনের সন্দেহ প্রকাশ না করে পারল না।

'কিন্তু ওটা কি সত্যি সত্যিই ছাগল ছিল?'

'ছাগল। মাইরি বলছি ছাগল! ছাগল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না!'

'কিন্তু ছাগলই যদি হবে . . . তাহলে শিঙ নেই কেন?'

'শিঙ দিয়ে তোমার হবেটা কী?'

'আমার দরকার কি না কথাটা তা নয়। আমার প্রশ্ন হল ছাগল জাতেরই জন্তু যদি হবে . . . তাহলে ওটার ছাঁদের ঠিক নেই কেন? শিঙ ছাড়া ছাগল কখনও দেখেছ? ঠিক কথা বলেছি কিনা? কোন বুনো জাতের ভেড়াও ত হতে পারে?'

'দেখ মাত্‌ভেইদাদু, বয়সে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে!' খ্রিস্তোনিয়া চটে উঠল। 'মেলেখভ্‌দের বাড়ি গিয়ে দেখে এসো। ওদের গ্রিশ্‌কার একটা চাবুক আছে – ছাগলের ঠ্যাঙের চামড়ায় মোড়া। গিয়ে দেখ দেখি, চিনতে পার কিনা?'

মাত্‌ভেইদাদু কিন্তু ঠিক সেই দিনই মেলেখভ্‌দের বাড়ি গিয়ে হাজির। গ্রিগোরির চাবুকের হাতলটা সত্যি সত্যি বুনো ছাগলের ঠ্যাঙের চামড়ায় কায়দা করে মোড়া। এমনকি হাতলের মাথায় ছাগলের ঠ্যাঙের ছোট্ট খুরটাও পুরোপুরি বজায় আছে, ওই রকমই কায়দা করে একটা তামার নালের সঙ্গে সেটা লাগান, হাতলের শোভাবর্ধন করছে।

লেন্ট পরবের সংযম ব্রতের শেষ সপ্তাহে বুধবার দিন খুব ভোরবেলা মিশ্‌কা কশেভয় বনের ধারে জলের মধ্যে পেতে রাখা ছাঁকা জালগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়ল। সে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তখন সবে চারদিক ফরসা হয়ে এসেছে। সকালের হিমে মাটি যেন কাঁপতে কাঁপতে জড়সড় হয়ে আছে, বরফের পাতলা আবরণের নীচে জমে শক্ত হয়ে গেছে কাদামাটি। মিশ্‌কার গায়ে তুলোঠাসা কোর্তা, পায়ে চামড়ার চটিজুতো, সালোয়ারের তলা মোজার মধ্যে গোঁজা। টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে ভোরের মাতাল করা হিমেল বাতাস আর জলের মিষ্টি সোঁদা গন্ধে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঘাড়ে একখানা লম্বা বৈঠা ফেলে সে হেঁটে চলল। নৌকোটা জলে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ দাঁড় বাইতে লাগল সে।

শিগ্‌গিরই সে তার জালগুলো একে একে দেখল, শেষ জালটা থেকে বেছে মাছ তুলে নিল, জালের পাশগুলো ঠিকঠাক করে রাখল, তারপর ধীরে ধীরে নৌকো বাইতে বাইতে সেখান থেকে সরে যাবার পর তামাক টানার ইচ্ছে হল তার। তখন ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে বেরোচ্ছে। পুব দিকে ছায়া ছায়া নীল সবজে আকাশের নীচের কিনারাটা যেন রক্ত ছিটানো। রক্ত যেন ধেবড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বেয়ে, তারপর সোনালি মরচে আভা ধারণ করছে। মিশ্‌কা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল একটা বুনো হাঁস আস্তে আস্তে উড়ে গেল। সে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে একপাশে সরে গেল, ঝোপঝাড়ে আটকে গিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। তিনটে জালে তার শিকার উঠেছে সের চারেক ওজনের একটা রুই মাছ, আর একগাদা চুনোপুঁটি মাছ – সেই দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে ভাবল, 'এর খানিকটা বেচে দিতে হবে। ট্যারা লুকেশ্‌কা নেবে, শুকনো নাশপাতি নেব তার বদলে। আমরা মায়ের তৈরি সেদ্ধ ফলের সরবত খাব।'

সিগারেট টানতে টানতেই নৌকো বেয়ে ঘাটের কাছে এলো। বাগানের বেড়ার ধারে যেখানে সে নৌকো ভিড়ায় সেখানে একজন কাকে যেন বসে থাকতে দেখল। কৌশলে দাঁড় টানতে টানতে আরও জোরে নৌকো বাইতে লাগল সে, মনে মনে ভাবল, 'কে হতে পারে লোকটা?'

বেড়ার ধারে উবু হয়ে বসে আছে গোলাম। খবরের কাগজ দিয়ে পাকানো একটা বিশাল সিগারেট টানছে সে। তার কুতকুতে ধারাল চোখদুটো ঘুমজড়ানো, জ্বলজ্বল করছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে গালদুটো কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া আর ধূসর দেখাচ্ছে।

'কী ব্যাপার তোমার?' মিশ্‌কা হাঁক দিল। একটা গোল বলের মতো ঢপঢপ আওয়াজ করে জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল তার চিৎকার।

'এদিকে এসো।'

'মাছ চাই নাকি?'

'মাছ দিয়ে আমি কী করব ছাই!'

ফাটা ফাটা গলায় কাশতে লাগল গোলাম, খক করে একগাদা গয়ার উগড়ে ফেলল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। গ্রেটকোটটা তার নিজের মাপের তুলনায় বড়, ক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার গায়ের জামার মতো ঢলঢল করছে। টুপির ঝুলন্ত কানাতের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে তার খাড়া দুই কানের নরম হাড়। এই কিছুদিন হল গ্রামে তার আবির্ভাব ঘটেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে রেড গার্ড হওয়ার 'কুখ্যাতি'। সৈন্যদল ভেঙে যাবার পর সে কোথায় ছিল এই বিষয়ে কসাকরা তাকে অনেক

জিজ্ঞেসবাদ করে, কিন্তু গোলাম তাদের প্রশ্নের দায়সারা গোছের উত্তর দিয়েছে, বিপজ্জনক আলোচনাগুলো এড়িয়ে গেছে। ইভান আলেক্সেয়েভিচ আর মিশ্‌কা কশেভয়ের কাছেই শুধু স্বীকার করেছে যে চার মাস ইউক্রেনের রেড গার্ডদের দলে ছিল, ইউক্রেনীয় জাতীয় বাহিনী হাইদামাকদের হাতে বন্দী হয়, সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সিভের্সের আর্মিতে ঢুকে পড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে রস্তোভের আশেপাশে অভিযান চালায়, তার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা মেরামত করে তোলার জন্য নিজেই নিজের ছুটি করিয়ে নিয়েছে।

গোলাম মাথার টুপি খুলল, সজারুর মতো খাড়া খাড়া চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে চার দিকে তাকাল। নৌকোর কাছে এগিয়ে এসে ফোঁস ফোঁস করে বলল, 'গতিক খারাপ, বড়ই খারাপ। . . . মাছ ধরা-টরা ছাড়্! মাছ ধরতে ধরতে আমরা নিজেদের কথা বেবাক ভুলে বসে আছি। . . .'

'কী খবর তোর – বল দেখি।'

মাছের আঁশটে গন্ধমাখা হাত দিয়ে গোলামের হাড়-বার-করা হাতটা চেপে ধরে আন্তরিক হাসি হাসল মিশ্‌কা। ওদের বন্ধুত্ব বহু কালের।

'গতকাল মিগুলিন্‌স্কায়ার কাছে রেড গার্ডরা চুরমার হয়ে গেছে। ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেল রে ভাই। . . . এবারে চারদিকে ফেঁসো উড়তে থাকবে! . . .'

'কোন্ রেড গার্ডরা? মিগুলিন্‌স্কায়াতে এলো কী করে?'

'জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তারা। কসাকরা বাগে পেয়ে তাদের সাফ করে দিয়েছে। . . . একগাদা লোককে বন্দী ক'রে কার্গিন্‌স্কায়াতে নিয়ে গেছে। সেখানে এতক্ষণে কোর্টমার্শালে বিচারও শুরু হয়ে গেছে। আজ আমাদের এখানে ফৌজে ডাকার জন্যে লোকজন জমায়েত করা হবে। দেখো সকাল থেকে যে-কোন সময় কেমন ঘণ্টা বাজা শুরু হয়ে যায়।'

কশেভয় নৌকোটা বেঁধে একটা থলের মধ্যে মাছগুলো ভরল, তারপর বিশাল বৈঠাটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। গোলাম একটা বাচ্চা ঘোড়ার মতো তিড়িংবিড়িং করতে করতে তার পাশে পাশে চলতে লাগল, মাঝে মাঝে হাতদুটো অনেকখানি ছড়িয়ে দোলাতে দোলাতে গ্রেটকোটের ঝুলটা গুটিয়ে আগে আগে ছুটতে লাগল।

'ইভান আলেক্সেয়েভিচ আমাকে বলেছে। আটাকলে আমার ডিউটি শেষ হতে এইমাত্র গেল কাজ করতে। সারা রাত ধরে আটাকলে হুড়মুড়, দুদ্দাড়! – কাজের আর শেষ নেই। কত গমই যে আনা হয়েছে! ও শুনেছে খোদ কর্তার মুখে। ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে কোন্ এক অফিসার যেন সের্গেই প্লাতোনভিচের কাছে এসেছে।'

এই কয়েক বছরের লড়াইয়ে মিশ্‌কার মুখের চেহারাটা যেমন সাবালক হয়ে

উঠেছে তেমনি তার জৌলুসও যেন কমে গেছে। গোলামের কথায় তার মুখের ওপর একটা বিমূঢ় ভাব খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন তাহলে কী করা?' আড়চোখে গোলামের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী করা এখন?'

'গাঁ থেকে সটকে পড়া দরকার।'

'কোথায়?'

'কামেন্স্কায়া।'

'ওখানে যে কসাকরা আছে!'

'একটু বাঁ দিকে।'

'কোথায়?'

'ওব্লিভি।'

'কী করে এখান থেকে পার পাওয়া যাবে?'

'ইচ্ছে থাকলেই তা করা যায়! যদি না করতে পারিস - থেকে যা, থেকে পচে মর্ গে!' গোলাম হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল। ''কোথায়? কোথায়?' আমি তার কী জানি ছাই? সে রকম বেকায়দায় পড়লে নিজেই বেরোবার উপায় খুঁজে বার করতে পারবি! নাকে শুঁকে বার করবি!'

'মাথা গরম করছিস কেন? অমন গরম মাথা নিয়ে শেষকালে ফেসাদে পড়বি, বুঝবি? তা ইভান কী বলছে?'

'তোমার ইভানকে নড়াতে নড়াতে. . .'

'আচ্ছা, আচ্ছা, অত গোলমাল করিস নে। . . . একটা মেয়েমানুষ এই দিকে তাকিয়ে আছে।'

তারা ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখল। একটা অল্পবয়সী মেয়েমানুষ, চালিয়াত আভ্‌দেইচের ছেলের বৌ বাড়ির উঠোন থেকে গোরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যে চৌমাথাটা পড়ল সেখানে আসার পর মিশ্‌কা হঠাৎ পিছনে ফিরল।

'কোথায় চল্লি?' গোলাম অবাক হয়ে গেল।

পেছন ফিরে না তাকিয়েই কশেভয় বিড়বিড় করে বলল:

'যাই, জালগুলো তুলে ফেলি গিয়ে।'

'কী জন্যে?'

'ওগুলো খোয়াতে যাব কেন?'

'তাহলে আমরা সটকাচ্ছি?' গোলাম উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মিশ্‌কা হাতের বৈঠাটা নেড়ে দূর থেকে বলল:

'ইভান আলেক্সেয়েভিচের কাছে চলে যা। জালগুলো বাড়ি রেখেই আমি আসছি।'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ এই ফাঁকে তার ঘনিষ্ঠ কসাকদের মহলে সংবাদটা

জানিয়ে দিতে পেরেছে। তার বাচ্চা ছেলেটা মেলেখভ্‌দের বাড়ি ছুটে গিয়ে গ্রিগোরিকে নিয়ে এসেছে। খ্রিস্তোনিয়া বিপদের আঁচ পেয়ে নিজেই এসে হাজির হয়েছে। শিগ্‌গিরই কশেভয়ও ফিরে আসতে পরামর্শ শুরু করে দিল ওরা। সকলেই একসঙ্গে তড়বড়িয়ে কথা বলতে চায় – যে-কোন মুহূর্তে বিপদের ঘণ্টি বাজার আশঙ্কা।

'এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হয়! আজই ছিপ গুটানো দরকার!' ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল গোলাম।

'এর পেছনে তুমি আমাদের কোন যুক্তি দেখাতে পার কি? – কেন আমরা যাব?' খ্রিস্তোনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কেন মানে? ফৌজে নামার হুকুম জারী হয়ে যাবে – তুমি কি ভাবছ পার পাবে?'

'আমি যাব না – ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল!'

'তোমাকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাবে।'

'অতই সোজা! আমি ত আর গলায় দড়ি বাঁধা এঁড়ে বাছুর নই!'

ইভান তার ট্যারা বৌটাকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিল, তারপর চটে গিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'ওদের নেওয়ার কথা – ওরা ঠিকই নেবে। . . . গোলাম ঠিক কথা বলেছে। কিন্তু এখন একমাত্র প্রশ্ন, কোথায় আমরা যাব? সেইখেনেই ত গেরো!'

'আমি ত তখনই ওকে বলেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিশ্‌কা কশেভয়।

'তোমরা কি ভাব তোমাদের মতো লোকদের আমার ভারী দরকার? আমি একাই যাব! অমন খুঁতখুঁতে লোকজনে আমার কোন কাজ নেই। 'এটা কেন, ওটা কেন? . . .' হ্যানাত্যানা . . . কত প্রশ্ন! যখন তোমাদের পিষে মারবে আর বলশেভিক মতের জন্যে ধরে ধরে জেলে পুরবে তখন ঠ্যালাটা টের পাবে। . . . তামাসা পেয়েছ নাকি? কী রকম সময় বুঝতে পারছ না? . . . যখন তখন সব রসাতলে যেতে পারে! . . .'

গ্রিগোরি মেলেখভ দেয়াল থেকে টান মেরে একটা মরচে ধরা পেরেক খুলে নিয়েছিল। কী রকম যেন একটা চাপা রাগে গরগর করতে করতে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে দু'হাতের মধ্যে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঠাণ্ডা গলায় গোলামকে বাধা দিয়ে সে বলল।

'তুমি অমন ভ্যাজর ভ্যাজর কোরো না বাপু! তোমার কথা আলাদা – তোমার আগুও নেই পিছুও নেই – যখন যেখানে খুশি যেতে পার। কিন্তু আমাদের ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। আমার বৌ আছে, দুটো বাচ্চা আছে। . . . গোলাবারুদের গন্ধ তোমার চেয়ে অনেক বেশি আমাকে শুঁকতে হয়েছে!' তার কালো চোখদুটো হঠাৎ ক্রোধভরে মিটমিট করতে লাগল, হিংস্র কুকুরের মতো

কষের দাঁত বার করে সে খিঁচিয়ে উঠল, 'তুমি যত খুশি বুকনি ঝাড়তে পার। তোমার আর কী? যেমন গোলাম ছিলে, তেমনি গোলাম রয়ে গেছ তুমি! ওই গায়ের জামাটা ছাড়া ত তোমার আর কিছুই নেই। . . .'

'তুমি অমন মুখ খিঁচাচ্ছ কেন? অফিসারগিরি ফলাতে এসেছ? চেঁচিও না বলছি! আমি তোমার তোয়াক্কা করি ভেবেছ?' গোলামও পাল্‌টা চেঁচিয়ে উঠল।

ঝোড়ো কাকের মতো মুখটা রাগে ফেকাসে হয়ে গেল, তার কুতকুতে চোখদুটো সরু কোটরের ভেতরে ভয়ঙ্কর হিংস্র ভাবে ছটফট করতে লাগল, এমনকি তার মুখের ধোঁয়াটে খোঁচা খোঁচা দাড়ি যেন খাড়া হয়ে নড়তে লাগল।

রেড গার্ডদের দলগুলো যে ওদের এই জেলায় এসে ঢুকছে ইভান আলেক্সেয়েভিচের মুখে এ খবর শোনার পর গ্রিগোরির মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় মনের মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল তারই ঝালটা সে ঝাড়ল গোলামের ওপরে। গোলামের পাল্‌টা চিৎকারে গ্রিগোরি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে যেন আঘাত খেয়ে লাফিয়ে উঠল। গোলাম যেখানে একটা টুলের ওপর বসে বসে উস্‌খুস করছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল, তাকে একটা রদ্দা বসিয়ে দেবার জন্য গ্রিগোরির হাত নিশ্‌পিশ করতে লাগল; কিন্তু অনেক কষ্টে হাত গুটিয়ে নিয়ে সে বলল, 'চোপ, শয়তান! ইতর! উল্লুক! তুই হুকুম দেবার কে রে? কেটে পড়্! কেউ তোকে ধরে রাখছে না! ভাগ এখেন থেকে, তোর ওই দুর্গন্ধ যেন ত্রিসীমানায় না থাকে! হয়েছে, হয়েছে, আর কোন কথা নয়, নইলে এমন দাওয়াই দিয়ে বিদেয় করব যে চিরকাল মনে থাকবে। . . .'

'ছাড়্ গ্রিগোরি! এটা কোন কাজের কথা নয়!' গোলামের কোঁচকানো নাকের সামনে থেকে গ্রিগোরির পাকানো মুঠোটা সরিয়ে দিয়ে কশেভয় বলে উঠল।

'ওসব কসাক-মেজাজ ছাড়! . . . লজ্জা করে না? ছি ছি মেলেখভ! লজ্জা হওয়া উচিত তোমার!'

গোলাম টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আনাড়ির মতো কাশতে কাশতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকাটের কাছে গিয়ে আর নিজেকে সামলাতে পারল না – ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রিগোরি মুখ বেঁকিয়ে হাসছে দেখে খোঁচা মেরে বলল, 'আবার কিনা রেড গার্ডে ছিল! . . . শালা, জারের মিলিটারি পুলিশ! . . . অমন বহু লোককে আমরা গুলি মেরে উড়িয়ে দিয়েছি!'

এবারে গ্রিগোরিও নিজেকে আর সামলাতে পারল না – ধাক্কা মেরে গোলামকে বারান্দায় বার করে দিতে দিতে তার ক্ষয়ে যাওয়া ফৌজী বুটজোতার হিলে পায়ের ঠোক্কর মেরে বিশ্রী গলায় সে হুমকি দিয়ে বলল, 'ভাগ্ এখেন থেকে! নইলে ঠ্যাঙদুটো ছিঁড়ে ফেলব!'

'আরে এসব কী হচ্ছে! এ যে দেখি একেবারে বাচ্চা ছেলেদের মতো শুরু করে দিলে!'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ সায় দিতে না পেরে আড়চোখে কটমট করে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল।

কশেভয় চুপচাপ ঠোঁট কামড়াতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল কোন একটা কটু কথা জিভের ডগায় আনতে আনতে সে সামলে নিল।

'আরে অন্যে কী করবে না করবে সে দায়িত্ব ওকে নিতে কে বলেছে? ওর অত ক্ষেপে যাওয়ার কী আছে?' গ্রিগোরি একটু ভেবাচেকা খেয়ে নিজের আচরণকে সমর্থন করার চেষ্টা করল। খ্রিস্তোনিয়া তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল – সেদিকে চোখ পড়তে একটা ছেলেমানুষী সরল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'ওকে প্রায় মেরেই বসেছিলাম আরেকটু হলে। . . . কিন্তু ওই ত শরীরের হাল! মারার মতো জায়গাটা কোথায়! . . . একখানা ঝাড়লেই খতম হয়ে যেত।'

'যাক, তোমরা তাহলে কী বল? কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

মিশ্‌কা কশেভয় প্রশ্নটা করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ইভান আলেক্সেয়েভিচের দিকে। তার সেই দৃষ্টির সামনে পড়ে বিব্রত হয়ে ঠেকে ঠেকে ইভান আলেক্সেয়েভিচ বলল:

'তাহলে, মিখাইল! . . . গ্রিগোরি একদিক থেকে দেখতে গেলে ঠিকই বলেছে। আমরা কী করে রাতারাতি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই? আমাদের পরিবার আছে, ঘরসংসার আছে। . . . দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলতে দাও! . . .' মিশ্‌কাকে অধৈর্য হয়ে উসখুস করতে দেখে সে তড়বড় করে বলে চলল, 'হয়ত কিছুই হবে না। . . . কে বলতে পারে? সেত্রাকভের কাছে দলটাকে ওরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আর কেউ ত ঢুকতে না-ও পারে। . . . আমরা বরং একটু অপেক্ষা করব। পরে দেখা যাবে। বলতে গেলে কি আমারও ঘরে বৌবাচ্চা আছে। আমাদের সব কাপড়জামা ছিঁড়ে গেছে, ঘরে আটা-ময়দা নেই। . . . তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেলাম – এ কী করে হয়? ওদের তাহলে কী হবে?'

মিশ্‌কা বিরক্তিভরে ভুরু নাচাল। মাটির মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল।

'তাহলে যাবার কথা ভাবছ না?'

'আমার মনে হয় অপেক্ষা করে দেখাই ভালো। পালাবার সময় যখন তখন পাওয়া যাবে। . . . আপনি কী মনে করেন গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ? আর তুমি, খ্রিস্তোনিয়া? . . .'

'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে . . . আমাদের কিছুটা সময় কাটাতে হবে . . . এই ত?'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ আর খ্রিস্তোনিয়ার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সমর্থন পেয়ে যেতে গ্রিগোরি যেন ধড়ে প্রাণ পেল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! সেই কথাই ত আমি বলছিলাম। সেই জন্যেই না গোলামের সঙ্গে আমার লেগে গেল! আরে এ ত আর আঙুর ক্ষেত থেকে আঙুরের থোকা কাটা নয়! এক, দুই – ব্যস, চুকে গেল! ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে.. ভাবতে হবে।...'

তার কথা শেষ হতে না হতে ঘণ্টা মিনার থেকে ঢং-ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল, আছাড় খেয়ে বন্যাস্রোতের মতো বারোয়ারিতলায়, রাস্তায় ঘাটে, অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল। ঘোলাটে বেনোজলের বুকের ওপর দিয়ে, ভিজে খড়িমাটির পাহাড়ের অন্তরীপের মাথার ওপর দিয়ে আওয়াজটা গড়াতে গড়াতে নীচে নেমে গেল, তারপর মশুরীর দানার মতো টুকরো টুকরো হয়ে বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল – অস্ফুট আর্তনাদ তুলে মিলিয়ে গেল। তারপর আরও একবার বেজে চলল ঢং-ঢং-ঢং! – এবারে অস্বস্তিকর, অবিশ্রান্ত।

'ওই শোনো, ডাক পড়ল!' খ্রিস্তোনিয়া ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে লাগল। 'আমি এক্ষুনি নৌকোয় গিয়ে উঠছি। ওই পাশটা দিয়ে একেবারে বনের ভেতরে চলে যাব। তারপর আর খুঁজে পায় কে আমাকে!'

'তাহলে এখন কী হবে?' কশেভয় বুড়ো মানুষের মতো দেহের ভার তুলে উঠে দাঁড়াল।

'এক্ষুনি যাচ্ছি নে আমরা,' সকলের হয়ে গ্রিগোরি উত্তর দিল।

কশেভয় আরও একবার ভুরু নাচাল, সোনালী কোঁকড়া চুলে পাকানো ভারী ঝুঁটিটা কপালের ওপর থেকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে সে বলল:

'আচ্ছা চলি তাহলে।... দেখা যাচ্ছে আমাদের রাস্তা এখন আলাদা আলাদা হয়ে গেল!'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল।

'তোমার বয়স কম, মিশ্‌কা, তাই মাথা গরম।... তুমি ভাবছ আমাদের রাস্তা আর এক হবে না? হবে, হবে! ভরসা রাখ!...'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে চলে এলো কশেভয়। উঠোনটা পার হয়ে পাশের বাড়ির মাড়াই-উঠোনের ভেতর দিয়ে পা চালাল। খানার কাছে জড়সড় হয়ে বসে ছিল গোলাম। সে যেন জানতই যে মিশ্‌কা এখানে আসবে। উঠে তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'ওরা রাজী হল না।'

'আমি আগেই জানতাম।... ওদের হিম্মৎ নেই।... আর গ্রিশ্‌কাটা বদের

ধাড়ি। তোর আবার বন্ধু! ও যদি কখনও কাউকে ভালোবেসে থাকে সে কেবল নিজেকে! আমাকে অপমান করল শালা শুয়োরের বাচ্চা! স্রেফ ওর গায়ের জোর বেশি বলে।... আমার কাছে রাইফেল ছিল না, তাই-নইলে ওটাকে খুন করতাম,' ধরা গলায় সে বলল।

তার পাশে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে তার মাথার কদমফুলের মতো খোঁচা খোঁচা চুলগুলোকে খাড়া হয়ে উঠতে থেকে মিশ্‌কা মনে মনে ভাবল, 'হ্যাঁ ঠিকই, নির্ঘাত খুন করে ফেলত!'

তারা দ্রুত চলতে লাগল। ঘণ্টার প্রত্যেকটি আওয়াজ যেন কশাঘাতে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

'চল্ আমাদের বাড়িতে একবার যাই। কিছু খাবারটাবার নিয়ে নিই-কী বলিস? পায়ে হেঁটে যাব, ঘোড়াটা ফেলে রেখে যাব। তুই কিছু নিবি না সঙ্গে?'

'আমার যা থাকার সবই আমার সঙ্গে।' গোলাম মুখ বাঁকাল। 'কোন চালচুলো নেই, দালানকোঠা জমিদারি কেনার মতো উপার্জনও করি নি।... গত পনেরো দিনের মাইনেটাও পাই নি। তা যাক গে, আমাদের ভুঁড়িওয়ালা মোখভ ওই নিয়ে বড়লোক হোক গে। আমি আমার মাইনে নিই নি দেখে ব্যাটা আনন্দে দু'হাত তুলে নাচবে।'

ঘণ্টা বাজা থামল। প্রভাত তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি, তার ঘুম ঘুম নিস্তব্ধতায় কোন ভাঙন ধরল না। পথের ধারে ছাইয়ের গাদার মধ্যে কতকগুলো মুরগী খোঁড়াখুড়ি করছে, পেট ভরে কচি দুব্বোঘাস খেয়ে নাদুসনুদুস বাছুরগুলো বেড়ার ধারে ঘোরাঘুরি করছে। মিশ্‌কা পেছন ফিরে তাকাল: কসাকরা দ্রুত বারোয়ারিতলার দিকে ছুটছে-ময়দানের জমায়েতে। কেউ কেউ বাড়ির উঠোন থেকে বেরিয়ে চলতে চলতেই লম্বা কোর্তা আর উর্দির বোতাম আঁটছে। একজন ঘোড়সওয়ার বারোয়ারিতলার ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্কুলের সামনে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েদের মাথার ওড়না আর পরনের ঘাঘরাগুলো সাদা ঝলক দিচ্ছে, ঘন কালো চাপ বেঁধে আছে পুরুষদের পিঠগুলো।

বালতি বাঁকে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল একটি মেয়েছেলে, রাস্তার মাঝখানে ওদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই অবস্থায় রাস্তা পার হওয়াটা প্রথাবিরুদ্ধ বলে সে চটে গিয়ে বলল, 'আগে বাড় না বাপু! রাস্তা পার হব যে!'

মিশ্‌কা তাকে নমস্কার জানাতে তার ধ্যাবড়া ভুরুজোড়ার নীচে হাসি ঝলকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কসাকরা সব ময়দানে যাচ্ছে, কিন্তু তোরা অন্যদিকে যাচ্ছিস যে? কী হল রে মিখাইল, ওখানে যাচ্ছিস না যে?'

'বাড়িতে একটু কাজ আছে।'

বাড়ির গলির কাছে এলো তারা। মিশাদের কুঁড়েঘরের চালাটা চোখে পড়ে, সেখানে একটা শুকনো চেরিগাছের ডালের সঙ্গে একটা ময়নার বাসা বাঁধা, বাসাটা হাওয়ায় দুলছে। ওপাশে টিলার ওপর আস্তে আস্তে ঘুরছে হাওয়া-কলের পালগুলো, একটা পাল থেকে খানিকটা তেরপলের কাপড় হাওয়ায় ছিঁড়ে গিয়ে পত্‌পত্‌ করছে, টিনের দোচালার চুড়োর গায়ে বাড়ি খাচ্ছে।

সূর্য তখনও জোরাল হয় নি, কিন্তু গরম আছে। দনের দিক থেকে তাজা হাওয়া বইছে। কোনায় আর্খিপ বগাতিরিওভের বাড়ির উঠোন। বাড়ির কর্তা বিশাল চেহারার সনাতনপন্থী বুড়ো, কোন এক সময় রক্ষিদলের গোলন্দাজ বাহিনীতে কাজ করত। কিছু মেয়েছেলে উঠোনে একটা বড় গোলাকার ঘরের দেয়ালে কাদা লেপছে, ইস্টার পরবের জন্য চুনকাম করছে। একজন গোবরগোলা এঁটেল মাটি পায়ে ছানছে। পরনের ঘাঘরাটা আঙুলের ডগা দিয়ে হাঁটুর অনেকখানি উঁচুতে তুলে ধরে গোল হয়ে ঘুরছে, অনেক কষ্টে কাদার ভেতর থেকে সে তার গৌরবর্ণের পুরুষ্টু পা টেনে টেনে তুলছে, পায়ের গুলিতে লাল লাল ডোরা দেখা যাচ্ছে – মোজার ডুরির দাগ, পাড়ের ডুরিগুলো সে হাঁটুর ওপরে টেনে তুলে দিয়েছে, শক্ত হয়ে কেটে বসেছে উরুর মাংসপেশীতে।

মেয়েমানুষটি নিজের চেহারা সম্পর্কে খুব সচেতন। সূর্য এখনও মাথার ওপর না চড়লে কী হবে রোদের ভয়ে মুখখানা সে রুমাল দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। আর দু'জন কমবয়সী মেয়েমানুষ – আর্খিপের দুই ছেলের বৌ – মই বয়ে সুন্দর ছাওয়া চালার নীচেকার নলখাগড়ার ধার পর্যন্ত উঠে গিয়ে চুনকাম করছে। জামার হাতা কনুইয়ের ওপর গুটিয়ে তারা চুনে গোলা ছোবড়ার তুলি বুলিয়ে যাচ্ছে, একেবারে চোখ অবধি রুমাল দিয়ে জড়ানো তাদের মুখের ওপর সাদা চুনকামের ছিটে এসে পড়ছে। কাজ করতে করতে তারা চমৎকার সুরেলা গলায় গান গাইছে। বগাতিরিওভের বড় ছেলের বিধবা বৌ মারিয়া প্রকাশ্যেই মিশ্‌কা কশেভয়ের পেছন পেছন ঘোরে। মুখে মেছেতার দাগ থাকলেও দেখতে শুনতে মন্দ নয়। পুরুষালি গোছের ভারী আর জোরাল বলে সারা গাঁয়ে তার গলার খ্যাতি আছে। নীচু গলায় সে গান ধরেছে:

...তোমার মতো কষ্ট কে হায় পায়...

অন্যেরা তার গানের কথাগুলো ধরল। তিনটে গলা নিপুণ সুর মিলিয়ে গেঁথে চলল নারীর তিক্ত, অকপট করুণ বিলাপ:

. . .পরান সখা, যুদ্ধে যারা যায়?
যদিও সখা ভরছে তোপে গোলা,
আমার কথা সাধ্য কি তার ভোলা? . . .

ঘাসজমি থেকে ঘোড়ার অবিরাম হ্রেষাধ্বনি ভেসে আসছে, তাইতে গানের কথাগুলো কেটে কেটে কানে বাজছে। মিশ্‌কা আর গোলাম গানটা শুনতে শুনতে বেড়ার কাছ দিয়ে চলতে লাগল।

. . .বার্তা এলো সরকারী ছাপ মারা
সখা আমার যুদ্ধে গেছে মারা।
মারা গেছে সখা আমার ওরে,
কোন্ সে ঝোপের তলায় আছে পড়ে। . . .

রুমালের নীচে মারিয়ার ধূসর চোখদুটি উষ্ণতায় চকচক করে উঠল। ফিরে তাকাতে পাশ দিয়ে মিশ্‌কাকে চলে যেতে দেখে চুনকামের ছিটে-লাগা মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, গভীর দরদভরা নীচু গলায় সে গাইল:

. . .দম্‌কা হাওয়া করছে মাতামাতি,
সোনার বরণ চুলের রাশি খাচ্ছে লুটোপুটি।
খয়েরি রঙের চোখদুটো কোন্ ফাঁকে,
খুবলে নিল মিশমিশে এক কাকে।

মিশ্‌কা গদগদ ভঙ্গিতে হাসল। মেয়েদের জন্য এ হাসি তার বাঁধা। বাড়ির যে মেয়েটি পায়ে কাদা মাটি ছানছিল তার নাম পেলাগেইয়া। মেয়েটির স্বামী ওদের বাড়ির ঘর জামাই। তার দিকে তাকিয়ে মিশ্‌কা বলল, 'আরেকটু ওপরে তোল গো, বেড়ার এ ধার থেকে দেখা যাচ্ছে না যে।'

মেয়েটা চোখ কুঁচকে বলল, 'দেখার ইচ্ছে থাকলেই দেখতে পাবে।'

মারিয়া সোজা হয়ে কোমরে হাত রেখে মইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চারপাশে তাকাতে তাকাতে গাঢ়স্বরে টেনে টেনে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে গো নাগর?'

'মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।'

'বেশি দূরে যেয়ো না। চল, গোলাঘরে গিয়ে একটু জড়াজড়ি করি গে।'

'শ্বশুর-টশুর কাউকেই দেখি কোন গেরাহ্যি নেই, বেহায়া মাগী!'

মারিয়া জিভ দিয়ে টকাস করে আওয়াজ তুলল, হো হো করে হাসতে

হাসতে চুনকামের ভিজে বুরুশটা মিশ্‌কার দিকে দোলাল। মিশ্‌কার টুপি আর কোর্তার ওপর চুনগোলা জলের ফোঁটা টপটপ করে ঝরে পড়ল।

'আরে অন্তত গোলামটাকে ধার দিলেও ত পারতে! আমাদের বাড়িঘর সাফাইতে হাত লাগাতে পারত!' মিছরির মতো সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে ওদের পেছনে চিৎকার করে বলল ছোট জা।

মারিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে কী যেন বলল, মেয়েরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল।

'আচ্ছা ছেনাল মাগী ত!' দ্রুত পা চালাতে চালাতে ভুরু কুঁচকে গোলাম বলল। কিন্তু মিশ্‌কার মুখে একটা কোমল অবসন্ন হাসি ফুটে উঠল। সে তাকে শুধরে দিয়ে বলল, 'আরে না, ছেনাল হতে যাবে কেন? অমনি, ফুর্তিবাজ আর কি! এই ত চলে যাব – পেছনে ফেলে যাব আমার ভালোবাসার জনকে। 'আহা আমার আকুলতা, বিদায় মাগি ওগো!'' গেটের মধ্য দিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে একটা গানের কলি আওড়াল সে।

তেইশ

কশেভয় চলে যাবার পর কসাকরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। গ্রামের মাথার ওপর তখনও বেজে চলেছে সেই বিপদ সঙ্কেতের ঘণ্টি, কুঁড়েঘরের ছোট ছোট জানলার শার্সিগুলো তাইতে অল্প অল্প ঝনঝন করতে লাগল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। চালাঘর থেকে মাটিতে পড়েছে সকালের ম্লান ছায়া। দুর্বোঘাসের ওপর শিশিরের ধূসর প্রলেপ লেগে আছে। শার্সির ভেতর দিয়ে পর্যন্ত আকাশটাকে দেখাচ্ছে গভীর আর নীলে নীল। আলুথালু মাথাটা হেঁট করে বসে ছিল খ্রিস্তোনিয়া। সেই দিকে তাকিয়ে দেখল ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

'হয়ত এতেই চুকেবুকে যাবে? মিগুলিনস্কায়ার লোকেরা ওদের চুরমার করে দিয়েছে, আর হয়ত ঢোকার কোন চেষ্টা করবে না। . . .'

'না, তা মনে হয় না . . .' সর্বাঙ্গ মোচড় দিয়ে বলল গ্রিগোরি। 'একবার যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আর দেখতে হবে না! কী বল, ময়দানে যাব কি আমরা?'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ টুপির দিকে হাত বাড়াল। মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকিঝুঁকি মারছিল তার মীমাংসা করতে করতে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা তোমরা বল দেখি, আমরা কি সত্যি সত্যিই কাদায় আটকে গেলাম না? মিখাইলের মাথাটা গরম হলে কী হবে সে কিন্তু কাজের ছেলে। . . . আমাদের দুয়ো দিয়ে চলে গেল।'

কেউ তার কথার কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে সকলে রওনা দিল বারোয়ারিতলার দিকে।

মাটির ওপর চোখ রেখে আনমনে চিন্তা করতে করতে চলতে লাগল ইভান আলেক্সেয়েভিচ। বিবেকের নির্দেশ না মেনে সে যে ছোটমনের পরিচয় দিয়েছে এই ভেবে সে মনে মনে কষ্ট পেতে লাগল। গোলাম আর কশেভয় ঠিকই করেছে; ইতস্তত না করে চলে যাওয়া উচিত ছিল। নিজের আচরণকে সমর্থন করার জন্য নিজেকে যে-সমস্ত বুঝ সে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল তার কোনটাই ধোপে টেঁকে না। ঘোড়ার খুর যেমন জমা জলের ওপরকার পাতলা বরফের স্তরকে মচমচ করে ভেঙে ফেলে ভেতরে ভেতরে কার যেন একটা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর সেগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে লাগল। এখন একমাত্র একটি স্থির সিদ্ধান্তই ইভান আলেক্সেয়েভিচ গ্রহণ করল – প্রথম যে লড়াই বাধবে তখনই পালিয়ে বলশেভিকদের দলে তাকে ভিড়তে হবে। ময়দানের দিকে যেতে যেতে এই সিদ্ধান্তটা তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল, কিন্তু না গ্রিগোরিকে না খ্রিস্তোনিয়াকে কাউকেই ইভান আলেক্সেয়েভিচ সে কথা বলল না; অস্পষ্ট ভাবে সে বুঝতে পারছিল যে ওদের উপলব্ধিটা একটু অন্যরকম, তাই মনের গভীরে কোথায় যেন ওদের সম্পর্কে একটু ভীতিও তার ছিল। তিনজনে একই সঙ্গে গোলামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, পরিবারের অজুহাত দেখিয়ে রাজী হয় নি; অথচ প্রত্যেকেই জানে তাদের এই ওজর-আপত্তিগুলো একেবারে ছেঁদো, যুক্তি হিশেবে ধোপে টেঁকে না। এখন ওরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে যে যার নিজের মতো করে একে অন্যের সামনে কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগল, যেন তারা কোন জঘন্য, লজ্জাকর কিছু একটা করে ফেলেছে। তারা নীরবে চলতে লাগল। কিন্তু মোখভ্‌দের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় এই গা গুলানো নীরবতা আর সহ্য করতে না পেরে নিজেকে এবং অন্য দু'জনকেও ধিক্কার দিয়ে সে বলে উঠল, 'অপরাধ গোপন করে কোন লাভ নেই। আমরা ফ্রন্ট থেকে এলাম বলশেভিক হয়ে, আর এখন কিনা সেঁধোচ্ছি ঝোপের নীচে! আমাদের হয়ে অন্য কেউ লড়াই করুক, আমরা মাগ-বৌদের নিয়ে . . .'

'আমি যা লড়াই করার করেছি, এবারে অন্যেরা করে দেখুক,' মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল গ্রিগোরি।

'ওরা কে? . . . ডাকাতী করে বেড়াবে, আর আমাদের কিনা যেতে হবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে? কী ধরনের রেড গার্ড বল ত? মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে, অন্যদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করছে। আমরা কী করতে যাচ্ছি একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখা দরকার। অন্ধ সব সময়ই আনাচে কানাচে গুঁতো খায়।'

‘তুমি যে ওকথা বলছ, তুমি কি নিজের চোখে দেখেছ খ্রিস্তোনিয়া?’ কঠিনস্বরে জিজ্ঞেস করল ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

‘লোকে ত তাই বলছে।’

‘ও . . . লোকে বলছে। . . .’

‘হয়েছে, হয়েছে! কেউ আবার শুনে ফেলতে পারে।’

কসাকদের সালোয়ারের দু'ধারের লাল ডোরা আর টুপিতে ময়দানের রূপ খুলে গেছে, ঝলমল করছে গোটা ময়দানটা; মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো কালো কালো হয়ে জেগে আছে ঝাঁকড়া লোমের লম্বা লম্বা টুপি। গোটা গ্রাম এসে জুটেছে – একমাত্র মেয়েছেলেরা ছাড়া। শুধুই বুড়ো হাবড়ার দল, লড়াই-ফেরতা বয়স্ক লোকজন আর অল্পবয়সী ছেলেছোকরারা। সামনে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ মাতব্বর লোকজন – অবৈতনিক হাকিম, গির্জার পরিষদের সদস্যবর্গ, স্কুলের পৃষ্ঠপোষক আর গির্জার তত্ত্বাবধায়ক। গ্রিগোরি এদিক ওদিক চোখ মেলে বাপের কাঁচাপাকা দাড়িটা খুঁজতে লাগল। বুড়ো মেলেখভ তার বেয়াই মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সামনে সমস্ত রকম সম্মানচিহ্নসমেত পলটনের ধূসর পোশাকী উর্দি গায়ে চাপিয়ে গাঁটওয়ালা লাঠির ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিশাকা দাদু। কোর্‌শুনভের পাশে চালিয়াত আভ্‌দেইচ – তাকে একটা টুকটুকে আপেলের মতো দেখাচ্ছে। মাত্‌ভেই কাশুলিনকেও দেখা যাচ্ছে। ত্‌সাত্‌সা-আতিওপিন একটা বেজায় জমকাল কসাক টুপি মাথায় দিয়েছে। আরও কিছু দূরে একটা নিরেট বেড়ার মতো অর্ধবৃত্তাকারে থিক-থিক করছে পরিচিত মুখগুলো – দেড়েল ইয়েগোর সিনিলিন, ‘ঘোড়ার নাল’ ইয়াকভ, আন্দ্রেই কাশুলিন, নিকলাই কশেভয়, ল্যাগবেগে বোর্‌শ্চিওভ, আনিকুশ্‌কা, মার্তিন শামিল, আটাকলের টিঙটিঙে মজুর গ্রোমভ, ইয়াকভ কলোভেইদিন, মের্কুলভ, ফেদোত বদভ্‌স্কোভ, ইভান তোমিলিন, ইয়েপিফান মাক্সায়েভ, জাখার করলিওভ আর চালিয়াত আভ্‌দেইচের ছেলে – বোঁচা নাক, ছোটখাটো চেহারার এক কসাক। ময়দান পেরিয়ে ওপাশে যেতে দলটার উলটো দিকে গ্রিগোরি দেখতে পেল তার দাদা পেত্রোকে। পেত্রোর জামার ওপর সেন্ট জর্জ ক্রসের গোলাপী কালো ফিতে ঝলমল করছে। নুলো আলেক্সেই শামিলের সঙ্গে দাঁত বার করে কথা বলছে সে। তার বাঁ দিকে জ্বলজ্বল করছে মিত্‌কা কোর্‌শুনভের সবুজ চোখদুটো। প্রোখর জিকভের সিগারেটের আগুনে সে তার সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে। প্রোখর তার বাছুরের মতো বড় বড় চোখ উল্‌টে নিজের সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে টানতে টানতে আগুন বাড়িয়ে দিয়ে মিত্‌কাকে ধরাতে সাহায্য করছে। পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে উঠতি বয়সের কসাকরা। গোল জায়গাটার মাঝখানে

একটা নড়বড়ে টেবিল বসানো। মাটি এখনও ভিজে থাকায় তার চারটে পায়াই অনায়াসে মাটিতে গেঁথে বসে গেছে। টেবিলটার ধারে বসে আছে গ্রামের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি নাজার, তার পাশে টেবিলের ওপর একটা হাত ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লেফ্‌টেনাণ্ট – গ্রিগোরি তাকে চেনে না। লোকটার মাথায় লম্বা ফলা লাগানো খাকি টুপি, পরনে কাঁধপটি লাগানো কোর্তা আর খাকি রঙের আঁটোসাঁটো চুস্ত প্যাণ্ট। বিপ্লবী কমিটির সভাপতি তাকে বিব্রত ভাবে কী যেন বলছে, লেফ্‌টেনাণ্ট একটু ঝুঁকে পড়ে সভাপতিমশাইয়ের দাড়ির সঙ্গে বিরাট খাড়া কানটা ঠেকিয়ে কথাগুলো শুনছে। ময়দানটা একটা মৌচাকের মতো মৃদু গুঞ্জনে ভরে উঠেছে। কসাকরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, হাসিঠাট্টা করছে, কিন্তু সকলেরই চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। দেরি দেখে ভিড়ের মধ্যে অল্পবয়সী কে একজন আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'শুরু করে দিন! আর দেরি কেন? প্রায় সবাই এসে গেছে!'

অফিসারটি সোজা হয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়াল, মাথার টুপি খুলল। তারপর পরিবার পরিজনের মধ্যে লোকে যে ভাবে কথাবার্তা বলে সেই রকম সহজ ভাবে বলতে শুরু করল:

'গাঁয়ের বুড়োকর্তারা, আর আপনারা, লড়াই-ফেরতা কসাক ভাইরা! সেত্রাকভ গ্রামে কী ঘটেছে আপনারা শুনেছেন কি?'

'কে এ? কোত্থেকে এলো?' গম্ভীর গলায় খ্রিস্তোনিয়া বলল।

'ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার, চোর্নায়া রেচ্‌কার লোক। সল্‌দাতভ না কী যেন নাম। . . .' একজন উত্তর দিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট বলে চলল, 'দিন কয়েক আগে রেড গার্ডদের একটা দল সেত্রাকভে এসেছিল। জার্মানরা ইউক্রেন দখল করেছে, আর দন ফৌজের প্রদেশের দিকে এগিয়ে আসার মুখে রেললাইন থেকে তাদের পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। রেললাইন থেকে সরে গিয়ে তারা মিগুলিন্‌স্কায়া এলাকার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। গ্রাম দখল ক'রে তারা কসাকদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করতে থাকে, মেয়েদের ধর্ষণ করা, বেআইনী গ্রেপ্তার ইত্যাদি নানা রকম কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেয়। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা এই ঘটনা জানতে পেরে অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে লুঠেরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রেড গার্ডদের দলটার অর্ধেক মারা পড়ে, বাকি অর্ধেক বন্দী হয়। মিগুলিন্‌স্কায়ার লোকেরা যুদ্ধজয় করে প্রচুর মূল্যবান সরঞ্জাম হাতিয়েছে। মিগুলিন্‌স্কায়া আর কাজান্‌স্কায়া জেলার লোকেরা বলশেভিক সরকারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ছোটবড় সমস্ত কসাকই প্রশান্ত দনকে রক্ষা করার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভিওশেন্‌স্কায়ার বিপ্লবী কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে,

তার জায়গায় জেলার আতামান নির্বাচন করা হয়েছে, বেশির ভাগ গ্রামেই এই ঘটনা ঘটেছে।'

লেফ্‌টেনান্টের বক্তৃতার এই জায়গায় বুড়োদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠল। সভাপতিমশাই ফাঁদে-পড়া নেকড়ের মতো তার চেয়ারে উসখুস করতে থাকে।

'সব জায়গায় সৈন্যদল গড়ে উঠেছে। এই বর্বর ডাকাতদলের নতুন হামলা থেকে জেলাকে বাঁচানোর জন্যে আপনাদেরও উচিত হবে লড়াই-ফেরতা সৈন্যদের নিয়ে দল গড়ে তোলা। আমাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে! লাল ফৌজের সরকার আমরা চাই না – তাতে শুধু ব্যভিচারই ডেকে আনা হবে – স্বাধীনতা তাতে আসবে না! বুশী চাষাভুষোরা আমাদের ঘরের বৌ আর বোনদের ইজ্জত নষ্ট করবে, আমাদের সনাতন খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ে উপহাস করবে, পবিত্র মন্দির অপবিত্র করবে, আমাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করবে – এ আমরা হতে দিতে পারি না। . . . কী বলেন আপনারা, বুড়োকর্তারা?'

ময়দানে উপস্থিত সকলে সমস্বরে গর্জন করে উঠল, 'ঠিক কথা! ঠিক কথা!' অফিসারটি এবারে এক ঘোষণাপত্রের স্টেনসিল-করা প্রতিলিপি পড়তে শুরু করে দিল। সভাপতিমশাই টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্রের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে টুক করে সেখান থেকে কেটে পড়ল। জনতা রুদ্ধবাক হয়ে শুনতে লাগল। শুধু পেছনের সারিতে যুদ্ধ-ফেরতা কিছু কসাক নিজেদের মধ্যে নির্জীব ভাবে কথাবার্তা বলে চলল।

অফিসার পড়া শুরু করতেই গ্রিগোরি ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল। বারোয়ারিতলা পেরিয়ে ধীরেসুস্থে ফাদার ভিস্‌সারিওনের বাড়ির কোনার দিকে পা বাড়াল সে। তার চলে যাওয়াটা মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের নজর এড়াল না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, 'তোমার ছোট ছেলে চলল যে, ওই দেখ!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভিড়ের ঘেরাওয়ের ভেতর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিল, 'এই গ্রিগোরি!' তার কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে ফুটে উঠল অনুনয় আর আদেশের সুর।

ডাক শুনে গ্রিগোরি খানিকটা কাত হয়ে ঘুরে থমকে দাঁড়াল, পিছু ফিরে তাকাল না।

'ফিরে আয় বাবা!'

'চলে যাচ্ছ যে বড়! ফিরে এসো!' বহু কণ্ঠের গর্জন উঠল। একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো জনতার মুখগুলো ঘুরে গেল গ্রিগোরির দিকে।

'হুঁঃ আবার অফিসার হয়েছেন!'

'নাক সিঁটকানোর কিছু নেই!'

'ও নিজেই ওই দলে ছিল কিনা!'

'বহু কসাকের রক্ত খেয়েছে!'

'লাল রাক্ষস!'

তাদের চিৎকার গ্রিগোরির কানেও পৌঁছুল। দাঁতে দাঁত চেপে সে শুনে গেল; স্পষ্টই বোঝা গেল সে নিজের সঙ্গে যুঝছে। বুঝিবা আর একটি মুহূর্ত – পিছু ফিরে না তাকিয়েই সে চলে যাবে। কিন্তু গ্রিগোরি একটু নড়েচড়ে উঠে মাটির দিকে চোখ রেখে জনতার দিকে ফিরে গেল। তাই দেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আর পেত্রো দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বুড়োরা উঠে পড়ে কাজে লেগে গেল। ভয়ানক তাড়াহুড়ো করে তক্ষুনি আতামান নির্বাচন করা হয়ে গেল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কোর্‌শুনভ আতামান নির্বাচিত হল। তার ফেকাসে সাদা মুখের মেচেতার দাগগুলো ধূসর বর্ণ ধারণ করল। জনতার মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে সে বিব্রত ভাবে পূর্বতন আতামানের হাত থেকে আতামান-শাসনক্ষমতার প্রতীক তামা-বাঁধানো লাঠিটা গ্রহণ করল। এর আগে কখনও সে আতামান হয় নি। তাকে নির্বাচন করার কথা উঠতেই সে স্বল্পশিক্ষিত এবং এরকম সম্মানের অযোগ্য এই অজুহাত দেখিয়ে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল। কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না সে। কিন্তু বুড়োরা যে ভাবে চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে এই নির্বাচনকে স্বাগত জানাল তাতে তার সমস্ত ওজর-আপত্তি ভেসে গেল।

'নাও, লাঠিটা ধর! এবারে আর 'না' করা চলবে না হে!'

'তুমি আমাদের গাঁয়ের সেরা গেরস্থ।'

'গাঁয়ের সম্পত্তি তুমি ফুঁকে দেবে না!'

'দেখো সেমিওনের মতো গাঁয়ের ভাগ°নেশা করে উড়িয়ে দিয়ো না!'

'আরে না . . . এ নেশা করে উড়িয়ে দেবে কি!'

'যদি তা করেও অন্তত এর ঘর থেকে জরিমানা নেওয়ার মতো কিছু পাওয়া যাবে!'

'ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেব না! . . .'

আকস্মিক নির্বাচন এবং আধা-যুদ্ধাবস্থার মতো সমস্ত পারিপার্শ্বিকটা এতই অস্বাভাবিক ছিল যে বিশেষ পীড়াপীড়ি ছাড়াই মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ রাজী হয়ে গেল। এবারের নির্বাচন অন্যান্য বারের মতো হল না। আগে হলে নির্বাচনের সময় জেলার আতামান আসত, গ্রামের দশটা ঘর থেকে একজন করে প্রতিনিধিকে ডাকা হত, নির্বাচন-প্রার্থীরা ভোটে নির্বাচিত হত। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সে সবের কোন বালাই রইল না, ব্যাপারটা হল একেবারেই সাদামাঠা: 'যাঁরা যাঁরা কোর্‌শুনভের পক্ষে দয়া করে ডান দিকে চলে যান।' অমনি গোটা জনতা হুড়মুড়

করে চলে গেল ডান দিকে। জিনোভিই-মুচির রাগ ছিল কোর্‌শুনভের ওপর। একমাত্র সে-ই জলামাঠের মাঝখানে বাজ-পড়া গাছের গুঁড়ির মতো নিজের জায়গায় একা দাঁড়িয়ে রইল।

ঘর্মাক্ত মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চোখের পলক ফেলারও অবকাশ পেল না – লাঠিটা তার হাতে গুঁজে দেওয়া হল, দূর থেকে এবং কানের কাছে সকলে গর্জন করে উঠল:

'খ্যাঁট লাগাও হে!'

'তোমার ত একেবারে জয়-জয়কার!'

'এই উপলক্ষে একটু মদ-টদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর!'

'আতামানকে কাঁধে তুলে দোলাও!'

কিন্তু লেফ্‌টেনান্ট বাধা দিয়ে হৈ-হট্টগোল থামিয়ে দিল, সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধানের দিকে বেশ কায়দা করে সভাটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল। সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার নির্বাচনের প্রশ্ন তুলল সে। সম্ভবত ভিওশেন্‌স্কায়াতে গ্রিগোরির কথা সে অনেক শুনে থাকবে। তাই তাকে প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে গোটা গ্রামেরই প্রশংসা জুড়ে দিয়ে সে বলল, 'কোন অফিসারকে কম্যাণ্ডার হিশেবে পেতে পারলে ভালো হয়। তাতে লড়াই বাধলে সফল হওয়া সহজ হবে আর ক্ষয়ক্ষতিও কম হবে। আর আপনাদের গ্রামে বীর আছেন অঢেল। আমি অবশ্য আমার নিজের মত আপনাদের ওপর চাপাতে চাই নে, কিন্তু আমার দিক থেকে আমি কর্ণেট মেলেখভের নাম সুপারিশ করতে পারি।'

'কোন্ মেলেখভ?'

'দু'জন আছে যে।'

ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতে পিছনে গ্রিগোরিকে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অফিসার তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাসল, চেঁচিয়ে বলল, 'গ্রিগোরি মেলেখভ! . . . আপনারা কী বলেন?'

'খুবই ভালো কথা!'

'আমরা খুবই খুশি হব!'

'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! হিম্মৎ আছে বটে!'

'মাঝখানটায় এগিয়ে এসো হে! চলে এসো!'

'মাতব্বর তোমাকে দেখতে চাইছেন!'

গ্রিগোরির মুখচোখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। পেছন দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে সে মাঝখানে এসে হাজির হল, তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো চারধারে তাকাতে লাগল।

'আমাদের ছেলেদের পথ দেখাও!' মাত্‌ভেই কাশুলিন হাতের লাঠিটা মাটিতে

ঠুকল, বেশ ঘটা করে হাত নাড়িয়ে ক্রুশ-প্রণাম করল। 'ওদের পথ দেখাও, ওদের চালিয়ে নিয়ে যাও। ভালো রাজহাঁসের পেছন পেছন যেমন মাদী হাঁসগুলো চলে, ওরাও যেন তেমনি তোমার পেছনে একজোট হয়ে রক্ষা পায়। ভালো রাজহাঁস যেমন তার গুষ্ঠিগোত্রকে পাহারা দিয়ে রাখে, হিংস্র জন্তুজানোয়ার আর মানুষের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে তুমিও তেমনি ওদের রক্ষা কর! আর চারটে ক্রস পাও বাবা, ভগবান তোমাকে সে ক্ষমতা দিন!'

'পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ? . . . আহা কী ছেলে তোমার! . . .'

'আহা কী মাথা একখানা! . . . শালা, ঘিলু আছে খানকির বাচ্চার মাথায়!'

'ওরে শালা ন্যাংড়া, মদ খাওয়া পাওনা হল কিন্তু!'

'হা-হা-হা! . . . মদ খেয়ে ফুর্তি করা যাবে!'

'বুড়ো কর্তারা! আস্তে, আস্তে! আচ্ছা ভলান্টিয়ার না ডেকেই যদি আমরা বয়সের হিশেবে দুটো কিংবা তিনটে লিষ্টি করে ফেলি, তাহলে কেমন হয়? ভলান্টিয়াররা ইচ্ছে হলে যেতে পারে, আবার নাও পারে। . . .'

'তিন বছরের তফাতে তিনটে ভাগ করা হোক!'

'পাঁচটা!'

'ভলান্টিয়ারই নেওয়া হোক না কেন?'

'তুমি নিজেই যাও না কেন বাপু? কে ধরে রাখছে তোমাকে? . . .'

লেফ্‌টেনান্ট নতুন আতামানের সঙ্গে কী একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, এমন সময় গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তের চারজন মাতব্বর এগিয়ে এলো তার দিকে। তাদের মধ্যে একজন, ছোটখাটো, দাঁত ফোকলা—'শুঁটকো' নামে লোকে তাকে চেনে, মামলাবাজ বলে তার বিশেষ খ্যাতি আছে। বুড়ো এত ঘন ঘন আদালতে যেত যে তার গেরস্থালির একমাত্র ঘোড়া—তার সাদা মাদী ঘোড়াটার নাকি আদালতের রাস্তা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—প্রভু মাতাল অবস্থায় কোন রকমে গাড়ির ভেতরে গড়িয়ে পড়ে একবার সপ্তমে সুর চড়িয়ে হাঁকলেই হল 'কাছারি!' অমনি মাদী ঘোড়াটা জেলা সদরের পথ ধরত। . . . 'শুঁটকো' তার মাথার টুপিটা টেনে খুলতে খুলতে লেফ্‌টেনান্টের দিকে এগোল। বাকি বুড়োরা কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মধ্যে একজন হল গেরাসিম বোল্‌দিরেভ—বেশ ভালো গেরস্থ, গ্রামের সকলে তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আর সব সদ্‌গুণের সঙ্গে বাকচাতুরীর জন্যও 'শুঁটকোর' বিশেষ খ্যাতি ছিল। লেফ্‌টেনান্টের কাছে এসে সে-ই প্রথম আবেদন জানাল:

'একটা আর্জি আছে, হুজুর!'

'বলুন, বুড়ো কর্তারা।' বিনীত ভাবে মাথা নুইয়ে মাংসল লতিসুদ্ধ বিরাট

কানটা বাড়িয়ে দিল লেফ্‌টেনাণ্ট।

'হুজুর, আপনি যে ভাবে আমাদের কম্যাণ্ডার ঠিক করে দিলেন তাতে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই গাঁ সম্পর্কে আপনার বিশেষ কিছু জানা নেই। আমরা মাতব্বরেরা কিন্তু আপনার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করছি – সে অধিকার আমাদের আছে। ওর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে।'

'অভিযোগ! কিসের অভিযোগ?'

'ও নিজে রেড গার্ডে ছিল, রেড গার্ডের একজন কম্যাণ্ডার ছিল। আমরা কী করে ওকে বিশ্বাস করি বলুন? মাত্র দু'মাস আগে জখম হয়ে ওখান থেকে ফিরেছে।'

অফিসারের মুখখানা গোলাপী হয়ে উঠল। তার কানদুটো যেন রক্তের চাপে ফুলে উঠল।

'কিন্তু তা কী করে হবে! আমি ত সে রকম কিছু শুনি নি। . . . কেউ এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলে নি। . . .'

'সত্যিই ও বলশেভিকদের দলে ছিল,' কঠিন স্বরে সমর্থন করল গেরাসিম বোল্‌দিরেভ। 'আমরা ওকে বিশ্বাস করি না!'

'ওকে বদলে দিন! এই যে আমাদের ছেলেছোকরারা সব কী বলাবলি করছে শুনুন। ওরা বলছে, প্রথম যে লড়াই হবে তাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে!'

'বুড়ো কর্তারা, শুনুন!' ডিঙ মেরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট চিৎকার করল। চালাকি করে লড়াই-ফেরতাদের এড়িয়ে বুড়োদের উদ্দেশেই সে কথাগুলো বলল। 'শুনুন বুড়ো কর্তারা! কর্ণেট গ্রিগোরি মেলেখভকে আমরা দলের কম্যাণ্ডার করেছি – এতে কোন দিক থেকে বাধা আছে কি? এইমাত্র আমাকে জানানো হল যে এই শীতকালে ও নিজেই নাকি রেড গার্ডদের দলে ছিল। আপনারা কি আপনাদের ছেলেদের, নাতিপুতিদের ওর ওপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারেন? আর আপনারা, লড়াই-ফেরতা ভাই-বন্ধুরা, আপনারা কি নিশ্চিন্তমনে এরকম একজন কম্যাণ্ডারের নির্দেশ মেনে চলতে পারবেন?'

কসাকরা হতবাক হয়ে মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি। প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি আর তুমুল নিনাদের ভেতর থেকে একটা কথাও স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ গলাবাজী করার পর সকলে যখন শান্ত হয়ে এলো তখন ভিড়ের মাঝখানের গোল জায়গাটায় এগিয়ে এলো লোমশ ভুরুওয়ালা বুড়ো বগাতিরিওভ। টুঁপি খুলে সভার সকলকে সম্মান জানিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে।

'আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধিমতে আমি মনে করি যে গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচকে এই পদ দেওয়া আমাদের ঠিক হবে না। উচ্ছন্নে গিয়েছে সে – আমরা সবাই

একথা শুনেছি। আগে সে আমাদের আস্থাভাজন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করুক, নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক, পরে দেখা যাবে। লড়াইয়ে সে ওস্তাদ – তা আমরা জানি। . . . কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, কুয়াশার আড়ালে সুয্যি ঢাকা পড়ে যায়! – ওর যোগ্যতা আমাদের চোখে পড়ছে না। বলশেভিকদের হয়ে সে যে কাজ করেছে তাতেই সব ঢাকা পড়ে গেছে! . . .'

'ওকে সাধারণ সেপাই করে দেওয়া হোক!' ছোকরা আন্দ্রেই কাশুলিন উত্তেজিত হয়ে বলল।

'পেত্রো মেলেখভকে কম্যাণ্ডার করা হোক!'

'গ্রিশ্‌কা দলের মধ্যে থাক!'

'আহা, কী কম্যাণ্ডারই না বাছা হয়েছিল!'

'আমার ভারী বয়ে গেছে! তোমাদের আমি থোড়াই পরোয়া করি!' উত্তেজনায় লাল হয়ে গিয়ে গ্রিগোরি পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল। সজোরে হাত নাড়া দিয়ে সে আবার বলল, 'আমি নিজেই নেব না ও কাজ। তোমাদের দিয়ে কী দরকার ছাই, আমার!' সালোয়ারের গভীর জেবের ভেতরে হাত গুঁজে কুঁজো হয়ে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

তার পেছন পেছন চিৎকার উঠতে লাগল:

'হুঁঃ, আসলে ওটার কোন মুরোদই নেই! . . .'

'হারামজাদার একশেষ! আবার নাক সিটকানো হচ্ছে!'

'আরে ছোঃ ছোঃ!'

'হবে না বাবা! এ হল সেই তুর্কী রক্তের মহিমে!'

'মুখ বুজে সহ্য করবার পাত্র নয় কিন্তু! লড়াইয়ের সময় অফিসারদের সামনেও মুখ বুজে থাকে নি। এখানে ত থাকবেই না। . . .'

'ফিরে এসো! . . .'

'ছি-ছি-ছি! . . .'

'ধর ওকে! ধরে বাঁধ! ধর্‌, ধর্‌, ধর্‌! . . .'

'আরে ওকে নিয়ে অত মাতামাতি করার কী আছে তোমাদের? ওর বিচার হওয়া দরকার!'

শান্ত হতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। তর্কাতর্কি করতে করতে উত্তেজিত হয়ে একজন আরেকজনকে ধাক্কা মারল, একজনের নাক দিয়ে রক্ত গড়াল, ছেলেছোকরাদের মধ্যে একজনের চোখের নীচটা হঠাৎ ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। শেষকালে যখন পুরোপুরি শান্তি ফিরে এলো তখন দলের কম্যাণ্ডার নির্বাচনের কাজ শুরু হল। পেত্রো মেলেখভকে বাছা হল। তার চোখেমুখে গর্বের দীপ্তি

খেলে গেল। কিন্তু এখানেই লেফ্‌টেনান্ট এক অভাবিত বাধার সম্মুখীন হল। একটা খুব তেজী ঘোড়া ছুটতে ছুটতে সামনে বড় বেশি উঁচু বেড়া দেখে যেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার অবস্থাও হল অনেকটা সেই রকম। এবারে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম লেখানোর পালা, কিন্তু একজন স্বেচ্ছাসেবককেও পাওয়া গেল না। এতক্ষণ যা যা ঘটছিল তাতে লড়াই-ফেরতারা বিশেষ কোন উদ্যোগ দেখাচ্ছিল না, এবারে তারা ইতস্তত করতে লাগল। নাম লেখানোর কোন গরজ দেখাল না, কেবল হাসিঠাট্টা করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

'অ্যাই আনিকেই তুই নাম লেখাচ্ছিস না কেন?'

আনিকুশ্‌কা বিড়বিড় করে বলল, 'আমার যে একেবারে কচি বয়েস। . . . এখনও গোঁফই গজায় নি। . . .'

'ওসব ছ্যাবলামি ছাড় ত! তুমি কি আমাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে চাও নাকি অ্যাঁ?' বুড়ো কাশুলিন ওর একেবারে কানের কাছে গর্জন করে উঠল।

আনিকেই এমন ভাব করল যেন কানের কাছে একটা মশা গুনগুন করছে। তাকে কোন পাত্তাই না দিয়ে সে পাল্‌টা জবাব দিল, 'তোমার আন্দ্রেইয়ের নাম লেখাও না গো!'

'লিখিয়েছি!'

'প্রোখর জিকভ!' টেবিলের ধার থেকে ডাক উঠল।

'এই যে!'

'তোমার নাম লিখব কি?'

'জানি নে। . . .'

'লিখলাম কিন্তু।'

মিত্‌কা কোর্‌শুনভ গম্ভীর মুখে টেবিলের কাছে এসে কাটা কাটা ভাবে হেঁকে বলল, 'আমার নাম লেখ।'

'আচ্ছা আর কেউ আছে? . . . ফেদোত বদভ্‌স্কোভ, . . . তুমি?'

'আমার একশিরা হয়েছে গো বুড়োকর্তারা!' কাল্‌মিক ধাঁচের তেরছা চোখ সলজ্জ ভঙ্গিতে মাটিতে নামিয়ে অস্ফুটস্বরে ফেদোত বলল।

লড়াই-ফেরতারা আর সামলাতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরল তারা, যা নয় তাই বলে সমানে রসিকতা করতে লাগল।

'তোর মাগ্‌কে সঙ্গে নিস ভাই! যদি ডেলাটা নেমে আসে তাহলে ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে পারবে।'

'ওঃ-হো-হো!' পেছনের সকলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যেতে লাগল, তারা

কাশতে লাগল, তাদের সাদা দাঁতের পাটি ঝলক দিয়ে উঠল, হাসিতে তেল চকচকে হয়ে উঠল তাদের চোখ।

পর মুহূর্তেই অন্য দিক থেকে উড়ে এলো আরেকটা টিপ্পনী।

'আমরা তোকে রাঁধুনি ক'রে নিয়ে যাব! জঘন্য মাংসের ঝোল যে-ই বানাবি, তোর পেটে ঢালব, যতক্ষণ না তোর ওই একশিরার ডেলা আরেক দিক থেকে না বেরিয়ে পড়ে ততক্ষণ ঢালতে থাকব।'

'বেশি জোরে ছুটতে পারবে না - তবে পিছু হঠার পক্ষে ঠিক আছে।'

মাতব্বররা বিরক্ত হয়ে ধমক দিল ওদের।

'হয়েছে, হয়েছে। এত ফুর্তি কিসের শুনি?'

'ইয়ারকি ফাজলামি করার আর সময় পেলে না!'

'লজ্জা করে না তোমাদের!' বুড়োদের মধ্যে একজন জ্ঞান দিল। 'ভগবান! হা ভগবান! ভগবানের কথা ভুলে গেলে নাকি অ্যাঁ? ভগবান ক্ষমা করবেন ভেবেছ? ওখানে মানুষ মরছে আর তোমরা কিনা এখানে . . . ভগবানের কথা একবার ভাব।'

'ইভান তোমিলিন।' লেফ্‌টেনাণ্ট পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল।

'আমি গোলন্দাজ,' তোমিলিন সাড়া দিয়ে বলল।

'নাম লিখব কি? গোলন্দাজও দরকার আমাদের।'

'লেখো-লেখো।'

জাখার করলিওভ, আনিকুশ্‌কা এবং আরও কয়েকজন মিলে গোলন্দাজ তোমিলিনকে নিয়ে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠল।

'আমরা উইলোকাঠ দিয়ে তোর জন্যে কামান বানিয়ে দেব!'

'কুমড়ো দিয়ে গোলা ছুঁড়বি, ছর্‌রার বদলে আলুও ব্যবহার করতে পারিস!'

এই রকম হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে ষাটজন কসাকের নাম লেখানো হয়ে গেল। সবার শেষে এলো খ্রিস্তোনিয়া। টেবিলের কাছে এসে সে কেটে কেটে বলল, 'তাহলে আমার নামটাও টুকে নাও। তবে আগেভাগেই বলে দিচ্ছি বাপু, লড়াই আমি করব না।'

'তাহলে আর নাম লেখানো কেন?' বিরক্তির সঙ্গে লেফ্‌টেনাণ্ট জিজ্ঞেস করল।

'একটু দেখব অফিসার সাহেব। আমি শুধু দেখতে চাই একবার।'

'লিখে নাও,' লেফ্‌টেনাণ্ট রহস্য ভেদ করতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল।

জমায়েত ভাঙার পর ময়দান থেকে লোকজন যখন বাড়ি ফিরতে লাগল তখন প্রায় দুপুর। ঠিক হল মিগুলিন্‌স্কায়ার লোকদের সাহায্যের জন্য পরের দিনই কসাকরা যাত্রা করবে।

পরদিন ভোরবেলায় ষাটজন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে বারোয়ারিতলায় জমা হল মাত্র জনাচল্লিশেক। গ্রেটকোট আর হাইবুট পরা, ফিটফাট সাজগোজ করা পেত্রো কসাকদের তাকিয়ে দেখল। অনেকের কাঁধে নতুন করে সেলাই করা নীল কাঁধপটি, তাতে তাদের পুরনো রেজিমেন্টের নম্বর লেখা, অনেকে আবার বিনা কাঁধপটিতেই শোভা বর্ধন করছে। ঘোড়ার জিনগুলো অভিযানে নেওয়ার উপযোগী গাঁটরি-বোঁচকার স্তূপে বোঝাই হয়ে আছে – থলেতে আর পুঁটুলিতে খাবারদাবার, জামাকাপড় আর ফ্রন্ট থেকে বাঁচিয়ে আনা কিছু কার্তুজ। রাইফেল সকলের নেই, বেশির ভাগ কসাকেরই হাতিয়ার হল তলোয়ার।

সেপাইদের বৌরা থেকে শুরু করে আবালবৃদ্ধ বনিতা সবাই ঝেঁটিয়ে বারোয়ারিতলায় এসেছে স্বেচ্ছাসেবকদের বিদায় জানাতে। পেত্রো জাঁক করে তার ধীরস্থির ঘোড়ার পিঠে চড়ে আধা স্কোয়াড্রনটা সাজাল। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে – ঘোড়াগুলো রঙবেরঙের, ঘোড়সওয়াররা যে যার খুশিমতো জামাকাপড় পরেছে – কারও গায়ে গ্রেটকোট, কেউ পরেছে উর্দি, কারও বা গায়ে বর্ষাতি। সব দেখাশোনার পর সে যাত্রা করার হুকুম দিল। ছোট দলটা এক কদম দু'কদম করে ঘোড়া চালিয়ে টিলার ওপরে গিয়ে উঠল, কসাকরা বিষণ্নমুখে গ্রামের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, পেছনের সারি থেকে কে একজন একটা গুলি ছুঁড়ল। টিলায় ওঠার পর পেত্রো দস্তানা পরল, তার গমরঙা গোঁফজোড়া মুচড়ে ঠিক করে নিল, ঘোড়াটাকে এমন ভাবে ঘুরিয়ে নিল যে সেটা তিড়িংবিড়িং করে পা ফেলে একদিকে কাত হয়ে চলল। বাঁ হাতে মাথার টুপি ঠেকিয়ে ধরে মৃদু হেসে সে হাঁক দিল, 'স্কোয়াড্রন, আমার কম্যাণ্ড শোন ! দুলকি চালে মার্চ করে চল ! . . .'

কসাকরাও রেকাবের ওপর খাড়া হয়ে চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিল। বাতাসের ঝাপটা লাগছে চোখেমুখে, ঘোড়ার লেজ আর কেশর আলুথালু উড়ছে, বৃষ্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কথাবার্তা হাসিঠাট্টা শুরু হল। খ্রিস্তোনিয়ার সাড়ে তিন হাত উঁচু কালো কুচকুচে ঘোড়াটা হোঁচট খেল। প্রভু মুখ খিস্তি করতে করতে চাবুক মেরে তাকে চেতিয়ে তুলল – ঘোড়াটা চাকার মতো করে ঘাড়টা বেঁকিয়ে টগবগিয়ে চলতে শুরু করল, দলছুট হয়ে পড়ল।

কার্গিন্স্কায়া জেলা সদর যাওয়া পর্যন্ত তাদের মেজাজ প্রফুল্লই রইল। তাদের মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে লড়াই-টড়াই হবে না, মিগুলিন্স্কায়ার ঘটনাটা কসাকদের রাজ্যসীমানায় বলশেভিকদের আচমকা হামলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চব্বিশ

কার্গিন্‌স্কায়ায় তারা যখন এসে পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জেলা-সদরে যুদ্ধ-ফেরতা কেউই আর নেই – সকলে মিগুলিন্‌স্কায়া চলে গেছে। বারোয়ারিতলায় লিওভচ্‌কিন ব্যাপারীর দোকানের সামনে পেত্রো তার দলটাকে ঘোড়া থেকে নামতে বলল, সে গেল জেলা সদরের আতামানের বাড়িতে। আতামান বলতে যে লোকটার সঙ্গে তার দেখা হল সে এক লম্বা, বিশাল মজবুত গড়নের অফিসার, মুখটা রোদে-পোড়া তামাটে। একটা লম্বা ঢিলে জামা তার গায়ে, কোন কাঁধপটি নেই, কোমরে ককেশীয় বেল্‌ট, দু'পাশে লাল ডোরা দেওয়া কসাক সালোয়ার তার পরনে – সাদা পশমের মোজার ভেতরে গোঁজা। পাতলা ঠোঁটের কিনারায় পাইপ ঝুলছে। খয়েরি রঙের চোখ দিয়ে ফুলকি বেরোচ্ছে, ভ্রূকুটি ক'রে চোখ মটকে তাকাচ্ছিল সে। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তামাক টানতে টানতে সে পেত্রোকে এগিয়ে আসতে দেখল। লোকটার বিশাল মূর্তি, শার্টের নীচ থেকে ফুটে ওঠা চিতানো বুকের আর হাতের লৌহকঠিন মাংসপেশী তার অসাধারণ শক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

'আপনিই কি জেলা-সদরের আতামান?'

ঝোলা গোঁফের নীচ থেকে ভক্‌ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে গুরুগম্ভীর গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ আমিই। কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি কি?'

পেত্রো তার নিজের পরিচয় দিল। পেত্রোর হাতে চাপ দিয়ে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে সে বলল, 'আমার নাম ফিওদর দ্‌মিত্রিয়েভিচ লিখভিদভ।'

ফিওদর লিখভিদভ গুসিনো-লিখভিদভ্‌স্কি গ্রামের কসাক। মোটেই হেলাফেলার লোক নয় সে। শিক্ষানবিশ রাজপুরুষ হিশেবে মাধ্যমিক সামরিক শিক্ষায়তনে পড়াশুনা শেষ করার পর অনেককালের মতো তার কোন পাত্তা ছিল না। কয়েক বছর পরে হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটল গ্রামে। ঊর্ধ্বতন শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া অনুমতির বলে পল্‌টনের সক্রিয় চাকরীর মেয়াদ যাদের শেষ হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে সে স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য রিক্রুট করতে লাগল। এখন যে এলাকাটাকে কার্গিন্‌স্কায়া জেলা বলা হয় সেখানে বেপরোয়া ধরনের, মারাকু লোকজন নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন গড়ে তুলে সে তাদের নিয়ে পারস্যদেশে চলে যায়। সে আর তার দলবল সেখানে এক বছর থেকে শাহের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর কাজ করে। পারস্যে যখন বিপ্লব দেখা দিল তখন শাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকেও পালাতে হল, পথে সে তার দলের অধিকাংশ লোকজন হারাল; তারপর একদিন সেই আগের মতোই আচমকা আবার এসে হাজির হল

কার্গিনে। তার সঙ্গে তখন ছিল কিছু কসাক, শাহের আস্তাবল থেকে বার করে আনা তিনটে বিশুদ্ধ আরবী জাতের দৌড়ের ঘোড়া; এছাড়া এনেছিল বেশ দামী দামী লুটের মাল – দামী গালিচা, মহামূল্যবান অলঙ্কার আর নানা রঙের জমকাল যত রেশমী কাপড়। মাসখানেক ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াল, সালোয়ারের জেব থেকে এখানে ওখানে বেশ কিছু পারস্যদেশীয় মোহর ছড়াল। সরু সরু পা, চোখজুড়ানো তুষারধবল ঘোড়াটা রাজহাঁসের মতো সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে চলতে লাগল, সেটার পিঠে চড়ে লিওভচ্‌কিনের দোকানের সিঁড়ির কাছে এসে এটা ওটা নানা জিনিস কিনতে দেখা গেল তাকে। ঘোড়া থেকে না নেমেই সে জিনিসের দাম দেয়, তারপর সোজা ঘোড়া হাঁকিয়ে উঠোনের উলটো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি আবার একদিন অন্তর্ধান করল ফিওদর লিখভিদভ। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করল তার নিত্যসহচর ও বার্তাবহ, গুসিনোভ্‌স্কি গ্রামের পান্তেলিউশ্‌কা নামে এক ওস্তাদ নাচিয়ে কসাক। পারস্যদেশ থেকে ঘোড়া এবং আরও যা যা সে এনেছিল সে সবেরও কোন হদিস মিলল না।

ছ'মাস পরে লিখভিদভের আবির্ভাব ঘটল আলবানিয়ায়। আলবানিয়ার দুরাৎসো শহর থেকে কার্গিনে তার চেনাপরিচিত লোকজনের কাছে ডাকঘরের অদ্ভুত অদ্ভুত ছাপ বুকে নিয়ে আল্‌বানিয়ার নীল নীল পাহাড়পর্বতের দৃশ্যসমেত রঙিন কার্ড আসতে লাগল। সেখান থেকে সে চলে গেল ইতালি, সারা বলকান উপত্যকা চষে বেড়াল, রুমানিয়ায় গেল, পশ্চিম ইউরোপেও গিয়েছিল – এমনকি প্রায় স্পেন পর্যন্ত। ফিওদর লিখভিদভের নামটা একটা রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা পড়ে রইল। গ্রামে তার সম্পর্কে নানা রকমের গুজব আর জল্পনাকল্পনা চলতে থাকে। লোকে শুধু একটা কথাই জানত যে রাজতন্ত্রী মহলগুলোর সঙ্গে লিখভিদভের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, পিটার্সবুর্গে হোমরাচোমরা লোকজনদের সঙ্গে তার ওঠাবসা আছে, 'রুশ জনসঙ্ঘের'* সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; কিন্তু বিদেশে কী ধরনের দৌত্যকর্ম সে পালন করত তার বিন্দুবিসর্গ কারও জানা ছিল না।

বিদেশ থেকে ফেরার পর ফিওদর লিখভিদভ আস্তানা গাড়ল পেন্‌জায়, গভর্নর জেনারেলের বাসভবন সংলগ্ন একটা বাড়িতে। কার্গিনে তার পরিচিত লোকজন একবার তার একটা ফোটো দেখতে পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথা নাড়াতে নাড়াতে হতভম্ব হয়ে জিভ দিয়ে টুস্‌কি মেরে বলতে থাকে, 'কী কাণ্ড, অ্যাঁ!'

---

* 'রুশ জনসঙ্ঘ' – জার-আমলের রাশিয়ার চরমপন্থী রাজতন্ত্রী সংগঠন। 'ব্ল্যাক স্কোয়াড্রন' নামেও পরিচিত। এই সংগঠন ইহুদীবিদ্বেষী প্রচার চালায়, ইহুদী নিধন ও বিরুদ্ধপক্ষের লোকজনকে হত্যা সংগঠন করে। এর জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেত। – অনুঃ

'ফিওদর দ্মিত্রিয়েভিচ কোথায় উঠেছে দেখ!' 'কী রকম লোকজনের সঙ্গে ওর খাতির, অ্যাঁ?' ছবিতে ফিওদর দ্মিত্রিয়েভিচ গভর্নরের স্ত্রীকে হাত ধরে ল্যাণ্ডোগাড়িতে উঠে বসতে সাহায্য করছে। তার বাঁকানাকওয়ালা সার্বীয় ধাঁচের তামাটে মুখের ওপর হাসি ফুটে উঠেছে। স্বয়ং গভর্নর তার দিকে তাকিয়ে এমন স্নেহভরে হাসছেন যেন সে তাঁর কোন আপনজন। ঘোড়াগুলো মুখের কড়া কামড়ে ধরে টগবগিয়ে ছোটার জন্য তৈরি হয়ে আছে, গাড়োয়ান টানটান হাতে লাগাম ধরে কোন রকমে তাদের সামলে রাখছে, তার চওড়া পিঠটা দেখা যাচ্ছে। লিখভিদভের একটা হাত দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথার লোমশ টুপিটার দিকে বাড়ানো, অন্য হাতের পুটে সে ধরে রেখেছে গভর্নরপত্নীর কনুইটা।

কয়েক বছর অদৃশ্য থাকার পর ১৯১৭ সালের শেষ দিকে ফিওদর লিখভিদভের আবির্ভাব ঘটল কার্গিনে, সেখানেই আস্তানা নিল – দেখে মনে হল যেন অনেক কালের মতো। এবারে সে সঙ্গে করে এনেছে তার বৌ আর একটা বাচ্চা – বৌটা ইউক্রেনীয় না পোলীয় বোঝা মুশ্‌কিল। বারোয়ারিতলার ওপরে চার কামরার একটা ছোটখাটো বাড়ি নিয়ে সে বসবাস করতে লাগল। শীতকালটা কী যেন সব রহস্যজনক পরিকল্পনা ভাঁজতে ভাঁজতে কাটাল। নিজের এবং বৌবাচ্চার শরীর পোক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে সারাটা শীতকাল (সে বছর যেরকম কড়া শীত পড়েছিল দন অঞ্চলে সচরাচর সেরকম পড়ে না) বাড়ির জানলাগুলো সে যে ভাবে হাঁ করে খুলে রেখে দিল তাতে কসাকরা অবাক হয়ে গেল।

সেত্রাকভের ঘটনার পর, ১৯১৮ সালের বসন্তকালে ফিওদর লিখভিদভকে আতামান বেছে নেওয়া হল। আর তখনই ফিওদর লিখভিদভের অপরিসীম ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটল। জেলাটা এমন শক্ত হাতে পড়ল যে এক সপ্তাহ পরে মাতব্বররা পর্যন্ত মাথা ঝাঁকিয়ে তাই নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। কসাকদের সে এমন শিক্ষা দিয়ে ছাড়ল যে জেলার পঞ্চায়েতে তার বক্তৃতার পর (লিখভিদভ কথা বলতে পারে বেশ গুছিয়ে; শুধু গায়ের জোর নয়, বুদ্ধিও তাকে প্রকৃতি কম দেয় নি) মাতব্বররা এক পাল ষাঁড়ের মতো গর্জন করে ওঠে, 'আপনার মঙ্গল হোক হুজুর! আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা জানাই!' 'তা যা বলেছেন!'

নতুন আতামান ডাণ্ডা ঘুরিয়ে শাসন চালাতে লাগল। সেত্রাকভের লড়াইয়ের খবর কার্গিন্‌স্কায়ায় আসতে না আসতে তার পরের দিনই জেলার যুদ্ধ-ফেরতা সমস্ত লোককে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। অ-কসাকরা (জেলার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশই তারা) প্রথমে যেতে গররাজি হয়েছিল, কোন কোন যুদ্ধ-ফেরতার বলশেভিকদের ওপর বেশ টান থাকায় তারা প্রতিবাদ করে বসল; কিন্তু লিখভিদভ পঞ্চায়েত বসানোর জন্য গোঁ ধরে রইল, সেখানে সে মাতব্বরদের

দিয়ে তার নিজের প্রস্তাবিত একটা ফতোয়া সই করিয়ে নিল – যে-সমস্ত অ-কসাক 'চাষী' লোকজন দনের প্রতিরক্ষায় যাবে না, তাদের জেলা থেকে বার করে দেওয়া হবে। পরের দিনই অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে বাজাতে, গান গাইতে গাইতে বহু ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই হয়ে সৈন্যরা চলল নাপোলভ আর চের্নেৎস্কায়া বসতির দিকে। অ-কসাকদের মধ্য থেকে একদা এক নম্বর মেশিনগান রেজিমেণ্টের সৈনিক ভাসিলি স্তরোজেন্‌কোর পরিচালনায় মাত্র কিছু সংখ্যক অল্পবয়স্ক সেপাই পালিয়ে রেড গার্ডদের দলে গিয়ে যোগ দিল।

পেত্রোর হাঁটার ভঙ্গি দেখেই আতামান বুঝতে পেরেছিল যে সে কোন নীচের পদ থেকে অফিসার পর্যায়ে উঠেছে। পেত্রোকে সে আর ঘরের ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল না। ভালোমানুষী অন্তরঙ্গতার সুরে তার সঙ্গে কথা বলল।

'না বাপু মিগুলিন্‌স্কায়াতে আর যেতে হবে না – ওখানে আপনাদের কিছু করার নেই। আপনাদের ছাড়াই কাজ হাসিল হয়ে গেছে – গতকাল সন্ধ্যায় আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি। ফিরে যান, গিয়ে পরে কী নির্দেশ হয় তার জন্য অপেক্ষা করুন। কসাকদের একটু ভালো করে নাড়া দিন দেখি! এত বড় গাঁ – সেখান থেকে কিনা লড়াইয়ে নামছে মাত্র চল্লিশজন! পাজী বদমাশগুলোকে আচ্ছা করে তাতিয়ে তুলুন গিয়ে! প্রশ্নটা ত তাদেরই ছালচামড়া বাঁচানোর! আচ্ছা আসুন, নমস্কার!'

হঠাৎ কেমন যেন চমকে দিয়ে অবলীলাক্রমে বিশাল বপুখানা নিয়ে পায়ের সাধারণ চামড়ার চটিজুতো ফটফট করতে করতে সে ঘরের ভেতরে চলে গেল। পেত্রোও চলল বারোয়ারিতলার কসাকদের কাছে। পেত্রো আসতেই সকলে তার ওপর প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগল।

'কী ব্যাপার?'

'কী হল?'

'মিগুলিনে যাচ্ছি তাহলে আমরা?'

পেত্রো তার নিজের মনের আনন্দ গোপন করার কোন চেষ্টা না করে হেসে বলল, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি! আমাদের ছাড়াই ওরা কাজ হাসিল করে ফেলেছে।'

কসাকরা হাসল, হুড়মুড় করে দল বেঁধে তারা এগিয়ে গেল বেড়ার গায়ে বাঁধা তাদের ঘোড়াগুলোর দিকে। খ্রিস্তোনিয়া ত এমন ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন তার পিঠ থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। তোমিলিনের কাঁধে চাপড় মেরে সে বলল, 'তাহলে, গোলন্দাজ, আমরা বাড়ি ফিরছি!'

'আমাদের মাগ-বৌরা বুঝি হেদিয়ে মরে গেল!'

'তাহলে আর কেন, এক্ষুনি যাওয়া যাক!'

ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল রাত কাটানোর জন্য আর

না থেমে সেই মুহূর্তেই রওনা দেবে। এবারে, ফিরতি পথে তারা চলল এলোমেলো ভাবে দঙ্গল বেঁধে। কার্গিনস্কায়াতে তারা এসেছিল অনিচ্ছাভরে, তখন তারা কদাচিৎ ঘোড়াকে দুলকি চালে ছুটিয়েছিল, কিন্তু এখন বাড়ি ফেরার নামে তারা উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কখন কখন ছেড়ে দিল টগবগিয়ে। বৃষ্টির অভাবে শুকনো চড়চড়ে মাটি ঘোড়ার খুরের তলায় গুমগুম আওয়াজ তুলতে লাগল। দূরের টিলাগুলোর ঝুঁটি ছাড়িয়ে, দনের ওপাড়ে কোথায় যেন বিদ্যুতের নীলচে ঝলকানি গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ছে।

গ্রামে যখন তারা এসে ঢুকল তখন মাঝরাত। পাহাড় থেকে নামার সময় আনিকুশ্‌কা তার অস্ট্রীয় রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ল, এক ঝাঁক গুলির গমগম আওয়াজ তুলে তাদের ফিরে আসার বার্তা জানাল। উত্তরে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল, বাড়ির কাছে চলে এসেছে টের পেয়ে কার যেন একটা ঘোড়া নাক ঘড়ঘড় করে কাঁপা কাঁপা চিঁহিহি আওয়াজ তুলল। গ্রামের ভেতরে তারা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পেত্রোর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মার্তিন শামিল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে বলল, 'অনেক লড়াই করেছি আমরা, আর নয়! এই ত বেশ হল!'

পেত্রো অন্ধকারের মধ্যে হাসল, বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঘোড়া ধরতে বেরিয়ে এলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। জিন খুলে আস্তাবলে নিয়ে গেল ঘোড়াটাকে। দু'জনে একসঙ্গে ঘরে ঢুকল।

'লড়াইয়ে যাওয়া মুলতুবী রইল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'জয় ভগবান। আর যেন কখনও শুনতে না হয়।'

ঘুম থেকে জেগে উঠল দারিয়া। ঘুমিয়ে তপ্ত হয়ে উঠেছিল তার শরীর। স্বামীর রাতের খাবারের যোগাড় করতে গেল। ভেতরের ঘর থেকে জামাকাপড় অর্ধেক পরা অবস্থায় কালো লোমে ভর্তি বুকটা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে এলো গ্রিগোরি। ঠাট্টার ভঙ্গিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল।

'কী সাবাড় করে এলে নাকি?'

'তা ঝোল যেটুকু আছে সাবাড় করে দেব।'

'এ আর এমন একটা কী কথা! ঝোল ত আমরা সাবাড় করতে পারবই, বিশেষ করে আমি যদি তোমার সঙ্গে হাত লাগাই। . . .'

* * *

ঈস্টারের আগে পর্যন্ত যুদ্ধের কোন নামগন্ধ নেই। কিন্তু যিশু খ্রীষ্টের মৃত্যুতিথি পালনের পরের দিন শনিবার ভিওশেন্স্কায়া থেকে এক বার্তাবহ ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে এলো। ঘেমে নেয়ে ওঠা ঘোড়াটাকে কোর্শুনভ্দের বাড়ির গেটের সামনে রেখে কোমরে বাঁধা তলোয়ারের ঝনঝন আওয়াজ তুলে ধাপ বয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠে এলো সে।

'কী খবর?' চৌকাটে পা ফেলতে ফেলতেই মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তাকে প্রশ্ন করল।

'গ্রামের মোড়লকে চাই আমি। আপনি?'

'হ্যাঁ আমিই।'

'এক্ষুনি আপনার কসাকদের সাজিয়ে ফেলুন। নাগোলিন্স্কায়া বিভাগের ভেতর দিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ তার রেড গার্ডদের দল নিয়ে আসছে। এই যে হুকুমনামা।' এই বলে ঘামে ভেজা মাথার টুপির ভেতরকার আস্তর উল্‌টে চিঠিটা বার করে দিল সে।

কথাবার্তার আওয়াজ শুনে নাকের ওপর চশমা আঁটতে আঁটতে গ্রিশাকা দাদু বেরিয়ে এলো। উঠোন থেকে ছুটে এলো মিত্‌কা। সকলে মিলে প্রদেশের আতামানের হুকুমনামাটা পড়ল। বার্তাবহ কাঠের কারুকাজ-করা রেলিঙে হেলান দিয়ে জামার হাতা দিয়ে ঝড়ঝাপ্‌টাখাওয়া মুখের ওপর থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল।

ঈস্টারের প্রথম দিন, সংযম ব্রত ভাঙার পরই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হল কসাকদের। জেনারেল আল্‌ফিওরভের হুকুমনামাটা ছিল বেশ কড়া – না গেলে কসাক নামের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে, এই ভয় দেখানো হয়েছে। তাই এবারে আগের মতো আর চল্লিশজন নয়, একশ' আটজনের বাহিনী চলল পদ্‌তিওল্‌কভের মোকাবিলা করতে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বুড়োও ছিল – লালদের সঙ্গে লড়াই করার ভারী শখ তাদের। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ঝোলা-নাক মাত্‌ভেই কাশুলিন। একটা অকর্মণ্য ছোট মাদী ঘোড়ার পিঠে সামনে শোভাবর্ধন করছে চালিয়াত আভ্‌দেইচ, সারাটা রাস্তা সে তার রাজ্যের উদ্ভট উদ্ভট গল্পকথা বলে কসাকদের মাতিয়ে রেখেছে। চলেছে বুড়ো মাক্সায়েভ, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন পাকাদাড়ি। . . . অল্পবয়স্করা চলেছে দায়ে পড়ে, কিন্তু বুড়োরা চলেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে – মহা উৎসাহে।

বর্ষাতির মাথার ঢাকনাটা মাথার টুপির ওপর টেনে দিয়ে গ্রিগোরি মেলেখভ চলেছে শেষের সারিতে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। অপরূপ শ্যামলিমার সাজে ঢাকা স্তেপভূমির বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে

চলেছে ঝড়ের মেঘ। মেঘের জটার ঠিক তলায়, অনেক উঁচুতে উড়ছে একটা ঈগলপাখি। ছড়ানো ডানাদুটো কদাচিৎ নাড়াতে নাড়াতে সে বাতাস ধরছে, বায়ুস্রোতের টানে সামান্য কাত হয়ে একটা পাটকিলে রঙের ঝাপসা মতন ঝিলিমিলি খেলিয়ে উড়ে চলেছে পুবের দিকে। ক্রমেই ছোট হতে হতে সেটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সবুজ স্তেপভূমি বৃষ্টিতে ভিজে ঝলমল করছে। শুধু জায়গায় জায়গায় চাপ চাপ হয়ে আছে গত বছরের সোমরাজগুল্ম, লাল টকটক করছে পাহাড়ী লতার ফুল, পাহাড়ের সারির ওপর প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীল ময়ূরকণ্ঠী রঙের ঢিবিগুলো দীপ্তি দিচ্ছে।

পাহাড় থেকে কার্গিনস্কায়ার দিকে নামার সময় কসাকরা দেখতে পেল একটা ছোট ছেলে কয়েকটা ষাঁড় মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে। তার খালি পা থেকে থেকে কাদায় পিছলে যাচ্ছে, হাতের চাবুকটা দোলাতে দোলাতে চলেছে সে। ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পেয়ে ছেলেটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ মনোযোগ দিয়ে ঘোড়সওয়ারদের আর জলকাদা-ছেটা লেজ বাঁধা ঘোড়াগুলোকে দেখতে লাগল।

'কে তুই? বাড়ি কোথায় তোর?' ইভান তোমিলিন জিজ্ঞেস করল।

'কার্গিন,' মাথার ওপর ঢাকা দেওয়া কোর্তাটার আড়াল থেকে মৃদু হেসে চটপট উত্তর দিল ছেলেটা।

'তোদের কসাকরা কি চলে গেছে?'

'চলে গেছে। রেড গার্ডদের সাফ করতে চলে গেছে। সিগারেটের তামাক হবে তোমাদের কাছে? তামাক আছে খুড়ো?'

'তামাক? কার দরকার? তোর?' গ্রিগোরি তার ঘোড়াটাকে লাগাম টেনে থামাল।

কসাক ছেলেটা এগিয়ে গেল। তার গোটানো সালোয়ারটা ভিজে সপসপ করছে, সালোয়ারের দু'ধারের ডোরাদুটো লাল টকটক করছে। গ্রিগোরি পকেট থেকে তামাকের বটুয়া বার করে দিলে সাহস করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কায়দা করে সুর খানিকটা চড়িয়ে বলল, 'এই এক্ষুনি পাহাড়ের নীচে নামতে নামতেই দেখতে পাবে মড়াগুলোকে। কাল আমাদের কসাকরা লালগুলোকে ধরে ভিওশেনস্কায়ায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, ওইখেনেই মেরে ফেলেছে।... আমি, খুড়ো, হুই বালিপাহাড়ের কাছে গোরু চড়াচ্ছিনু, দেখলাম কুপিয়ে কেটে ফেললে ওদের। বাপ্‌রে, কী ভয়ঙ্কর! যেই তরোয়াল ঘোরাতে শুরু করে দিল অমনি কী হাউমাউ কান্না আর চারধারে ছুটোছুটি!... পরে আমি ওখেনে গিয়ে দেখনু।... একজনার কাঁধটা কেইটে ফেলে দিয়েছে, নিশ্বেস ফেলতিছে ঘন ঘন, দেখা যায় কল্‌জেডা রক্তবন্যের মাঝখানে ধুকপুক ধুকপুক করতিছে, আর কী নীল পিত্তির

থলেটা! . . . কী ভয়ঙ্কর!' সে আবার বলল। কসাকরা যে তার বিবরণ শুনে এতটুকু ভয় পেল না তাতে যেন সে মনে মনে অবাকই হয়ে গেল। গ্রিগোরি, খ্রিস্তোনিয়া আর তোমিলিনের হিমকঠিন, নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত তা-ই তার মনে হয়েছিল।

সিগারেট ধরিয়ে গ্রিগোরির ঘোড়ার ভিজে ঘাড়ে হাত বুলাল সে, তারপর 'আপনার ভালো হোক' বলেই ষাঁড়গুলোর দিকে ছুটে গেল।

রাস্তার ধারে বসন্তের জলপ্লাবনে ধোওয়া একটা অগভীর খাতের মধ্যে রেড গার্ডদের খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ, ওপরে হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে আছে দো-আঁশলা মাটির স্তর। টিনের মতো চকচকে একটা তামাটে নীল মুখ দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে, তুলোঠাসা নীল প্যান্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে কালো রঙের খালি পা।

'এগুলোকে উঠিয়ে কবর দিতেও বুঝি ওদের ঘেন্না হয়! . . . শালা শুয়োরের বাচ্চা!' চাপাগলায় বিড়বিড় করে খ্রিস্তোনিয়া বলল, তারপর আচমকা সপাং করে ঘোড়ার গায়ে চাবুক মেরে গ্রিগোরিকে ছাড়িয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে লাগল।

'তাহলে দনের মাটিতেও রক্ত দেখা গেল!' বাঁকা হেসে তোমিলিন বলল। থরথর করে কেঁপে উঠল তার গালদুটো।

পঁচিশ

সকালবেলাটার কোন তুলনা হয় না। ন'টার সময়ও রীতিমতো গরম ছিল, কিন্তু দুপুরের দিকে দক্ষিণ থেকে বাতাস ধেয়ে এলো, আকাশে ভেসে চলল মেঘ। শহরতলিতে পপ্‌লারের চটচটে কচি পাতা, দালান কোঠার ইটের গাঁথুনি আর রোদে পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে এলো।

আগের দিন দন গণকমিসার পরিষদের একটা পাঁচমিশালী দল নিয়ে বুন্‌চুক আর আন্না স্টেশনে একটা বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী দলকে নিরস্ত্র করে। মাত্র গতকালই বুন্‌চুকের মুখ বুড়োটে আর গভীর খাঁজকাটা দেখাচ্ছিল, কিন্তু আজ দখিনা বাতাস যেন তার সমস্ত ক্লান্তি ও উদ্বেগ দূর করে দিয়েছে। এখন সে দেউড়ির ধাপের কাছে বসে পুরোদস্তুর একজন গেরস্থের মতো একটা তেলের স্টোভ নিয়ে ব্যস্ত, আন্নার ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছে সন্দেহের বাঁকা হাসি, বুন্‌চুক মাঝে মাঝে সন্দেহের দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাচ্ছে।

সকালে খেতে বসার আগে সে বোকার মতো বড়াই করে বলে ফেলেছিল

যে এক সময় গ্যালিসীয় চাটনি দিয়ে কাটলেট বানানোয় তার খুব দক্ষতা ছিল।

'সত্যি বলছ?' আন্না সন্দেহ প্রকাশ করল।

'সত্যি।'

'কোত্থেকে শিখলে?'

'তা শুনে কী হবে? যুদ্ধের সময় একজন পোল মেয়েছেলে আমাকে শিখিয়েছিল।'

'বেশ ত বানাও না তাহলে। আমার কিন্তু বাপু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।'

এই কারণেই স্টোভ নিয়ে তার এমন ব্যস্ততা। আবার ভাঁজ পড়ল তার ভুরুতে। আন্নার হাসিতে এত বেশি খুনসুটির ভাব লুকানো ছিল যে বুনচুকের অসহ্য মনে হল। পোড়া আলুগুলো চাটুতে নাড়তে নাড়তে সে ভুরু কোঁচকাল।

'তুমি যদি আমার ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেল আর হাসিঠাট্টা কর তাহলে তোমার কি ধারণা আমার পক্ষে কিছু তৈরি করা সম্ভব? তাছাড়া এটাকে কি স্টোভ বলে? এ যে কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেস!'

উত্তরে আন্না টেনে টেনে প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলল, 'আহা তুমি কেন খাস বাবুর্চি হলে না! কী চমৎকার চমৎকার সব পদ রান্না করতে তুমি! . . . পেঁয়াজ আর তেজপাতার গন্ধে মাতোয়ারা রান্নাঘরের মধ্যে মহা দাপটে ঘুরে বেড়াতে তুমি! সত্যি, রন্ধনশিল্পটায় তুমি একবার মন দিয়ে দেখ না কেন? ওর মধ্যে কত রহস্য আছে, কত জিনিসের এখনও চর্চাই হয় নি।'

'আঃ বড্ড বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু!'

আঙুলে এক গোছা চুল জড়িয়ে খেলতে শুরু করল আন্না, বুনচুকের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। 'দাঁড়াও আজই দলের সকলকে বলে দিচ্ছি মেশিনগানার বলে তুমি নিজেকে চালাচ্ছ বটে, কিন্তু আসলে তুমি কোন রাজা-উজীরের বাড়ির খাস-বাবুর্চি ছিলে।'

যখন গ্যালিসীয় চাটনির বদলে বদগন্ধযুক্ত বিশ্রীস্বাদের একটা পদার্থ তৈরি হল তখন বুনচুক সত্যি সত্যিই মুষড়ে পড়ল। কিন্তু আন্না বীরবিক্রমে তা খেয়ে ফেলল, এমন কি দু একটা প্রশংসাবাদও করল।

'মন্দ নয়। . . . চাটনিটা ভালোই বলতে হয়। . . . অবশ্য একটু ঝাল হয়েছে এই যা।'

'তাহলে তেমন খারাপ হয় নি, কী বল?' বুনচুক বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল, তার মন-মরা ভাবটা কেটে গেল। 'আহা কিছু মুলো যদি এখানে কুরে দেওয়া যেত তাহলে আর দেখতে হত না! . . .' বলতে বলতে পরম পরিতৃপ্তিভরে সে জিভ দিয়ে একটা টুসকি মারল – আন্না যে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বীরত্বের সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধন করছে, সে দিকে নজরই দিল না।

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় আন্না কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। উদাসীন হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে খাবার চিবুতে লাগল। বুন্‌চুক মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্ন করতে থাকলে বেশ দেরি করে করে উত্তর দিতে লাগল। পরে উঠে বাগানে বেড়ার ধারে রোদে এসে দাঁড়াল, অন্যমনস্কের মতো একটা খড় দাঁতে কাটতে লাগল।

আন্নার মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে তার এলোমেলো চুলের উত্তেজনাকর গন্ধে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বুন্‌চুক জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ? কী ব্যাপার তোমার ?'

আন্না স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, মাঝে মাঝে চোখের পল্লব নামিয়ে নিতে লাগল, গায়ের জামার একটা বোতাম খুলল, আটকাল, তারপর আবার খুলল।

'তুমি কি শহরে যাচ্ছ ?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভীষণভাবে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'শিগ্‌গিরই আমার আর কাজ করার উপায় থাকবে না, ইলিয়া . . .'

'কেন ?'

কাঁধদুটো ঝাঁকাল সে, রোদ পড়ে একটা পপ্‌লার গাছের নীচে আলোছায়ার যে নক্সা তৈরি হয়েছিল সেটা দেখতে লাগল। নীচু বেড়ার ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অপ্রত্যাশিত বিরক্তির সঙ্গে সে বলল, 'আমি পোয়াতি। আগে আমার বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু এখন আমার আর কোন সন্দেহ নেই – সাত মাস কি সাড়ে সাত মাসের মধ্যেই আমি মা হব।'

সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় পপ্‌লার গাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরল, আন্নার মাথার চুল তার মুখের ওপর এলোমেলো ছড়িয়ে দিল। চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দেবার কোন চেষ্টা সে করল না। চোখের আয়ত মণিদুটো গভীর হয়ে উঠেছে। বুন্‌চুক অপেক্ষা করতে লাগল, নীরবে আন্নার হাতে হাত বুলাতে লাগল। কিন্তু বুন্‌চুকের বিরুদ্ধে কিসের যেন একটা অসন্তোষ মনের ভেতরে পুষে রেখেছে আন্না, তার আদরে কোন সাড়া না দিয়ে টলতে টলতে সে ফিরে গেল ঘরের দিকে।

বুন্‌চুক পেছন পেছন ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মনের অধৈর্য আর ভেতরে চেপে থাকতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন তাহলে কী উপায় ?'

'কিছুই না,' উদাসীন ভাবে আন্না উত্তর দিল।

ওদের স্তব্ধতা বড়ই পীড়াদায়ক। বুন্‌চুক কথা হাতড়াতে লাগল, যদিও চিন্তাগুলো যে এলোমেলো হয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে সচেতন থাকার ফলে মনে মনে তার কষ্ট হতে লাগল।

'হোক না আন্না। তত দিনে প্রতি-বিপ্লবকে আমরা খতম করে দেব। ছেলেপুলে হওয়াটা খারাপ কিসের ?' সহজ প্রবৃত্তি বশে সে যেন বুঝতে পারছিল কোন্ পথে কথাবার্তা চালানো উচিত হবে, তাই আনাড়ির মতো হেসে সে চটপট যোগ

করল, 'হওয়া দরকার আন্না। হোক না একটা ছেলে – মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর একটা ছেলে! আমি আর কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকব না, হাত-পা-ঝাড়া সাধারণ মিস্ত্রী হব। ভেবে দেখ, জীবনটা কী সুখেরই না হবে! তিন বছরের মধ্যে তোমার গায়ে সুন্দর চর্বির ভাঁজ পড়বে, আমার একটা নেয়াপাতি ভুঁড়ি হবে, একটা ছোট্ট বাড়ি কিনব আমরা। . . . জানলার ধারিতে জেরানিয়াম ফুল আর খাঁচায় ক্যানারি পাখি অবশ্যই থাকবে। ছুটিছাঁটার দিনে বন্ধুবান্ধব আসবে আমাদের বাড়িতে, নয়ত আমরা আমাদের মতো গণ্যমান্য লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তুমি রবিবার রবিবার পিঠে বানাবে, পিঠে ঠিকমতো না হলে চোখের জল ফেলবে। ব্যাঙ্কে আমাদের পয়সা থাকবে। . . .'

আন্না গোড়ার দিকে মুখে নিরানন্দ হাসি ফুটিয়ে অনিচ্ছাভরে শুনে যাচ্ছিল। শেষকালে সামান্য নাক টেনে সে বলল, 'কল্পনার চূড়ান্ত!'

'কেন, তোমার পছন্দ নয়?'

'মন্দ নয়।'

'মুশকিল হচ্ছে এর মধ্যে ভালোর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

দু'জনে মিলে শহরে গেল। রস্তোভের সর্বত্র গণতন্ত্রের এত প্রকাশ যে শহরটাকে চেনাই যায় না। সৈন্য, মজুর আর ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় পরা অফিস-কর্মচারীদের ভিড়ে গিজগিজ করছে রস্তোভ শহর। ছাতলা পরা সবজেটে রঙের জামাকাপড়ের বিপুল সমুদ্র, চামড়ার কোর্তার ঝলমলে শোভা, ফ্রক কোটের কালো ছিটে, কোথাও কোথাও এই বৈচিত্র্যহীন পটভূমিতে মেয়েদের সাদা পোশাক – যেন কারুকাজে অলঙ্কৃত করে দিচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে পড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর মজুরদের এই সাধারণ বিশাল ভিড়ের মধ্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে জরাজীর্ণ ওভারকোট গায়ে কোন এক কর্মচারীর গৃহবধূ – ত্রস্ত চলেছে বাড়ির দরকারী টুকিটাকি বাজার করতে।

বেড়ার গায়ে সাঁটা ফতোয়া আর ইস্তাহারগুলো বাতাসে ছিঁড়ে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। রাস্তায় ঝাড়ু পড়ে নি। সর্বত্র ঘোড়ার নাদ আর তেতে ওঠা পাথরের গন্ধ।

শহরের এই রূপ পরিবর্তন কোন এক কারণে আন্নার বেশ আশ্চর্য লাগল।

'দেখ ইলিয়া শহরটা কেমন গণতন্ত্রের আদল পেয়েছে! একটা টপ-হ্যাট কিংবা একটাও ওয়েস্টকোট কোথাও নজরে পড়ে না। সব যেন পাথুরে রঙের।'

'শহর হচ্ছে বহুরূপী। আজ যদি প্রতি-বিপ্লবী সাদারা এখানে আসত তাহলে এর রঙ কেমন পালটে যেত জান?' বুনচুক নিজের মনে কী একটা ভাবতে ভাবতে হাসল। বুনচুক দেখতে পেল একটা হাইস্কুলের ছাত্র বুক খোলা ওভারকোট ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে রাস্তা পার হয়ে চলেছে, ওভারকোটের সবগুলো বোতাম

কেটে ফেলে দেওয়া, তার মাথার টুপির ব্যাণ্ডে যেখানে কোন এক সময় একটা ব্যাজ ছিল, দেখা যাচ্ছে একটা গভীর দাগ।

লেবুর খোসার মতো গায়ের রঙ, লোলচর্ম এক বুড়ো চীনেম্যান সাদোভায়া আর তাগান্‌রোগ স্ট্রীটের মোড়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। প্যাঁচার মতো আধবোজা ঢুলু ঢুলু চোখে বুঁদ হয়ে একজন জাহাজী দাঁত দিয়ে সূর্যমুখী ফুলের বীচি ছাড়াতে ছাড়াতে থু থু করে খোসা ফেলছে আর পায়ের চকচকে গামবুট দিয়ে মস্‌মস্‌ আওয়াজ করছে।

বুন্‌চুক আর আন্না চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে ফ্ল্যাটবাড়ির সেই সারিটার সামনে এসে দাঁড়াল, এককালে যার মালিক ছিল পারামোনভ। একটি কথাও না বলে অনেকটা নিস্পৃহ ভাবে তারা দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে চলে গেল। . . .

নোভোচের্‌কাস্‌স্ক-কসাকদের যে দলটা শহরের দিকে এগিয়ে আসছে তাকে প্রতিহত করার জন্য একটা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে সেইদিন সন্ধ্যায় পদ্‌তিওল্‌কভ যখন দন কার্যনির্বাহী সমিতির মিটিং-এর মাঝখানে এসে বাধা দিল, তখন ওদের দু'জনের আবার দেখা হল। একই সারিতে তারা মার্চ করে চলল।

'বাড়ি ফিরে যাও আন্না,' আন্নার হাতটা ছুঁয়ে শান্তস্বরে মিনতি করে বলল বুন্‌চুক।

কিন্তু সে গোঁ ধরে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইল।

'আন্না ফিরে যাও।'

শহরতলিতে তাদের স্বল্পকালের সঙ্ঘর্ষের মাঝখানে বাধা এলো একজন প্রৌঢ়া মহিলার কাছ থেকে। ওদের সারিগুলোকে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে দেখে সে গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে ওদের ওপর টাটকা নরম রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতে লাগল আর খালি বাঁ হাতটা নাড়িয়ে তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এগুলো ওই হারামজাদাগুলোকে দাও। বড় ঘরের ওই খানকীর বাচ্চা চের্নেৎসোভটা আমার স্বামীকে মেরেছে! কত খনিমজুরের পরিবারকে কসাকরা অনাথ ক'রে দিয়ে গেছে! . . . ওগুলোকে দাও, আচ্ছা করে দাও! . . . আমাদের চোখের জলের বদলা চাই! . . .'

সৈন্যদের মধ্যে একজন – মাথার সামনের দিকে বেশ খানিকটা টাক পড়েছে – পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক টুকরো রুটি লুফে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠল তার ওপর।

'অমন চেল্লাচেল্লি করছ কেন, অ্যাঁ? চুপ কর, নইলে একদিন দেখবে তোমার পড়শীরাই তোমাকে কসাকদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

বুন্‌চুক তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আন্না মৃদু হেসে বলল, 'এটাই কি শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের বন্ধনের চিহ্ন নয়?'

'আড়াল নাও!' সারির মাথা থেকে কে একজন চিৎকার করে বলল।

ততক্ষণে শহরতলি ছাড়িয়ে এসেছে তারা। লড়াই শুরু হয়ে গেল। কসাকদের গুলিগোলার মজুত কমে আসায় তারা উৎসাহশূন্য হয়ে ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে আক্রমণ করতে লাগল।

পদ্‌তিওল্‌কভ রেড গার্ডদের সারির এমুড়ো থেকে ওমুড়ো দাপাদাপি করতে করতে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'গুলিগোলার ব্যাপারে তোমরা কোন কিপ্টেমি কোরো না ভাই! ওদের সকলের পেছনে খরচ করার মতো যথেষ্ট আছে আমাদের!'

গুলিগোলার যথেচ্ছ ব্যবহার চলল। গোলার পর গোলা ফেটে পড়তে লাগল, স্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে একটা ইটখোলার ধূমায়মান চিমনির ওপাশে প্রতিধ্বনি তুলল।

ঠোঁট থেকে নোন্‌তা ঘাম চাটল বুন্‌চুক।

'এখানে রাখব?' মেশিনগানারদের একজন বলল।

'হ্যাঁ ঠিক আছে!'

'গুলি ভরব?'

'হ্যাঁ, লাগাও!'

বুন্‌চুক তাড়াতাড়ি করে মেশিনগানটা বসানোর জন্য একটা অগভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলল। ধরাধরি করে মেশিনগানটা সেখানে বসিয়ে দেওয়া হল। তার সঙ্গী কার্তুজের ফিতে পরিয়ে দিল।

ছব্বিশ

বুন্‌চুকের মেশিনগানারদের মধ্যে একজন ছিল তাতারস্কি গ্রামের সেই কসাক মাক্সিম্‌কা গ্রিয়াজ্‌নোভ। কুতেপভের স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সে তার ঘোড়াটা হারিয়েছিল। এর পর থেকে সে প্রচণ্ড মদ খেতে শুরু করে, তাসের জুয়ো তাকে পেয়ে বসে। সেই যে ঘোড়াটা যেটার রঙ ছিল ষাঁড়ের মতো, পিঠ বরাবর রুপোলি ডোরা, মাক্সিম্‌কাকে পিঠে নিয়েই সেটা যখন মারা পড়ল, তখন মাক্সিম্‌কা জিনটা পিঠ থেকে খুলে নিয়ে প্রায় ক্রোশ দুয়েক বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন দেখতে পেল শত্রুসৈন্যরা যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে তাড়া করেছে, জ্যান্ত পার পাওয়া দুষ্কর, তখন জিন থেকে বুকে বাঁধার জমকাল কারুকাজ করা পটিটা খুলে ফেলল, সেটা আর ঘোড়ার মুখের সাজটা নিয়ে কারও কোন তোয়াক্কা না করে রণস্থল থেকে প্রস্থান করল। এরপর তার আবির্ভাব ঘটল একেবারে রস্তোভে। এক কসাক মেজরকে কুপিয়ে কেটে ফেলে তার কাছ থেকে রুপো বাঁধানো যে

তলোয়ারটা হাতিয়েছিল, রস্তোভে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিন তাসের জুয়ো খেলে সেটা হারাল, ঘোড়ার যে সাজটা তার হাতে ছিল সেটা, এমনকি পরনের সালোয়ার, বাছুরের চামড়ার হাইবুট পর্যন্ত হারাল। বুনচুকের প্লেটুনে সে এলো একেবারে উলঙ্গ অবস্থায়। বুনচুক তাকে পরনের জামাকাপড় দিল, সাদরে জায়গা দিল তাকে। মাক্সিম্‌কা হয়ত নিজেকে শোধরাতেও পারত, কিন্তু রস্তোভে ঢোকার মুখে যে লড়াই শুরু হল সেই সময় একটা গুলি এসে তার মাথায় বিঁধল, মাথার খুলিটা টিনের খাবারের কৌটোর মতো খুলে গেল। মাক্সিম্‌কার নীল চোখদুটোর একটা টসকে তার জামার ওপর গড়িয়ে পড়ল, ভাঙা করোটি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। এক কালের ঘোড়া চোর, হালের পাঁড় মাতাল, ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার কসাক গ্রিয়াজ্‌নোভ নামে কোন লোক যেন কস্মিনকালে ধরাধামে ছিল না।

বুনচুক তাকিয়ে দেখল মাক্সিম্‌কার দেহটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাক্সিম্‌কার মাথার ফুটোটা থেকে রক্ত ছিটকে এসে মেশিনগানের নলে লাগতে সেখান থেকে সযত্নে তা মুছে ফেলল বুনচুক।

সেই মুহূর্তে পিছু হটে যাবার দরকার হল। বুনচুক মেশিনগান টেনে নিয়ে চলল। তামাটে পিঠটা রোদের দিকে ক'রে, গায়ের জামাটা মাথার ওপর তুলে দিয়ে (মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হাত দিয়ে মাথার ওপর টেনে দিয়েছিল) গরম মাটির ওপর পড়ে পড়ে জুড়িয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়ে গেল মাক্সিম্‌কা।

তুরস্কের ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসা সৈন্যদের নিয়ে আগাগোড়া তৈরি রেড গার্ড প্লেটুনটা চৌরাস্তার প্রথম যে মোড়টা পেল সেখানেই ঘাঁটি গাড়ল। সামনের দিকে টাক-পড়া জরাজীর্ণ পশমী টুপি মাথায় সৈন্যটি বুনচুককে মেশিনগান বসাতে সাহায্য করল, বাকিরা রাস্তার আড়াআড়ি ব্যারিকেড ধরনের একটা অবরোধ বানিয়ে ফেলল।

'এসে দেখা করে যাও!' সামনের টিলার ওধারে ধনুকের মতো বাঁকা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে একজন দাড়িওয়ালা সৈন্য হেসে বলল।

'এখন আমরা এদের ওপর ছাড়ব!'

'ভাগু রে সামারা, ভাগু!' বেশ জোয়ান চেহারার এক ছোকরাকে একটা বেড়ার তক্তা খোলার চেষ্টা করতে দেখে একজন তাকে চেঁচিয়ে বলল।

'এই যে ওরা আসছে!' সামনের দিকে টাক-পড়া লোকটা ভোদ্‌কার গুদামের চালের ওপর উঠে বসেছিল – সেখান থেকে চিৎকার করে সে বলল।

আন্না মাটির ওপর ওত পেতে শুয়ে পড়ল বুনচুকের পাশে। রেড গার্ডরা ব্যারিকেড দিয়ে সাময়িক ভাবে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তার আড়ালে ঘন হয়ে শুয়ে পড়ল।

এই সময় ওদের পাশের, ডান দিকের গলিটা দিয়ে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে তিতির পাখিরা যেমন ছোটে, সেই রকম ছুটে এসে জনা দশেক রেড গার্ডদের একটা দল কোনার বাড়িটার দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিল। দৌড়ানোর সময় একজন শুধু চেঁচিয়ে বলার অবকাশ পেল, 'ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আমাদের পেছন পেছন! সাবধান!'

মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার মোড়টা জনশূন্য ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সামনে ধুলোর ঝড় ওড়াতে ওড়াতে ক্যারাবিন বন্দুক একপাশে চেপে মাথার টুপিতে সাদা পটি বাঁধা এক কসাক ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল। এত জোরে ঘোড়ার লাগাম ধরে সে টান মারল যে ঘোড়াটা পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে প্রায় বসে পড়ল। বুনচুকও অমনি নাগান রিভল্ভারের গুলি ছুঁড়ল। কসাকটা ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে পড়ে উল্টো দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। মেশিনগানের কাছে যে সমস্ত সৈন্য ছিল তারা কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে উস্খুস করতে লাগল। দু'জন বেড়াটা বরাবর ছুটে গিয়ে গেটের কাছে শুয়ে পড়ল।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল ওরা ইতস্তত করছে, এক্ষুনি ওরা পালাবে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভরা স্তব্ধতা, ওদের হতচকিত দৃষ্টি – দৃঢ়তার কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল না।... কিন্তু এর পর যা ঘটল তার একটি মাত্র মুহূর্তই বুনচুকের স্মৃতিতে স্পর্শ করে উজ্জ্বল গাঁথা হয়ে রইল। আন্না এক লাফে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার মাথায় ওড়নাটা খসে পেছনে সরে গেছে, চুল এলোমেলো, মুখ রক্তশূন্য, সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে তাকে দেখে চেনা যায় না। রাইফেল হাতে নিয়ে চারধারে তাকাতে তাকাতে কসাকটা যে বাড়িটার পেছনে গা ঢাকা দিয়েছিল, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, তারপর তার চেহারার মতোই চিনতে না পারার মতো ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'আমার পেছনে চলে এসো!' সঙ্গে সঙ্গে অনিশ্চিত পদক্ষেপে হোঁচট খেতে খেতে ছুট দিল।

বুনচুক উঁচু হয়ে উঠে দেখল। একটা অস্ফুট আর্তনাদে বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখটা। পাশের একজনের হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছুটল আন্নার পিছন পিছন। দুই পায়ে সে ভয়ঙ্কর কাঁপুনি অনুভব করল, আন্নাকে ফিরে আসতে বলার প্রবল চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, চিৎকার করে তাকে ডাকতে গিয়ে কালো হয়ে গেল বুনচুকের মুখ। পেছনে কয়েকজন লোক দুপদাপ পা ফেলে ছুটে আসছে, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বুনচুক তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে পারল এখনই এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে যা আর কখনও সংশোধন করা যাবে না। সেই মুহূর্তে বুনচুক ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে আন্নার এই আচরণ অর্থহীন, বিচারবিবেচনাহীন, তার পরিণতি

ভয়ঙ্কর, কেননা এতে অন্যেরা আকৃষ্ট হবে না।

কোনাটার কাছে আসতেই ছুটে আসা কসাকদের সরাসরি পাল্লার মুখে পড়ে গেল বুন্‌চুক। তারা ছুটতে ছুটতে এলোমেলো এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল। গুলির শিস। পরক্ষণেই আহত খরগোসের মতো আন্নার করুণ আর্তনাদ। এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মেলে মাটিতে ভেঙে পড়ল আন্না। কসাকরা কখন কী ভাবে ফিরে চলে গেল বুন্‌চুক দেখতে পেল না; বুন্‌চুকের মেশিনগানের কাছে যে আঠারো জন সৈন্য ছিল, আন্নার এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে উৎসাহিত হয়ে তাদের অনেকে কসাকদের পেছন পেছন কী ভাবে তাড়া করে গেল এ দৃশ্যও সে দেখতে পেল না। তার চোখের সামনে তখন একমাত্র আন্না। আন্না ছটফট করছে তার পায়ের কাছে। ওকে তুলে কোথাও বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এক পাশে উল্‌টে দিল, নিজের হাতের কোন সাড় পেল না। দেখতে পেল বাঁ দিকে রক্তের দাগ, নীল ব্লাউজের ছেঁড়া টুকরোগুলো ঝুলছে ক্ষতের চারধারে, বুঝতে পারল গুলি ভেতরে ঢুকে ফেটে গিয়ে এই ক্ষত হয়েছে, বুঝতে পারল এর অর্থ আন্নার মৃত্যু, তার চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে আসছে, তাতে ফুটে উঠেছে মৃত্যুর চিহ্ন।

কে একজন বুন্‌চুককে ঠেলে সরিয়ে দিল। আন্নাকে সকলে ধরাধরি করে কাছের একটা বাড়ির উঠোনে নিয়ে এসে চালাঘরের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুইয়ে দিল।

মাথার সামনের দিকে টাক-পড়া সৈন্যটা একরাশ তুলো গুঁজে দিল ক্ষতস্থানে, পর মুহূর্তেই সেগুলো চাপ চাপ রক্তে ভিজে ফুলে কালো হয়ে উঠতে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুন্‌চুক নিজেকে সামলে নিয়ে আন্নার ব্লাউজের কলারের বোতাম খুলে দিল, নিজের গায়ের ভেতরের জামা থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল; দেখতে পেল ফাঁকে ফাঁকে বাতাস ঢুকে বুদ্বুদের মতো ভুড়ভুড়ি তুলে বেরিয়ে আসছে রক্ত, আন্নার মুখটা নীলচে সাদা হয়ে আসছে, তার কালো ঠোঁটদুটো যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, কিন্তু ফুসফুসদুটো বাতাসের অভাবে আঁকুপাঁকু করতে লাগল – বাতাস মুখ দিয়ে ঢুকে ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আন্নার গায়ের জামাটা ছুরি দিয়ে কেটে বুন্‌চুক নিঃসঙ্কোচে অনাবৃত করে দিল কালঘামে ভেজা তার শরীরটা। কোন রকমে ক্ষতের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। কয়েক মিনিট পরে আন্নার জ্ঞান ফিরে এলো। কালো কোটরে বসা চোখদুটো মেলে ইলিয়ার দিকে তাকাল, চোখের পাতা মৃদু কাঁপতে কাঁপতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলল।

'জল! উঃ কী গরম!' চেঁচিয়ে উঠল সে, ছটফট করতে করতে আর্তনাদ করে উঠল। 'আমি বাঁচতে চাই! ই-লি-য়া! . . . ওগো! . . . উঃ!'

বুন্‌চুক তার ফোলা ফোলা ঠোঁটদুটো চেপে ধরল ওর তপ্ত গালে, মগে করে খানিকটা জল ঢেলে দিল ওর বুকের ওপর। ওর কণ্ঠার হাড়ের নীচের গর্তটা জলে কানায় কানায় ভরে উঠে পরক্ষণেই শুকিয়ে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে আন্না। বুন্‌চুক ওর বুকের ওপর কতই না জল ঢালল! আন্না ছটফট করতে লাগল, বুন্‌চুকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

'উঃ কী গরম! . . . আগুন! . . .'

তার দেহের শক্তি ফুরিয়ে এলো, একটু একটু করে জুড়িয়ে আসতে লাগল শরীরটা। পরিষ্কার গলায় সে বলল, 'কেন এমন হল ইলিয়া? দেখলে ত কত সহজ। . . . বড় অদ্ভুত লোক তুমি! . . . দারুণ সোজা। . . . ইলিয়া, লক্ষ্মী আমার, তুমি কিন্তু মাকে যে করে হোক . . . তুমি জান . . .' লোকে হাসতে গেলে যে রকম হয় সেই ভাবে আধবোজা চোখদুটো কুঁচকে যন্ত্রণা ও আতঙ্কের ভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে, তারপর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসতে ঢোক গিলতে গিলতে অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল, 'প্রথমে মনে হল . . . একটা ধাক্কা, যেন ছ্যাঁকা খেলাম। . . . এখন সারা শরীর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। . . . বুঝতে পারছি, আমি মারা যাচ্ছি। . . .' বুন্‌চুক দু'হাত নাড়িয়ে বিষণ্ণভাবে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে দেখে ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'অমন কোরো না! উঃ কী কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে!'

থেমে থেমে ঘন ঘন অনেক কথা বলে গেল সে, যেন মনের সমস্ত বোঝা হাল্‌কা করার চেষ্টা করছে। বুন্‌চুক সীমাহীন আতঙ্কে লক্ষ করল তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, যেন আরও স্বচ্ছ, দু'পাশের রগের কাছটায় যেন আরও হলুদ হয়ে আসছে। আন্নার হাতের দিকে দৃষ্টি সরে যেতে বুন্‌চুক দেখতে পেল হাতদুটো নিষ্প্রাণ হয়ে শরীরের পাশে পড়ে আছে, লক্ষ করল হাতের নখগুলোতে পেকে ওঠা টসটসে কালো জামের মতো গোলাপী নীল রঙ ধরেছে।

'জল! বুকের ওপর জল দাও! . . . ওঃ কী গরম!'

বুন্‌চুক জল আনতে ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। ফিরে এসে চালাঘরের নীচে আন্নার গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ আর শুনতে পেল না। মুখটা অন্তিম মুহূর্তের যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে, মোমের ছাঁচের মতো হাতের তালুটা তখনও উষ্ণ, ক্ষতস্থানের ওপর চেপে ধরা – তার ওপর এসে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের আলো। তার দু কাঁধে আস্তে করে চাপ দিতে দিতে বুন্‌চুক তাকে উঁচু করে তুলে ধরল, মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল তার নাকের দিকে – নাকটা সরু হয়ে এসেছে, নাকের খাঁজের কাছে মেছেতার ছোট ছোট দাগগুলো কালো কালো দেখাচ্ছে; ছড়ানো দুই কালো ভুরুর নীচে লক্ষ করল চোখের মণির জুড়িয়ে আসা ঝলক। অসহায় ভাবে এলিয়ে পড়া মাথাটা ক্রমেই আরও নীচের দিকে ঝুলে পড়তে লাগল, বালিকার ঘাড়ের

মতো রোগাটে তার ঘাড়ের ওপর একটা নীল শিরা দপদপ করে নাড়ীর শেষ স্পন্দনটুকু জানিয়ে দিল।

আধবোজা কালো চোখের পাতায় ঠোঁট চেপে ধরে বুনচুক ডাক দিল, 'আন্না, বন্ধু আমার!' তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'পাশে চেপে ধরা হাতদুটো এতটুকু না নাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম সোজা হয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল।

অন্ধের মতো গেটের একটা খুঁটিতে সে ধাক্কা খেল, ধরা গলায় একবার আর্তনাদ করে উঠল, তার যেন মনে হল আন্নার ডাক সে শুনতে পাচ্ছে, চার হাত পায়ে ভর দিয়ে সে ক্রমেই আরও তাড়াতাড়ি হামা দিতে লাগল, তার মুখ প্রায় মাটিতে ঘসটে গেল। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল, অসংলগ্ন কতকগুলো শব্দ বেরিয়ে এলো। একটা আহত পশুর মতো বেড়ার পাশে ভীষণ ভাবে ছটফট করতে করতে বুকে হেঁটে বেড়াতে লাগল সে। উঠোনে চালাঘরের নীচে যে তিনজন রেড গার্ড ছিল, তারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তাকে, নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল। মানুষের শোকের এমন বীভৎস ও নগ্ন প্রকাশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা।

সাতাশ

এর পরের দিনগুলো বুনচুকের যেন কাটল টাইফাসের বিকারের ঘোরে। হাঁটাচলা, এটা ওটা সেটা কাজকর্ম সে করে গেল, খেল, ঘুমোল, কিন্তু সবই যেন কেমন একটা নেশার ঘোরে, আধা ঘুম, আধা জাগ্রত অবস্থায়। হতবুদ্ধি হয়ে ফোলাফোলা চোখে তাকিয়ে থাকে তার চারপাশের ছড়ানো জগতের দিকে, যেন কিছুই বুঝতে পারে না। চেনাপরিচিতদের সে চিনতে পারল না, তাদের দেখে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন নেশায় চুর হয়ে আছে, নয়ত দীর্ঘকাল কোন মারাত্মক রোগভোগের পর সবে সেরে উঠেছে। আন্নার মৃত্যুর পর থেকে তার বোধশক্তি সাময়িক ভাবে ভোঁতা হয়ে গেল – কিছুই ভালো লাগে না, কিছুই ভাবতে চায় না সে।

বন্ধুরা হয়ত বলল, 'বুনচুক, খাও!' – স্থির শূন্য দৃষ্টিতে একটা বিন্দুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অতিকষ্টে আলস্যভরে চোয়াল নেড়ে খাবার খেল।

ওরা তার ওপর নজর রাখল, ওকে হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলল নিজেদের মধ্যে।

'তুমি কি অসুস্থ?' মেশিনগানারদের মধ্যে একজন পরের দিন ওকে জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তাহলে কী হল তোমার? ওর কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ?'

'না।'

'আচ্ছা এসো, তামাক খাওয়া যাক। ওকে ত আর এখন ফিরিয়ে আনা যাবে না ভাই। এর পেছনে এত ইন্ধন খরচ করা ঠিক হবে না।'

ঘুমের সময় হলে তাকে বলা হল, 'ঘুমিয়ে পড় বুন্‌চুক। সময় হয়ে গেছে।' – অমনি সে শুয়ে পড়ে।

বাস্তব জগৎ থেকে সাময়িক ভাবে সরে গিয়ে এই অবস্থায় চার দিন কেটে গেল তার। পাঁচদিনের দিন রাস্তায় ক্রিভশ্‌লিকভের সঙ্গে তার দেখা। তার জামার হাতা ধরে টান দিল ক্রিভশ্‌লিকভ।

'আরে এই যে! তোমাকেই ত খুঁজছি!' বুন্‌চুকের দুর্ভাগ্যের খবর ক্রিভশ্‌লিকভের জানা ছিল না। বন্ধু ভাবে তার কাঁধে চাপড় মারল, পরক্ষণেই উদ্বেগের সঙ্গে হেসে বলল, 'কী হল তোমার? মদের নেশাটেশা করো নি ত? উত্তরের প্রদেশগুলো থেকে কসাকদের জড় করার জন্যে সেখানে দল পাঠানো হচ্ছে, শুনেছ? পাঁচজনের একটা কমিশন হয়েছে। ফিওদর নিয়ে যাচ্ছে দলটাকে। উত্তরের কসাকরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা। নইলে আমরা এখানে ফাঁদে আটকা পড়ে থাকব। গতিক খারাপ! তুমি যাবে? প্রচারের জন্যে লোক দরকার আমাদের। যাবে?'

'হ্যাঁ যাব,' বুন্‌চুক সংক্ষেপে উত্তর দিল।

'বাঃ, বেশ! আমরা কাল রওনা দিচ্ছি। অর্লভ দাদুর ওখানে চলে এসো। উনি আবার আমাদের জ্যোতিষী।'

সেই আগের মতোই পরিপূর্ণ সমাহিত এক মানসিক অবস্থার মধ্যে বুন্‌চুক যাত্রার আয়োজন করল। পরদিন ১লা মে, দলের সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দনের সোভিয়েত সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি রীতিমতো আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়াল। ইউক্রেন থেকে জার্মান দখলদার-বাহিনী এগিয়ে আসছে, প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের কবলে পড়ে ভাটির জেলা আর প্রদেশগুলোর রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে।

রস্তোভ প্রদেশের আড়ত এলাকায় জেনারেল পপোভ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখান থেকে নোভোচের্কাস্‌স্কের ওপর যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা আছে। ১০ থেকে ১৩ই এপ্রিল রস্তোভে সোভিয়েতগুলোর জেলা-কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সময় চেরকাসীয়রা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে রস্তোভের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে উপকণ্ঠের কিছু জায়গা দখল করে ফেলায় অধিবেশনে একাধিকবার বাধা পড়ে।

একমাত্র দনের উত্তরে, খোপিওর আর উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসা প্রদেশে তখনও বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। দনের ভাটি অঞ্চলের কসাক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমর্থনলাভের সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ আর অন্য সকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আকৃষ্ট হল ওই আগুনের উষ্ণতার দিকে। সৈন্যসমাবেশের প্রয়াস বানচাল হয়ে গেল। পদ্‌তিওল্‌কভ হালে দন গণকমিসার পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। লাগুতিনের উদ্যোগে পদ্‌তিওল্‌কভ ঠিক করেছে উত্তরে গিয়ে যুদ্ধ-ফেরতাদের নিয়ে তিন-চারটে রেজিমেন্ট গড়ে তুলবে, তাদের নিয়ে ভাটি এলাকায় প্রতিবিপ্লবীদল আর জার্মানদের বাধা দেবে।

পাঁচজনকে নিয়ে সৈন্যসমাবেশের এক জরুরী কমিশন গঠন করা হল। পদ্‌তিওল্‌কভ হল তার সভাপতি। সৈন্যসমাবেশের প্রয়োজনে তারা কোষাগার থেকে সোনা আর জারের টাকা মিলে এক কোটি রুব্‌ল নিল। তাড়াহুড়ো করে প্রধানত আগেকার কামেন্‌স্কায়া এলাকার প্লেটুনের কসাকদের নিয়ে টাকার বাক্সের পাহারাদারদল গড়ে তোলা হল। তারপর প্রচারের কাজের জন্য কয়েকজন কসাক সঙ্গে নিয়ে ১লা মে অভিযাত্রীদলটা যখন কামেন্‌স্কায়া যাত্রা করল তখনই জার্মান প্লেনগুলো থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে।

ইউক্রেন থেকে পিছু হটা রেড গার্ডদের নিয়ে যে সমস্ত সামরিক ট্রেন চলেছে সেগুলোর ভিড়ে রেলপথ গাদাগাদি। বিদ্রোহী কসাকরা পুল উড়িয়ে দিচ্ছে, রেল দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। রোজ সকালে নোভোচের্‌কাস্‌স্ক-কামেন্‌স্কায়া লাইনের মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন দেখা দেয়, এক ঝাঁক চিলের মতো চক্কর খেতে খেতে নীচে ছোঁ মারে – সামরিক ট্রেনগুলোর ওপর মেশিনগানের সংক্ষিপ্ত কয়েক ঝাঁক গুলি ছোঁড়ে, কামরার ভেতর থেকে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে রেড গার্ডদের দল। ঘর্ঘর আওয়াজ করে ওঠে গুলিগোলার ছর্‌রা, যুদ্ধ আর ধ্বংসের কটু গন্ধের সঙ্গে ধাতু পোড়ার গন্ধে ভরে ছেয়ে যায় আকাশ বাতাস। এরাপ্লেনগুলো মুহূর্তের মধ্যে অবিশ্বাস্যরকম উঁচুতে উঠে উধাও হয়ে যায়, কিন্তু রাইফেলধারীরা আরও অনেকক্ষণ ধরে তাদের ভাঁড়ার উজার করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তখন ট্রেনের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে খালি-কার্তুজের স্তূপে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। নভেম্বর মাসে ওক গাছের সোনালি ঝরাপাতায় যেমন গিরিপথ ছেয়ে যায়, তেমনি রেলরাস্তার ধারের বালি ছেয়ে থাকে খালি-কার্তুজে।

সর্বত্র সীমাহীন ধ্বংসের চিহ্ন। ঢালের ওপর আগুনে পুড়ে ঝাঁই, চূর্ণবিচূর্ণ রেলের কামরা, টেলিগ্রাফের খুঁটির ওপর ছেঁড়া তারে জড়ানো ইন্‌সুলেটরগুলো সাদা ঝকঝক করছে। বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, বেড়াগুলো সার ধরে নিশ্চিহ্ন, যেন ঘূর্ণিঝড়ে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে। . . .

অভিযাত্রীদের দলটি ট্রেনে করে পাঁচদিন ধরে মিল্লেরোভোর দিকে এগোতে লাগল। ছয় দিনের দিন সকালবেলা পদ্‌তিওল্‌কভ তার নিজের কামরায় কমিশনের সদস্যদের সভা ডাকল।

'এভাবে এগুনো সম্ভব নয়! এসো আমাদের সঙ্গে যা যা জিনিসপত্র আছে সব ফেলে দিয়ে মার্চ ক'রে এগোতে থাকি।'

'বল কী?' লাগুতিন অবাক হয়ে বলল। 'উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসার পথে আমরা যত দিন খুট্‌খুট্‌ করে এগোতে থাকব তার মধ্যেই শত্রুরা এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'অনেকটা দূর,' ম্রিখিন ইতস্তত করে বলল।

একমাত্র ক্রিভশ্‌লিকভই একটা গ্রেটকোট গায়ে মুড়ি দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। গ্রেটকোটটার কলারের ডোরার রঙ জ্বলে গেছে। ক্রিভশ্‌লিকভ মাত্র কয়েকদিন আগে অভিযাত্রীদলটার নাগাল ধরেছে। ম্যালেরিয়ার জ্বরে কাঁপছে সে, কুইনিন খেয়ে তার কান আর মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্‌ করছে। আলোচনায় সে কোন অংশ নিল না, একটা চিনির বস্তার ওপর কোলকুঁজো হয়ে বসে রইল। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন চোখ মেলে সে কটমট করে তাকাতে লাগল পদ্‌তিওল্‌কভের 'প্রণয়িনী' জিন্‌কার দিকে। পীনোন্নত স্তন, বাদামী চুল এই মেয়েটি নার্স, এই অজুহাত দেখিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোগা পাতলা চেহারার ক্রিভশ্‌লিকভ যেমন তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না তেমনি জিন্‌কাও তার ওপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করার সুযোগ ছাড়ে না। সুডৌল পাদুটো ছড়িয়ে আরাম করে একটা চায়ের পেটির ওপর বসে, খেঁকশিয়ালীর দাঁতের মতো খুদে খুদে দাঁতে সিগারেটের গোড়া চিবুতে চিবুতে সে বেহায়ার মতো হাসছিল। প্রথম যেদিন ওদের দু'জনের দেখা হয় সেদিন থেকেই ওদের দু'জনার দু'জনকে ভারী অপছন্দ। কী করে পদ্‌তিওল্‌কভকে টিট করা যায় আর এই প্রাণীটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় – ক্রিভশ্‌লিকভ সে-সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

'ক্রিভশ্‌লিকভ! তুমি কি বোবা হয়ে গেলে নাকি?' ম্যাপ থেকে মুখ না তুলেই শুষ্ককণ্ঠে পদ্‌তিওল্‌কভ জিজ্ঞেস করল।

'কী ব্যাপার?'

'আমরা কী নিয়ে আলোচনা করছি শুনছ না? মার্চ করে যেতে হয় আমাদের, নইলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে, আমরা খতম হয়ে যাব। তুমি কী বল? তুমি ত আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া-জানা লোক। বল।'

'মার্চ করে যাওয়া যায় না এমন নয়,' থেমে থেমে ধীরে ধীরে ক্রিভশ্‌লিকভ

শুরু করল, কিন্তু তারপর হঠাৎই তার দাঁতগুলো যেন হুবহু নেকড়ের দাঁতের মতো বেরিয়ে পড়ে কড়মড় করে উঠল, জ্বরের প্রকোপে মৃদু কাঁপতে লাগল তার শরীর। 'আমাদের সঙ্গে অত মালপত্তর না থাকলে তা করা যেত। সঙ্গে যত মেয়েমানুষ নেওয়া সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশি আছে তোমার কাছে। চুলোয় যাক ওগুলো! ওগুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে হবে আমাদের।'

'আঃ মিখাইল, ওসব কথা ছাড়।' অস্বস্তিভরে আপত্তি জানাল পদ্‌তিওল্‌কভ।

'ছাড়ব কেন?' ক্রিভশ্‌লিকভের দাঁতে দাঁত বেধে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনরকমে দাঁতের ফাঁক দিয়ে সে উচ্চারণ করল। 'গাড়ি করে মেয়েদের ঘোরানোর সময় নয় এটা।'

লাগুতিন তাকে উৎসাহদানের ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

জিন্‌কা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার নীল চোখে চাপা আগুন।

'আমি তোমার গাড়িতে চেপে বেড়াচ্ছি না, বুঝলে ঠুঁটো! অত কাঁপাঝাঁপা কেন? থামালে!'

'আরে থাম দেখি, অনেক হয়েছে!'

'তুমি নিজের সম্পর্কে ভাব কী? ভারী আমার অফিসার হয়েছে! শালা।'

'থামো!' কুচকাওয়াজের হুকুম ছাড়ার স্বরে পদ্‌তিওল্‌কভ হাঁকল। তারপর জিন্‌কার দিকে ঘুসি পাকিয়ে বলল, 'চেল্লাচেল্লি থামালে! নইলে এখুনি কিন্তু চুলের মুঠো ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব!'

জিন্‌কা চুপ করে গেল, বিতৃষ্ণাভরে নাক কোঁচকাল। পদ্‌ভিওল্‌কভ খেঁকিয়ে উঠল লাগুতিনের ওপর।

'তুমি অমন ছেনালের মতো মিটিমিটি হাসছ যে বড়! মার্চ করে কেন এগুনো যাবে না তার কোন সঠিক কারণ দেখাতে পার?'

এলাকার ম্যাপটা দরজার কাছে এনে মেলে ধরল পদ্‌তিওল্‌কভ। ব্রিখিন উঁচু করে ধরল দুই কোনা। মেঘাচ্ছন্ন পশ্চিম দিক থেকে দমকা হাওয়া আসছিল, তার ঝাপটায় ম্যাপটা পত্‌পত্‌ করতে লাগল, খস্‌খস্‌ আওয়াজ তুলে হাত থেকে খসে পড়ার উপক্রম হল।

'এই যে আমরা কী ভাবে যাব, দেখ!' তামাকের ছোপলাগা আঙুল ম্যাপের ওপর কোনাকুনি চালিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল। 'স্কেল দেখতে পাচ্ছ? শ দেড়েক মাইল হবে বড় জোর, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই ত দেখছি। ধুত্তোর ছাই!' লাগুতিন রাজী হয়ে গেল।

'তুমি, মিখাইল? কী বল্?'

ক্রিভশ্‌লিকভ বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকাল:

'আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আমি তাহলে এক্ষুনি গিয়ে কসাকদের চটপট ট্রেন থেকে নামতে বলি। সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

ব্রিখিন উৎসুক দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকাল, কারও মুখে আপত্তির কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে কামরা থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

যে সামরিক-ট্রেনে চেপে পদ্‌তিওল্‌কভের অভিযাত্রীদল যাত্রা করেছিল, সেদিনের সেই বিষণ্ণ বাদলা সকালে সেটা বেলায়া কালিত্‌ভার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রেটকোটে মাথা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বুনচুক তার কামরায় শুয়ে ছিল। কামরায় আর সব কসাক চায়ের জল গরম করছে, নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করছে।

মিগুলিনস্কায়ার কসাক ভান্‌কা বোল্‌দিরেভ – বাচাল প্রকৃতির, লোককে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে ওস্তাদ – দলের একজন মেশিনগানারের পেছনে লেগেছে সে।

'ওহে ইগ্‌নাত, তোমার বাড়ি কোন্ প্রদেশে?' তামাকের ধোঁয়ায় পোড়া ফ্যাঁসফেঁসে ভাঙা গলায় সে বলল।

'তাম্বোভ,' উত্তরে নরম মোটা গলায় গোবেচারা ইগ্‌নাত বলল।

'তুমি মোর্‌শান্‌স্কের লোক, তাই না?'

'না, শাত্‌স্কের।'

'ও, আচ্ছা। . . . শুনেছি ওখানকার ছোকরারা নাকি দারুণ লড়ুয়ে হয় – একজনের বিরুদ্ধে মারামারিতে সাতজন নামতে ভয় পায় না। আচ্ছা সেই যে বেদির সামনে শশা দিয়ে একটা বাছুরের গলা কাটতে গিয়েছিল – সেটা কি তোমাদের গাঁয়ের ঘটনা?'

'হয়েছে, হয়েছে, ছাড় দেখি।'

'ওঃ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম! ওটা তোমাদের গাঁয়ের ঘটনা নয়। আচ্ছা, সেই যে গির্জের গায়ে চাপটা চাপটা করে সরা পিঠে লাগিয়ে, মটরদানার ওপর গির্জাটাকে বসিয়ে পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছিল – তোমাদের গাঁয়ে না? ঠিক বলি নি?'

চায়ের জল ফুটতে শুরু করল, ফলে কিছুক্ষণের জন্য বোল্‌দিরেভের রসিকতার হাত থেকে ইগ্‌নাত রেহাই পেল। কিন্তু সকালের খাবার খেতে বসতে না বসতে ভান্‌কা ফের শুরু করে দিল।

'ইগ্‌নাত, শুয়োরটা খাচ্ছ না যে তুমি? ভালোবাস না নাকি?'

'না, না, তা কেন?'

'তাহলে এই নাও শুয়োরের পাছার মাংস। খেতে ভালো?'

সকলে হাসিতে ফেটে পড়ল। একজন কার যেন গলায় বিষম লেগে গেল। অনেকক্ষণ ধরে খক্‌খক্ করে কাশতে লাগল। সকলে উৎসাহভরে জুতোর খস্‌খস্

খট্‌খট্ আওয়াজ তুলল। পরক্ষণেই হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রুদ্ধস্বরে ইগ্‌নাতকে বলতে শোনা গেল:

'গেলার ইচ্ছে হয় ত তুমি নিজেই গেল না শালা! তোমার ওই পাছা নিয়ে আমার কাছে আসা কেন বাপু!'

'পাছা আমার নয়, শুয়োরের।'

'ওই একই হল – জঘন্য!'

বোল্‌দিরেভ তার খসখসে গলায় নির্বিকার ভাবে টেনে টেনে বলল, 'জঘন্য? আরে তোমার মাথা খারাপ নাকি? ঈস্টারের প্রসাদী করা মাংস। তার চেয়ে বললেই পার যে হারাম বলে ভয় পাচ্ছ। . . .'

বোল্‌দিরেভের জেলার হাল্‌কা বাদামী চুল সুন্দর চেহারার এক কসাক, চারটি পর্যায়ের সেন্ট জর্জ ক্রসের সবগুলোরই অধিকারী, তাকে ঠাট্টা করে যুক্তি দিয়ে বোঝাল:

'ছাড়্ দেখি ইভান! এই ব্যাটাকে নিয়ে নির্ঘাত বিপদে পড়বি তুই! পাছা খেয়ে শেষকালে বলবে, দাও বুনো শুয়োর। কোথায় পাবি তুই?'

বুন্‌চুক চোখ বুজে শুয়ে ছিল। ওদের কথাবার্তা তার কানে যাচ্ছিল না। মাত্র কয়েকদিন আগের সেই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি যেন আগের চেয়েও তীব্র হয়ে উঠে তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। বন্ধ চোখের ঝাপসা ঢাকনার মধ্যে তার সামনে যেন দূর দিগন্তের ধূসর বাদামী অরণ্যশ্রেণীতে ঘেরা, তুষার-ঢাকা স্তেপভূমি ঘুরপাক খাচ্ছে। সে যেন অনুভব করতে পারছে ঠাণ্ডা বাতাস, আন্নাকে যেন দেখতে পেল তার পাশে। দেখতে পাচ্ছে আন্নার কালো চোখ, বড় আদরের মিষ্টি সেই মুখের দৃপ্ত অথচ কোমল রেখাগুলো, নাকের খাঁজের কাছে মেচেতার ছোট ছোট দাগ, কপালে চিন্তার রেখা। . . . তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে বুন্‌চুক তা বুঝতে পাচ্ছে না – কথাগুলো অস্পষ্ট, আরও সব কণ্ঠস্বর আর হাসির আওয়াজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু তার চোখের তারার ঝলকানি আর চোখের পল্লবের কাঁপুনিতে বুন্‌চুক আন্দাজ করতে পারছে সে কী বলছে। . . . কিন্তু তার পরই দেখা দিল আর এক আন্না – নীলচে হলুদ মুখ, গালে জুড়িয়ে আসা চোখের জলের দাগ, নাকটা সরু হয়ে গেছে, তীব্র যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে ঠোঁট।

ঝুঁকে পড়ে আন্নার কোটরে বসা, জুড়িয়ে যাওয়া কালো চোখে চুমু খেতে গেল বুন্‌চুক। . . . আর্তনাদ করে উঠল সে, ফোঁপানি থামানোর জন্য নিজের মুখেই হাত চাপা দিল। মুহূর্তের জন্যও আন্না তার চোখের সামনে থেকে সরছে না। এতটা সময় কেটে যাওয়া সত্ত্বেও আন্নার মূর্তি তার কাছে অস্পষ্ট হল না, মলিনও হল না। তার মুখ, তার অবয়ব, হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গি, মুখের ভঙ্গি, টানা

টানা ভুরু–এই সবগুলো টুকরো মিলে গড়ে তুলল তার এক অখণ্ড, পরিপূর্ণ, জীবন্ত রূপ। বুনচুকের মনে পড়ল আন্নার রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাসে ভরা ভাবপ্রবণ কথাগুলো, আন্নার সঙ্গে থাকার সময় যা কিছু উপলব্ধি করেছে সবই তার মনে পড়ল। স্মৃতিতে জাগ্রত মূর্তি এত জীবন্ত হয়ে উঠল যে তার মানসিক যন্ত্রণা আরও দশগুণ বেড়ে গেল।

নিজের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে কোন যুক্তির বালাই না রেখে একটা জন্তুর মতো সে নিজেকে সঁপে দিল শোকের হাতে, উপশমের কোন চেষ্টা করল না। অমনিতে শক্তসমর্থ ও কঠিন হলে কী হবে একটা ঘুণধরা গাছের মতো ভেতরে ভেতরে সে ক্ষয়ে যেতে লাগল।

ট্রেন থেকে নামার হুকুম হতে তাকে ডেকে তোলা হল। উঠে উদাসীন ভাবে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর মালপত্র নামাতে সাহায্য করল। ওই রকমই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসে রওনা দিল।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার দু'ধারের নীচু ঘাসগুলো ভিজে গেছে। টিলাগুলোর মাথা আর গিরিখাতের ওপর দিয়ে অবাধে বাতাস ঝাপটা দিয়ে চলেছে। দূরে আর কাছে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রাম আর বসতি। পেছনে রেলের ইঞ্জিনের ধোঁয়া, স্টেশনের লাল লাল চৌকো দালানকোঠা। বেলায়া কালিত্‌ভা থেকে ভাড়া করা চল্লিশখানারও বেশি গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলেছে। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে চলছে। এঁটেল কালোমাটি বৃষ্টিতে ভেজার ফলে পথ চলা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। চাকায় কাদা আটকে যেতে লাগল, কালো কালো পেঁজা তুলোর মতো হয়ে জড়িয়ে যেতে লাগল। সামনে ও পেছনে ভিড় করে চলেছে স্থানীয় খনিমজুররা। কসাকদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা তাদের পরিবার পরিজন আর ভাঙাচোরা যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে পালাচ্ছে পুবের দিকে।

গ্রাচির সাইডিং লাইনের কাছে যখন তারা এসেছে তখন রমানোভ্‌স্কি ও শ্চাদেন্‌কোর বিধ্বস্ত রেড গার্ড দলগুলো তাদের নাগাল ধরল। সৈন্যদের সকলের মুখে ছাইরঙের প্রলেপ পড়েছে, লড়াই, অনিদ্রা আর অবিরাম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটানোর ফলে তারা এখন শ্রান্ত ক্লান্ত। শ্চাদেন্‌কো এগিয়ে এলো পদ্‌তিওল্‌কভের কাছে। তার সেই সুন্দর মুখটা, বিলাতি কেতায় ছাঁটা গোঁফজোড়া আর পাতলা টিকালো নাক আগের সেই শ্রী ছাঁদ হারিয়ে ফেলেছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে বুনচুক শুনতে পেল ভুরুজোড়া ভীষণ ভাবে কুঁচকে ক্রুদ্ধ ও অবসন্ন স্বরে শ্চাদেন্‌কো বলছে, 'আমাকে কী বোঝানোর চেষ্টা করছ? আমার ছেলেছোকরাদের

আমি চিনি না বলতে চাও? গতিক খারাপ, তার ওপর আবার শালার জার্মানরা! কী করে ফৌজ জোগাড় করব বল?'

তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর পদ্‌তিওল্‌কভ খানিকটা হক্‌চকিয়ে গেল, ভুরু কোঁচকাল, নিজের ফিটন-গাড়িটার কাছে ফিরে গেল। ক্রিভশ্‌লিকভ তাকে দেখে গাড়ি থেকে অর্ধেক শরীর ওঠাতে উত্তেজিত ভাবে তাকে কী যেন বলতে লাগল। এদের দিকে লক্ষ করতে বুনচুক দেখতে পেল ক্রিভশ্‌লিকভ কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের ঝটকা মেরে বাতাস কাটার ভঙ্গি করল, ঝটপট কতকগুলো কথা বলল। পদ্‌তিওল্‌কভের চোখেমুখে খুশির ভাব খেলে গেল, সে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। আড়াই মণী গোলন্দাজের বোঝার ভারে গাড়ির পাশটা মড়মড় করে উঠল। গাড়োয়ান সপাং করে চাবুক মারল ঘোড়ার পিঠে, চাপচাপ কাদা পাশে ছিটকে পড়ল।

'চালাও!' সামনের দিক থেকে হাওয়া আসতে থাকায় চামড়ার কোর্তাটা খুলে সে দিকে মেলে ধরে চোখ কুঁচকে পদ্‌তিওল্‌কভ হাঁক দিল।

আঠাশ

অভিযাত্রীদের দলটি বেশ কয়েক দিন ধরে ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া জেলায় পৌঁছানোর চেষ্টায় দনেৎস প্রদেশের বহুদূর ভেতরে ঢুকতে লাগল। ইউক্রেনীয় বসতিগুলোর লোকজন সর্বত্র তাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল, স্বেচ্ছায় তাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী বেচল, ঘোড়ার খাবার বেচল, আশ্রয়ও দিল। কিন্তু ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া পর্যন্ত যাবার জন্য ঘোড়া ভাড়া দেওয়ার প্রশ্ন উঠলেই ইউক্রেনীয়রা ইতস্তত করতে থাকে, মাথা চুলকায়, সরাসরি 'না' করে বলে।

'অমন মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছ কেন? ভালো পয়সা দেব,' একজন ইউক্রেনীয়কে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল।

'আমার প্রাণডার কি কানাকড়িও দাম নাই?'

'আরে তোমার প্রাণ দিয়ে আমার কী হবে? আমরা গাড়ির জন্যে ঘোড়া চাই।'

'পারুম না।'

'কেন?'

'কসাকগো দ্যাশে যাইতাছ না!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী হয়েছে?'

'কওন যায় না ভালো-মন্দ কীই না হইবার পারে। তুমি কি ভাবতাছ

ঘোড়াগুলানের লাইগা প্রাণে কষ্ট অইব না আমার? না রে বাই, হেই অনুরোধটা কইরো না, যামু না – পারুম না!'

ক্রাস্নকুত্স্কায়ার যত কাছাকাছি তারা এগিয়ে আসতে লাগল পদ্‌তিওল্‌কভ এবং তার দলের অন্যান্যরা ততই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল। স্থানীয় লোকজনের মনোভাবের পরিবর্তন বেশ বোঝা যাচ্ছিল। গোড়ার দিকের বসতিগুলোতে যেরকম সাদর অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা পাওয়া গিয়েছিল, পরেরগুলোতে তেমনি অভিযাত্রীদলের প্রতি স্থানীয় লোকজনের বিরূপতা ও সন্দেহের ভাব চাপা রইল না। অনিচ্ছায় খাবারদাবার বেচল, প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল। আগেকার বসতিগুলোতে যেমন স্থানীয় অল্পবয়সী ছেলেছোকরারা বিচিত্রবর্ণের ভিড় করে অভিযাত্রী দলের গাড়িঘোড়া ঘিরে দাঁড়াত, এখন আর তা হয় না। লোকজন ঘরবাড়ির জানলা থেকে থমথমে মুখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাদের দেখে, রাস্তায় দেখলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে দূরে সরে যায়।

'তোরা কি খ্রীষ্টান, না পাষণ্ড?' অভিযাত্রীদলের কসাকরা ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'অমন জুলজুল ক'রে তাকিয়ে দেখার কী আছে?'

নাগোলিনো বিভাগের একটা বসতিতে অভ্যর্থনাটা এতই শীতল হল যে ভান্‌কা বোল্‌দিরেভ মরিয়া হয়ে উঠে চটেমটে বারোয়ারিতলার মাটিতে মাথার টুপি আছড়ে ফেলল, তারপর ওপরওয়ালাদের কেউ ধারেকাছে আছে কিনা দেখার উদ্দেশ্যেই যেন চারপাশে নজর বুলিয়ে নিয়ে ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'তোরা কি মানুষ না শয়তানের বাচ্চা? অমন চুপ করে আছিস কেন শালারা? তোদের অধিকার রাখার জন্যে আমরা নিজেদের রক্ত ঝরাচ্ছি, আর তোরা কিনা আমাদের দেখেও দেখিস না! এই নাকি তোদের নীতিজ্ঞান! লজ্জা করে না! কমরেডরা, এখন আমরা সবাই সমান – কসাক, 'ঝোঁটন' বলে আর কিছু নেই – তাই অমন চোখ ছানাবড়া করে আমাদের দেখার কিছু নেই ছাই। ভালো চাস ত এক্ষুনি ডিম মুরগী সব নিয়ে আয় – সব কিছুর জন্যেই আমরা জারের টাকায় দাম দেব!'

জনা ছয়েক ইউক্রেনীয় জোয়ালে জোতা ঘোড়ার মতো ঘাড় গুঁজে শুনে গেল বোল্‌দিরেভের আস্ফালন। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় একজনও কোন সাড়া দিল না।

'শালা শুয়োরের বাচ্চারা, তোরা যেমন 'ঝোঁটন' ছিলি, তেমনই আছিস! জাহান্নামে যা তোরা, পচে মর গিয়ে শুয়োরের বাচ্চারা! পেট মোটা বুর্জোয়ার দল! ওলাউঠা মহামারীও নেয় না তোদের!' ছেঁড়া টুপিটা মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়েছিল বোল্‌দিরেভ, এবারে আরও একবার আছড়ে ফেলে চূড়ান্ত অপমানের জ্বালায় মুখ লাল করে বলল, 'তোদের কাছ থেকে কিছু আশা করাই অন্যায়!'

'অমন গাঁক গাঁক করো না!' ইউক্রেনীয়রা এদিক ওদিক সরে পড়তে পড়তে শুধু এই কথাই তাকে বলল।

এই বসতিতেই একজন প্রৌঢ়া ইউক্রেনীয় রেড গার্ড দলের এক কসাককে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা নাকি সব কাইড়্যা লইবা? মানুষগুলানরে কাইট্যা ফালাইবা? – কথাডা কি ঠিক?'

কসাকটাও এতটুকু ইতস্তত না করে জবাব দিল, 'ঠিকই শুনেছ। সকলকে না হলেও বুড়ো মানুষদের ত কেটে ফেলবই।'

'হায় ভগবান! তাগো লইয়া ক্যান টানাটানি তোমাগো?'

'আমরা খিচুড়ি দিয়ে ওদের পাকিয়ে খাব। ভেড়াগুলো আজকাল কেমন যেন ঘাস ঘাস হয়ে গেছে, সেরকম সোয়াদ পাওয়া যায় না ওগুলোর। বুড়ো ঠাকুর্দাকে কড়ায় সাঁতলে যা ঝোলটা হয়...'

'তাম্‌সা কইরত্যাছ তাই না?'

'মিছে কথা বলছে ও মাসী! আজেবাজে ফাজলামি!' কথার মাঝখানে ব্রিখিন বলল। পরে ফাজিলটাকে একা পেয়ে সে তার ওপর খুব এক চোট নিল।

'কী ভাবে, কার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করতে হয় জানা উচিত! পদ্‌তিওল্‌কভ শুনতে পেলে এরকম রসিকতার জন্যে এক বিরাশি সিক্কা ঝেড়ে তোমার বদন বিগড়ে দিত। লোকজনকে অমন ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছ কেন? এক্ষুনি গিয়ে সবাইকে বলে বেড়াবে যে আমরা সত্যি সত্যিই বুড়ো হাবড়াদের কেটে ফেলব।'

পথের মাঝখানে থামা আর রাত কাটানোর সময় কমিয়ে ফেলতে লাগল পদ্‌তিওল্‌কভ। উদ্বেগে অস্থির হয়ে সে তাড়াতাড়ি এগুনোর চেষ্টা করতে লাগল। ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া জেলার বসতির মধ্যে ঢোকার আগের দিন লাগুতিনের সঙ্গে তার অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল।

'আমি যা বলি শোনো ইভান। আমার মনে হয় বেশি দূর যাওয়া ঠিক হবে না। উস্ত-খোপিওর্‌স্কায়া জেলা-সদর পর্যন্ত গিয়েই কাজ শুরু করে দেব! আমরা সৈন্যদলে নাম লেখানোর কথা জানাব, বলব এক শ' রুব্‌ল করে মাইনে দেওয়া হবে – তবে হ্যাঁ ঘোড়া আর সাজসরঞ্জাম নিজেদের আনতে হবে। জনসাধারণের টাকা নিয়ে ত আর আমরা ছিনিমিনি খেলতে পারি না! উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া থেকে আমরা তোমার বুকানোভ্‌স্কায়া, স্লাশ্চেভ্‌স্কায়া, ফেদোসেয়েভ্‌স্কায়া, কুমিল্‌জেন্‌স্কায়া, গ্লাজুনোভ্‌স্কায়া আর স্কুরিশেন্‌স্কায়া হয়ে উজানের দিকে চলতে থাকব। যত দিনে মিখাইলোভ্‌কা পৌঁছুব, সেই সময়ের মধ্যে একটা ডিভিশন হয়ে যাবে! কী বল, পারব না?'

'সে হয়ত পারব – অবশ্য যদি সব কিছু শান্ত থাকে ওখানে।'

'তোমার কি মনে হয় ওখানেও শুরু হয়ে গেছে?'

'কী করে জানব বল?' লাগুতিন তার পাতলা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নাকি-নাকি করুণ গলায় বলতে লাগল, 'আমরা একটু দেরি করে ফেলেছি ফেদিয়া, আমার আশঙ্কা হচ্ছে ঠিক সময়ে আমরা পৌঁছুতে পারব না। অফিসাররা ইতিমধ্যে সেখানে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি ত করছিই আমরা। তুমি কিন্তু ঘাবড়িও না! ঘাবড়ালে চলবে না আমাদের।' বলতে বলতে পদ্‌তিওল্‌কভের চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো। 'আমরা লোকজনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ঘাবড়ালে চলবে কী করে? সময় পাব! ঠিক ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারব! আর সপ্তাহ দুয়েক পরেই জার্মানদের আর প্রতিবিপ্লবীদের আমরা ঠ্যাঙাতে শুরু করব! ওঃ, দনের মাটি থেকে তখন আমরা ওদের যা ঝাড়তে শুরু করব না, বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব!' একটু চুপ করে থেকে জোরে জোরে সিগারেটে কয়েকটা টান দিল, শেষকালে তার গোপন চিন্তাটাই ব্যক্ত করল, 'যদি দেরি করে ফেলি তাহলে আমরা ত যাবই, সঙ্গে সঙ্গে দনের সোভিয়েত শাসনেরও হয়ে গেল। না, না, দেরি করলে চলবে না! আমাদের পৌঁছুনোর আগেই যদি অফিসারদের বিদ্রোহের ঢেউ ওখানে গড়িয়ে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না!'

পর দিন সন্ধ্যার দিকে অভিযাত্রীদল ক্রাস্নকুত্স্কায়া জেলার মাটিতে পদার্পণ করল। লাগুতিন আর ক্রিভশ্‌লিকভের সঙ্গে সামনের সারির একটা গাড়িতে পদ্‌তিওল্‌কভ যাচ্ছিল। আলেক্সেয়েভ্‌স্কি গ্রামে পৌঁছুনোর একটু আগেই তারা দেখতে পেল স্তেপের মাঠে গোরুবাছুরের পাল চরছে।

'চল, ওই রাখালকে গিয়ে একটু জিজ্ঞেসবাদ করে দেখি,' লাগুতিনকে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল।

'হ্যাঁ যাও তোমরা,' ক্রিভশ্‌লিকভ সায় দিল।

লাগুতিন আর পদ্‌তিল্‌কভ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গোরুবাছুরের পালের দিকে এগোল। গোরু চরানোর মাঠ রোদে পুড়ে ঝাঁই হয়ে গেছে, বাদামী রঙের ঘাস চকচক করছে। নীচু নীচু ঘাসগুলো খুরের চাপে মাটিতে বসে গেছে, শুধু পথের ধারে কতকগুলো ছোট ছোট ঝোপে হলুদ ফুল ফুটে আছে, যবের মতো দেখতে কিছু বুনো গাছের শীষে সরসর করে ঝাঁটার মতো দুলছে। একটা বুড়ো সোমরাজফুলের ডাঁটা ভেঙে নিয়ে হাতে থেঁতো করে তার ঝাঁঝাল তেতো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পদ্‌তিওল্‌কভ এগিয়ে গেল রাখালের দিকে।

'কেমন আছ গো বুড়ো কর্তা?'

'এই ত আছি ভগবানের দয়ায়।'

'গোরু চরাচ্ছ বুঝি?'

'তা হ্যাঁ, চরাচ্ছি।'

বুড়ো ভুরু কোঁচকাল, সাদা দুই ভুরুর ঝোপের নীচ থেকে তাকাল, হাতের পাচনিটা নাচাল।

'তারপর, চলছে কেমন?' গতানুগতিক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করল পদ্‌তিওল্‌কভ।

'ভগবানের কৃপায় চলে যাচ্ছে।'

'তোমাদের এখানকার খবর কী?'

'বলার মতো কিছু ত শুনি নি। কিন্তু তোমরা কারা?'

'আমরা সব সেপাই, বাড়ি ফিরছি।'

'বাড়ি কোথায় তোমাদের?'

'উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া।'

'সেই পদ্‌তিওল্‌কভটা আপনাদের সঙ্গে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে।'

রাখালের মুখ একেবারে ফেকাসে হয়ে গেল, দেখেই বোঝা গেল সে ভয় পেয়ে গিয়েছে।

'কী হল কর্তা? অমন ভয় খেয়ে গেলে কেন?'

'কেন, বাছারা, লোকে যে বলছে তোমরা নাকি সনাতনী খ্রীষ্টানদের সব মেরে কেটে সাফ করে দিচ্ছ?'

'একদম বাজে কথা! কারা এসব গুজব ছড়াচ্ছে?'

'এই ত গত পরশু পঞ্চায়েতের এক জমায়েতে আতামান আমাদের বললে। শুনে বলেছে না কোন সরকারী কাগজ হাতে পেয়ে বলেছে জানি নে – পদ্‌তিওল্‌কভ নাকি কাল্‌মিকদের নিয়ে আসছে আমাদের সবাইকে কেটে সাফ করে দিতে।'

'তোমাদের এখানে আতামানও হয়েছে নাকি আবার?' লাগুতিন এক ঝলক তাকাল পদ্‌তিওল্‌কভের দিকে।

পদ্‌তিওল্‌কভ তার হলদেটে কষের দাঁত দিয়ে ঘাসের ডাঁটা কাটছিল।

'এই কয়েকদিন আগে একজন আতামান ঠিক করেছি আমরা। সোভিয়েত তুলে দেওয়া হয়েছে।'

লাগুতিন আরও কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশেই বিশাল এক লোমওঠা ষাঁড় একটা গাইয়ের ওপর লাফিয়ে উঠে সেটাকে মাটির সঙ্গে লেপটে দিল।

'আরে হারামজাদা শয়তানটা দেখছি ওটার হাড়গোড় ভেঙে ফেলবে।' হায় হায় করে উঠল রাখাল। অপ্রত্যাশিত ভাবে বয়সের পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে

বুড়ো গোরুর পালের দিকে ছুটল, ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল, 'আরে এ যে নাস্তিয়ার গোরু! . . . হাড় গুঁড়ো করে ফেললে গো! . . . অ্যাই অ্যাই! . . . অ্যাই টেকো, কী হচ্ছে! . . .'

পদ্‌তিওল্‌কভ দু'হাত অনেকখানি উঠিয়ে দোলাতে দোলাতে দমদম করে পা ফেলে গাড়ির কাছে ফিরে গেল। গেরস্থ ধরনের মানুষ লাগুতিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, রুগ্‌ণ চেহারার ছোটখাটো গোরুটাকে ষাঁড়টার চাপে মাটিতে চেপ্‌টে পড়ে থাকতে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ল, সেই মুহূর্তে মনে মনে না ভেবে পারল না, 'ইশ্‌ হাড়গোড় ভেঙে ফেলবে দেখছি! হয়ত ভেঙেই ফেলেছে, শয়তানের বাচ্চা!'

গোরুটা যখন ষাঁড়ের নীচ থেকে অখণ্ড শিরদাঁড়া নিয়ে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলো একমাত্র তখনই নিশ্চিন্ত হয়ে সে গাড়ির দিকে পা বাড়াল। 'আমরা কী করব? দনের পারে সর্বত্রই কি তাহলে ওরা আবার আতামানপ্রভুত্ব ফিরিয়ে এনেছে?' মনে মনে সে নিজেকে প্রশ্ন করল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য আবার তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়ল পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পাল দেওয়ার সুন্দর ষাঁড়টার ওপর। ষাঁড়টা তার বিশাল কপালের গুঁতো দিতে দিতে চওড়া কাঠামোর এক বিশাল কালো গাভীর গা শুঁকছিল। তার গলকম্বল হাঁটু অবধি এসে পড়েছে, দীর্ঘ, শক্তিশালী ও হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে পড়েছে। খাটো খাটো পাগুলো নরম মাটিতে খুঁটির মতো গেঁথে বসেছে। ভালো জাতের এই ষাঁড়টাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে লাগুতিন তার চকচকে লাল রঙের ওপর চাকাচাকা দাগের পশমের গায়ে সোহাগ ভরা দৃষ্টি না বুলিয়ে পারল না, উদ্বেগ-আশঙ্কা সমাকুল একঝাঁক চিন্তার ভেতর দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে তার মন থেকে বেরিয়ে এলো একটি মাত্র চিন্তা: 'আহা, আমাদের দেশে যদি অমন একটা ষাঁড় থাকত! আমাদের পাল দেওয়ার ষাঁড়গুলো সব যেন কেমন ছোট ছোট।' চলতে চলতে এই চিন্তাটা চকিতে তাকে বিদ্ধ করল। কিন্তু মেশিনগানের গাড়িটার কাছে আসার পর কসাকদের নিরানন্দ মুখগুলোর ওপর নজর পড়তে লাগুতিন মনে মনে বিবেচনা করতে লাগল এখন কোন্ পথে যাত্রা করা তাদের ঠিক হবে।

* * *

ম্যালেরিয়া জ্বরে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে স্বপ্নদ্রষ্টা ও কবি ক্রিভশ্‌লিকভ। পদ্‌তিওল্‌কভকে সে বলল, 'আমরা প্রতিবিপ্লবী ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার থেকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সে ঢেউয়ের ঝাপটা এখনই আমাদের ওপর এসে পড়ছে। আর তাকে এড়ানোর উপায় নেই, সমান পাড়ের ওপর ঢেউয়ের ধাক্কার মতো তরতর্ করে এগিয়ে আসছে।'

দেখা গেল যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র পদ্‌তিওল্‌কভই তার যাবতীয় জটিলতা উপলব্ধি করতে পারছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে গাড়িতে বসে আছে সে, প্রতি মুহূর্তে চিৎকার করে কোচোয়ানকে বলছে, 'হাঁকা!'

পেছনের গাড়িগুলোয় কেউ কেউ গান শুরু করেছিল, পরে এক সময় থেমে গেল। সেখান থেকে গাড়ির চাকার মৃদু ঘর্ঘর আওয়াজকে মাঝে মাঝে ছাপিয়ে আসছে হৈ-হল্লা আর হাসির হুল্লোড়।

রাখালের কাছ থেকে যে খবর পাওয়া গিয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণিত হল। আরও কিছু দূর যাবার পর পথে তাদের দেখা হয়ে গেল যুদ্ধ-ফেরতা এক কসাকের সঙ্গে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে চলেছে স্‌ভেচ্‌নিকভ গ্রামে। তার উর্দিতে কাঁধপটি লাগানো, মাথার টুপিতে ফিতে। তাকে জিজ্ঞেসবাদ করে পদ্‌তিওল্‌কভ যা জানতে পারল তাতে তার মুখ আরও কালো হয়ে গেল।

আলেক্সেয়েভ্‌স্কি গ্রাম পেরিয়ে গেল তারা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। শুধু পুব দিকে কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে তেরছা সূর্যের আলোয় ঢালা গাঢ় নীল রঙের একটুকরো আকাশ চোখে পড়ছে।

ঢালু পথে বুবাশ্‌কিন নামে এক তাভ্রিচীয় পল্লীতে নামতে না নামতেই তারা দেখতে পেল সেখান থেকে লোকজন সব উলটো দিকে ছুটছে, পুরোদমে ছুটছে কয়েকটা গাড়ি।

'পালাচ্ছে।... আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে।...' ভেবাচেকা খেয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে লাগুতিন বলল।

পদ্‌তিওল্‌কভ চেঁচিয়ে বলল, 'ওদের ফিরিয়ে আন! আরে চিৎকার করে ডাক না ছাই!'

কসাকরা তাদের গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লাফাতে লাফাতে মাথার টুপি খুলে নাড়তে লাগল। ওদের মধ্যে কে একজন জোরাল গলায় চিৎকার করে বলল, 'এ-ই!... কোথায় চললে তোমরা?... থাম!...'

অভিযাত্রীদলের গাড়িগুলো দুলকি চালে গড়গড়িয়ে পল্লীর ভেতরে এসে ঢুকল। চওড়া রাস্তাটা জনশূন্য। রাস্তার মাথার ওপর বাতাস ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা বাড়ির উঠোনে এক ইউক্রেনীয় বুড়ি বিলাপ করতে করতে একটা ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বালিশগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। খালি পায়ে, খালি মাথায়, বুড়ির স্বামীটি ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে আছে।

বুবাশ্‌কিনে এসে তারা জানতে পারল বাসস্থানের খোঁজে পদ্‌তিওল্‌কভ যাকে পাঠিয়েছিল, কসাক টহলদার দল তাকে পাকড়াও করে টিলার ওপাড়ে নিয়ে চলে গেছে। বোঝা গেল কসাকরা আশেপাশেই কোথাও আছে। চটপট নিজেদের মধ্যে

পরামর্শ করার পর ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত হল। পদ্‌তিওল্‌কভ গোড়ায় এগিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু এখন সে দোনমন করতে লাগল।

ক্রিভশ্‌লিকভ আবার ম্যালেরিয়ার জ্বরের ধাক্কায় কাঁপতে শুরু করেছে। তাই সে চুপ করে রইল।

আলোচনার সময় বুন্‌চুকও উপস্থিত ছিল। তার দিকে ফিরে পদ্‌তিওল্‌কভ জিজ্ঞেস করল, 'নাকি সামনে এগোনোর চেষ্টা করব? কী বল?'

বুন্‌চুক উদাসীন ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। তার কাছে এখন সামনে যাওয়া পেছনে যাওয়া – সবই সমান; কেবল চলা নিয়ে কথা – যে গভীর বিষণ্ণতা তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে চলেছে তার হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পাওয়া নিয়ে কথা। মেশিনগানের গাড়ির পাশে পায়চারি করতে করতে পদ্‌তিওল্‌কভ উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসার দিকে এগোলে কী কী সুবিধা হতে পারে বলতে লাগল। কিন্তু দলের কসাক প্রচারকদের একজন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল।

'তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে! আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি? প্রতি-বিপ্লবীদের খপ্পরে? ওই আবদার চলবে না দাদা! আমরা ফিরে যাব! মরার ইচ্ছে আমাদের নেই। ওটা কী? দেখতে পাচ্ছ?' টিলার ওপর দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সবাই ফিরে তাকাল সেই দিকে। ছোট্ট টিলার মাথাটার ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তিনটে ঘোড়সওয়ারের মূর্তি।

'ওদের টহলদার দল!' লাগুতিন চেঁচিয়ে উঠল।

'আর ওদিকে, ওই যে আরও!'

টিলার ওপর আরও ঘোড়সওয়ারের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। তারা ছোট ছোট দল বাঁধল, তারপর ভেঙে আলাদা আলাদা হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে টিলার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার আবির্ভাব ঘটল তাদের। পদ্‌তিওল্‌কভ ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। ফিরতি পথে সেই আলেক্সেয়েভ্‌স্কি গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হল তাদের। অভিযাত্রীদলের গাড়ির সারিকে এগিয়ে আসতে দেখামাত্র স্থানীয় লোকজন এখানে ওখানে লুকিয়ে পড়তে লাগল, এদিক ওদিক পালিয়ে যেতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল কসাকরা আগে থাকতে তাদের সাবধান করে দিয়েছে।

সন্ধ্যা নামল। ঝিরঝিরে কনকনে বৃষ্টি ঝরতে লাগল অবিরাম। লোকের জামাকাপড় ভিজে জবজব করতে লাগল, ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সবাই। ওরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলল। সামনের পথটা টিলার গায়ে ঘুরপাক খেয়ে নীচে একটা উপত্যকার মধ্যে নেমে গেছে, সেখান দিয়ে যেতে যেতে আবার পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে গেছে টিলার ওপরে। টিলার

মাথায় মাথায় কসাক টহলদার দল – এই দেখা দিচ্ছে, পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারা অভিযাত্রীদলের সঙ্গে সঙ্গে চলছে – অমনিতেই মনের ভেতরে যে অস্বস্তি আছে তাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলো গিরিখাত যেখানে নাবাল জায়গাটাকে কেটে চলে গেছে, তার কাছাকাছি এসে পদ্‌তিওল্‌কভ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, সঙ্গের লোকজনকে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল, 'তৈয়ার হও!' ক্যাভালেরি ক্যারাবিনের সেফ্‌টি-ক্যাচটা সরিয়ে দিল সে, গাড়ির পাশে পাশে চলতে লাগল। গিরিখাতে, বাঁধ দেওয়া একটা পুকুরের মধ্যে বসন্তের বরফগলা বেনো জল নীল হয়ে জমে আছে। গোরুবাছুরের পাল সেখানে জল খেতে আসে – পুকুরের ধারে পলিমাটি তাদের খুরের দাগে জর্জরিত। ঝুরঝুরে বাঁধটা যেখানে ঝুঁকে পড়েছে তার ওপরটা লম্বা লম্বা আগাছা আর লতাপাতায় ছেয়ে গেছে। নীচে, জলের ধারে অবাড়ন্ত হোগলার বন, বৃষ্টির ছাঁট লেগে সরসর করছে ধারাল পাতাওয়ালা ঘাসগুলো। পদ্‌তিওল্‌কভ এখানে কসাকদের চোরা-হামলার আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু গোপন অনুসন্ধানের জন্য আগে যে দলটাকে পাঠানো হয়েছিল তারা সেরকম কাউকে দেখতে পেল না।

'ফিওদর, এখন অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই,' পদ্‌তিওল্‌কভকে গাড়ির কাছে ডেকে এনে ফিসফিস করে ক্রিভশ্‌লিকভ বলল। 'এখন ওরা হামলা করবে না। করবে রাত্রে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়।'

উনত্রিশ

পশ্চিমে ঘন কালো মেঘ জমেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। অনেক অনেক দূরে দনের ওপারে কোথায় যেন বিদ্যুৎ চমকাল, কমলা রঙের আলোটা একটা আহত পাখির ডানার মতো কেঁপে কেঁপে উঠল। ওধারে মেঘের কালো কম্বলে মুড়ি দিয়ে সূর্যাস্তের আভা ম্লান দীপ্তি দিচ্ছে। নিস্তব্ধতার কানায় কানায় ভরে ওঠা একটা পেয়ালার মতো স্তেপভূমি, গিরিখাতের ভাঁজে ভাঁজে এখনও ধরে রেখেছে ক্ষীয়মাণ দিবালোকের বিষণ্ণ বিচ্ছুরণটুকু। মে মাসের এই সন্ধ্যাটার মধ্যে কেমন যেন একটা শারদীয় ভাব। বুনো ঘাসে এখনও ফুল ধরে নি, কিন্তু সেখান থেকে পর্যন্ত ভেসে আসছে একটা অবর্ণনীয় রকমের কেমন যেন পচা পচা গন্ধ।

ভিজে ঘাসপাতার পাঁচমিশালী গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পথ চলতে লাগল পদ্‌তিওল্‌কভ। বুটের গোড়ালিতে চাপ চাপ কাদা লেগে যেতে মাঝে মাঝে সে থেমে সেখান থেকে কাদা পরিষ্কার করল। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে তার বিশাল ভারী শরীরটাকে ক্লান্ত ভাবে টেনে নিয়ে চলল, তার গায়ের বোতাম-খোলা চামড়ার কোর্তাটা বৃষ্টিতে ভিজে মস্‌মস্‌ আওয়াজ করতে লাগল।

পলিয়াকোভো-নাগোলিন্‌স্কায়া বিভাগের কালাশ্‌নিকভ পল্লীতে তারা যখন এলো ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। কসাকরা গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগল। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পদ্‌তিওল্‌কভ পাহারা বসানোর নির্দেশ দিল। কসাকরা গাঁইগুঁই করে সে ডাকে সাড়া দিল। তিনজন বেঁকে বসল।

'কমরেডী আদালতে বিচার করতে হয় ওদের! ফৌজী হুকুম তামিল না করার জন্যে গুলি করে মার!' উত্তেজিত হয়ে উঠল ক্রিভশ্‌লিকভ।

অনবরত উত্তেজনার মধ্যে থাকার ফলে পদ্‌তিওল্‌কভ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। তিক্ত ভাবে হাত নেড়ে সে বলল, 'পথের ধকলে ওদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। নিজেদের বাঁচানোরও কোন চেষ্টা করবে না। আমরা খতম হয়ে গেলাম, মিশা! . . .'

লাগুতিন কোন রকমে কয়েকজন লোক যোগাড় করে গ্রামের বাইরে নজর রাখার জন্য পাঠিয়ে দিল।

'আমাদের ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না ভাই! তাহলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে!' যে-সব কসাক পদ্‌তিওল্‌কভের খুব ঘনিষ্ঠ, বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে তাদের বলতে লাগল।

সারা রাত সে দু'হাতে মাথা গুঁজে টেবিলের ধারে বসে রইল, ফোঁস ফোঁস করে ভারী ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। ভোরের আগে আগে তার বিরাট মাথাটা টেবিলের ওপর নুইয়ে পড়ল, ঘুমে তার চোখ প্রায় জুড়িয়ে এলো; এমন সময় পাশের বাড়ির উঠোন থেকে রবার্ট ফ্র্যাশেনব্রুডার এসে তাকে জাগিয়ে দিল। যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ভোরের আলো ফুটেছে। পদ্‌তিওল্‌কভ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। বাইরের বারান্দায় আসতেই দেখতে পেল বাড়িউলী গোরু দুইছে।

'টিলার ওপর ঘোড়সওয়াররা ঘোরাফেরা করছে,' পদ্‌তিওল্‌কভকে দেখে নিস্পৃহ ভাবে সে বলল।

'কোথায়?'

'গ্রামের ওপাশে।'

একলাফে উঠোনে নেমে এসে পদ্‌তিওল্‌কভ তাকিয়ে দেখল: গ্রামের মাথার

ওপর আর তীরের জলমগ্ন মাঠের উইলোঝাড়ের মাথার ওপর সাদা কুয়াশার আবরণ ঝুলছে; তারও পেছনে, টিলার ওপরে বহুসংখ্যক কসাকের কতকগুলো দল চোখে পড়ছে। দুলকিতে আর হাল্কা চালে এগিয়ে আসতে আসতে গ্রামটাকে তারা চারদিক থেকে চক্রব্যূহের আকারে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ফেলছে।

পদ্‌তিওল্‌কভ যে-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল শিগ্‌গিরই সে-বাড়ির উঠোনে, তার মেশিনগানের গাড়ির কাছে দলের লোকজন এসে জড় হতে লাগল।

মিগুলিন্‌স্কায়ার কসাক ভাসিলি মিরোশ্‌নিকভ। বিশাল দেহ, বিরাট ঝুঁটি তার মাথায়। পদ্‌তিওল্‌কভকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল সে, মাটিতে চোখ রেখে বলল, 'একটা কথা বলার ছিল কমরেড পদ্‌তিওল্‌কভ। . . . এইমাত্র একটা প্রতিনিধিদল এসেছিল ওদের কাছ থেকে,' হাত নেড়ে সে টিলার দিকে দেখাল, 'ওরা তোমাকে জানাতে বলেছে আমরা যেন এক্ষুনি হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করি। নইলে ওরা আক্রমণ করবে।'

'শালা . . . শুয়োরের বাচ্চা! . . . এসব কী কথা বলতে এসেছিস আমাকে?' মিরোশ্‌নিকভের গ্রেটকোটের কলার চেপে ধরল পদ্‌তিওল্‌কভ, তাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেশিনগানের গাড়ির দিকে ছুটে গেল। রাইফেলের নলটা চেপে ধরে ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলায় সঙ্গী কসাকদের বলল, 'ধরা দেওয়া? . . . প্রতি-বিপ্লবের সঙ্গে আবার কথা কী হতে পারে? ওদের সঙ্গেই ত আমাদের লড়াই! আমার পেছন পেছন চলে এসো! সার বাঁধ!'

উঠোন থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল সকলে। দঙ্গল বেঁধে ছুটে চলে এলো গ্রামের শেষ প্রান্তে। তারা শেষ বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছুতে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে পদ্‌তিওল্‌কভের নাগাল ধরল কমিশনের সদস্য ক্রিখিন।

'কী লজ্জার কথা, পদ্‌তিওল্‌কভ! আমরা কি শেষ পর্যন্ত আমাদেরই ভাই-বন্ধুদের রক্তপাত করব? ছাড় দেখি! আমার মনে হয় কথাবার্তা বলে আপসে মিটানো যেতে পারে!'

প্লেটুনের অতি সামান্য একটা অংশ তাকে অনুসরণ করেছে, তাই দেখে সুস্থমস্তিষ্কে বিচার-বিবেচনা করে যখন সে বুঝতে পারল যে সঙ্ঘর্ষ ঘটলে পরাজয় অনিবার্য, তখন পদ্‌তিওল্‌কভ আর কোন কথা না বলে রাইফেলের ছিটকিনি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, নিস্তেজ ভাবে মাথার টুপিটা খুলে ঝাড়া দিল।

'ছেড়ে দাও, ভাই সব, ছেড়ে দাও! গ্রামে ফিরে চল। . . .'

সবাই ফিরে এলো। পাশাপাশি তিনটে উঠোনে অভিযাত্রীদলের সকলে জমায়েত হল। খানিক পরেই গ্রামে কসাকদের আবির্ভাব ঘটল। চল্লিশজন ঘোড়সওয়ারের একটা বাহিনী টিলা থেকে নেমে এলো।

গ্রামের মাতব্বরদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ আত্মসমর্পণের শর্ত আলোচনার জন্য গ্রামের বাইরে যাত্রা করল। বিরুদ্ধপক্ষের মূল শক্তিগুলো গ্রাম ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের পজিশন ছাড়ল না। পদ্‌তিওল্‌কভ যখন গোরুবাছুর চলার রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল সেই সময় বুনচুক পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে এসে তাকে থামাল।

'আমরা কি আত্মসমর্পণ করছি?'

'গায়ের জোরে ওরা আমাদের আস্ত রাখবে না। . . . উপায় কী? . . . কী করবে বল?'

'মরার ইচ্ছে হয়েছে?' বুনচুকের সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল।

পদ্‌তিওল্‌কভের সঙ্গে যাচ্ছিল গ্রামের মাতব্বররা। তাদের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে নিরুত্তেজ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে সে বলল, 'ওদের বলে দিও, অস্ত্র আমরা দিচ্ছি না! এখন তুমি আর আমাদের নেতা নও! কার সঙ্গে তুমি পরামর্শ করেছ, শুনি? কার হুকুমে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছ?' তারপর হঠাৎ ঘুরে গিয়ে বদ্ধমুষ্টিতে রিভল্‌ভারটা চেপে ধরে দোলাতে দোলাতে ফিরে চলল।

ফিরে এসে সঙ্গী-কসাকদের সে বোঝানোর চেষ্টা করল, তাদের উচিত ব্যূহ ভেঙে লড়াই করতে করতে রেলরাস্তার দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু দেখা গেল বেশির ভাগ লোকই আপস করার পক্ষে। কেউ কেউ মুখ ঘুরিয়ে নিল, কেউ কেউ আবার চটেমটে সরাসরি জানিয়ে দিল, 'তোমার লড়তে ইচ্ছে হয় লড় গে। আমরা আমাদের ভাই বন্ধুদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি নে!'

'আমরা ওদের ওপর বিশ্বাস রেখেই খালি হাতে যাচ্ছি।'

'ঈস্টারের পুণ্য তিথি, এমন দিনে আমরা কিনা রক্তপাত করব?'

বুনচুকের গাড়িটা গোলাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির নীচে গায়ের গ্রেটকোটটা ফেলে তার ওপর শুয়ে পড়ল, রিভল্‌ভারের খাঁজকাটা বাঁটটা কিন্তু সেইভাবেই হাতের মুঠোয় চেপে রেখে দিল। প্রথমে সে ভাবল পালিয়ে গেলে হয়। কিন্তু এই ভাবে চুপি চুপি দল ছেড়ে পালিয়ে ফেরার হয়ে যাওয়ায় তার মন সায় দিল না। মনে মনে 'ধুত্তোর' বলে হাল ছেড়ে দিয়ে সে পদ্‌তিওল্‌কভের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

পদ্‌তিওল্‌কভ ফিরে এলো ঘণ্টা তিনেক বাদে। অন্যান্য আরও বহু কসাকের বিরাট একটা দল তার সঙ্গে গ্রামে এসে ঢুকল। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ বা মুখের লাগাম ধরে ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে, বাকিরা সব পদ্‌তিওল্‌কভ আর সাব-অল্‌টার্ণ স্পিরিদোনভকে ঘিরে ঠেলতে ঠেলতে স্রেফ পায়ে হেঁটে চলেছে।

এই স্পিরিদোনভ এককালে পদ্‌তিওল্‌কভের সঙ্গে একই ব্যাটারীতে কাজ করত। এখন পদ্‌তিওল্‌কভের অভিযাত্রীদলকে ধরার জন্য যে বাছাই দল গড়া হয়েছে সে তার নেতৃত্ব দিচ্ছে। মাথাটা বেশ উঁচু করে পদ্‌তিওল্‌কভ যে রকম চেষ্টা করে সোজা পা ফেলে চলছে তা দেখে মনে হয় যেন পানের মাত্রাটা তার একটু বেশি হয়ে গেছে। স্পিরিদোনভ তাকে যেন কী বলছে, জ্বালাধরা সূক্ষ্ম হাসি হাসছে। তার পেছন পেছন এক কসাক বিরাট সাদা নিশানের অযত্নে চাঁছা এবড়োখেবড়ো ডাণ্ডাটা বুকে চেপে ধরে ঘোড়ার পিঠে চলেছে।

যে সমস্ত রাস্তায় আর আঙিনায় অভিযাত্রীদলের গাড়িগুলো ছিল দেখতে দেখতে নবাগত কসাকদের ভিড়ে সেগুলো ভরে উঠল। সঙ্গে সোরগোলও উঠল বহু কণ্ঠের। যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই একসময় পদ্‌তিওল্‌কভের সঙ্গে এক প্লেটুনে কাজ করেছে। উল্লাসের ধ্বনি আর হাসিঠাট্টা শোনা যেতে লাগল।

'আরে একই গোয়ালের গোরু দেখছি! পথ ভুলে এখানে কী করে?'

'বাহা বাহা, জিতা রহো, প্রোখর!'

'ভগবানের কী অসীম দয়া!'

'আরেকটু হলেই তোমার সঙ্গে আমাদের লড়াই বেধে গিয়েছিল আর কি! মনে আছে ল্‌ভোভের কাছে অস্ট্রিয়ানদের কী তাড়াটাই দিয়েছিলাম?'

'আরে দানিলো দাদা যে। দাদা গো! খ্রীষ্ট উঠেছেন!*'

'উঠেছেন, সত্যি সত্যিই উঠেছেন!' চুমু খাওয়ার প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল। দুই কসাকে গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, হাসতে হাসতে এ ওর পিঠে চাপড় মারল।

পাশেই আরেক সুরে কথাবার্তা।

'ব্রত ভাঙার সময়ই আমরা পেলাম না।'

'তোমাদের আবার ব্রত-ট্রত কী হে? তোমরা ত বলশেভিক!'

'বলশেভিক ত কী হয়েছে? আমরা বলশেভিক ঠিকই, কিন্তু ভগবানেও বিশ্বাস করি।'

'দূর! যত বাজে কথা!'

'মাইরি বলছি, ভগবানের দিব্যি!'

'ক্রস পর গলায়?'

'পরব না কেন? এই ত!' চওড়া মুখ দশাসই চেহারার এক রেড গার্ড

---

* অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান ঘটেছে। ইস্টারের সম্ভাষণ। সম্ভাষণের উত্তরে ওই কথাটাই পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তারপর বক্তা ও প্রতিবক্তা পরস্পরকে চুম্বন করে। – অনুঃ

কসাক ঠোঁটটা ছুঁচালো করে তার ফৌজী শার্টের কলারের বোতাম খুলে ফেলল, ব্রোঞ্জ রঙের লোমশ বুকের ওপর ঝোলানো সবুজ ছাতলা পরা তামার ক্রসটা বার করে দেখাল।

'বিদ্রোহী পদ্‌তিওল্‌কভকে' ধরার বাহিনীতে ক্ষেতের বিদে, কুড়ুল আর লাঠিসোটা নিয়ে যে-সব মাতব্বর ছিল তারা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাউয়ি করতে লাগল।

'তবে যে লোকে বলে তোমরা খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে দিয়েছ?'

'তোমরা নাকি শয়তানের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছ। . . .'

'শুনেছি তোমরা নাকি গির্জে ধ্বংস করছ, পুরুতদের ধরে ধরে খুন করছ।'

'মিথ্যে কথা!' চওড়া মুখ রেড গার্ডটি বেশ জোর দিয়ে অস্বীকার করল। 'রাজ্যের মিথ্যে কথা বলে তোমাদের বুঝ দিচ্ছে। কেন আমি নিজেই ত রস্তোভ ছেড়ে আসার আগে গির্জেয় গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি।'

বেঁটেখাটো থুত্থুড়ে এক বুড়ো অর্ধেক ছাঁটা ডাণ্ডার মাথায় একটা বর্শা গেঁথে নিয়ে এসেছিল। এই কথা শুনে উল্লসিত হয়ে হাততালি দিয়ে সে বলে উঠল, 'তা-ই বল!'

রাস্তায়, আঙিনায় উৎসাহিত কথাবার্তার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আধ ঘণ্টা খানেক পরে বকোভ্‌স্কায়া জেলার একজন সার্জেন্ট-মেজর আর কয়েকজন কসাক বিশাল জনতার নিবিড় ভিড় ঠেলতে ঠেলতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলো।

'পদ্‌তিওল্‌কভের দলের যারা যারা আছ এগিয়ে এসো! নাম লেখা হবে!' তারা হাঁক দিল।

সাব-অল্‌টার্ণ স্পিরিদোনভের গায়ে খাকী শার্ট, কাঁধপটিও খাকী রঙের; টুপিতে অফিসারের পদমর্যাদাসূচক সাদা ফিতে – এক টুকরো ভাঙা মিছরিদানার মতো সাদা জ্বলজ্বল করছে। মাথার টুপিটা খুলে চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'পদ্‌তিওল্‌কভের দলের যারা আছ তারা সবাই বাঁ দিকে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াও! বাকিরা – ডাইনে! আমরা, তোমাদের লড়াই-ফেরত ভাইরা, তোমাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মিলে ঠিক করেছি, তোমরা তোমাদের সমস্ত হাতিয়ার আমাদের দিয়ে দেবে, কারণ তোমাদের হাতে হাতিয়ার দেখে লোকে ভয় পাচ্ছে। রাইফেল আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র যা আছে সব তোমাদের গাড়িতে জড় করে রাখ। আমরা একসঙ্গে মিলে ওগুলো পাহারা দেব। তোমাদের দলটাকে আমরা ক্রাস্নকুত্‌স্কায়াতে পাঠিয়ে দেব, সেখানকার সোভিয়েতে তোমরা তোমাদের সমস্ত হাতিয়ার ফেরত পাবে।'

রেড গার্ড কসাকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। উঠোনে

চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। কুম্‌শাৎস্কায়া জেলার কসাক কোরোত্‌কোভ চিৎকার করে উঠল, 'না, দেব না!'

লোকজনে ঠাসা রাস্তায় আর উঠোনে উঠোনে অসন্তোষের থমথমে চাপা গুঞ্জন।

আগত কসাক জনতার স্রোতটা ডান ধারে আছড়ে পড়ল। পদ্‌তিওল্‌কভের রেড গার্ড বাহিনীর লোকজন জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মাঝখানে। ক্রিভশ্‌লিকভের গায়ের গ্রেটকোটটা দু কাঁধের ওপরে ফেলা, দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। বিষদৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে। লাগুতিন ঠোঁট বাঁকাল। সকলে ভেবাচেকা খেয়ে গেল, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল।

বুন্‌চুক স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে হাতিয়ার সে ছাড়বে না। রাইফেলটা হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভের কাছে দ্রুত ছুটে এলো সে।

'হাতিয়ার আমরা ছাড়ব না! শুনছ?'

'আর উপায় নেই, দেরি হয়ে গেছে। . . .' নার্ভাস হয়ে বাহিনীর তালিকাটা হাতের মধ্যে ডেলা পাকাতে পাকাতে ফিসফিস করে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল।

তালিকাটা স্পিরিদোনভের হাতে চালান হয়ে গেল। স্পিরিদোনভ তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে একশ' আঠাশ জন লোকের নাম আছে। . . . বাকিরা গেল কোথায়?'

'মাঝপথে ছেড়ে চলে গেছে।'

'বটে, এই কথা! . . . আচ্ছা, যাক গে। এবারে হাতিয়ার দেওয়ার হুকুম দাও ওদের।'

পদ্‌তিওল্‌কভ সকলের আগে কোমরের বেল্ট থেকে খাপসুদ্ধ রিভল্‌ভার খুলল। হাতিয়ারটা তুলে দেওয়ার সময় বিড়বিড় করে অস্ফুটস্বরে বলল, 'তলোয়ার আর রাইফেল গাড়িতে আছে।'

নিরস্ত্রীকরণের কাজ শুরু হয়ে গেল। রেড গার্ডরা মনমরা হয়ে তাদের হাতিয়ারগুলো তুলে দিতে লাগল, কেউ কেউ তাদের রিভল্‌ভার বেড়ার ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল, উঠোনের চারধারে ছড়িয়ে পড়ার সময় এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল।

'যারা হাতিয়ার তুলে দেবে না তাদের সকলের শরীর তল্লাশী করে দেখব,' বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল স্পিরিদোনভ।

রেড গার্ডদের একটা অংশ বুন্‌চুকের পরিচালনায় রাইফেল দিতে অস্বীকার করল; তাদের জোর করে নিরস্ত্র করা হল।

মেশিনগানের ব্রিচ-লক নিয়ে একজন মেশিনগানার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে তাই নিয়ে হুলস্থূল বেধে গেল। হৈ-হট্টগোলের ফাঁকে কয়েকজন গা ঢাকা দিল।

স্পিরিদোনভ তৎক্ষণাৎ একদল পাহারাদার স্থির করে তাদের দিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভের দলের বাদবাকিদের ঘেরাও করে ফেলল, সকলের শরীর তল্লাশী করল, তালিকা দেখে নাম ডাকার চেষ্টা করল। বন্দীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাড়া দিল, কেউ কেউ চেঁচাতে লাগল:

'মেলানোর আবার কী আছে? আমরা সবাই এখানে আছি।'

'ক্রাস্নকুত্স্কায়া নিয়ে চল আমাদের!'

'কাজ শেষ কর, কমরেডরা!'

টাকার বাক্স সীল করে কড়া পাহারায় কার্গিন্‌স্কায়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর স্পিরিদোনভ বন্দীদের সার বেঁধে দাঁড় করাল। এবারে সঙ্গে সঙ্গে তার গলার স্বর ও আচরণ পাল্‌টে গেল। সে হুকুম দিল:

'দু'সার করে! বাঁয়ে মোড়! কুইক মার্চ! কোন কথা নয়!'

রেড গার্ডদের সারির মধ্যে মৃদু কলধ্বনি উঠল। তারা এলোমেলো ভাবে পা ফেলে ধীরে ধীরে চলতে লাগল, কিছুক্ষণ বাদে সারগুলো সব মিলেমিশে গেল, সকলে দঙ্গল বেঁধে চলল।

পদ্‌তিওল্‌কভ যখন তার দলের লোকদের বলে কয়ে হাতিয়ার ছাড়তে রাজী করিয়েছিল তখনও তার আশা ছিল হয়ত এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে। কিন্তু বন্দীদের গ্রামের বাইরে নিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদার কসাকরা দু'পাশের লোকজনের গায়ের ওপর ঘোড়া উঠিয়ে দিয়ে তাদের ঠেলতে লাগল। বহুকালের ব্যবহারে কালো রঙধরা একটা পুরনো মাকড়ি-কানে, আগুনের মতো লাল টকটকে দাড়িওয়ালা এক বুড়ো কসাক বাঁ ধার ঘেঁসে যেতে যেতে অকারণে বুনচুকের গায়ে চাবুকের বাড়ি মেরে বসল। বুনচুক ঘুষি পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু আরও জোরে দ্বিতীয় একটা বাড়ি খাওয়ার ফলে সে তাড়াতাড়ি ভিড়ের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে যেতে বাধ্য হল। আত্মরক্ষার জৈবিক তাড়নায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে এটা করতে হল।

ঘন দল বেঁধে চলতে থাকা সঙ্গীসাথীদের শরীরের চাপে চেপ্‌টে গিয়ে আন্নার মৃত্যুর পর এই প্রথম তার ঠোঁটে একটা অস্থির বাঁকা হাসি ফুটে উঠল – মানুষমাত্রেরই বাঁচার ইচ্ছেটা যে কত প্রচণ্ড, কত প্রবল এই ভেবে সে অবাক হয়ে গেল।

পাহারাদাররা বন্দীদের পেটাতে শুরু করে দিল। শত্রুদের হাতে কোন হাতিয়ার নেই দেখে মাতব্বর বুড়োরা পাশবিক উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে তাদের গায়ের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিল, ঘোড়ার জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে চাবুকের বাড়ি মারতে লাগল, তলোয়ারের ভোঁতা দিক দিয়ে ঘা মারতে লাগল। যাদের ওপর আঘাত এসে

পড়ছিল তারাই হুড়োহুড়ি করে ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল – ফলে ধ্বস্তাধ্বস্তি, চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

ভাটির এলাকার এক ডাকাবুকো চেহারার লম্বা রেড গার্ড দু'হাতের মুঠো উঁচিয়ে নাচাতে নাচাতে চিৎকার করে বলল, 'আমাদের যদি মেরেই ফেলতে চাও তাহলে এখনই মেরে ফেল না কেন? . . অমন নিষ্ঠুর রসিকতা করছ কেন তোমরা?'

'তোমরা যে কথা দিয়েছিলে তা গেল কোথায়?' ক্রিভশ্‌লিকভের কণ্ঠস্বর বেজে উঠল।

মাতব্বররা এবারে তাদের অত্যাচার খানিকটা কমাল। একজন বন্দী যখন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' তার উত্তরে পাহারাদারদের ভেতর থেকে যুদ্ধ-ফেরতা এক তরুণ চাপা গলায় বলল, 'তোমাদের পনমারিওভ গ্রামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। তোমরা ভয় পেয়ো না ভাই! আমরা তোমাদের খারাপ কিছু করব না।' তার কথার সুরে রেড গার্ডদের ওপর তার সহানুভূতি গোপন রইল না।

ওদের পনমারিওভ গ্রামে নিয়ে আসা হল। স্পিরিদোনভ আর দু'জন কসাক একটা ঘুপচি দোকানঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। বন্দীদের একে একে প্রশ্ন করে ভেতরে ঢোকাতে লাগল।

'নাম? পদবী? কোথায় বাড়ি?' একটা তেলচিটে ফৌজী নোটবইয়ে উত্তর টুকে নিতে লাগল।

বুনচুকের পালা এলো।

'পদবী?' পেন্সিলের শীষটা কাগজের গায়ে ঠেকাল সে। কিন্তু রেড গার্ডটির চওড়া কপাল আর থমথমে গম্ভীর মুখের ওপর এক ঝলক নজর পড়তে যখন দেখতে পেল গায়ে থুতু ছিটানোর জন্য ঘৃণাভরে তার ঠোঁটদুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, তৎক্ষণাৎ সারা শরীর দুলিয়ে তড়াক করে একপাশে সরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ভেতরে চলে যা শুয়োরের বাচ্চা! নাম ছাড়াই দিব্যি মরতে পারবি!'

বুনচুকের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তাম্বোভের ইগ্‌নাতও কোন উত্তর দিল না। আরও একজন কে যেন বেনামে মৃত্যুই কাম্য বিবেচনা করে নীরবে চৌকাট ডিঙাল। . . .

স্পিরিদোনভ নিজের হাতে তালা ঝুলাল। পাহারা বসাল।

অভিযাত্রীদলের গাড়িগুলো থেকে হাতানো খাবারদাবার আর অস্ত্রশস্ত্র যখন দোকানঘরের কাছে ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছে তখন পদ্‌তিওল্‌কভ আর তার দলবলকে ধরার কাজে যে-সমস্ত গ্রাম যোগ দিয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সংগঠিত ফৌজী আদালতের এক বৈঠক চলছিল কাছাকাছি একটা বাড়িতে।

সভাপতিত্ব করছিল বকোভ্স্কায়া জেলার হলুদ ভুরুওয়ালা গাঁট্টাগোট্টা চেহারার কসাক মেজর ভাসিলি পপোভ। চেপ্টা মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে দিয়ে দুই কনুই অনেকখানি ছড়িয়ে টেবিলে ঠেকিয়ে সে বসে আছে। তার মাথার পেছন দিকে নক্সা-করা তোয়ালে-ঢাকা একটা আয়না ঝুলছে। তেল চকচকে কঠিন চোখে ভালোমানুষী ভাব ফুটিয়ে তুলে আদালতের সদস্য কসাকদের দিকে সে তাকাল, তাদের মুখের ওপর ঘুরতে লাগল তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি। কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা-ই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু।

'ওদের আমরা কী ব্যবস্থা করব, আপনারাই বলুন, বুড়ো কর্তারা?' পপোভ আবার প্রশ্ন করল।

পাশেই বসে ছিল সাব-অল্টার্ণ সেনিন। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে সে কী যেন বলল। সেনিন সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল। পপোভের চোখের তারা ছোট হয়ে এলো, চোখের কোণে যে খুশির ছটা এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিল তা মুছে গেল। চোখদুটো অন্য রূপ ধারণ করল, চোখের পাতার ফাঁক ফাঁক পালকের সামান্য আড়ালে ফুটে উঠল হিমশীতল কঠিন দীপ্তি।

'ওরা আমাদের ঘরবাড়ি লুট করতে, কসাকদের ধ্বংস করতে আসছিল। ওরা আমাদের দেশের শত্রু, দেশদ্রোহী। ওদের নিয়ে আমরা কী করব বলুন?'

মিলিউতিনস্কায়া জেলার সদাচারপন্থী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের এক বুড়ো, ফেভ্রালেভ স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো একলাফে উঠে দাঁড়াল।

'গুলি করে মার! সবগুলোকে গুলি করে মার!' ভূতগ্রস্তের মতো সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। উন্মত্তদৃষ্টিতে টেরিয়ে টেরিয়ে সকলের দিকে তাকাল, বিষম খেতে খেতে চিৎকার করে বলল, 'ওরা আমাদের ধর্মের শত্রু। খ্রীষ্টকে বেচে দিয়েছে ওরা! কোন মায়াদয়া দেখানো নয়! যত সব ইহুদীর ঝাড়! . . . মেরে ফেল! মেরে ফেল ওদের! . . . ক্রুশে ঝুলিয়ে মার! আগুনে পুড়িয়ে মার ওদের! . . .'

লোকটার পাতলা, আঁশ-আঁশ দাড়ির গোছা দুলতে লাগল, সাদা ছোপ ধরা আগুনরঙা চুলের রাশি আলুথালু ছড়িয়ে পড়ল। কথা বলতে বলতে তার পাটকিলে রঙের ঠোঁটদুটো ভিজে উঠেছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল সে।

'দূরে কোথাও নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। না কী বলেন? . . .' আদালতের জনৈক সদস্য দিয়াচেন্‌কো ইতস্তত করে বলল।

'গুলি করে মার?'

'প্রাণে মেরে ফেলার হুকুম দাও!'

'আমিও তা-ই বলি!'

'প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হোক সবগুলোকে।'

‘বুনো আগাছা ক্ষেত থেকে উপড়ে ফেলে দাও!’

‘প্রাণে মেরে ফেলা। প্রাণে মেরে ফেলাই একমাত্র শাস্তি!’

‘অবশ্যই গুলি করে মারা হবে! এ নিয়ে আর কোন কথাই উঠতে পারে না!’ স্পিরিদোনভ রুষ্ট হয়ে বলল।

একেকটা করে চিৎকার ওঠে আর মেজর পপোভের মুখের কোনার রেখাগুলো রুক্ষ হয়ে সমানে নীচে ঝুলে পড়তে থাকে, পাথরের মতো কঠিন, সর্পিল আকার ধারণ করে; আশেপাশের সকলের ওপর সন্তুষ্ট, আত্মতৃপ্ত, ভালোমানুষী যে ভাবটা এই খানিকক্ষণ আগেও তার মুখে লেগেছিল তা মিলিয়ে গেল।

‘গুলি করে মারা হবে! লেখ!’ আদালতের কেরানির কাঁধের পেছন থেকে উঁকি মেরে সে হুকুম দিল।

ঘরের ভেতরের কুপিটা বারবার নিভে যাওয়ার উপক্রম করছিল। নাদুসনুদুস চেহারার বয়োবৃদ্ধ এক কসাক জানলার ধারে বসে বসে অনবরত বাতির পলতে উস্‌কে দিচ্ছিল। লোকটা এবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে চিৎকার করে বলল, ‘পদ্‌তিওল্‌কভ আর ক্রিভশ্‌লিকভ – এই দুই দুশমনের তাহলে কী হবে? এদেরও কি গুলি করেই মারা হবে? . . . ওদের পক্ষে এটা কম হল না!’

‘দলের পাণ্ডা হিশেবে ওদের ফাঁসি দেওয়া হবে!’ সংক্ষেপে উত্তর দিল পপোভ, কেরানির দিকে ফিরে আবার সে বলল, ‘লেখ, আদালতের রায়। আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ . . .’

কেরানির পদবীও পপোভ। মেজরের কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় সে। হাল্‌কা রঙের মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো। মাথা নীচু করে খস্‌খস্‌ করে সে লিখে চলল।

‘তেল বোধহয় ফুরিয়েই গেল। . . .’ কে যেন আক্ষেপ ভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বাতিটা মিটমিট করতে লাগল। পলতে ধোঁয়া ওঠাতে শুরু করল। ঘরের চালে মাকড়সার জালে একটা মাছি আটকে পড়েছিল, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেটা ভনভন করে চলল, কাগজের ওপর খস্‌খস্‌ শব্দে কলম চলতে লাগল, আদালতের কোন এক সদস্য হাঁপানির টানে ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

আদালতের রায়

২৭শে এপ্রিল (১০ই মে), ১৯১৮ সাল
আমরা কার্গিন্‌স্কায়া, বকোভ্‌স্কায়া ও ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া জিলার
নিম্নলিখিত গ্রামসমূহের নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ভাসিলিয়েভ্‌স্কি . . . . স্তেপান মাক্সায়েভ
বকোভ্‌স্কি . . . . নিকলাই ক্রুজিলিন
ফোমিন . . . . ফিওদর কুমভ
উজান এলাকার ইয়াব্লনেভ্‌স্কি . . . . . আলেক্সান্দর কুখ্‌তিন
ভাটি এলাকার দুলেন্‌স্কি . . . . লেভ সিনেভ
ইলিন্‌স্কি . . . . সেমিওন ভলোৎস্কোভ
কন্‌কোভ্‌স্কি . . . . মিখাইল পপোভ
উজান এলাকার দুলেন্‌স্কি . . . . . . ইয়াকভ রোদিন
সেভোস্তিয়ানভ . . . . আলেক্স ফ্রলোভ
মিলিউতিন্‌স্কায়া জিলা সদর . . . . মাক্সিম ফেব্রালেভ
নিকলায়েভ . . . . মিখাইল গ্রোশেভ
ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া জিলা সদর . . . . ইলিয়া ইয়েলান্‌কিন
পনোমারিওভ পল্লী . . . . ইভান দিয়াচেন্‌কো
ইয়েভ্‌লাম্তিয়েভ পল্লী . . . . নিকলাই ক্রিভভ
মালাখভ পল্লী . . . . লুকা ইয়েমেলিয়ানভ
নোভো-জেমৎসেভ . . . . মাত্‌ভেই কনভালভ
পপোভ . . . . মিখাইল পপোভ
আস্তাখভ . . . . ভাসিলি শ্চেগোল্‌কোভ
অর্লভ . . . . ফিওদর চেকুনভ
ক্লিমো-ফিওদরভ্‌স্কি . . . . ফিওদর চুকারিন

ভ. স. পপোভের সভাপতিত্বক্রমে

এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি:

১) মেহনতী জনসাধারণের উপর লুণ্ঠন ও তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার অভিযোগে নিম্নে মোট ৮০ জন ব্যক্তির নামের যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহাদ্দিগের সকলকে শাস্তিস্বরূপ গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে; উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দুইজন – পদ্‌তিওল্‌কভ ও ক্রিভশ্‌লিকভের উপর দলপতি হিসাবে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের বিধি আরোপ করা হইল।

২) উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে মিখাইলোভ্‌স্কি গ্রামের কসাক আন্তোন কালিত্‌ভেনৎসোভকে বেকসুর খালাসের হুকুম দেওয়া হইল।

৩) পদ্‌তিওল্‌কভের বাহিনী হইতে পলায়নকারী এবং অতঃপর ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া জিলা সদরে ধৃত কন্‌স্তান্‌তিন মেল্‌নিকভ, গাব্রিল মেল্‌নিকভ, ভাসিলি মেল্‌নিকভ, আক্সিওনভ ও ভেরশিনিন অত্র রায়ের প্রথম ধারা বলে (মৃত্যুদণ্ডে) দণ্ডিত হইবে।

৪) উক্ত দণ্ড আগামীকাল ২৮শে এপ্রিল (১১ই মে) সকাল ছয়টায় কার্যকরী হইবে।

৫) বন্দীদিগের উপর নজর রাখিবার জন্য নিযুক্ত পাহারাদারদলের ভার সাব-অলটার্ণ সেনিনের উপর বর্তাইল। এতদুদ্দেশ্যে অদ্য সন্ধ্যা ১১ ঘটিকার মধ্যে প্রতিটি গ্রাম হইতে দুইজন করিয়া রাইফেলধারী কসাক তাঁহার আজ্ঞাধীনে প্রেরণ করা হউক। অত্র দণ্ডাজ্ঞা কোন কারণে কার্যকরী না হইলে তাহার দায় আদালতের সদস্যবর্গের উপর বর্তাইবে। প্রতিটি গ্রাম হইতে পাঁচজন করিয়া কসাকের এক একটি প্রহরীদল বধ্যভূমিতে প্রেরিত হইবে, তাহারা দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করিবে।

স্বাক্ষর ভ. স. পপোভ

সমরিক বিভাগের সভাপতি

আ. ফ. পপোভ, করণিক

১৯১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল (প্রাচীন পঞ্জিকামতে) তারিখে
সামরিক আদালতের বিচারে
মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পদ্‌তিওল্‌কভ ও তাহার দলের সদস্যবর্গের

নাম-তালিকা

নং	**জিলা**	**নাম ও পদবী**	**দণ্ড**
১	উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়া	ফিওদর পদ্‌তিওল্‌কভ	ফাঁসি
২	ইয়েলান্‌স্কায়া	মিখাইল ক্রিভশ্‌লিকভ	ফাঁসি
৩	কাজান্‌স্কায়া	আভ্‌রাম কাকুরিন	গুলি
৪	বকানোভ্‌স্কায়া	ইভান লাগুতিন	”
৫	নিজেগরোদ্‌স্কায়া প্রদেশ	আলেক্সেই ইভ. অর্লভ	”
৬	নিজেগরোদ্‌স্কায়া	ইয়েফিম মিখ্‌. ভাখ্‌তেল	”
৭	উস্ত্‌-বিস্ত্রিয়ান্‌স্কায়া	গ্রিগোরি ফেতিসভ	”
৮	মিগুলিন্‌স্কায়া	গাভ্রিল ত্‌কাচভ	”
৯	মিগুলিন্‌স্কায়া	পাভেল আগাফোনভ	”
১০	মিখাইলোভ্‌স্কায়া	আলেক্সান্দর বুব্‌নোভ	”
১১	লুগান্‌স্কায়া	কালিনিন	”
১২	মিগুলিন্‌স্কায়া	কন্‌স্তান্‌তিন ব্রিখিন	”
১৩	মিগুলিন্‌স্কায়া	আন্দ্রেই কনোভালভ	”
১৪	পল্‌তাভ্‌স্কায়া প্রদেশ	কন্‌স্তান্‌তিন কির্স্তা	”
১৫	কতোভ্‌স্কায়া	পাভেল পজ্‌নিয়াকভ	”
১৬	মিগুলিন্‌স্কায়া	ইভান বোল্‌দিরেভ	”
১৭	মিগুলিন্‌স্কায়া	তিমোফেই কলিচেভ	”
১৮	ফিলিম্‌-চেল্‌ব	দমিত্রি ভলোদারভ	”
১৯	চেরনিশেভ্‌স্কায়া	গেওর্গি কার্পুশিন	”
২০	ফিলিম্‌-চেল্‌ব	ইলিয়া কাল্‌মিকোভ	”
২১	মিগুলিন্‌স্কায়া	সাভেলি রিব্‌নিকভ	”
২২	মিগুলিন্‌স্কায়া	পলিকার্প গুরভ	”
২৩	মিগুলিন্‌স্কায়া	ইগ্‌নাত জেম্‌লিয়াকভ	”

২৪	মিগুলিন্স্কায়া	ইভান ক্রাভ্ৎসোভ	”
২৫	রস্তোভ	নিকিফোর ফ্রলোভ্স্কি	”
২৬	রস্তোভ	আলেক্সান্দর কনো-ভালভ	”
২৭	মিগুলিন্স্কায়া	পিওত্র ভিখ্লিয়া-ন্ৎসেভ	”
২৮	ক্লেৎস্কায়া	ইভান জোতভ	”
২৯	মিগুলিন্স্কায়া	ইয়েভ্দোকিম বাব্কিন	”
৩০	মিখাইলোভ্স্কায়া	পিওত্র স্ভিন্ৎসোভ	”
৩১	দোব্রিন্স্কায়া	ইল্লারিওন চেলোবিৎ-চিকভ	”
৩২	কাজান্স্কায়া	ক্লিমেন্তি ড্রোনভ	”
৩৩	ইলোভ্লিন্স্কায়া	ইভান আভিলভ	”
৩৪	কাজান্স্কায়া	মাত্ভেই সাক্মাতভ	”
৩৫	ভাটি এলাকার কুর্মোইয়ার্স্কায়া	গেওর্গি পুপ্কোভ	”
৩৬	তের্নোভ্স্কায়া	মিখাইল ফেভ্রালেভ	”
৩৭	খের্সোন্স্কায়া প্রদেশ	ভাসিলি পান্তেলেইমনভ	”
৩৮	কাজান্স্কায়া	পার্ফিরি লিউবুখিন	”
৩৯	ক্লেৎস্কায়া	দ্মিত্রি শামভ	”
৪০	ফিলোনোভ্স্কায়া	সাফোন শারোনভ	”
৪১	মিগুলিন্স্কায়া	ইভান গুবারেভ	”
৪২	মিগুলিন্স্কায়া	ফিওদর আবাকুমভ	”
৪৩	লুগান্স্কায়া	কুজ্মা গর্শ্কোভ	”
৪৪	গুন্দোরোভ্স্কায়া	ইভান ইজ্ভারিন	”
৪৫	গুন্দোরোভ্স্কায়া	মিরোন কালিনোভ্ৎ-সেভ	”
৪৬	মিখাইলোভ্স্কায়া	ইভান ফারাফোনভ	”
৪৭	কোতোভ্স্কায়া	সের্গেই গোর্বুনভ	”
৪৮	ভাটি এলাকার চির্স্কায়া	পিওত্র আলায়েভ	”
৪৯	মিগুলিন্স্কায়া	প্রকোপি অর্লভ	”
৫০	লুগান্স্কায়া	নিকিতা শেইন	”
৫১	সিনিয়র মেকানিক	আলেক্সান্দর ইয়াসেন্স্কি	”

৫২	রস্তোভ	মিখাইল পলিয়াকভ	”
৫৩	রাজ্‌দোর্‌স্কায়া	দ্‌মিত্রি রগাচোভ	”
৫৪	রস্তোভ	রবার্ট ফ্রাশেন্‌ব্রুডার	”
৫৫	রস্তোভ	ইভান সিলেন্দের	”
৫৬	সামার্‌স্কায়া প্রদেশ	কন্‌স্তান্‌তিন ইয়েফিমভ	”
৫৭	চের্নিশেভ্‌স্কায়া	মিখাইল অভ্‌চিন্নিকভ	”
৫৮	সামার্‌স্কায়া প্রদেশ	ইভান পিকালভ	”
৫৯	ইলোভ্‌লিন্‌স্কায়া	মিখাইল করেৎস্কোভ	”
৬০	কুম্‌শাৎস্কায়া	ইভান করোৎকোভ	”
৬১	রস্তোভ	পিওত্‌র বিরিউকভ	”
৬২	রাজ্‌দোর্‌স্কায়া	ইভান কাবাকোভ	”
৬৩	লুকোভ্‌স্কায়া	তিখন মলিৎভিনভ	”
৬৪	মিগুলিন্‌স্কায়া	আন্দ্রেই শ্‌ভেৎসোভ	”
৬৫	মিগুলিন্‌স্কায়া	স্তেপান আনিকিন	”
৬৬	ক্রেমেন্‌স্কায়া	কুজ্‌মা দিচ্‌কিন	”
৬৭	বাক্‌লানোভ্‌স্কায়া	পিওত্‌র কাবানভ	”
৬৮	মিখাইলোভ্‌স্কায়া	সের্গেই সেলিভানভ	”
৬৯	রস্তোভ	আর্তেম ইভান্‌চেন্‌কো	”
৭০	মিগুলিন্‌স্কায়া	নিকলাই কনোভালভ	”
৭১	মিখাইলোভ্‌স্কায়া	দ্‌মিত্রি কনোভালভ	”
৭২	ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া	পিওত্‌র লিসিকভ	”
৭৩	মিগুলিন্‌স্কায়া	ভাসিলি মিরোশ্‌নিকভ	”
৭৪	মিগুলিন্‌স্কায়া	ইভান ভলখোভ	”
৭৫	মিগুলিন্‌স্কায়া	ইয়াকভ গর্দেয়েভ	”

অপর তিনজন তাহাদিগের ব্যক্তিপরিচয় জ্ঞাপন করে নাই।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের তালিকা লেখা শেষ করে আদালতের রায়ের শেষে আঁকাবাঁকা হাতে 'কোলন' বসিয়ে পাশের লোকটির হাতে কলম গুঁজে দিয়ে কেরানি বলল, 'নাও, সই কর।'

কামড়ে কামড়ে কলমের হাতলটার এমন দুর্দশা হয়েছে যে দেখলে মনে হয় বুঝি পাঠশালার কোন পড়ুয়ার হাতে এককালে পড়েছিল।

নোভো-জেম্‌ৎসেভ গ্রামের প্রতিনিধি কনোভালভ ছাইরঙা জার্মান বনাত

কাপড়ে তৈরি মিলিটারীর আঁটো পোশাকী জামাটা গায়ে দিয়ে এসেছে, জামার কলারের সামনের দু'ধার লাল টকটক করছে। মুখ কাচুমাচু করে হেসে পাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। কালো কুচকুচে, কড়া-পড়া মোটা মোটা আড়ষ্ট আঙুলে সে কলমটা ধরল।

'লেখা-টেখা আমার আবার তেমন আসে না,' বেশ যত্ন করে হাত বুলিয়ে 'ক' অক্ষরটা লিখতে লিখতে সে বলল।

এর পরে সই করল রোদিন। লেখার ব্যাপারে তারও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা গেল। কলম চালানোর কসরত করতে গিয়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল, ঘাম ছুটতে লাগল। অন্য একজন আবার লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিশেবে বেশ জুত করে কলমটা ঝাড়ল, সই করতে গিয়ে তার মুখের ভেতর থেকে জিভটা বেরিয়ে এলো, পরে কাজ শেষ হলে আবার গুটিয়ে নিল। পপোভ ঘসঘস করে অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার নাম সই করল, পদবীর শেষে লম্বা একটা টান মারল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে ভিজে মুখটা মুছল।

'লিস্টিটা এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া দরকার,' হাই তুলতে তুলতে সে বলল।

'এর জন্যে কালেদিন পরপার থেকে আমাদের ধন্যবাদ দেবেন,' কালির লেখায় ভেজা পাতাটা চুনকাম করা সাদা দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে কেরানিকে শুষতে দেখে সেই দিকে তাকিয়ে ছেলে-ছোকরাদের ধরনে রসিকতা করে হেসে সেনিন বলল।

তার সেই রসিকতার জবাব কেউ দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এলো।

'হা ভগবান যিশু. . .' কে একজন বারান্দার অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলল।

ত্রিশ

সে রাতে আকাশের তারাগুলো ফিকে হলুদ দুধাল আলো ছড়াচ্ছিল। তালাবন্ধ দোকানঘরটার ভেতরে গাদাগাদি করা বন্দীদের কারও চোখে প্রায় ঘুম নেই। অল্পস্বল্প কথাবার্তা উঠছে, পরক্ষণেই থিতিয়ে পড়ছে। বদ্ধ বাতাসে আর উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

সন্ধ্যাবেলায় রেড গার্ডদের একজন উঠোনে বেরোবার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল:

'দরজা খোল কমরেড ! বাইরে যেতে হবে, চেপে রাখতে পারছি না যে ! . . .'

লোকটা তার ভেতরের মোটা সুতীর জামাটা প্যান্টের ওপরে ঝুলিয়ে দিয়ে আলুথালু বেশে খালি পায়ে দরজার গায়ের চাবিগলানোর ফুটো ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। সে বারবার বলছিল, 'দরজাটা খোল না কমরেড !'

'ওসব কমরেড-টমরেড নয়! তোর কমরেড হল নেকড়ে,' শেষকালে পাহারা-দারদের মধ্যে একজন বলল।

'দরজা খোল ভাই!' বন্দী সম্বোধনটা পালটাল।

রাতের খাবারের খোঁজে কিছু বুনো হাঁস অন্ধকার আকাশে উড়ছিল। পাহারাদার রাইফেল নামিয়ে রেখে ডানার সাঁই সাঁই আওয়াজ শুনল, সিগারেট শেষ করে চাবির ফুটোয় মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'প্যান্টেই ছেড়ে দাও ইয়ার। এক রাতে সালোয়ার পচে নষ্ট হবে না। সকালে ওই অবস্থাতেই সগ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'আমাদের হয়ে গেল!' দরজার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে হতাশ হয়ে রেড গার্ডটি বলল।

বন্দীরা সকলে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে আছে। এক কোনায় বসে পদ্‌তিওল্‌কভ তার পকেটগুলো ওল্‌টালো, বিড়বিড় করে শাপ-শাপান্ত করতে করতে একতাড়া নোট ছিঁড়তে লাগল। পাশেই শুয়ে ছিল ক্রিভশ্‌লিকভ। নোটগুলো কুটি কুটি করে ছেঁড়া হয়ে গেলে পায়ের জুতো খুলল পদ্‌তিওল্‌কভ, তারপর ক্রিভশ্‌লিকভের কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওরা আমাদের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছে। জোচ্চুরি করেছে শালা শুয়োরের বাচ্চারা! . . . আফশোস হচ্ছে মিখাইলো! যখন ছোট ছিলাম বাবার গাদা বন্দুকটা নিয়ে দনের ওপাড়ে জঙ্গলে শিকার করতে যেতাম। বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হত যেন সবুজ চাঁদোয়ার নীচ দিয়ে হেঁটে চলেছি। জলার ধারে বুনো হাঁসেরা বসে আছে। গুলি করতে গিয়ে কখন কখন ফসকাতাম – তখন যা আফশোস হত! – ইচ্ছে হত গলা ছেড়ে কাঁদি। এই এখন আবার সেই রকম আফশোস হচ্ছে – লক্ষ্য ফসকেছি! তিন দিন আগে যদি রস্তোভ ছাড়তাম তাহলে এমন করে এখানে মরণের মুখে পড়তে হত না। প্রতি-বিপ্লবের সমস্ত চক্রান্তকে আমরা উলটে দিতে পারতাম!'

যন্ত্রণায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাসল ক্রিভশ্‌লিকভ।

'চুলোয় যাক, মারুক আমাদের! এখন আর মরতে ভয় পাই না। . . . শুধু ভয় হয়, পরলোকে দেখা যদি হয়, তুমি আমি কেহ কারে চিনিবে না হায়! . . . সেখানে ফেদিয়া, আমাদের দু'জনের দেখা হবে কিন্তু আমরা একে অন্যের কাছে অচেনা-অজানা হয়ে থাকব। . . . কী ভয়ঙ্কর! . . .'

'আঃ ছাড় দেখি!' ক্রিভশ্লিকভের কাঁধের ওপর তার উত্তপ্ত বড় বড় হাতদুটো রেখে আহতস্বরে গজগজ করে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল। 'সেটা কোন কথা নয়। . . .'

লাগুতিন কাকে যেন তার নিজের গ্রামের কথা বলছিল। তার লম্বাটে মাথার জন্য দাদু যে তাকে 'গোঁজ' বলে ক্ষ্যাপাত, আর এই দাদুই যে একবার তাকে পরের তরমুজ ক্ষেতে তরমুজ চুরি করতে দেখে জোর চাবুক কষিয়েছিল এই রকম নানা গল্প সে বলে যাচ্ছিল।

নানা রকম কথার মালা গাঁথা হতে লাগল সেই রাত্রে। সবগুলোই বিচ্ছিন্ন, ছেঁড়া ছেঁড়া।

বুন্‌চুক বসে ছিল দরজার একেবারে কাছটায়। দরজার ফাঁক দিয়ে যতটা বাতাস আসছিল সাগ্রহে তা-ই সে বুকভরে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এলোমেলো ভাবে অতীতের কত কথাই না তার মনে আসতে লাগল! মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। একটা তপ্ত শলাকার খোঁচা খেয়ে অনেক কষ্টে মা'র সম্পর্কে চিন্তাটাকে সে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল, আন্নার স্মৃতি আর তাদের এই কিছুকাল আগেকার দিনগুলোর দিকে চিন্তার মোড় ঘুরাল। . . . এতে সে শান্ত সমাহিত হয়ে পরম সুখ ও স্বস্তি অনুভব করল। মৃত্যুর কথা ভেবে এখন আর তার তেমন ভয় হচ্ছে না। ওরা যে তার প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে এই চিন্তায় তার শিরদাঁড়া বেয়ে যে একটা অস্পষ্ট কম্পন খেলে যেত, যে ব্যাকুল আর্তি তার মনে জেগে উঠত তা আর সে অনুভব করছে না। একটা তিক্ত যন্ত্রণাদায়ক পথযাত্রার শেষে ক্লান্তি যখন প্রচণ্ড, যখন সারা দেহ এমন ভেঙে আসে যে কোন কিছুতেই মনে আর কোন উত্তেজনা জাগে না, সেই রকম এক নিরানন্দ বিশ্রাম গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কিছু দূরে কয়েক জন বন্দী আলোচনা করছিল মেয়েমানুষদের কথা - প্রেম-ভালোবাসা, ছোট-বড় যে-সমস্ত আনন্দ একে অন্যের হৃদয়কে জড়িয়ে রেখেছে তাই নিয়ে আলোচনা করতে করতে তারা কখনও খুশি, কখনও বা বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল।

পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের কথা বলছে সকলে। . . . তারা বলাবলি করছে এ বছর ফসল বেশ ভালো হয়েছে - গমের ক্ষেতের ভেতরে দাঁড়কাক উড়ে বসলে এখনই চোখে পড়ে না। ভোদ্‌কার জন্য, মুক্তির জন্য তারা ছটফট করছে, পদ্‌তিওল্‌কভকে গালাগাল করছে। কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকের ওপরেই নেমে এলো তন্দ্রার কালো ডানার আড়াল। দেহে মনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে তারা যে যেমন ভাবে পারে - শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে লাগল।

যখন ভোর হয়ে আসছে সেই সময় বন্দীদের মধ্যে কে একজন - ঘুমের

মধ্যে না জাগ্রত অবস্থায় – ভীষণ ভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পূর্ণবয়স্ক কর্কশ মানুষগুলো, যারা সেই ছেলেবেলার পর থেকে চোখের জলের নোনা স্বাদ ভুলে গেছে, তারা যখন কাঁদে তখন কী ভয়ঙ্করই না মনে হয়! সঙ্গে সঙ্গে ঘুম-ঘুম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ধমকে উঠল কয়েকটা কণ্ঠস্বর।

'থামলি হতভাগা!'

'ছিচকাঁদুনে মেয়েমানুষ নাকি!'

'গলার নলী টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হয়! – চোপ্!'

'ছাপোষা লোক... চোখের জল ফেলছে!'

'লোকে ঘুমুচ্ছে... কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?'

যে লোকটা কাঁদছিল এত কথার পর সে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ল, তারপর চুপ করে গেল।

আবার প্রায় নেমে এলো নিস্তব্ধতা। এখানে ওখানে আনাচে কানাচে সিগারেটের আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নেই। গাদাগাদি করে থাকা সুস্থসবল পুরুষমানুষদের গায়ের ঘাম আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে রাত্রিতে ঝরা টাট্‌কা সফেন শিশিরের গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে উঠেছে।

গ্রামের মধ্যে একটা মোরগ ডেকে উঠে ভোরের আবির্ভাব বার্তা ঘোষণা করল। লোকজনের পায়ের শব্দ আর লোহার ঝনঝন শব্দ কানে এলো।

'কে যায়?' পাহারাদারদের মধ্যে কে একজন অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল।

উত্তরে গলা খাঁকারি দিয়ে অল্পবয়সী একজন লোক উৎসাহভরে চটপট বলে উঠল, 'বন্ধুলোক গো। পদ্‌তিওল্‌কভের লোকজনের জন্যে কবর খুঁড়তে চলেছি।'

দোকানঘরের ভেতরে সকলে সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল।

একত্রিশ

কর্ণেট পেত্রো মেলেখভের নেতৃত্বে তাতার্‌স্কি গ্রামের কসাক দলটা মে মাসের ১১ তারিখ ভোরবেলা পনমারিওভ গ্রামে এসে পৌঁছুল।

সারা গ্রাম জুড়ে ঘোরাঘুরি করছে চির্-এর কসাকরা। কেউ কেউ ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে, অনেকে দল বেঁধে চলেছে গ্রামের শেষ প্রান্তে। গ্রামের মধ্যিখানে এসে পেত্রো তার দলটাকে থামাল, সকলকে ঘোড়া থেকে নামার হুকুম দিল। কয়েকজন লোক তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

‘কোত্থেকে আসছ ভাই তোমরা?’ একজন জিজ্ঞেস করল।

‘তাতার্স্কি থেকে।’

‘তোমরা একটু দেরি করে ফেলেছ। . . . তোমাদের সাহায্য ছাড়াই পদ্‌তিওল্‌-কভকে ধরে ফেলেছে ওরা।’

‘কোথায় ওরা? এখান থেকে কি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে?’

‘ওই ওখানে আছে। . . .’ ছোট দোকানঘরটার গড়ানে চালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাসতে হাসতে কসাকটা বলল, ‘খাঁচার ভেতরে একপাল মুরগীর মতো বসে আছে।’

খ্রিস্তোনিয়া, গ্রিগোরি মেলেখভ এবং আরও কয়েকজন কাছে এগিয়ে এলো।

‘কোথায় ওদের পাঠানো হচ্ছে তাহলে?’ খ্রিস্তোনিয়া জানতে চাইল।

‘যমের বাড়ি।’

‘কী? কী? . . . কী সব আজেবাজে কথা বলছ?’ লোকটার ওভারকোটের কিনারা চেপে ধরল গ্রিগোরি।

‘বরং তুমিই আরও বেশি করে বাজে বক মশাই!’ গ্রিগোরির শক্ত হাতের মুঠো থেকে আস্তে করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে সে উত্তর দিল। ‘ওই যে তাকিয়ে দেখ, ওদের জন্যে ফাঁসিকাঠও তৈরি হয়ে গেছে।’ দুটো অবাড়ন্ত উইলোগাছের মাঝখানে যে ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়েছিল সেই দিকে দেখিয়ে দিল কসাকটা।

‘ঘোড়াগুলো বাড়িঘরের উঠোনে তুলে বেঁধে রাখ!’ পেত্রো হুকুম দিল।

* * *

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের প্রান্তে পুরুষ আর মেয়েমানুষদের ঘন ভিড় জমেছে। সকাল ছয়টায় রেড গার্ডদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে খবর পেয়ে পনমারিওভ গ্রামের লোকজন সোৎসাহে চলেছে, যেন কোন এক দুর্লভ মজার দৃশ্য দেখতে। কসাক-মেয়েরা যে ভাবে সাজগোজ করেছে দেখে মনে হয় বুঝি তারা উৎসবে যোগ দিতে এসেছে, অনেকে আবার বাচ্চাকাচ্চাও সঙ্গে এনেছে। গোরুচরানোর মাঠের চারধারে লোকে ভিড় করে আছে, ফাঁসিকাঠ আর একটানা লম্বা হাত চারেক গভীর গর্তটার ধারে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছে। গর্তটার এক পাশে স্তূপ করে ফেলা দোআঁশলা মাটির ওপর বাচ্চারা দাপাদাপি করছে। কসাকরা এ ওর সঙ্গে মিলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মহা উৎসাহে আসন্ন প্রাণদণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করছে, মেয়েরা করুণমুখে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে।

মেজর পপোভ এলো। ঘুমজড়ানো চোখ, গম্ভীর চেহারা। শক্ত দাঁতের পাটি বার করে সিগারেট চিবুতে চিবুতে টানতে লাগল সে। ভাঙা গলায় পাহারাদারদলের কসাকদের হুকুম দিল।

'গর্তের কাছ থেকে লোকজন হটাও! স্পিরিদোনভকে বল প্রথম কিস্তির লোকগুলোকে নিয়ে আসতে!' ঘড়ি দেখল সে। একপাশে সরে গিয়ে লক্ষ করতে লাগল পাহারাদারদের ধাক্কা খেয়ে কসাক জনতার ভিড়টা পায়ে পায়ে পিছু হটছে, শেষকালে জায়গাটাকে ঘিরে একটা ঢালাই করা চিত্রবিচিত্র অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্পিরিদোনভ কসাকদের একটা দল নিয়ে দ্রুত দোকানঘরটার দিকে চলল। পথে পেত্রো মেলেখভের সঙ্গে দেখা হতে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের গ্রাম থেকে কোন ভলান্টিয়ার পাওয়া যাবে?'

'কিসের ভলান্টিয়ার?'

'আদালতের রায় বহাল করার জন্যে জল্লাদ চাই যে!'

'না, ওরকম লোক আমাদের নেই, হবেও না!' স্পিরিদোনভ রাস্তা আটকে দাঁড়ালে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কর্কশ ভাবে পেত্রো উত্তর দিল।

কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল। টুপির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা সোজা চুলগুলোকে হাতের তালু দিয়ে পাট করতে করতে এক পাশে কাত হয়ে পেত্রোর দিকে এগিয়ে এলো মিত্‌কা কোর্‌শুনভ। নলখাগড়ার মতো সবুজ রঙের আধবোজা চোখদুটো পিটপিট করতে করতে সে বলল, 'আমি গুলি করতে রাজী আছি। . . . 'না' বলছ কেন? আমি রাজী আছি,' হেসে সে মাটিতে চোখ নামাল। 'আমাকে কিছু বুলেট দাও। একটা মাত্র কার্তুজের ক্লিপ আছে আমার।'

মিত্‌কার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গেল আন্দ্রেই কাশুলিন – তার ফেকাসে কঠিন মুখে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ও ক্রূঢ়তার ছাপ; আর গেল কাল্‌মিক ধাঁচের চেহারার ফেদোত বদভ্‌স্কোভ।

চারদিক থেকে কসাকদের পাহারায় ঘেরাও হয়ে আসামীদের প্রথম দলটা দোকানঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গাদাগাদি করে দাঁড়ানো বিশাল জন সমুদ্রের মধ্যে ফিসফিসানি ও চাপা কোলাহলের ঢেউ খেলে গেল।

সামনে চলেছে পদ্‌তিওল্‌কভ। খালি পা। পরনে কালো বনাত কাপড়ের চুস্ত্‌, ওপরের দিকটা ঢিলে, গায়ে চামড়ার কোর্তা, বোতাম খোলা, হাঁ হয়ে আছে। সাদা ধবধবে বিশাল পাদুটো দৃঢ় ভঙ্গিতে কাদার মধ্যে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে, পা হড়কে যেতে বাঁ হাতটা সামান্য সামনে উঠিয়ে টাল সামলাচ্ছে। তার পাশে পাশে পা ছেচঁড়াতে ছেঁচড়াতে চলেছে ক্রিভশ্‌লিকভ, মুখটা মড়া মানুষের মতো ফেকাসে। তার চোখে অস্বাভাবিক শুকনো দীপ্তি, যন্ত্রণাকাতর মুখের

পেশী তিরতির করে কাঁপছে। দুই কাঁধের ওপর আলগা করে চাপানো গ্রেটকোটটার সামনের দিক খোলা। কাঁধ জড়সড় করে ক্রিভশ্‌লিকভ সেটাকে ভালো করে গায়ে জড়ানোর চেষ্টা করছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন তার ভয়ানক শীত করছে। ওদের দু'জনের গায়ের জামাকাপড় কেন যেন খুলে নেওয়া হয় নি। কিন্তু অন্য সকলের গায়ে ভেতরের জামা ছাড়া আর কিছু নেই। বুনচুক ভারী ভারী পা ফেলে চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তাল ফেলে পাশাপাশি চলছে লাগুতিন। দু'জনেই খালি পা। লাগুতিনের ছেঁড়া ইজেরের ফাঁক দিয়ে পাতলা চুলে ঢাকা পায়ের নলির হলদে চামড়া দেখা যাচ্ছে। তার ঠোঁটদুটো কাঁপছে। চলতে চলতে সে সলজ্জভাবে ছেঁড়া জায়গাটা ঢাকার চেষ্টা করছে। বুনচুক পাহারাদারদলের মাথার ওপর দিয়ে ধূসর মেঘের আবরণে ঢাকা দূর আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তার শান্ত শীতল চোখদুটো কিসের এক প্রত্যাশায় অস্থিরভাবে মিটমিট করছে, কলারখোলা জামার নীচে চওড়া হাতের তালুটা ঢুকিয়ে ঘন লোমের জঙ্গলে ঢাকা বুকে হাত বুলোচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন এমন একটা কিছুর প্রত্যাশায় আছে যা ঘটা অসম্ভব অথচ ঘটলে আনন্দের হত। . . . কেউ কেউ মুখে একটা উদাসীন নিস্পৃহ ভাব রক্ষা করে চলার চেষ্টা করছে। সাদাচুল বলশেভিক অর্লভ সোৎসাহে হাত নাড়াচ্ছে, ঘৃণাভরে পাহারাদার কসাকদের পায়ের কাছে থুতু ফেলছে। কিন্তু দু-তিনজনের চোখে এমন চাপা ব্যাকুলতা, বিকৃত মুখে এমনই সীমাহীন আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠেছে যে পাহারাদাররা পর্যন্ত দৈবাৎ চোখে চোখ পড়ে যেতে সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

দ্রুত পায়ে চলেছে। ক্রিভশ্‌লিকভ হড়কে পড় পড় হতে পদ্‌তিওল্‌কভ তাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা আর লাল-নীল টুপি পরা কসাক জনতার সমুদ্রটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ভ্রূকুটি করে সেই দিকে তাকিয়ে পদ্‌তিওল্‌কভ জোর গলায় অশ্লীল গালাগাল করে উঠল, তারপর এক পাশ থেকে লাগুতিন তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার ?'

'এই ক'দিনে তোমার চুল সাদা হয়ে গেছে। . . . ইস, দু'পাশের রগের চুলে সাদা-সাদা ছোপ লেগেছে!'

'চুল সাদা হবে না?' সরু কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে অনেক কষ্টে দম নিয়ে সে আবার বলল, 'এমন চমৎকার অবস্থার মধ্যে পড়লে চুল সাদা হবে না ত কী ? নেকড়ে যে নেকড়ে, খাঁচায় পুরলে সে-ও বুড়িয়ে যায়, আর আমি ত মানুষ।'

এর পর তাদের আর একটি কথাও হল না। জনতা ঘন হয়ে সামনে এগিয়ে আসতে থাকে। ডান দিকে চোখে পড়ে তাদের কবর দেওয়ার জন্য খোঁড়া হলদে মাটির লম্বাটে খাদটা। স্পিরিদোনভ হুকুম দিল:

'থাম!'

পদ্‌তিওল্‌কভ সঙ্গে সঙ্গে একপা সামনে এগিয়ে গেল। সমাগত গ্রামবাসীদের সামনের সারির ওপর ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি বুলাল সে। বেশির ভাগেরই পাকা চুল পাকা দাড়ি। যুদ্ধ-ফেরতারা পেছনে কোথায় যেন আছে – হয়ত বিবেকের দংশনে পীড়িত। পদ্‌তিওল্‌কভ তার ঝোলো গোঁফ সামান্য নাড়িয়ে চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় বলতে লাগল, 'বুড়ো কর্তারা, আমাদের কমরেডরা কেমন করে মৃত্যু বরণ করে আমাকে আর ক্রিভশ্‌লিকভকে তা দেখার সুযোগ দিন। আমাদের পরে ফাঁসি দেবেন, এখন আমরা আমাদের বন্ধু আর কমরেডদের দেখতে চাই, যাদের মনের জোর কম তাদের সাহায্য করতে চাই।'

চারদিকে এমন স্তব্ধতা নেমে এলো যে টুপির ওপর বৃষ্টির ফোঁটার টপ্‌টপ্ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

মেজর পপোভ পেছনে কোথায় যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাকের হলদে ছোপ ধরা দাঁতের পাটি বার করে হাসছে। তার কোন আপত্তি নেই। মাতব্বররা একেকজন নানা স্বরে আলাদা করে চেঁচিয়ে সম্মতি জানাল।

'ঠিক আছে!'

'দেখুক!'

'গর্ত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও ওদের!'

ক্রিভশ্‌লিকভ ও পদ্‌তিওল্‌কভ ভিড়ের ভেতরে পা বাড়াল, জনতা সরে গিয়ে মাঝখানে সরু রাস্তা করে দিল। তারা খানিকটা দূরে এসে দাঁড়াল। চারদিক থেকে লোকে ঘন হয়ে ঘিরে রাখল তাদের, শত শত চোখের উৎসুক দৃষ্টি তাদের বিঁধতে লাগল। তারা দেখতে লাগল কসাকরা আনাড়ির মতো রেড গার্ডদের ধরে ধরে গর্তটার দিকে পিছন দিয়ে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। পদ্‌তিওল্‌কভ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ক্রিভশ্‌লিকভকে না-কামানো লিকলিকে ঘাড়টা বাড়িয়ে ডিঙ মেরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে।

একেবারে বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে বুনচুক। সে খানিকটা কুঁজো হয়ে আছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, মাটিতে নামানো চোখের দৃষ্টি সেখান থেকে আর তুলছে না। তার পেছনে নীচু হয়ে গায়ের জামার প্রান্তটা ধরে ছেঁড়া ইজেরটা ঢাকা দেওয়ার জন্য লাগুতিন টানাটানি করছে। তৃতীয়জন তাম্বোভের ইগ্‌নাত। তারপরে ভান্‌কা বোল্‌দিরেভ – চেহারা এত পালটে গেছে যে দেখে চেনার উপায় নেই, বয়স যেন অন্তত বিশ বছর বেড়ে গেছে। পঞ্চম জনকে দেখে চেনার চেষ্টা করল পদ্‌তিওল্‌কভ। অনেক কষ্টে চিনতে পারল – কাজানস্কায়া জেলার মাত্‌ভেই সাক্‌মাতভ, সেই কামেনস্কায়া থেকে শুরু করে যে ছিল পদ্‌তিওল্‌কভের সমস্ত

সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার সঙ্গী। আরও দু'জন গর্তের দিকে এগিয়ে এলো, গর্তের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেত্রো লিসিকভ মারমুখী মূর্তি ধারণ করেছে, উদ্ধত ভঙ্গিতে হাসছে, চেঁচিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল করছে, আঁকশির মতো করে পাকানো নোংরা হাতের মুঠিটা স্তব্ধ জনতার দিকে তুলে শাসাচ্ছে। করেৎস্কভের মুখে কোন কথা নেই। শেষজনকে চ্যাংদোলা করে আনতে হল। মাথা পেছনে হেলিয়ে সে পিছু হটার চেষ্টা করতে লাগল, নির্জীব পাদুটো মাটিতে ঘষটাতে লাগল, যে কসাক পাহারাদাররা তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসছিল তাদের আঁকড়ে ধরল, চোখের জলে ভেজা মুখটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'ছেড়ে দাও, ও ভাই, ভগবানের দোহাই, ছেড়ে দাও! ও দাদারা! ও ভাইসব! . . . করছ কী তোমরা? জার্মান যুদ্ধে আমি চারটে ক্রস পেয়েছি! . . . আমার ছেলেপুলে আছে! ভগবান, আমি কোন দোষ করি নি! . . . আঃ, করছ কী তোমরা, বল ত? . . .'

আতামান রক্ষিবাহিনীর একজন লম্বামতো কসাক তার বুকে হাঁটুর গুঁতো মেরে গর্তের দিকে ঠেলে দিল তাকে। একমাত্র তখনই লোকটাকে চিনতে পারল পদ্‌তিওল্‌কভ, চিনতে পেরে সে আঁতকে উঠল। অমন করে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল সে আর কেউ নয় – পদ্‌তিওল্‌কভের বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ রেড গার্ডদের একজন। হাল্‌কা রঙের গোঁফ, দেখতে সুন্দর, মিগুলিনস্কায়ার এই কসাক ছোকরাটি ১৯১০ সাল থেকে পল্টনে আছে; চারটে পর্যায়ের সেন্ট জর্জ ক্রসের সবগুলোরই অধিকারী সে। পাহারাদাররা তাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, কিন্তু সে আবার পড়ে গেল। কসাকদের পায়ের কাছে চার-হাত-পায়ে সে হামাগুড়ি দিতে লাগল, তাদের যে বুট তার মুখে লাথি মারছিল শুকনো চড়চড়ে ঠোঁট দিয়ে তা-ই চেপে ধরতে লাগল, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাঙা ভাঙা রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'আমাকে মেরো না! দয়া কর তোমরা! . . . আমার তিন তিনটে বাচ্চা . . . মেয়ে আছে একটা। . . . ও ভাই, ও দাদারা! . . .'

আতামান রক্ষিবাহিনীর কসাকটার হাঁটু জড়িয়ে ধরল সে, কিন্তু লোকটা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক পাশে সরে গেল, লোহার নাল লাগানো জুতোর গোড়ালি দিয়ে সপাটে এক লাথি কষে দিল তার কানের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে সাদা কলার বেয়ে পড়তে লাগল।

'ওকে দাঁড় করিয়ে দাও!' ক্ষিপ্ত হয়ে স্পিরিদোনভ চিৎকার করে উঠল।

কোন রকমে ওরা তাকে টেনে তুলল, খাড়া করে দিয়ে দৌড়ে আবার পিছিয়ে এলো। উলটো দিকের সারিতে স্বেচ্ছাসেবকরা রাইফেল তুলে তৈরি হয়ে

দাঁড়াল। জনতা আর্তনাদ করে উঠে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। মেয়েদের মধ্যে কে একজন বিশ্রী গলায় হাউমাউ করে উঠল।...

ওই ধোঁয়া ধোঁয়া ধূসর আকাশটাকে, বুনচুক যার বুকে উনত্রিশটা বছর বিচরণ করেছে সেই বিষাদাচ্ছন্ন ধরণীটাকে একবার, আরও একবার তাকিয়ে দেখার ভারী ইচ্ছে হল তার। চোখ তুলতে সে দেখতে পেল হাত দশেক দূরে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে কসাকদের সারিটা। ওদের মধ্যে একজন - বিশাল চেহারা, টুপির নীচ থেকে সামনের চুলের গোছা সাদা ধবধবে সরু কপালের ওপর এসে পড়েছে, সবুজ চোখদুটো কোঁচকানো; লোকটা ঠোঁটে ঠোঁট শক্ত করে চেপে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সোজা তাক করে আছে তার দিকে - বুনচুকের বুকের দিকে। গুলি ছোটার ঠিক আগে আগে বুনচুকের কানের পর্দা ছাপিয়ে ফেটে পড়ল আর্তকণ্ঠের একটা চিৎকার। বুনচুক ঘাড় ফেরাল - মুখে মেছেতার দাগওয়ালা অল্পবয়সী এক মেয়েমানুষ ভিড়ের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো, কোলের বাচ্চাটাকে একহাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, অন্যহাতে তার চোখ চাপা দিয়ে সে ছুটতে লাগল গ্রামের দিকে।

এলোমেলো গুলি চলার পর গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা আটজন যখন গড়িয়ে পড়ল তখন জল্লাদরা ছুটে এলো গর্তের কাছে।

মিত্কা কোর্‌শুনভ যে রেড গার্ডটিকে গুলি করেছিল সে তখনও মাটিতে পড়ে ছটফট করছে, নিজের কাঁধ নিজেই কামড়াচ্ছে; তাই দেখে লোকটার ওপর আরও একটা গুলি চালিয়ে দিয়ে আন্দ্রেই কাশুলিনকে ফিসফিস করে বলল, 'দ্যাখ, এই শালার দিকে চেয়ে দ্যাখ একবার! নিজের কাঁধ নিজেই কামড়ে রক্তারক্তি করে ফেলল, কিন্তু মরল একটা নেকড়ের মতো - টুঁ শব্দটি না ক'রে।'

আরও দশজন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হল গর্তের কাছে।...

দ্বিতীয় ঝাঁক গুলি ছোটার পর মেয়েরা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ধাক্কাধাক্কি করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে হাত ধরে বাচ্চাদের হিড়হিড় করে টানতে টানতে পালাতে শুরু করল। পুরুষরাও অনেকে সরে পড়তে লাগল। এই বীভৎস হত্যালীলা, মুমূর্ষুদের আর্তচিৎকার আর কাতরানি, যারা তাদের পালার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের কান্নাকাটি - অতিমাত্রায় ভয়ঙ্কর এই মর্মন্তুদ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অনেকেই সেখান থেকে সরে গেল। শুধু রয়ে গেল মৃত্যু দেখে দেখে যাদের প্রাণ কঠিন হয়ে গেছে সেই যুদ্ধ-ফেরতারা আর বুড়ো মাতব্বরদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কট্টর ধরনের, তারা।

খালি পা খালি গা রেড গার্ডদের একেকটি নতুন নতুন দল আনা হয়, সঙ্গে

সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদেরও বদল হয়, গুলির ঝাঁক ছুটতে থাকে, ফাঁকে ফাঁকে আলাদা আলাদা গুলির শুকনো কট্‌কট্‌ আওয়াজ – যারা অর্ধমৃত হয়েছে তাদের সাবাড় করে দেওয়া হচ্ছে। গুলি চলার মাঝখানের ফাঁকে প্রথম দফার মৃতদেহগুলোর ওপর তাড়াহুড়ো করে মাটি চাপা দেওয়া হতে লাগল।

যারা তাদের পালার অপেক্ষায় আছে পদ্‌তিওল্‌কভ ও ক্রিভশ্‌লিকভ এগিয়ে এসে তাদের উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কথা এখন আর আগের সেই অর্থ বহন করতে পারল না। বোঁটা শুকিয়ে আসা গাছের পাতার মতো যাদের জীবন আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝরে পড়বে, এখন, ঠিক এই মুহূর্তে আর এক উপলব্ধি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ছিন্নভিন্ন জনতার ভিড় ঠেলে গ্রিগোরি মেলেখভ গ্রামের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় পদ্‌তিওল্‌কভের মুখোমুখি পড়ে গেল সে। পদ্‌তিওল্‌কভ সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে পেছনে সরে গেল।

'আচ্ছা, তুমিও এখানে মেলেখভ?'

একটা নীলচে পাণ্ডুর আভা ছড়িয়ে পড়ল গ্রিগোরির দুই গালে। সে থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, দেখতেই ত পাচ্ছ। . . .'

'তা ত দেখছিই . . .' হঠাৎ এক প্রবল ঘৃণায় ফেটে পড়ে গ্রিগোরির পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে পদ্‌তিওল্‌কভ বলল। 'নিজের ভাই-বন্ধুদেরই গুলি করে মারছ? . . . ভোল পালটেছ? . . . তুমি কী মানুষ, বুঝলাম এখন।' গ্রিগোরির আরও কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের আর ওদের – দুই দলেরই সেবা করছ বুঝি? যে বেশি দাম দিতে পারে, তাই না? ছ্যাঃ, ছ্যাঃ!'

গ্রিগোরি তার জামার আস্তিন চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'গ্লুবোকায়ার লড়াইয়ের কথা মনে আছে? . . . অফিসারদের কেমন ক'রে গুলি ক'রে মারা হয়েছিল মনে আছে? . . . তোমারই হুকুমে মারা হয়েছিল ত! অ্যাঁ? এবারে তার ফল ভুগতে হবে তোমাকে! তাই বলি কি। দুঃখু করো না! একমাত্র তুমিই অন্যের ছালচামড়া ছাড়াবে তাই কি হয়? তোমার দিন শেষ হয়েছে দন গণকমিসার পরিষদের সভাপতিমশাই! শালা বজ্জাত! ইহুদীদের কাছে বেচে দিয়েছিস কসাকদের! বুঝলে ত? আরও শুনতে চাও?'

গ্রিগোরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্তোনিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'চল, ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে যেতে হয়। বেরিয়ে পড়া দরকার! এখানে আমাদের কিছু করার নেই। হা ভগবান, লোকজনের কী দশা হয়েছে আজকাল! . . .'

ওরা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পদ্‌তিওল্‌কভের গলা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

যুদ্ধ-ফেরতা লোকজন আর মাতব্বররা তাকে ঘেরাও করে রেখেছে, তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবেগে গলা চড়িয়ে চিৎকার করছিল পদ্‌তিওল্‌কভ।

'তোমরা অজ্ঞ . . . অন্ধ! চোখে দেখতে পাও না তোমরা! অফিসাররা তোমাদের ধাপ্পা দিয়েছে, তোমাদের দিয়ে তোমাদের ভাই-বন্ধুদের খুন করাচ্ছে! তোমরা ভাবছ আমাদের খুন করলেই সব শেষ হয়ে যাবে? মোটেই না! আজ তোমরা কর্তৃত্ব পেয়েছ, কিন্তু কালই তোমাদের গুলি খেয়ে মরতে হবে! সমস্ত রাশিয়া জুড়ে সোভিয়েত সরকার কায়েম হবে। তখন আমার কথা মনে পড়বে তোমাদের! অযথা তোমরা আমাদের রক্তপাত ঘটাচ্ছ! তোমরা মূর্খ!'

'অন্যদেরও আমরা এই ভাবেই শায়েস্তা করব!' মাতব্বরদের একজন লাফিয়ে উঠে পাল্টা জবাব দিল।

'সবাইকে ত আর গুলি করে সাবাড় করতে পারবে না, বুড়োকর্তা!' পদ্‌তিওল্‌কভ হাসল। 'গোটা রাশিয়াকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারবে না। নিজের মাথা সামলাও! পরে টনক নড়বে তোমাদের, কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে!'

'তুমি আমাদের শাসিও না!'

'আমি শাসাচ্ছি না। আমি তোমাদের পথ দেখাচ্ছি।'

'তুমি নিজেই অন্ধ, পদ্‌তিওল্‌কভ। মস্কো তোমার চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে!'

শেষ কথাগুলো শুনবার জন্য গ্রিগোরি আর দাঁড়াল না। প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল যেখানে তার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল সেই আঙিনার দিকে। গুলির আওয়াজ শুনে ছটফট করছিল ঘোড়াটা। গ্রিগোরি আর খ্রিস্তোনিয়া তাদের ঘোড়ার জিনের কষি টেনে বাঁধল, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল, একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে টিলা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল।

এদিকে পনমারিওভে তখনও ঝলকে ঝলকে গুলি ছুটছে, দমকে দমকে উড়ছে ধোঁয়া: ভিওশেন্‌স্কায়া, বকোভ্‌স্কায়া, ক্রাস্নকুত্‌স্কায়া আর মিলিউতিন্‌স্কায়ার কসাকরা কাজান্‌স্কায়া, মিগুলিন্‌স্কায়া, রাজ্‌দোর্‌স্কায়া, কুম্‌শাত্‌স্কায়া আর বাক্‌লানোভ্‌-স্কায়ার কসাকদের গুলি করে মেরে চলছে।

গর্তটা চুড়োচুড়ি বোঝাই হয়ে উঠল। মাটি চাপা দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে সমান করা হল। কালো মুখোস পরা দু'জন অফিসার পদ্‌তিওল্‌কভ আর ক্রিভশ্‌লিকভকে ফাঁসিকাঠের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

সগর্বে মাথা তুলে পদ্‌তিওল্‌কভ বীরদর্পে উঠে দাঁড়াল ফাঁসিকাঠের নীচের টুলটার ওপরে। জামার কলারের বোতাম খুলে উন্মুক্ত করে দিল তামাটে রঙের পুরুষ্টু ঘাড়টা, তারপর সাবান মাখানো ফাঁসটা নিজে হাতে গলায় পরল – একটা পেশীও তার কাঁপল না। ক্রিভশ্‌লিকভকে সামনে আনার পর অফিসারদের মধ্যে

একজন তাকে টুলের ওপর উঠতে সাহায্য করল, সে-ই ফাঁসটা পরিয়ে দিল তার গলায়।

'মরার আগে শেষ কথা বলতে দাও আমায়,' পদ্‌তিওল্‌কভ অনুরোধ জানাল।

'বল!'

'বলে যাও, বলে যাও!' যুদ্ধ-ফেরতারা চেঁচাল।

ভিড়টা ততক্ষণে অনেক পাতলা হয়ে গেছে। সেদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে সে বলল, 'আমাদের মরার দৃশ্য দেখার জন্যে কত কম লোক রয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ! বিবেকের জ্বালা আছে না! আমরা খেটে-খাওয়া মানুষদের জন্যে, তাদের স্বার্থে, জেনারেলদের ঘুঘুর বাসা ভাঙার জন্যে লড়াই করেছি। নিজেদের জানের পরোয়া আমরা করি নি। এখন তোমাদের হাতেই আমরা মরতে বসেছি! কিন্তু তার জন্যে তোমাদের কোন অভিশাপ দিচ্ছি না! . . . ওরা তোমাদের চূড়ান্ত ধোঁকা দিয়েছে! বিপ্লবী সরকার কায়েম হবে, তখন তোমরা বুঝতে পারবে সত্য কার দিকে ছিল। প্রশান্ত দনের সেরা সন্তানদের তোমরা এই গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়েছ। . . .'

লোকজনের গুঞ্জন এত বেড়ে উঠতে লাগল যে পদ্‌তিওল্‌কভের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট শোনাল। এই সুযোগে একজন অফিসার চটপট লাথি মেরে পদ্‌তিওল্‌কভের পায়ের নীচের টুলটা ফেলে দিল। পদ্‌তিওল্‌কভের বিশাল ভারী দেহটা একটা মোচড় খেয়ে ঝপ্ করে নীচে ঝুলে পড়ল, কিন্তু পাদুটো মাটিতে ঠেকে গেল। ফাঁস শক্ত হয়ে গলা আটকে ধরতে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, ফলে ঠেলে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করল সে। খালি পায়ের বুড়ো আঙুল ভিজে ধামসানো মাটিতে ঠেকিয়ে ডিঙ মেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে খাবি খেতে লাগল, স্তব্ধ হতবাক জনতার ওপর কোটর থেকে বেরিয়ে পড়া চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল, 'কী করে মানুষকে ঠিকমতো ফাঁসিতে ঝোলাতে হয় তাও শেখো নি দেখছি। . . . আমাকে যদি একাজ করতে বলা হত, তাহলে তোর পা মাটিতে ঠেকতো না, স্পিরিদোনভ। . . .'

তার মুখ থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজলা উঠতে লাগল। মুখোসধারী অফিসার দু'জন আর ধারেকাছে যে কসাকরা ছিল তারা সবাই মিলে অনেক কষ্টে অবসন্ন ভারী দেহটাকে ঠেলেঠুলে টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল।

ক্রিভশ্‌লিকভের কথা শেষ করতে দেওয়া হল না। তার পায়ের নীচ থেকে টুলটা ছিটকে গিয়ে একজনের ফেলে যাওয়া একটা কোদালের গায়ে ঠং করে লাগল। শুকনো ধরনের পেশীবহুল দেহটা অনেকক্ষণ ধরে দুলতে লাগল, কখনও কুঁচকে এমন দলা পাকিয়ে গেল যে হাঁটুদুটো দুমড়ে থুতনি স্পর্শ করল, কখনও বা ফের টানটান হয়ে খিঁচুনি তুলল। . . . পদ্‌তিওল্‌কভের পায়ের তলা থেকে

যখন দ্বিতীয়বার টুল ঠেলে ফেলে দেওয়া হল তখনও কেঁপে কেঁপে উঠে তার দেহটা প্রাণের সাড়া দিচ্ছে, তার কালো জিভটা মুখ থেকে ঠেলে একপাশে বেরিয়ে এসে তখনও নড়াচড়া করছে। বিশাল ভারী দেহটা আবারও ঝপাং করে নীচে পড়ে গেল, চামড়ার কোর্তার কাঁধের সেলাই পটপট করে ছিঁড়ে গেল, এবারেও পায়ের আঙুলের ডগা মাটিতে গিয়ে ঠেকল। কসাক জনতা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। কেউ কেউ ক্রুশ-প্রণাম করতে করতে সরে পড়তে লাগল। সকলে এত বেশি হতবিহ্বল হয়ে পড়ল যে পদ্‌তিওল্‌কভের মুখটা লৌহকঠিন আকার ধারণ করতে মুহূর্তের জন্য যেন ভূতগ্রস্তের মতো আতঙ্কিত চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল।

কিন্তু পদ্‌তিওল্‌কভ তখন বাক্‌শক্তিরহিত। ফাঁস তার গলায় শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। সে কেবল বিস্ফারিত চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল, তার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল মুখটা বাঁকিয়ে, যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টায় ভয়ঙ্কর ভাবে মোচড় দিয়ে দেহটা ওপরে তুলল।

কে একজন শেষকালে এর একটা সমাধান খুঁজে বার করল, কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। তাড়াহুড়ো করে পদ্‌তিওল্‌কভের পায়ের তলা থেকে চাপ চাপ মাটি তুলে ফেলতে লাগল। কোদালের প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে দেহটা আরও সোজা হয়ে ঝুলতে লাগল, আরও বেশি লম্বা হয়ে আসতে লাগল গলাটা, আর সামান্য কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ তার মাথাটা পেছন দিকে কাত হয়ে ভেঙে পড়ল। তার আড়াইমনী ওজনের দেহটা দড়িতে আর ধরে রাখতে পারছিল না। আড়কাঠে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে দড়িটা আস্তে আস্তে দুলতে লাগল, আর পদ্‌তিওল্‌কভের দেহটাও যেন তার রক্তজমাট কালো মুখ, লালা আর চোখের জলের তপ্ত ধারায় ভেজা বুক হত্যাকারীদের দেখানোর উদ্দেশ্যেই সেই দুলুনির তালে তাল মিলিয়ে চার ধারে ঘুরপাক খেয়ে চলল।

বত্রিশ

মিশ্‌কা কশেভয় আর গোলাম কেবল পরের রাত্রে কার্গিন্‌স্কায়া ছেড়ে বেরোতে পারল। স্তেপের প্রান্তরে পুঞ্জপুঞ্জ কুয়াশা ফেনিয়ে উঠছে, গিরিখাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়ে ঢুকছে, গড়িয়ে গড়িয়ে গভীর খাত আর গহ্বর বয়ে নামছে, খাড়া পাহাড়ের শিরাগুলোকে লেহন করছে। হাল্‌কা পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশার আড়ালে জ্বলজ্বল করছে টিলাগুলো। কচি ঘাসের মধ্যে তিতির পাখি ডাকছে। ঊর্ধ্ব আকাশে চাঁদ

ভাসছে নলখাগড়ার জঙ্গল আর শেওলায় ঢাকা পুকুরে পূর্ণপ্রস্ফুটিত এক শতদলের মতো।

হাঁটতে হাঁটতে ভোর হয়ে এলো। মাথার ওপর সপ্তর্ষিমণ্ডলের জ্যোতি ম্লান হয়ে এসেছে। শিশির পড়তে শুরু করেছে। ভাটির ইয়াব্‌লনোভ্‌স্কি গ্রামের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। আর এক ক্রোশ যেতে পারলেই গ্রাম, এমন সময় টিলার ঝুঁটির ওপর কসাকরা তাদের নাগাল ধরে ফেলল। ছয়জন ঘোড়সওয়ার তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। মিশ্‌কা আর গোলাম ছুটে এক পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘাস সেখানে ছোট ছোট, তাছাড়া চাঁদের আলোও উজ্জ্বল। . . . তারা ধরা পড়ে গেল। তাদের উলটো দিকে তাড়া করে নিয়ে চলল ঘোড়সওয়াররা। শ'খানেক হাত নীরবে চলল। . . . তারপর একটা গুলির শব্দ। গোলামের পাদুটো জড়িয়ে গেল, নিজের ছায়া দেখে ভয় পেয়ে ঘোড়া যেমন কাত হয়ে যায় তেমনি সে চলতে লাগল একপাশে কাত হয়ে। তারপর যে ভাবে সে পড়ে গেল তাকে ঠিক পড়ে যাওয়া বলে না – অনেকটা যেন আনাড়ির মতো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল পথের ধারের নীলচে-ধূসর সোমরাজগুল্মের মধ্যে।

মিশ্‌কা আরও মিনিট পাঁচেক হেঁটে চলল। দেহে তার আর কোন সাড় রইল না। কানের ভেতরটা ঝিনঝিন করছে, শুকনো মাটিতে যেন পা জড়িয়ে যাচ্ছে।

শেষকালে সে জিজ্ঞেস করল, 'গুলি করছিস না কেন শুয়োরের বাচ্চারা? অমন তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারছিস কেন?'

'চল্‌ চল্‌, এগিয়ে চল্‌! কোন কথা নয়!' একজন কসাক দরদভরা কণ্ঠে বলল। 'চাষাটাকে আমরা মেরে ফেললাম, কিন্তু তোর ওপর মায়া হল। জার্মান যুদ্ধে বারো নম্বর রেজিমেণ্টে ছিলি ত?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ ত, আবারও সেই বারো নম্বরেই কাজ করবি। তোর এই ছোকরা বয়স। একটু বয়ে গেছিস এই যা, ও কিছু নয়। আমরা চিকিচ্ছে করে তোকে সারিয়ে তুলব!'

তিন দিন পরে কার্গিন্‌স্কায়া জেলা সদরের এক ফৌজী আদালতে মিশ্‌কার 'চিকিচ্ছে' করা হল। তখনকার দিনের আদালতে শাস্তির দু'রকম ব্যবস্থা ছিল: গুলি করে মারা আর চাবকানো। যাদের গুলি করে মারার হুকুম হত তাদের রাতের বেলায় লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যাওয়া হত, আর যাদের সংশোধনের আশা থাকত তাদের বারোয়ারিতলায় প্রকাশ্যে চাবকানো হত।

রবিবার সকাল থেকে, বারোয়ারিতলার মাঝখানে বেঞ্চি পাতার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে জমা হতে লাগল। দেখতে দেখতে বারোয়ারিতলা লোকে লোকারণ্য

হয়ে উঠল, লোকে বেঞ্চির ওপর, চালাঘরের সামনে স্তূপাকার করা তক্তা, বাড়িঘর ও দোকানপাটের চালের ওপর ভিড় করে এসে দাঁড়াল। প্রথমে শাস্তি দেওয়া হল গ্রাচোভের পাদ্রীর ছেলে আলেক্সান্দ্রভকে। কট্টর বলশেভিক বলে তার নামডাক, গুলি করে মারলেই উপযুক্ত শাস্তি হত। কিন্তু বাপ ভালো পাদ্রী, সকলের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, তাই আদালত পাদ্রীর ছেলেকে গোটা কুড়ি ঘা বেত মারার রায় দিল। প্যান্ট খুলে ন্যাংটো করে আলেক্সান্দ্রভকে বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হল। একজন কসাক তার পায়ের ওপর বসল (হাতদুটো বেঞ্চের তলায় বেঁধে রাখা হয়েছে), এক গোছা উইলো ডালের বেত নিয়ে দু'জনে দাঁড়াল দু'পাশে। চাবুক মারা শেষ হয়ে গেলে আলেক্সান্দ্রভ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, প্যান্টটা টেনে তুলে চারদিকে ঘুরে ঘুরে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানাল। তাকে যে গুলি করে মারা হয় নি এতেই সে বেজায় খুশি, তাই সকলকে নমস্কার আর কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল:

'আপনাদের অসীম দয়ার কথা মনে থাকবে বুড়ো কর্তারা!'

'ওতেই যেন তোমার মঙ্গল হয়!' কে একজন উত্তর দিল।

বারোয়ারিতলা জুড়ে একসঙ্গে সকলে এমন হো-হো করে হেসে উঠল যে একটু দূরে চালার নীচে যে বন্দীরা বসে ছিল তাদের মুখে পর্যন্ত হাসি দেখা গেল।

দণ্ডমতো মিশ্‌কার ওপরও গরম গরম কুড়িটা বেতের বাড়ি পড়ল। কিন্তু যন্ত্রণার চেয়েও লজ্জা আর অপমানের জ্বলুনি অনেক বেশি। গোটা এলাকার ছেলেবুড়ো সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সালোয়ার টেনে তুলল মিশ্‌কা। যে কসাকটা তাকে বেত মেরেছিল প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে তাকে বলল, 'বিচারটা কিন্তু ঠিক হল না।'

'কেন, কী হল?'

'ভাবল আমার মাথা, আর জবাবদিহি করতে হল কিনা পাছাকে! এ কলঙ্ক যে সারা জীবনেও ঘুচবে না!'

'ও কিছু নয়। লজ্জার মাথা খেয়েও দিব্যি থাকা যায়,' সান্ত্বনা দিল কসাকটা। তারপর শাস্তি দেওয়ার পর দুটো ভালো কথা বলে উৎসাহ দেওয়ার ইচ্ছায় তাকে বলল, 'তুমি কিন্তু বেশ শক্ত আছ ছোকরা। বার দুয়েক আমি ভালোমতোই ঘা বসিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ঠিক কাঁদবে, কিন্তু চেয়ে দেখি – না। বুঝলাম এর মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বার করা যাবে না। এই সেদিন বেত মারলাম একটাকে – বাছাধন দিল হেগে সঙ্গে সঙ্গে। তার মানে সহ্যি করার কোন ক্ষ্যামতাই নেই।'

পরের দিনই আদালতের রায় অনুযায়ী মিশ্‌কাকে ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

গোলামের কবর দেওয়া হল দু'দিন পরে। গাঁয়ের মোড়ল ইয়াবলনেভ্‌স্কায়ার

দু'জন কসাককে কবর খোঁড়ার জন্য পাঠিয়ে দিল। তারা একটা অগভীর গর্ত খুঁড়ল, গর্তের ভেতরে পা ঝুলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তামাক টানতে লাগল।

'এখানকার মাটি বড্ড শক্ত,' একজন বলল।

'শক্ত বলে শক্ত! একেবারে লোহা! বাপের জম্মে কেউ এ জমি চষে নি। অনেক কাল পড়ে থেকে থেকে শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে গেছে।'

'যাক. . . ছোকরা এখানে ভালো মাটিতেই শুয়ে থাকবে – টিলার মাথায়। . . . আলো বাতাস অনেক আছে, শুকনো খটখটে জায়গা। . . . শিগ্‌গির পচবে না।'

ঘাসের সঙ্গে লেপটে জড়সড় হয়ে পড়ে ছিল গোলামের মৃতদেহটা। সেই দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা, তারপর উঠে দাঁড়াল।

'পায়ের জুতোজোড়া খুলে নেব?'

'নয়ত কী? বুটজোড়া এখনও দিব্যি ভালো আছে।'

খ্রীষ্টীয় বিধিমতে পশ্চিমদিকে মাথা করে ওকে কবরের মধ্যে শুইয়ে দিল ওরা। ঘন করে চাপ চাপ কালো মাটিতে ঢেকে দিল কবরটা।

'পায়ে মাড়িয়ে একটু সমান করে দেব?' কবরের ওপরকার মাটি কানায় কানায় সমান হয়ে যেতে ওদের দু'জনের মধ্যে যার বয়স একটু কম, সে জিজ্ঞেস করল।

'না, দরকার নেই। যেমন আছে তেমনি থাক,' অন্যজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। 'কেয়ামতের দিনে ফেরেশ্‌তারা যখন শিঙা বাজিয়ে ডাকবে তখন বেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে পারবে। . . .'

দু সপ্তাহের মধ্যে কচি সোমরাজগুল্ম আর বুনোঝোপে ঢেকে গেল ছোট্ট টিবিটা। টিবির মাথায় দুলতে লাগল বুনো জইয়ের ডাঁটা, একপাশে সরষে জাতীয় গাছের ফুলে ফুলে জমকাল হলুদ রং ধরল, এখানে ওখানে ফুত্‌নার মতো ঝুলতে লাগল রঙবেরঙের নানা ফুল। 'টিম' লতা 'স্পার্জ' আর অন্যান্য মিষ্টি লতাপাতার গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। এর কিছুকাল পরেই কাছের এক গ্রাম থেকে এক বুড়ো সেখানে এসে হাজির হল। কবরের মাথার ওপর গর্ত খুঁড়ে সদ্য চাঁছা ওকগাছের একটা খুঁটি পুঁতে তার ওপর এক ভজনালয় খাড়া করল। ভজনালয়ের তিনকোনা চালার নীচে অন্ধকারের মধ্যে মৃদু দীপ্তি দিতে লাগল দেবজননীর বিষাদপ্রতিমা। নীচে, চালের কার্ণিশের গায়ে কালো রঙের প্রাচীন স্লাভনিক অক্ষরে সুন্দর কারুকাজ করে লেখা একটা বাণী:

> অনাচারে যবে সব যায় রসাতলে,
> সেদিন কি ভাই ভায়ের বিচার চলে?

বুড়ো ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। কিন্তু স্তেপের উন্মুক্ত প্রান্তরে সেই ভজনালয় তার চিরন্তন বিষণ্ণ রূপ নিয়ে রয়ে গেল – যারাই ওই পথ দিয়ে যাবে তাদের চোখে ধরিয়ে দেবে বিষাদের ঘন ছায়া, মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে এক অস্পষ্ট অব্যক্ত আকুলতা।

তারও পরে সেই মে মাসেই ভজনালয়ের সামনে দুটো পুরুষ-তিতির মারামারি করতে লাগল, পাকা শ্যামাধানের শ্যামল রাশি তছনছ করে নীল সোমরাজ ঝোপের মধ্যে সঙ্গিনীর অপেক্ষায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা করে ফেলল। মাদী পাখির জন্য, বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য, প্রেম-ভালোবাসা আর বংশবৃদ্ধির অধিকারের জন্য তারা লড়াই করে চলল। তারও কিছুকাল পরে ওই ভজনালয়েরই সামনে লম্বা লম্বা ঘাসের গোছা আর বুড়ো ঝাঁকড়া সোমরাজের আচ্ছাদনের নীচে মাদী তিতির ধোঁয়াটে নীল ছিটছিট নয়টা ডিম পাড়ল, চকচকে পালকভর্তি ডানার আড়ালে ঢেকে, নিজের দেহের উষ্ণতা দিয়ে তা দিতে বসল সেই ডিমের ওপর।
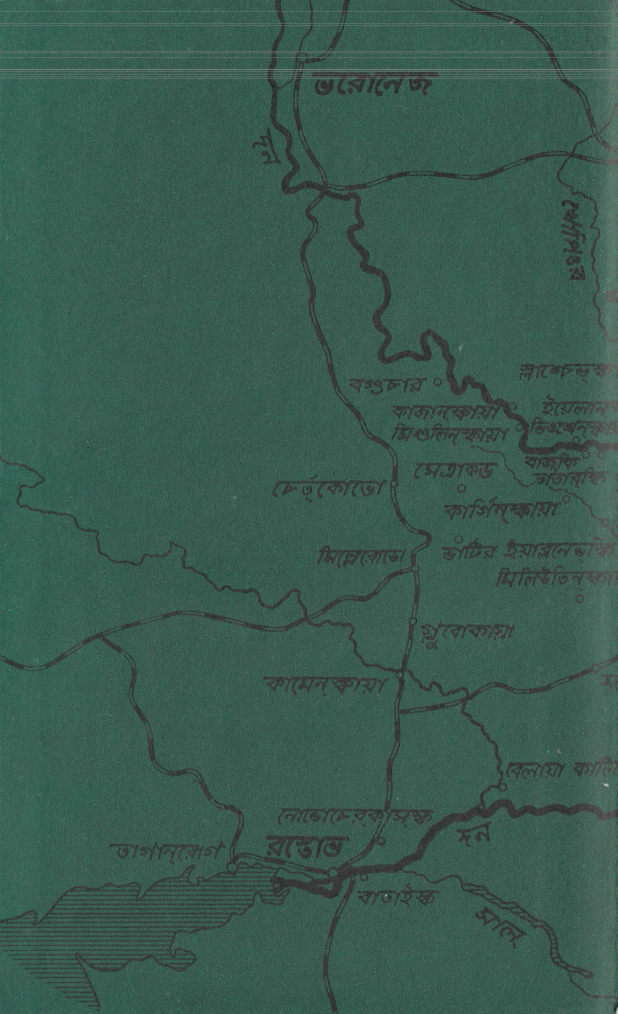
সারাতভ
ভোলগা
লাল দরী
মেদ্‌ভেদিৎসা
কামিশিন
কুমিল্‌কেন্‌স্কায়া
উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া
উস্ত-খোপিওর্‌স্কায়া
ত্সারিৎসিন
চির
ভোলগা

মিখাইল শোলখভ

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ও নোবেল পুরস্কারবিজয়ী লেখক মিখাইল শোলখভের (১৯০৫-১৯৮৪) 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসটি সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক রচনা। দন-কসাকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক এমন সমস্ত চরিত্রের ভাগ্য ও জীবনের গতিবিধি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অক্টোবর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর প্রবল ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছে; তিনি দেখিয়েছেন সমাজ-জীবনে, মানুষের চৈতন্যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের এক জটিল সংগ্রাম। শোলখভ তাঁর নিজের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমার আগ্রহ মানুষে - যে-মানুষ সামাজিক ও জাতীয় মহাপ্লাবনের মধ্যে পড়েছে, তাতে। . . . আমার মনে হয় এই সব মুহূর্তে মানুষের চরিত্র কেলাসিত হতে থাকে। . . .

'আমি চাই, আমার বইগুলি যেন মানুষকে ভালো হতে, তার চিত্ত আরও নির্মল ও বিশুদ্ধ করে তুলতে, মানবতাবাদ ও মানবপ্রগতির আদর্শের জন্য সক্রিয় সংগ্রামের প্রয়াস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।' (মিখাইল শোলখভ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ থেকে।)

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো